বিষাক্ত সুন্দর ফুল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মডার্ন কলাম
১০/২এ. টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৬৮ / এপ্রিল ১৯৬১
প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, ক[illegible]তা-৯
ম[illegible]কঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, [illegible]
[illegible]গণেশ বসু

অনামিত্র সেনগুপ্ত

এবং

অর্চিতা সেনগুপ্তকে

শুভেচ্ছাসহ—

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের :

বসন্ত রাতের ঝড়

'বিষাক্ত সুন্দর ফুল' বেরিয়েছিল অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার একটি শারদীয়া সংখ্যায়। 'শঙ্খবিষ' চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। 'আততায়ী' বেরিয়েছিল শারদীয় কলেজ স্ট্রিট পত্রিকায়। ছয়ের দশকের শেষাশেষি সারা দেশে সার্বিক অস্থিরতা এবং দ্বন্দ্বের যে অভিঘাত শুরু হয়েছিল, এই সব উপন্যাসের মধ্যে তারই প্রতিফলন থেকে গেছে। তাই এদের কথাবস্তুতে অনিবার্যভাবে থ্রিলারধর্মী বিন্যাস লক্ষ করা সম্ভব। তবে প্রথম উপন্যাসটিতে অতীন্দ্রিয় রহস্যের যেটুকু ছায়া পড়েছে, তার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সমস্যা হল, সমাজ ও পারিপার্শ্ব থেকে ব্যক্তির অস্তিত্বে কীভাবে যেন এক রহস্যময় আদিম শক্তি এসে হানা দেয়, তার কোনও ব্যাখ্যা সরলীকৃত করার অর্থ হয় না। কোনও সুন্দর ফুল নিজে কি জানে তার পরাগে-পরাগে প্রকৃতি ছড়িয়ে রেখেছে মারাত্মক বিষ ?

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বিষাক্ত সুন্দর ফুল

তাকে দেখলে আপনার সহজ মনে হত না। সে সহজ মেয়ে ছিল না।

এই বলে গগন তার সত্তরবছরের প্রাজ্ঞ চোখদুটোর দৃষ্টি নদীর ওপারে রাখল। এখন সে আকাশ দ্যাখে, নাকি সবুজ পাটক্ষেত, বোঝার উপায় নেই। নদীর জল কুলেকুলে ভরা। সেই হলদে গাঢ় জলের ওপর অনেকক্ষণ থেকে একটা শঙ্খচিল ঘুরঘুর করছে। সওয়ারিবাহী ঘাটের নৌকোর ওপর দিয়ে তার ছায়া বারবার চমক দিয়ে যাচ্ছে। প্রিয়নাথ দেখল, শঙ্খচিলটা ছোঁ দিয়ে ছোট্ট কী একটা মাছ তুলল ঠোঁটে। আর ঠিক সেইসময়েই ওপারের গাছপালা থেকে একজোড়া শিকরে বাজ ছুটে এল। শঙ্খচিলটা উজানের বাঁক লক্ষ্য করে পালাতে থাকল। তার পালানোর মধ্যে যে অসহায় ভাবটুকু অনুমান করা যায়, প্রিয়নাথকে তা হাসাল।

গগন বলল—হাসির কথা তো বটেই। ধরিত্তি খুব সহজ মেয়ে ছিল না। ওই যে বটতলা দেখছেন, ওখানে তাকে ফেলে দিয়েছিল। শেয়ালশকুনে খায়। তারপর থেকে দিনেদুপুরেও পারতপক্ষে কেউ একলা ওখানে যেতে সাহস করে না। এমন কি, এই যে আমাকে দেখছেন, আমিও না।

প্রিয়নাথ শিকরে বাজদুটোকে অনেকটা ঘুরে ফিরতে দেখছিল। সামনে ওপারে শিমুল গাছটায় হয়তো ওদের আস্তানা। মৃগাঙ্কবাবুর কথাটা এ মুহূর্তে মাথায় এসে গেল তার। গাঁয়ে ঢুকেছেন কতক্ষণ হয়ে গেল, ফেরার নাম নেই। মৃগাঙ্কবাবুর পিঠে বন্দুক আছে। কথা আছে, দুজনে ওপারের বিলে পাখি মারতে যাবে। ঘাটের বটতলার নিচে বাঁশের মাচায় বসিয়ে রেখে গেছেন। গেছেন তো গেছেন।

আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? গগন দ্রুত জাল বোনা শুরু করে ফের। তার বিশাল ফ্যাকাসে থাবায় কাঠিটা ছটফট করতে থাকে।—ধরিত্তির মেয়েকে দেখেও ধরিত্তিকে বুঝতে পারলেন না? হাড়ে-হাড়ে মায়ের অভ্যেসগুলো নিয়ে জন্মেছে। বয়স হয়েছে, চোখে ভালো দেখতে পাইনে। রাতবিরেতে নৌকো নিয়ে বেরোই না। তাহলে অনেক খেলা দেখতে পেতাম। কুসমি মাকে পেয়েছে।

কী নাম বললে? ধরিত্তি? প্রিয়নাথ আনমনে শুধোয়।

হুঁ।

তার মানে—ধরিত্রী?

তাই হবে। বঙ্কুবাবু—আপনাদের মিগাঙ্কবাবুর বাবা নাকি ওই নাম দেন। আমরা জানতাম ধরা। কেউ বলত ধরি। আমার বিয়ের বছর ওরা এসেছিল বিহার থেকে।

প্রিয়নাথ একটু কৌতূহলী হয়।—বিহার থেকে?

হ্যাঁ। জাতে চাঁইমোড়ল। ওই যে দেখছেন—ওই বাড়িগুলো, ওদেরই। শাকসব্জী ফলমূলের চাষ করে। ধরিত্তি তাদেরই একজনা ছিল। কিন্তু হলে কী হবে? রক্তে কী একটা ছিল ওর। স্বামীটা ছিল থুত্থুড়ে বুড়ো। হাঁপানির রুগী। সে আমলে তো এমন পাকা রাস্তাঘাট ছিল না। মোটরগাড়ি তো দূরের কথা, সাইকেলও দেখা যেত না। বঙ্কুবাবুর কথা আলাদা। জোতজমিওলা শিক্ষিত মানুষ। তিনিই যা সাইকেলে চেপে নক্রোশ ভেঙে শহরে যেতেন। আর ছিল ঘোড়া। তো ধরিত্তি তার স্বামী বুধিরামকে টাট্টু চাপিয়ে এনেছিল। বুধিরামের দূরসম্পর্কের ভাই তখন এই কালুখাঁর দিয়াড়ে এসে জুটেছে। বঙ্কুবাবুর মাটি। ধরিত্তি কী মোহিনী লাগাল, দেড়বিঘে মাটি গেয়ে গেল। শুনেছি, একপয়সাও সেলামী লাগেনি। সেলামী তো ধরিত্তির সেই কীরকম চোখজোড়া! বলে গগন চাপা হাসে।

প্রিয়নাথ বাঁদিকে ঘুরে গ্রামের দিকে তাকায়। মৃগাঙ্কবাবুর দেরি হচ্ছে। ঘন সবুজ আমকাঁঠাল আর লিচুর বাগানে ঘেরা সুন্দর ছবির মতো গ্রাম। অবশ্য কিছুদিন আগেই বর্ষায় পচে ভুট হয়েছে। কাদা থিক থিক করছে এখনও অনেক জায়গায়। তবে এই ধূসর নরম মাটির জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতা প্রচণ্ড। ডাইনে মাঠে পাকা আউশ সবে তুলে নিয়েছে। কোথাও কোথাও পাট কাটা হয়ে গেছে। সাদা বকগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরছে সেখানে। বাবলাবনের বনচড়ুইদের কিচির-মিচির শব্দ স্পষ্ট কানে আসছে। এই সকালেই রোদ বড্ড চড়া হয়ে যাচ্ছে। ঘাম ফুটছে। অবশ্য নদীর ধার এবং বটের ছায়া বলে আরামও আছে কিছু। বাতাস খুব শান্তভাবে বইছে। একটু তফাতে চার পাঁচটা চা-পানবিড়ি আর খাবারের দোকান। সেখানে ভিড় নেই বিশেষ। যা জমেছিল, বাস ছেড়ে যাওয়ার পর কমে গেছে। বাসটা ফিরবে সেই দুটোয়। তিনটেয় ফের রওয়ানা হবে। শেষ পাড়ি দিয়ে ফিরবে একেবারে রাত আটটায়। পাশেই একটা তিনদিকঘেরা আটচালায় ওদের আপিস। সেখানে পাটের গাঁইট পাহাড় জমে রয়েছে।

গগন বলে—চোখ দেখে মানুষ চেনা যায়, কী বলেন? আ মার মাঝেমাঝে মনে হত, ধরিত্তি মানুষ ছিল না। হ্যাঁ—তা একদিক থেকে ছিল না বলা যায় বৈকি। আপনি ডাইনি দেখেছেন কখনও?

না তো।

সেআমলে পাড়াগাঁয়ে ডাইনি জন্মাত। মায়ের কোলে সুন্দর ফুটফুট ছেলে দেখলে তারা চোখ দিয়ে রক্ত শুষে খেত। ছেলে নীল হয়ে ঝিমোতে ঝিমোতে মারা পড়ত।

হ্যাঁ, সেসব গল্প অনেক শুনেছি।

কিন্তু সেসব ধরিত্তি যৌবন ফুরোলে শুরু করেছিল। একবার রক্তের স্বাদ পেলে যা হয়। তার যৌবনে সে উলঙ্গ হয়ে—বিশ্বাস করুন, একেবারে উলঙ্গ হয়ে মাথায় ডালা

চাপাত। তাতে থাকত ধুপচি। ধুপচিতে আগুনের আঙার। মুঠোমুঠো ধুপ-গুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে রাতদুপুরে বেরিয়ে পড়ত মাঠে বা পথেঘাটে। সেকালে লোকে এত ভীতু ছিল, ভাবতে পারবেন না। ওই দেখে সবাই ঘরে ঢুকে খিলকপাট আঁটত।

প্রিয়নাথ আরও কৌতূহলী হয়।—এমন কেন করত ও ?

গগন আনমনে মুখ নামিয়ে বলে—জানি না। হয়তো তন্তর-মন্তরের ব্যাপার, হয়তো ধাপ্পা।

ধাপ্পা কেন ?

ধরিত্তি গোড়ারদিকে আসলে ছিল চুন্নি। সেবার গাঁয়ে মড়ক লেগেছে প্রচণ্ড। বমিপায়খানা আর মরণ। দাহ হয় না, গোর পায় না—সব মড়া নদীর ধারে ওইখানটায় ফেলে দেয় সবাই। রাতদুপুরে ভাবলাম, যা হবার হবে—মাছটাছ গাঁয়ে কেউ খায় না বটে, শহরে গেলে বেচা যাবে। ঘরে অনটন চলছে। জাল নিয়ে বেরোলাম। বেশ জ্যোছনা আছে। চাঁদ টগবগ করছে মাথার ওপর। যেই পথে নেমেছি, কী একটা দৌড়ে আসছে দেখলাম। পাশ দিয়ে অমানুষী চেরা গলায় কীরকম ডাক ডেকে দৌড়ে গেল—উলঙ্গ, মাথায় এলো চুল, জ্যোছনায় স্তনদুটো দুলতেও দেখলাম। আমার গা বাজল। কিন্তু রাগ হল ভীষণ। ধরিত্তিকে চিনতে পেরেছিলাম কি না। অমনি জাল ফেলে তাড়া করলাম! সে কী দৌড় ওর! মাঠে গিয়ে ধরে ফেললাম। হুঁ—ধরিত্তি।···গগন চুপ করল। ঠোঁটের কোণায় হাসির ঝিলিক।

প্রিয়নাথ বলে—তারপর ?

আপনি ভদ্রলোক মানুষ। শুনতে খারাপ লাগবে। তারপর কী হওয়া উচিত বুঝে নিন। তবে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগল ধরিত্তি। আমি শুনিনি। আমার রাগ হয়েছিল প্রচণ্ড।

কেন অমন করে, বলল না ?

বলল। বলল, আগের জন্মে কামাখ্যার ডাকিনী ছিল। সেই অভ্যাস। তবে কী সাংঘাতিক মেয়ে দেখুন, কী বিশ্বাসঘাতিনী! বঙ্কুবাবুর বাড়ি গেছে একদিন রাত্রিবেলা। সবে ওনারা খেয়ে শুতে যাবেন। গরমের মাস। উঠোনে বারান্দায় গল্পগুজব করছেন। আচমকা ধরিত্তি উলঙ্গ হয়ে ঢুকে ওর সেই অমানুষী ডাকটা ডাকল। অমনি সবাই ঘরে ঢুকে খিলকপাট আঁটল। বঙ্কুবাবু সেরাতে ছিলেন না—শহরে মামলা চলছিল। উকিলবাড়ি ছিলেন। তা ধরিত্তি করল কী, যতসব এঁটো থালাবাসন ছিল রান্নাঘরের বারান্দায়, সব নিয়ে পালাল। বঙ্কুবাবু ফিরে এসে কী করেছিলেন, মনে নেই। কী বা করবেন ? ওনাকে তো গোড়াতেই গিলে খেয়েছিল।

প্রিয়নাথ একটু আগে খেয়া পেরিয়ে যেতে দেখেছে সেই ধরিত্রীর মেয়ে কুসমি বা

কুসুমকে। এখন সেই চেহারা দেখতে পায়। আঁটো, নিটোল গড়ন, একটু হাল্কাও বটে, ছিপছিপে আর মাজাভারি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। টানা চোখদুটো—ঠিকই বলেছে গগন, কী যেন অমানুষিক দৃষ্টির আলোয় ঈষৎ ধূসর, ঈষৎ নীল। ব্রেসিয়ার ছিল কি? প্রিয়নাথের মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, আশ্চর্য সুন্দর একটি যুবতী সে দেখেছে।

নাই পেতে পেতে অবশেষে ধরিত্তি যা হবার হল। দুষ্টু সব চেলাও জুটিয়ে ফেলল। ওই যে শ্মশানের বটগাছটা দেখছেন, যেরাতে আমি ওর ডগায় আগুন জ্বলতে দেখেছি—তার সকালেই শুনেছি এলাকায় কারো বাড়ি ডাকাতি হয়েছে। সে অবশ্যি ধরিত্তির পাকাচুলের বয়সের কথা। অবশেষে পুলিশের টনক নড়ল। ফাঁদ পেতে ধরিত্রীকে ধরা হল। জেল খাটল ছ'বছর। ফিরল যখন তখন থুত্থুড়ে বুড়ি, কুঁজী। তাড়া করার সময় ওর কোমর ভেঙে দিয়েছিল পুলিশ।

ওর মেয়ে কোথায় ছিল তখন?

মেয়ে মান্যবর মোড়লের বাড়িতে ছিল। সবাই জানে, বঙ্কুবাবু ভরণপোষণ দিতেন গোপনে। ধরিত্তি ফিরলে মেয়েকে গছিয়ে দিল সে। তবে ধরিত্তির চরম লাঞ্ছনার বাকি ছিল। বঙ্কুবাবু নেই—মারা গেছেন। কুঁড়েঘরে ধরিত্তির মড়া পচে ভূত হচ্ছে। কুসমি সবার হাতেপায়ে ধরে কান্নাকাটি করে বেড়াচ্ছে। জাতে ওরা চাঁই মোড়ল। আমাদের কেউ তো ছোঁবে না। ওদিকে ওর জাতও ওকে কবে থেকে পতিত করে বসে আছে, তারাও ছোঁবে না। তখন কী হল জানেন? ধরিত্তির পায়ে বিচুলির দড়ি বেঁধে টানতে টানতে বের করল কুসমি। বাড়ির নিচে নদী। গরমের খটখটে মাস। দিব্যি ফেলে দিতে পারত চড়ায়। পুঁতেও দিতে পারত। তা সে করল না। টানতে টানতে গাঁয়ের রাস্তা ঘুরিয়ে এখানে আনল। তারপর এখান থেকে নিয়ে গেল ওই শ্মশানে। কত লোক দেখল হাঁ করে। আমিও দেখছিলাম। ধরিত্তির মুখটা আকাশপানে—খোলা চোখ, সেই অমানুষী দৃষ্টি—আর সাদা চুলগুলো ঘষা খাচ্ছে মাটিতে, প্রায় উলঙ্গ শরীরটা—থুঃ!

থুথু ফেলে গগন হঠাৎ থামে। তারপর ভুরু কুঁচকে দূরের কিছু দেখতে দেখতে ফের বলে—আমি ধরিত্তির মড়া পোড়ানোর খরচ দিতাম। কুসমি আমাকে তো কিছু বলেনি।

প্রিয়নাথ একটু হাসে।—ও তোমাকে বাবা বলে ডেকে গেল, শুনলাম!

এ্যাঁ? হ্যাঁ। কুসমি আমাকে বাবা বলে। এমনিতে ভারি মিষ্টি মেয়েটা। ভারি ভালো। কিন্তু হলে কী হবে? মা-ই ওকে খেয়েছে। মধ্যে মধ্যে ভর ওঠে। চুল নাড়া দিয়ে মাথা দুলিয়ে খেলতে বসে। কী সব আজগুবি কথা বলে।

প্রিয়নাথ চমকে ওঠে।—সে কী!

তাই তো বলছিলাম এতক্ষণ। সেই হিস্‌ট্রিই তো শোনালাম। কুসমির চোখদুটো দেখলেন না? আমার তো ভয় হচ্ছিল, যেভাবে আপনার দিকে তাকাচ্ছিল। নতুন

মানুষ আপনি।…গগন ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে ওঠে।

ওর চলে কী ভাবে ?

কেন ? সেই দেড়বিঘে ক্ষেত ভিটের সঙ্গে। শাকসব্জি ফলায়। ছাগল পোষে। সপ্তায় দুদিন হাটে যায়। ভালই চলে।

বিয়েটিয়ে করেনি ?

একবার করেছিল। ও তো জাতছাড়া—একঘরে। যাকে বিয়ে করেছিল, সে ওর জাতের নয়। শহর থেকে এনেছিল ছোকরাকে। কদিন পরেই কুসমির কাণ্ডকারখানা দেখে—নাকি কেউ বলে, বেধড়ক পিটুনি খেয়েই পালায়। আর আসেনি। ও ডাকিনী—বাবুমশাই, কামরূপ কামাখ্যা ছাড়া ওর যোগ্য জুড়ি নাই।…গগন জোরে হেসে ওঠে ফের।

প্রিয়নাথ কুসমি বা কুসুমকে স্মরণ করে। কোথায় গেল খেয়া চেপে ?

এতক্ষণে মৃগাঙ্ককে দেখা গেল। গ্রাম থেকে বেরিয়ে পাকা সড়কে উঠল। তার পাশে পাশে একটা কালো সিড়িঙ্গে মতো লোক আসছে। তার দুহাতে দুটো মোরগ। সে মৃগাঙ্ককে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। মৃগাঙ্ক নির্বিকার আসছে।

কাছে এসে মৃগাঙ্ক বলল—প্রিয়বাবু মোরগ খাবেন নাকি ?

মোরগ ? প্রিয়নাথ একটু হাসল।…কেন ? বেরোবেন না তাহলে ?

নিশ্চয় বেরোব। মানে বেরিয়ে তো পড়েইছি। তবে এই মোরগদুটোও কাস্টডিতে রেখে দেওয়া যায়। খালি হাতে ফিরলে কাজ দেবে। রাখব ?

আপনার ইচ্ছে। কত দাম বলছে ?

দশটাকা।

প্রিয়নাথ অবাক হল। অতবড় দুটো মোরগ মাত্র দশটাকায়! অথচ মৃগাঙ্ক যেন দরাদরি করতে চায়।

মোরগওলা প্রিয়নাথের দিকে পড়ল।—রেখে দিন সার, খুব ভালো জাত। এত সস্তায় আর হয় না। নেহাৎ অভাবে বেচে দিচ্ছি। শহরে নিয়ে যেতে পারলে ডবল দাম হত।

মৃগাঙ্ক বলল—হত। কিন্তু খরচাটা হিসেব করেছিস তো ? ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রির সামিল। যা, আমার খামারে নিয়ে গিয়ে রেখে আয়। নবীনকে বলবি, বেঁধে রাখতে।

লোকটা বলল—যাচ্ছি বাবু। টাকাটা ?

মৃগাঙ্ক খচে গেল।—টাকা তোর জন্যে পকেটে নিয়ে বেরিয়েছি ব্যাটা! ওবেলা গিয়ে নিয়ে আসিস। উঠুন প্রিয়বাবু।

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে বলল—বাবু, টাকাটা এখন পেলে ভালো হত। আপনার দিব্যি, বিশ্বাস করুন—একটা নয়াপয়সাও নাই ঘরে। চাল ডাল কিনতে হবে।

রাতউপোস দিনউপোস চলছে।

মৃগাঙ্ক আরও বিরক্ত হয়ে বলল—তোদের অভাব শালা এ জীবনে আর ঘুচবে না।···তারপর ওপাশে চায়ের দোকানটার দিকে ঘুরে কাকে চেঁচিয়ে বলল—এই ফটিক! একে দশটা টাকা দে তো বাবা। যা—ওর কাছে নি গে। আর সোজা খামারবাড়ি চলে যা। নবীনকে বলবি বেঁধে রাখতে।

লোকটা চলে গেল। প্রিয়নাথ মাচা থেকে নেমে বলল,—আপনার নিজের একটা নৌকো থাকা উচিত ছিল মৃগাঙ্কবাবু।

বাবার ছিল একটা পানসি। আমার দরকার হয় না।···বলে মৃগাঙ্ক হেসে উঠল।···আমি মশাই স্পিডি মানুষ। আরও দশবিশটে হাত পা থাকলে বেঁচে যেতুম। আরে, হালদারমশাই যে! এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি!

গগন নমস্কার করে বলল,—বিলপারে চললেন বুঝি? যান—খুব হাঁস নামছে শুনলাম। নতুনবাবুকে দেখিয়ে আসুন আপনার রাজত্ব!

পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল মৃগাঙ্ক। প্রিয়নাথ ও গগনকে দিল। নিজে ধরাল। তারপর বলল—হুঁ—কী বলছিলে যেন হালদারমশাই? রাজত্ব না কী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। রাজত্ব।

বলেছ বেশ! তবে রাজত্ব রাখা বোধ করি আর সম্ভব হচ্ছে না হে হালদারমশাই। বাইশ বিঘে পাট ছিল ওপারে। প্রায় অদ্ধেকটা ইতিমধ্যে চোরে সাবাড় করেছে। আউশও বিশেষ তুলতে পারিনি। ডগাশুদ্ধ নিকেশ করেছিল। হঠাৎ এত চোরের উপদ্রব বেড়ে গেল কেন বুঝতে পারছি না।

গগন মাথা দুলিয়ে রহস্যময় হাসল।—বছর বিশেক আগে এ তল্লাটে এই রকম হঠাৎ চুরি ডাকাতি বেড়ে গিয়েছিল। আপনার বাবা তখন বেঁচে। আপনি তখন পেণ্টুলপরা ছেলে। মনে নিশ্চয় নাই। তবে কথা হল এই যে সর্ষের মধ্যে ভূত থাকে। তাঁর মতো মানুষও টের পান নি। নাকি—সব জেনেও চুপচাপ ছিলেন।

ধুরন্ধর মৃগাঙ্ক হাসল।—ধরিত্রীঠাকরানের কথা বলছ হালদারমশাই?

হুঁ। এতক্ষণ নতুনবাবুকে সেই গল্পই বলছিলাম। ধরিত্তি খুব সহজ মেয়ে ছিল না—তাই বলছিলাম।

খেয়া নৌকোটা ঘাটে এসে লেগেছে। কয়েকবোঝা ঘাস নিয়ে জনা'তিন 'ঘেসেড়া' বা ঘাসকাটা লোক নামল। তিনটি মেয়ে একবোঝা করে পাটকাঠি মাথায় নিয়ে সাবধানে নেমে এল। মৃগাঙ্ক তাদের সবার দিকে সন্দেহাকুল চোখে তাকাচ্ছিল। চলে গেলে সে বলল—হালদারমশাই, মেয়েগুলো কোন পাড়ার চেনো নাকি?

গগন সেদিকে তাকিয়ে বলল,—চোখ দুটোর মাথা খেয়েছি। পাটকাঠি নিয়ে গেল—ওদের কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

তাহলে কুনাইপাড়ার হবে। একবোঝা তো ফেলে রাখবার জো নাই ওদের জ্বালায়। দিনে দিনে মানুষের অভাব যা বাড়ছে—এরপর দেখবেন নিজের ঠ্যাং দুটো কটমট করে খাচ্ছে।

ঘেটেল ডাকছিল।—বাবু, পারে যাবেন নাকি ?

যাব। আসুন প্রিয়বাবু! বলে মৃগাঙ্ক পা বাড়াল!

কূলে কূলে ভরা ভৈরব। তবে স্রোতের টান অনেকটা বেড়ে গেছে। ওপারে ডাইনে অনেকটা ধ্বস ছেড়েছে। নৌকোয় উঠে প্রিয়নাথ বলল—গগনকে হালদারমশাই বলেন নাকি ?

হ্যাঁ। ওকে এখন সবাই তাই বলে। কেন শুনবেন? দুই ছেলেকে বি. এ. পাশ করিয়েছে। ভাবতে পারেন—জেলের ছেলে! বড় মহেন্দ্র এখন দুর্গাপুর প্ল্যান্টে চাকরী করে। ছোট সত্যেন্দ্র ভগীরথপুর হাইস্কুলের টিচার। অবশ্য সবই বাবার উদ্যোগে হয়েছে বলতে পারেন। ওই স্কুলটা ঠাকুর্দা করে যান। তারপর দুইপুরুষ ধরে আমরা ছেলেধরা হয়ে লড়ে গেছি!

প্রিয়নাথ বলল—যে সব শুনেছি।

কে বলল? গগন?

না। অন্যলোকের কাছে। গগন আমাকে একটা অদ্ভুত গপ্প শোনাচ্ছিল।

ধরিত্রী ঠাকরানের গপ্প ?

হ্যাঁ। খুব অদ্ভুত লাগল।

মৃগাঙ্ক সিগ্রেটটা স্রোতে ফেলে দিয়ে বলল—গগন খানিকটা বাড়াবাড়ি নিশ্চয় করেছে। ও তাই করে। ওসব তন্ত্রমন্ত্র ডাইনিটাইনিতে আমার কোনকালেই বিশ্বাস নেই মশায়। ভাবতে পারেন—একটা মেয়ে স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে এলাকার লোককে ভয়ে চুপ করিয়ে রাখল সারাজীবন? এখনও তার জের মেটেনি। এখনও শুনবেন ধরিত্রীর ভূতটা সমানে জ্বালাচ্ছে। সেদিন বালক মণ্ডলের বউকে ভূতে ধরেছিল। ধরিত্রীর নাম বলেছে নাকি!…মৃগাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল।

ধরিত্রীর তো মেয়ে রয়েছে। কুসুম না কী যেন নাম।

এ্যাঁ? হ্যাঁ, কুসমি।

একটু আগে ওপারে গেল দেখলাম, এই নৌকোয়।

মৃগাঙ্ক চমকে উঠল যেন।—তাই বুঝি?

গগন বলল। তা না হলে আমার চেনার কথা নয়। মেয়েটি গগনকে বাবা বলল শুনলাম।

ধরিত্রীর সঙ্গে নাকি গগনের সম্পর্ক ছিল। পুলিশ একসময় গগনকে যখন তখন ধরে নিয়ে যেত। বাবা না থাকলে গগনেরও জেল হত।

কার্তিকের সকালে নদী আর ওপারের গাছপালা জীবনের কী একটা ব্যাপার নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে—প্রিয়নাথের এরকম লাগে। দূরে বাঁকের দিকে

বাবলাবনে তখনও মনে হচ্ছে কুয়াসার আলোয়ান রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। কোথায় ঘুঘু ডাকছিল। প্রিয়নাথের মগজে কুরে কুরে বসতে থাকল সেই ডাকটা। কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে।

কী ভাবছেন? মৃগাঙ্ক ডাকে।

প্রিয়নাথ তাকায়।

খারাপ লাগছে না তো?

কী?

আমাদের লাইফটা এখনও বেশ প্রিমিটিভ। চাষবাস :জল-জঙ্গল নিয়ে থাকি। মাঝেমাঝে ভৈরব ঠেলে চলে যাই পদ্মার দিকে। চরে কাটিয়ে আসি। আপনাকেও নিয়ে যাব'খন। দেখবেন।

মাঝারি গড়নের নদী। কিন্তু স্রোতের টান থাকায় বেশ খানিকটা ভাটিয়ে যায় খেয়ানৌকোটা। তারপর লগির খোঁচা মেরে ধারে-ধারে উজোন বেয়ে ঘাটে পৌঁছয়। সাদা দুধের সরের মত মাটি। কাদা হয়না। প্রথমে লাফ দিয়ে নামে মৃগাঙ্ক : তারপর হাত বাড়িয়ে দেয়—ধরুন।

প্রিয়নাথ তার হাত ধরে পাড়ে নামে। ঘেটেল বলে—বাবুদাদা, সিগারেট দিয়ে যান।

মৃগাঙ্ক একটা সিগারেট দিতে থাকে ওকে। ততক্ষণে প্রিয়নাথ সোজা গিয়ে বাঁধে ওঠে। বাঁধ থেকে এত বিস্তৃত ল্যাণ্ডস্কেপ নজরে পড়ছিল। কোথাও কোথাও কাচের টুকরোর মতো জলা—বাদবাকি সবুজ—কোথাও কিছু হলুদ নিবিড়তা। পাটক্ষেতের ওপর কুয়াশা লেপটে আছে। কোথাও কিছু মানুষ। এই বিশাল রহস্যময় দুর্গম পৃথিবীতে তাদের তুচ্ছ লাগছিল।

চলুন। মৃগাঙ্ক এসে যায়। তারপর দক্ষিণ দিকে বাঁধ ধরে হাঁটতে থাকে দুজনে—মৃগাঙ্ক আগে, পিছনে প্রিয়নাথ।

বাঁধের ওপাশে গভীর নয়নজুলি। কালো পাটপচা জলের আঁশটে গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারে। পাটের জাগ দেওয়া হয়েছে সেখানে। ওপরে কচুরিপানা আর ঘাসের চাবড়া। একটা দুটো বাঁশের খুঁটিতে মালিকানার চিহ্ন। আবার খানিকটা ফাঁকা—সেখানে প্রচণ্ড কালো জল। কীসব পোকামাকড় ভনভন করে উড়ছে। নয়নজুলির পাড়ে রাশীকৃত সাদা পাটের স্তূপ। চলতে চলতে মৃগাঙ্ক বলে—একবার চাঁদনী রাতে এখানটায় ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। ভুট্টা লাগানো ছিল সাত বিঘে জমিতে। শুওরের উপদ্রব হত। অগত্যা একটা মাচা বেঁধে ওপরে ছাউনি দিয়ে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। রাত আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তাম। একা। সারাটা রাত দড়ি টেনে টিনে ঢনঢন আওয়াজ করা ছিল কাজ। তখনও বন্দুক পাইনি। তা একরাতে নদী পেরিয়ে এখানটা আসতেই আমি হতভম্ব! মুসলমানদের মড়া কবরে দেওয়ার আগে দলবেঁধে নমাজ পড়ে দেখেছেন? হঠাৎ দেখি, চাঁদনি রাতে ওই

জমিটায় হাজার হাজার লোক মাটিতে মাথা গুঁজে নমাজ পড়ছে। কোন শব্দ নেই। আর—ওরা মাটিতে মাথা গুঁজে পড়ে আছে তো আছেই। বয়স ছিল কম। মনে হল, এই লোকগুলো মাথা তুলে আমাকে দেখতে পেলেই একটা কিছু করবে যেন। অযৌক্তিক ভয়!…মৃগাঙ্ক খিকখিক করে হাসল।

তারপর? প্রিয়নাথ আনমনে শুধোয়।

তারপর টের পেলাম সাদা সাদা জিনিসগুলো পাটকাঠি। এমনি করে কতকিছু দেখে-টেখে শিখেছিলাম—আসলে অলৌকিক বলতে তেমন কিছু পৃথিবীতে নেই। সবই লৌকিক।

হ্যালুসিনেসান! প্রিয়নাথ মন্তব্য করে।

একজ্যাক্টলি! হ্যালুসিনেসান! এই জঙ্গলে মাঠ আর বিলে কতরাতে যে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখেছি, ভাবতে পারবেন না। কতসব অদ্ভুত আলো—হাউই। এমনকি নানারকম আজগুবি আওয়াজ। একবার কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছিল। ডেকে-ডেকে একসময় থেমে গেল। একবার একটা লোককে পাটকাটা চোর ভেবে সারা মাঠ পিছনে দৌড়লাম—বিলের জলে গিয়ে সে ডুবে গেল।

ডুবে গেল? সে কী!

তাছাড়া কী বলব? স্বপ্নে আপনি যা দেখেন, তা বর্ণনা করতে পারেন? মানুষের ভাষা নেহাৎ একটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর বন্দোবস্ত। সব ব্যাপার প্রকাশ করা যায় না। মানুষ নিজের হাতে যা সব বানিয়েছে, তার প্রায় সবটাই সে বর্ণনা করতে পারে। যা বানায় নি, তা পারেনা। আপনি ক্লেয়ার ভয়েন্স মানেন?

ভেবে দেখিনি।

আমাদের একটা কুকুর ছিল। সে বাড়ির বাইরে পাঁচিলের আড়ালে কেউ এলেও টের পেত। যাক্, সে একসময় হবে। তবে একবার সত্যি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম, বুঝলেন?

ভূত নাকি? প্রিয়নাথ হাসে।

না। ধরিত্রী। ওইখানটায় একটা খাল আছে। সে ডুব দিচ্ছিল আর কী তুলে খাচ্ছিল তলার পাঁক থেকে। পাটবনের ভিতরে লুকিয়ে দেখছিলাম। আমার বয়স তখন এগারো বারো। মনে হচ্ছিল, ওর কষায় রক্ত দেখতে পাচ্ছি। একটু পরে সে পুরো উলঙ্গ অবস্থায় উঠে এল জল থেকে। ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলুম।

কী খাচ্ছিল?

সেটাই তো বুঝতে পারিনি। এখনও ধাঁধাঁ লাগে ব্যাপারটা। আসুন, এখানে নামতে হবে আমাদের।

বাঁধটা বাঁক নিয়ে পশ্চিমে ঘুরল। নদীর সমান্তরাল। নদী ও বাঁধের মধ্যে বড়বড় গাছপালা আছে। মাঠের দিকে নেমে আলপথে ওরা হাঁটতে থাকে। বুকসমান উঁচু তেজী ধারাল পাতা চিতিয়ে আখখেতগুলো তলোয়ারধারী যোদ্ধাদের

মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও শূন্য আউশের ক্ষেতে হলুদ ভিজে নাড়ার ওপর বক চরছে। শামুকগুলো রোদ পোহাচ্ছে। একটা খেঁকশিয়াল কী খাচ্ছিল। দেখামাত্র পাটবনে গিয়ে ঢুকল। ওরাও এবার পাটবন পেরোতে থাকে। সরু আল ধবধব করছে—তার বুকে ছায়ার কাটাকুটি নক্‌সা কেন্নুইনগুলো বিড়ে পেতে কেউ, কেউ গুটিসুটি হাঁটছে। পাট প্রায় আটফুট উঁচু। কালো-কালো ফল ধরেছে ইতিমধ্যে —কিছু ফল এখনও সবুজ। ততক্ষণ কোন কথা হয় না। শিশিরে জামা ভিজে যায় দুজনেরই।

ফাঁকায় পৌঁছে মৃগাঙ্ক বলে—ওই ঢিবিমতো জায়গাটা দেখছেন—ওটার পিছনে একটা জলা আছে। দুচারটে হাঁস প্রায়ই দলছুট হয়ে বিল থেকে চলে আসে ওখানে। দেখা যাক্‌। আর সিগ্রেট খাবেন নাকি? এরপর কিন্তু কিছুক্ষণ এমার্জেন্সি মশাই—নো স্মোক।

দিন। আমারও আছে অবশ্য।

থাক্‌। নিন। মৃগাঙ্ক সিগ্রেট দেয়। লাইটার বের করে জ্বালে। প্রিয়নাথেরটা ধরিয়ে দিয়ে বলে—বলেছিলাম গামবুট নিন। কথা শুনলেন না।

আপনি তো নেননি।

অভ্যেস। এই বুনো মাটিতে অনেক হেঁটেছি খালি পায়ে। তবে মশাই—কিছু যদি মনে না করেন, জুতো দুটো আপনার জিম্মায় রেখে আমি কাজে নামব।

ঠিক আছে।

নাকি আপনিও একটু আধটু থ্রিল নিতে চান? ছোটাছুটি করবেন?

মন্দ কী! ভালো লাগবে।

গ্র্যান্ড! তাহলে প্যান্ট গুটিয়ে ফেলুন। জামা খুলুন। দেখুন—আমি যা যা সব করি। গায়ে কাদা লাগতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে কিংবা বুকে হেঁটে এগুতে হয় অনেক সময়। আর একটা কথা বলে দিই। খুব দেখে শুনে হাঁটবেন। সাপটাপ দেখা দিতে পারে। ঘাবড়াবেন না! পাথরের টুকরো ভাববেন নিজেকে—গায়ের ওপর যেতে দেবেন, যদি যেতে চায়।

প্রিয়নাথ একটু শিউরে উঠল। তবু ভাল লাগার টানে আমল দিলনা সেই ত্রাসটুকু। শুধু বলল—একটা লাঠিফাঠি হাতে নেওয়া যায় না?

নিশ্চয়ই যায়। অবশ্যই। থামুন একটা ডাল কেটে আনছি।

কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ছুরি বের করে এগোল মৃগাঙ্ক। ফাঁকা ঘাসের জমির ওপর ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছিল। প্রিয়নাথ চিনতে পারে গাছগুলো। বেত, নাটাফল, কুঁচ এইসব কাঁটাঝোপ। তাদের ফাঁকে একটা ছড়ালো ভাঁড়ুলে গাছ সবে মাথা তুলেছে। মৃগাঙ্ক হাত বাড়িয়ে একটা মোটা সরল ডাল নুইয়ে ধরে। ছুরির কোপ বসায়। তারপর নিয়ে আসে। পাতাগুলো কেটে ফেলে। বেশ একটা লাঠি হয়ে ওঠে। এগিয়ে দিয়ে বলে—নিন।

তারপর দুজনে প্যাণ্ট গোটায়। জামা খুলে ফেলে। বন্দুকটা মাটিতে পড়ে থাকে—ঘুমন্ত বাঘের পিঠ দেখলে ওইরকম টানটান লাগে। প্রিয়নাথের হাত নিসপিস করে। কিন্তু হঠাৎ কেমন শূন্যতা তার মাথার খুলির মধ্যে টের পায়। দুচোখে কুয়াসা আর খাপচাখাপচা সবুজ রঙ ভাসে।
কয়েকটা কার্তুজ পকেটে ভরে ঝোলা জামাকাপড় জুতো মৃগাঙ্ক নিয়ে যাই সেই ঝোপে। রেখে এসে বলে—চলুন। নেমে পড়া যাক।
প্রিয়নাথ একটু সংশয়ী হয়ে বলে—কেউ নিয়ে পালাবেনা তো?
না। চলুন। এদিকে বড় একটা আসেনা কেউ।
ফের একটা পাটবন পেরিয়ে ঢিবিব কাছে পেঁছিয় ওরা। তারপর মৃগাঙ্ক বলে—সচরাচর আমি উড়িয়ে দিয়ে গুলি করি। তাতে রিস্ক কম। জলাটা যা জঙ্গুলে। ঠিকমতো বাগে পাওয়া যায়না—এম করা কঠিন। আপনি কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন মশাই। শিকার কুড়োনোরও যথেষ্ট আনন্দ আছে।
ঢিবিটা কাঁটাঝোপে ভর্তি। কাশঝোপও বয়েছে। ফুলেফুলে ভবা। বাঘনখার গাছ আছে কিছু। আকন্দঝাড় ধরে অনেক কষ্টে প্রিয়নাথ ওঠে মৃগাঙ্কেব পিছনে। এখনও শিশির শুকোয়নি। ঘাসের ফুলে দুজোড়া রোমশ পা ভরে যায়। পোকা কুটকুট করে। আর অনবরত মাকড়সাব ভিজে জাল মুখে বুকে জড়িয়ে যায়। কোন জালে শিশিরের ফোঁটা টলটল করে। অস্বস্তি কিংবা ত্রাসে গা ঘিনঘিন কবে প্রিয়নাথের। ঢিবিটা যেখানে শেষ হয়েছে, নিচে একটা জলার শুরু। নানারকম দামে তার জল ঢাকা। দামের ওপর শোলার ঝাড় গজিয়েছে। প্রিয়নাথ কিছু দেখতে পায় না। মৃগাঙ্ক তার ঘাড়ে হাত রেখে বসতে ইশারা করে। তারপর উপুড় হয়ে ঘাসের মধ্যে সে সাপের মতো এগোতে থাকে। বন্দুকটা ঘাসে ডুবে থাকে। প্রিয়নাথ দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে। কিছু দেখতে পায় না সে। একটা দলপিপি পিঁপিঁ করে উড়ে যায় হঠাৎ। অনেকটা দূরে একটা হিজলের গাছে থরে বিথরে সাদা বকের ঝাঁক দেখতে পায়। মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় প্রিয়নাথ কুসুমের কথা ভাবে। চেহারা ও শরীরটা ভোলা যায় না। কী যেন আছে। ওই চোখে, ওই শরীরে—পৃথিবীর খুব পুরনো ব্যাপার।
হঠাৎ বন্দুকের শব্দ হয়। আচমকা এই শান্ত নির্জন নিসর্গ ছত্রখান হয়ে পড়ে। বারুদের গন্ধে বাতাস কটু হয়। আঁক আঁক চিৎকার আর ডানার শব্দ খুব কাছেই মাথার ওপর শুনে প্রিয়নাথ মুখ তোলে। ফের বন্দুকের শব্দ হয়। একটা ঝড় বইতে থাকে যেন। দূরের হিজল থেকে বকগুলো উড়ে পালায়। দলপিঁপির ডাক শোনা যায়। কোথায় হট্টিটি পাখি চেঁচিয়ে ওঠে ট্রি ট্রি ট্রি···ট্রি ট্রি ট্রি। মৃগাঙ্কের গর্জন শোনা যায়—প্রিয়বাবু! দেখুন—দেখুন! লক্ষ্য রাখুন!
কিছু না ভেবেই প্রিয়নাথ ওঠে। একটা হাঁস বাঁদিকে পাটক্ষেতের ধারে পড়ে ডানা ঝটপট করছে। আরেকটা পাটক্ষেতের ওপরে কোথায় হঠাৎ নেমে গেল। সে প্রায়

জ্ঞানশূন্য হয়ে ঢিবি থেকে ঝাঁপ দিয়ে দৌড়তে থাকে। সামনের হাঁসটা ধরে ফেলে। তার ঠোঁটের ফাঁকে রক্ত। হাঁসটা নিয়ে সে মৃগাঙ্কের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। মৃগাঙ্ক ইসারা করে—ওদিকে, ওদিকে !

হ্যাঁ—সেই হাঁসটা। প্রিয়নাথ পাটবনে ঢুকে পড়ে। হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়বার চেষ্টা করে। বনচড়াইয়ের ঝাঁক ফর ফর করে উড়ে পালায় মাথার ওপর। একহাতে হাঁস, অন্যহাতে সবুজ পাটগাছ ঠেলে-ঠেলে সে হাঁটে।

কিন্তু পাটবন শেষ হতে চায় না। কতদূর, কতদূর। একটা বেজি দৌড়ে পালাল। একটা ঢ্যামনা সাপ সরসর করে চলে গেল বাঁদিকে। দম আটকে আসছিল প্রিয়নাথের। সামনে একটা শেয়াল নীল জ্বলজ্বলে চোখে তাকে একটুখানি দেখেই সরে গেল। অস্বস্তিতে অস্থির হচ্ছিল সে। ভুল করে ঘুরে মরছে না তো ? সে বাঁদিকে ঘুরল।

একটু পরেই ফাঁকা একটা জমিতে গিয়ে পড়ে সে। প্রায় এক একর জায়গার পাট কেটে নেওয়া হয়েছে। একদিকে বাবলাবন, বাকি তিনদিকে পাটক্ষেত। বাবলাবনের দিকেই আন্দাজে এগোয় প্রিয়নাথ। হাঁসটা খুঁজে পাওয়া যাবে না আর। অসম্ভব। এখন সেই ঢিবিতে ফিরে যাওয়াই এক সমস্যা। নরম মাটিতে নিজের পায়ের দাগ লক্ষ্য করে ফেরা যায়। কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছে ফের পাটবনে ঢুকতে। দম আটকে এবার মরেই যাবে।

বাবলাবনের কাছে এসে সে ভাবল, চেঁচিয়ে মৃগাঙ্ককে ডাকবে। মৃগাঙ্ক এসে তাকে নিয়ে যাক। এ এক বিশ্রি ব্যাপার হল দেখা যাচ্ছে। নাঃ, আর শিকার দেখতে আসবে না সে।

প্রিয়নাথ বুকভরে দম নিয়ে ডাকতে গিয়েই থেমে যায়। তার হৃৎপিণ্ডে রক্ত আচমকা ছলাৎ করে ওঠে। ডানদিকে পাটবনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ধরিত্রীর মেয়ে কুসুম ! তার একহাতে একটা কাটারি, অন্যহাতে সেই হাঁসটা। সে প্রিয়নাথকে দেখছে নিঃশব্দে।

এমন নিষ্পলক চোখ প্রিয়নাথ কখনও দেখেনি। দেখেনি কোনদিন এমন নির্জনে গোপনে সহস্রকোষী প্রাণীর মতো একটি প্রতীক্ষা—যার প্রতিটি শেষে উজ্জ্বল ফসফরাসের ক্রূর অভিসন্ধি।

আর সম্পূর্ণ চবচবে ভিজে শরীরে দাঁড়িয়ে আছে কুসুম। খুব পাতলা স্বচ্ছ কাপড় চামড়া বা মাংসের ভাঁজসমেত শরীরকে ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে যেন। হ্যাঁ—ব্রেসিয়ার বা জামা কিছুই গায়ে নেই ওর। দুটো স্তন, ঈষৎ ঢিমালো, স্পষ্ট এবং লজ্জাশূন্য। ওর দুই উরু অকপট, সন্ধিস্থলে রক্তাক্ত ধূসর হাঁসটা ঝুলছে ; যার ফলে প্রিয়নাথের মনে হয় কিছু আব্রু রক্ষা পেয়েছে। বাহু দুটো রসাল ফুটির মতো। প্রিয়নাথ বাঘ হতে পারলেও এই আদিম বনভূমিতে কিছু ঘটত কিনা বলা যায় না। ফের যখন চোখে চোখ পড়ল, প্রিয়নাথ নিজের খুলির মধ্যে একটা নীল বিদ্যুৎ

ঝলসাতে দেখল। চোখের সামনে ছোপছোপ সবুজ রঙের ওপর কীরকম কালো কালো ধ্যাবড়া দাগ পড়ল। এবং হঠাৎ বালকের মত ভয় পেল প্রিয়নাথ!

সে ঘুরল অন্যদিকে। সারা শরীর ঠাণ্ডা আর ভারি মনে হচ্ছিল তার। সেই সময় কানে এল,—বাবু হাঁসটা নেবেন?

প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে গেল।

ইচ্ছে হলে নিয়ে যান।

প্রিয়নাথ ঘুরে বলে—তাহলে ধরলে কেন?

কুসুম হাসল একটু।—সামনে পড়ল, তাই ধরলাম। মৃগাঙ্কবাবুর হাঁস আমার হজম হবে না। নিয়ে যান।

প্রিয়নাথ ঘামে। আর ইতস্তত করে বলে—থাক। ধরেছ যখন, তুমিই নাও।

বাবু, আপনার কপালটা দেখি!

হঠাৎ তাকে কাছে আসতে দেখে প্রিয়নাথ অবাক হয়। তার বুকের মধ্যে হাজার হাজার পাথর গড়িয়ে পড়ে সে অস্থির হয়ে বলে।

কী আছে কপালে?

কুসুম ভুরু কুঁচকে ওর দিকে এমনভাবে তাকায় যে প্রিয়নাথের প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগে। কুসুম ঠোঁটের কোণে হেসে বলে—আপনার নাম কী শুনি?

কেন? নাম নিয়ে কী হবে?

আহা, বলুন না!

প্রিয়নাথ।

প্রিয়নাথ?

হ্যাঁ।

বললে রাগ করবেন নাতো?

না। কী বলবে?

আপনার জন্মের সময়টা খুব অপয়া ছিল। (আকাশে আঙ্গুল তুলে) ঠিক ওইখানটায় চাঁদ ছিল—ঈশান কোণায় একটা প্যাঁচা ডেকেছিল, বায়ু কোণায় একটা শিয়াল ডেকেছিল। আপনার মায়ের প্রসব-যন্ত্রণার সময় সাপে ব্যাঙ ধরেছিল। টিকটিকির লেজ খসে পড়েছিল। আর শুকনো ডালে কামিখ্যের ডাকিনী এসে বাতাসের সুরে গান করেছিল। আর শুনবেন বাবু?

এবার সব অস্বস্তি দূর হয়ে হাসি পায়। প্রিয়নাথ হাসি চেপে বলে—হুঁউ। আর কী হয়েছিল?

কুসুম মাথা দোলায়। এখন সব বলা যাবে না। আমার আখড়ায় যাবেন—সব বলব।

বেশ, তাই যাব। পয়সা লাগবে নাকি?

আপনি নতুন মানুষ, লাগবে না।

ভালো। যাব।
বাবু, আপনি এদেশে কেন এলেন?
আসা ঠিক হয়নি বুঝি?
না। আপনি এসেছেন বলে দেশে আকাল লাগবে। ঈশান কোণায় প্যাঁচা ডাকবে—বায়ুকোণায় শেয়াল। টিকটিকির লেজ খসে পড়বে। সাপে ব্যাঙ ধরবে। কামিখ্যের ডাকিনী এসে বাতাসের সুরে কথা বলবে। বাবু, আপনি অপয়া।
হাসতে গিয়ে সামলে নেয় প্রিয়নাথ। গম্ভীর হয়। বলে—তুমি সব দেখতে পাও বুঝি?
হ্যাঁ, পাই। বাবু, আমার চোখের দিকে তাকান।
প্রিয়নাথ তাকানোর চেষ্টা করে।
কী দেখছেন?
দুটো চোখ।
আরেকটা চোখ দেখতে পাচ্ছেন না?
ভ্যাট্! প্রিয়নাথ বিরক্ত হয় এবার।
আপনার মধ্যে আঁধার জমে আছে বাবু। যাবেন আমার ঘরে, দেখিয়ে দেব। আমি ওই চোখে সব দেখতে পাই। আপনার পিছনে—
প্রিয়নাথ চমকে ওঠে।
আপনার পিছনে ছায়া চলছে বাবু, সাবধান। ঐ ছায়া সাপ হয়ে আপনাকে দংশাবে।
প্রিয়নাথ পা বাড়ায়। বেশ মজার ব্যাপার করা গেল এতক্ষণ। মৃগাঙ্ক অপেক্ষা করছে। হয়তো ভাবছে তার জন্যে।
বাবু, আপনি কেন এসেছেন এদেশে?
আমার ইচ্ছে। বলে প্রিয়নাথ হাঁটতে থাকে ফাঁকা জমিতে।
আপনার ইচ্ছে মিটবেনা, ফিরে যান।
আচ্ছা, যাব।
মৃগাঙ্কবাবু সহজ মানুষ নয় বাবু, সাবধান।
প্রিয়নাথ ফের চমকে উঠে পিছন ফেরে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারা শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে তার। মাথার ভিতরে নীল আগুনের হল্কা ছুটে যায়। কিন্তু কুসুম অদৃশ্য। একেবারে মুছে গেছে সে।
অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়নাথ। ভারি আশ্চর্য তো! কাছাকাছি কোন ঝোপঝাড় নেই। দশবারো হাত দূরে পাটক্ষেত। ওখানেই ঢুকেছে সম্ভবত। সে পাটক্ষেতটার ডগা লক্ষ্য করতে থাকে। কেউ চললে ডগা দুলবেই। পাখির ঝাঁক উড়বে। কিন্তু না—তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।
প্রিয়নাথ টের পেল, সে প্রচণ্ড ঘেমেছে। এতক্ষণ কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল হয়তো। তার মনে হয়, হাতের এই গুলিবিদ্ধ হাঁসটার মতো তার শরীরও অন্য

কার বিশাল হাতে ঝুলছে। একটা সবুজ ব্যাপকতা তীব্র চেতনায় জরজর হয়ে তাকে ঘিরেছে এবং কোটিকোটি চোখ দিয়ে তাকে দেখছে। প্রিয়নাথ নিজেকে বোঝাল, এত অকারণ নার্ভাস হয়ে পড়ার কী আছে! বস্তুত এও কতকটা মৃগাঙ্কবাবুর মতো হ্যালুসেনিসন ছাড়া কিছু নয়। সে পিশাচী ডাইনি ইত্যাদির গল্প অনেক শুনেছে এখানে এসে। পিশাচীরা আবার কেউ বউ সেজে থাকে এবং মড়া কচমচিয়ে খায়। ভাগ্যিস, কুসুম হাঁসটা কচমচ করে চিবুচ্ছিল না।

প্রিয়বাবু!

প্রিয়নাথ দ্রুত ঘোরে। মৃগাঙ্ক বন্দুক হাতে পাটবন ঠেলে বেরিয়ে এল।

পেলেন?

না।

ওদিকে কী দেখছিলেন এতক্ষণ?

আপনাদের কুসুমকে।

মৃগাঙ্ক ভুরু কুঁচকে তাকায়।—কুসমি? এখানে কী করছিল মাগী?

হাঁসটা ধরে ফেলেছে। আর···

মৃগাঙ্ক পা বাড়িয়ে বলল—হাঁসটা ধরেছে? চুন্নির সাহস তো কম নয়! কেড়ে নিলেন না কেন?

প্রিয়নাথ পাংশুমুখে হাসল।—কী সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছিল। কোন মানে হয় না। শেয়াল প্যাঁচা সাপ ব্যাঙ ডাকিনী—আরও কী সব।

আপনিও যেমন! ওতেই তাক লাগিয়ে কেটে পড়ল? আসুন তো দেখি।

মৃগাঙ্ক যেভাবে পা বাড়ায়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়নাথ তাকে অনুসরণ করে। মৃগাঙ্ক ফের বলে— কোনদিকে গেল?

দেখিনি। এই যে, এখানে দাঁড়িয়েছিল, তারপর চলে আসছিলাম তখন ডাকল।

ঘাসগুলো জলে চবচব করছে একখানে। কেউ একটু আগে দাঁড়িয়েছিল, তার ছাপ আছে। ঘাসগুলো শুয়ে পড়েছিল—সবে সোজা হতে শুরু করেছে। একটা শীষালো ঘাস তড়াক করে সোজা হতেই প্রিয়নাথ শিউরে উঠল।

ঝুঁকে পড়ে কুসুমের গতিপথ খুঁজছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টে মৃগাঙ্ক। মনে হচ্ছে যেন বাঘটাঘের ব্যাপার। তার মুখটা লাল টকটক করছে। আর কার্তিকের রোদ এবার খর হয়েছে। দর দর করে ঘাম গড়াচ্ছে। প্রিয়নাথ বলে—খুব আশ্চর্য লাগল। চোখের পলকে মুছে গেল মেয়েটি! কোন লজিক খুঁজে পাচ্ছিনে।

হুঁ, লজিক থাকে না ওর বেলা। মৃগাঙ্ক ঘাসের অবস্থা লক্ষ্য করতে করতে হাঁটে।

মৃগাঙ্কবাবু!

উঁ?

ছেড়ে দিন।

ছেড়ে দেব কী বলছেন মশাই! একটা ছররার দাম কত হয়েছে জানেন?

প্রিয়নাথের মনে হল, মৃগাঙ্কর অন্য কোন ব্যাপারে গভীর রাগ আছে নির্ঘাৎ। মৃগাঙ্ক পাটক্ষেতের দিকে এগোচ্ছে তখন। বড্ড বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে সে। প্রিয়নাথ বলে—চলে আসুন!

মৃগাঙ্ক অস্ফুটে চেঁচিয়ে ওঠে—এই দেখুন, এই দেখুন!

কী?

পায়ের দাগ।

পাটক্ষেতটা এখানে আচমকা বাঁয়ে ঘুরে গেছে। দু মিটার জায়গা কোনাকুনি পাট ঠেলে এগিয়ে মৃগাঙ্ক গর্জে উঠল—এ্যাই কুসমি!

প্রিয়নাথ দৌড়ে গেল। ওপাশে ব্যানাকাশের জঙ্গল রয়েছে। পাটক্ষেতের আলের নিচেই একটা মস্তো গর্ত। সেখান থেকে কুসুম লাফিয়ে উঠেছে। খরগোসের মতো কয়েকটি লাফে ওদিকে আখের খেতে সে ঢুকে গেল।

মৃগাঙ্ক বন্দুক তুলেছিল। হাসতে হাসতে নামাল।—দেখলেন কাণ্ড? মাগীর সত্যি কোন তুলনা নেই!

প্রিয়নাথও হাসে।—আমি ভাবছিলাম…

গর্তে বসে হাঁসটা কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে?

সেইরকম কিছু।

হ্যাঁ, তাতেও অবিশ্বাস্য কিছু নেই ওর পক্ষে। মাংসের লোভ ওর প্রচণ্ড।

দুজনে খড়ের জঙ্গলটা পেরিয়ে অনেকটা ঘুরে ঢিবিতে পৌঁছল। মৃগাঙ্ক জামাজুতোর পুঁটলিটা সবসুদ্ধ ব্যাগে ঢোকাল। প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। কাঁধে ঝোলাল।

মৃগাঙ্ক ভুরু কুঁচকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। গোঁফটা একবার সযত্নে পাকিয়ে নিয়ে বলল—আসুন, আজ আর হাঁসটাস হবে না। হরিয়াল বা ঘুঘু পাই নাকি দেখা যাক্।

খালের ধারে-ধারে ওরা হাঁটে। পশ্চিম-দক্ষিণে এগিয়ে যায়। একটু পরে মৃগাঙ্ক বলে—ওই গাছপালার জটলা দেখছেন, ওখানটা হল আমলাবাগ। আমলাবাগের নাম শোনেননি?

শুনেছি মনে হচ্ছে।

লালগোলার মহারাজাদের পূর্বপুরুষ ভৈরবের পাড়ে বাহান্ন একর জায়গায় আমকাঁঠাল লিচুর বাগান করেছিলেন। পরে দেখাশোনার অভাবে সব জঙ্গল হয়ে যায়। জন্তু জানোয়ার এসে জোটে। বাঘ শুওর হায়েনা—কত রকম। ভালো জাতের আম ফলত একসময়। এখন উচ্ছন্নে গেছে। অনেক কেটে বিক্রি করা হয়েছে যুদ্ধের সময়। আমার ঠাকুর্দার আমলে নাকি একজোড়া হরিণও ছাড়া হয়েছিল। তাছাড়া হাজারটা ভুতের গল্প আছে। এমন [illegible] কা বাংলাদেশে আর নেই, মশাই। শুধু ভুত, ডাইনি, পিশাচী আর অলৌকিক ব্যাপারের রাজত্ব।

আসলে—আমার মনে হয়, এখানকার মানুষ কোন অজ্ঞাত কারণে বড্ড বেশি রোমাণ্টিক আর কল্পনাপ্রবণ। আমলাবাগের ওদিকে একটা গ্রাম আছে শিমুলিয়া। সে গাঁয়ে সবাই ভুতের ওঝা আর তান্ত্রিক। বেলায়-বেলায় বউঝিদের পটাপট ভুতে ধরে। আবার ছেড়ে দেয়। একদিন নিয়ে যাব—দেখবেন। তাক লেগে যাবে। তবে আমলাবাগে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি টের পেয়েছিলাম। ভাবতে গা শিউরে ওঠে।

কী ?

একটা আশ্চর্য গন্ধ। মোটামুটি এলাকার সবরকম ফুলের গন্ধই আমার জানা। গাছপালাও চিনি। কিন্তু কোন-কোন সময় ওখানে একটা সুগন্ধ মাত্র দু-এক মিনিটের জন্যে—হ্যাঁ—এক বা দুমিনিট বড জোর এসে আবার মিলিয়ে যায়। গন্ধটা খুবই অচেনা। অনেক খুঁজে তেমন কোন গাছ বা ফুল দেখতে পাইনি। আর গন্ধটা পেলে একটা দারুন রিঅ্যাকশন ঘটে যায়। একরকম অস্থিরতা—উত্তেজনা !

প্রিয়নাথ একটু চুপ করে থাকার পর বলে—আমার পিসেমশাই-এর বাড়ি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে। বনেদী বড় গ্রাম। পাশে কুনুর নদী আছে। মাইল দুই উত্তরে অজয়ের সঙ্গে মিলেছে। ওখানেই কোগ্রাম—কবি কুমুদরঞ্জনের বাড়ি। তা—ওই কুনুরের পাড়ে একটা বড়ো জঙ্গুলে বাগান দেখেছি—লোকে বলে আতরের বন। কেন জানেন ? ওখানে কোন কোন সময় আতরের গন্ধ পাওয়া যায়।

আপনি পাননি ?

হুঁ-উ। তখন আমার বয়েস চৌদ্দ-পনের হবে। ভীষণ রোমাণ্টিক স্বভাবের ছিলাম।

এখন আপনার বয়েস কত হল ?

কী মনে হয় আপনার ?

আমার চেয়ে অনেক ছোট আপনি। আমার ছত্রিশ হয়েছে।

আমি আপনার চেয়ে ছসাত বছরের ছোট।

মৃগাঙ্ক পিছু হটে ওর কাঁধে হাত রাখে।—মাই ইয়ংগার ব্রাদার ! হুঁঃ—তাহলে তো মুখখিস্তি করতে বাধবে মশাই !

প্রিয়নাথ বলে—না, স্বচ্ছন্দে।

সেই বাঁধে গিয়ে ওঠে ওরা। তারপর মৃগাঙ্ক হঠাৎ বলে—কুসমিকে দেখে তাহলে খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলেন ?

না তো। কেন ?

ইচ্ছে হয় ?

কিসের ?

ওকে পেতে ?

প্রিয়নাথ আচমকা সোজা হয়—বাঘ চলে যাওয়ার পর ব্যানার নুয়েপড়া শীষ যেমন সাঁৎ করে ওঠে। ফুঁসবলে—যান! কী যে বলেন! ভ্যাট্!

গত খরায় এক অফিসার এসেছিলেন আপনার বয়সী। টিউবেল নিয়ে সেচের ব্যাপারে এনকোয়ারি করতে। তিনি কুসমির প্রেমে পড়ে যান।

তারপর?

তারপর কিছু নেই। প্রায়ই ওর বাড়ি গিয়ে বসে থাকতেন। উপলক্ষ্য বউয়ের দুরারোগ্য ব্যাধির ফয়শালা। যদ্দুর জানি, কুসমি ওঁকে একগোছা চুল কাঠিতে জড়িয়ে দিয়েছিল নাকি। জলে চুবিয়ে জলটা বউকে খাওয়াতে বলেছিল।… …

মৃগাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল।

প্রিয়নাথের মন বিরূপ হয় মৃগাঙ্কের প্রতি। সে কোন কথা বলে না। তার এতক্ষণে মনে হয়, মৃগাঙ্ক তার প্রতি তুখোড় বসের মতো আচরণ করছে। সে মৃগাঙ্কের কৃষিখামারে নতুন ট্রাকটার আর কিছু হার্ভেস্টার কম্বাইনের সঙ্গে নতুন আমদানি কর্মচারী—নিতান্ত ট্রাকটার চালক। তাকে বন্ধুভাবে নিল, বলেছিল মৃগাঙ্ক। নিয়েছে কি? মনে হচ্ছে—কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে মৃগাঙ্ক খেলছে। চোয়াল শক্ত হয়ে যায় প্রিয়নাথের।

অবশ্য আর কী বা প্রত্যাশা জীবনে করার আছে তার? ডাক্তারের ছেলে—ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হবে—হয়নি। হয়েছিল নিতান্ত কারিগর। তবে তার এক্সপার্ট হিসেবে একটা উপাধি জুটেছিল এই যা। মৃগাঙ্ক সেই মর্যাদাটুকুও যেন আর দিচ্ছে না।

দুঃখিত প্রিয়নাথ দূরে ও কাছে সবুজগুলো দেখতে থাকে। সেই সময় আন্দাজ পঞ্চাশ মিটার দূরে একটা বিশাল গাবগাছের (এ এলাকায় প্রচুর গজায়) তলায় কুসুমকে দেখতে পায়। এদিকে তাকিয়ে আছে। পরক্ষণে সে গাছটার ওধারে সরে যায়। মুছে যায়। প্রিয়নাথ মৃগাঙ্ককে সে খবর দিল না।…

ওখানে মা গঙ্গা, এখানে ইনি বাবা ভৈরব। এ নদীর এরকম পরিচয় দিয়েছিল গগন হালদার। মাঝখানে আঠারো মাইলের ছাড়াছাড়ি—সমান্তরাল দুটি প্রবাহ। গ্রীষ্মে দুজনেরই চেহারা এক। খড়িখড়ি ধূসর ছাইমাখা শান্ত সন্ন্যাসীর গড়ন। কালো স্বচ্ছ জলে অনেক শান্তি থাকে। কিন্তু ভৈরব পুরুষ। স্বয়ং রুদ্রদেব। তাই বর্ষায় চেহারা বদলে যায় দ্রুত। প্রচণ্ড গর্জন করে দুধারের মাটি থাবায় টেনে নেয়। গগন বলেছে—বর্ষায় বহরমপুরের ঘাটে গিয়ে দেখে আসুন। মা তখনও শান্ত হয়ে হাসছেন। আর এ ব্যাটার ক্ষ্যাপামি চূড়ান্ত।

কালুখাঁর দিয়াড় ছোট্ট গ্রাম তার পাড়ে। টিকে আছে এতদিন, এই আশ্চর্য।

সাঁইমোড়ল, কিছু জেলে-কুনাই-ডোম-বাউরী আর কিছু মুসলমান সুখেদুঃখে বেঁচে আছে। মাটি উর্বর। সবুজে সবুজে ভরা। তবু দারিদ্রের শেষ নেই। আমকাঁঠাল লিচু আর আউশ পাট রবিখন্দ ফলে প্রচুর। তবু ক্ষিদে মেটেনা মানুষের। সপ্তায় একদিন ভাত খেতে পাওয়া ভাগ্যের কথা অনেকে বলে। গগন বলেছে—জোতজমি তো বেশি মানুষের নাই। তাই এ অবস্থা। ভূমিহীন খেটে খাওয়া লোকই শতকরা নব্বুইজন।

মৃগাঙ্ক শতকরা একজনের দলে। কিন্তু সে অনন্যসাধারণ মানুষ। দুমাইল দূরে ভগীরথপুরে তার বাড়ি। এখানে কালুখাঁর দিয়াড়ের পাকা সড়কের নিচে দক্ষিণের বুড়ো মাঠটা নিয়ে সে কৃষিকর্ম করেছে গতবছর থেকে। অবশ্য মাঠের সবটাই তার জমি নয়। তার বাবা বঙ্কুবাবু আইন বাঁচিয়ে জমি রাখতে জানতেন। মৃগাঙ্কও কিছুটা জানে। আর সবুজ বিপ্লবের যুগে সে একজন 'কৃষিবীর' মোটামুটি—সরকারী সমর্থন তার দিকে প্রচুর।

মৃগাঙ্কের আরও অনেক ব্যাপার আছে। সে তার ঠাকুর্দার প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলের সেক্রেটারি। আঞ্চলিক নানা কমিটিতে সে আছে। কিন্তু সেসব ব্যাপারে তার গরজ খুব কমই। খামার আর শিকার এই তার নেশা। নিজেকে সে 'প্রিমিটিভ' মানুষ বলে থাকে। সে গ্রাম্য রাজনীতি বরদাস্ত করে না। এড়িয়ে থাকে। একরোখা, বেপরোয়া মানুষ সে—কিন্তু সবার সঙ্গে সবার মতো হয়ে মিশতে জানে। অকৃপণ হাতে খরচ করতেও পটু সে। খামার বাড়িতে প্রায়ই গান দেয়—অর্থাৎ যাত্রা, পাঁচালী, আলকাপ, বাউল। পুজোপার্বণ নানা উপলক্ষে মোটা চাঁদা দেয়। এর ফলে জনপ্রিয়তা সে অঢেল পেয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয়তা তার কাম্য বলে মনে হয় না। সে কোন ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় নাক গলায় না। বিচার করতে আগ্রহী নয়। নালিশ শুনলে রেগে বলে—মরগে যা! আমি কিছু করতে পারব না। এবং এসব সময় তাকে খুব স্বার্থপর মানুষ মনে হয়। মিটিঙে ডাকা হলে সে যায়। চুপচাপ সিগ্রেট টানে। মত চাইলে বলে—আপনার যা ভালো হয় করুন না। কোন অমত নেই। তারপর বেরিয়ে এসে মোটর সাইকেলে চাপে। সটান চলে আসে খামারে।

মৃগাঙ্ক বিয়ে করেনি। তার মা বউ দেখবার সাধ নিয়ে মারা যান, তাতে তার একটুও খারাপ লাগেনি। আর কোন ভাই নেই তার। শুধু একটি মাত্র বোন—ডাক নাম স্বাধীন, নামটা অদ্ভুতই বলা যায়। আসল নাম স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার রাতে তার জন্ম হয়েছিল—তাই ওই নাম। মেয়েদের জন্যে আলাদা স্কুল করা সম্ভব হয়নি বলে ভগীরথপুরে কো-এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে। স্বাধীন সেখানে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে। বহরমপুর গার্লস কলেজেও বছর দুই পড়েছিল। বাসে বারো মাইল যাতায়াত করত দৌলতপুর থেকে। দৌলতপুরে তাকে নিয়মিত পৌঁছে দিত এবং নিয়ে আসত মৃগাঙ্ক। ওই কারণেই মোটর

সাইকেলটা কেনা হয়। এখন অবশ্য বাকি পাঁচ মাইল অব্দি বাস আসা যাওয়া করছে। এখন ভগীরথপুরের মেয়েদের কলেজে পড়ার অসুবিধে নেই। তা—স্বাধীন আর পড়তে চায়নি, ভালো ছাত্রী ছিল না—সেটা একটা কারণ হতে পারে, কিংবা সে যেমন বলেছিল, ভালো লাগে না। কী হবে বই-ফই মুখস্থ করে? মৃগাঙ্ক বোনকে জেদ করেনি। সেও তো স্কুল ফাইন্যালের বেশি এগোয়নি। ষাঁড়ের মতো গোঁ ধরে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কুবাবুর মতো বিদ্যোৎসাহী আর দাপট-ওয়ালা মানুষও তাকে কাবু করতে পারেন নি।

একটু দেরি করেই স্বাধীনের বিয়ে দেয় মৃগাঙ্ক। স্বাধীন একেবারে স্বাধীন টাইপের মেয়ে। মৃগাঙ্ক হেসে বলেছিল—ওই নাম রাখাটাই গণ্ডগোল করেছে। তার স্বামী বিহারের ভাগলপুরের বাসিন্দা। পশ্চিমা বামুনদের এই এক মুশকিল। অতদূরে আত্মীয় কুটুম্ব খুঁজে আনতে হয়। স্বাধীন বার দুই গিয়ে দিন চল্লিশ ছিল ভাগলপুরে। তারপর স্বামী বিজয়েন্দুকে নিয়ে সোজা চলে আসে। বিজয়েন্দু সেখানে স্কুলমাস্টারিতে ঢুকেছিল সবে। এখানে ঘর-জামাই হয়ে এসে ফের শ্বশুরের স্কুলে মাস্টারি পেয়ে যায়। এখনও ছেলেপুলে না হলেও দিব্যি কাটাচ্ছে। তবে মৃগাঙ্ক এত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, বলার নয়। অতবড় বাড়িটা সামলাতে সে হিমসিম খাচ্ছিল। এখন স্বাধীন ও বিজয়েন্দু থাকায় ও সমস্যা নেই। বঙ্কুবাবুর একটা ছোট্ট চিড়িয়াখানার মতো ছিল। একটা হরিণ, ময়ূর, বাঘের বাচ্চা এবং আরও সব জীবজন্তু পাখি নিয়ে তার শুরু। এখন সব মরে একটা বাচ্চা হরিণ, একজোড়া ময়ূর আর কিছু পাখিতে ঠেকেছে। স্বাধীনের নেশা বলতে ওই চিড়িয়াখানাটাই। ছেলেবেলা থেকেই সে ওই নিয়ে থেকেছে বাবার পাশাপাশি। এখনও আছে। মৃগাঙ্ক তার জন্যে একটা গন্ধগোকুল খুঁজছে। পায়না।

বিজয়েন্দু স্কুলমাস্টার। অপূর্ব সুন্দর চেহারা। চেহারায় বাঙালী ছাপ নেই—ভাষাতেও তেমন নেই। খুব নিরীহ শান্ত গোবেচারা মানুষ সে। বইপত্তর নিয়ে কাটায়। বিকেলে কোনদিন হাঁটতে হাঁটতে শ্যালকের খামারেও আসে। কিছুক্ষণ থাকার পর নদীর ধারে চলে যায়। চুপচাপ একলা বসে থাকে।

প্রিয়নাথের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিজয়েন্দুর। প্রিয়নাথ সকালেব দিকে আজ বিশ-বাইশ বিঘে চষেছে ট্রাকটরে। চৈতালির জন্যে জমি তৈরি করা হচ্ছে। খুব হাল্কা চাষ। মাটি এমনিতেই নরম। গুঁড়ো হয়ে যায় সহজে। মিল্ক পাউডারের মতো। মাটি পরীক্ষা করছে হাঁটু দুমড়ে। ডিস্ক হ্যারোগুলো এ মাটির উপযুক্ত নয়। বেশি গভীর হয়ে যায়। বদলানো দরকার ভেবেছে। তারপর আটচালায় গিয়ে কৃষিযন্ত্রগুলোর দিকে শূন্যদৃষ্টে তাকিয়েছে। নিজের ঘরে গেছে। মৃগাঙ্কেরই ঘর। পাশাপাশি দুটো খাটে দুজনে থাকে। মৃগাঙ্ক মোটর সাইকেলে চেপে শহরে গেছে—হয়তো কার্তুজ কিনতে। চাষবাসের কিছু ইংরেজী বই রয়েছে একটা কাঠের থাকে। একটা বই টেনে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। তারপর সারা দুপুর ঘুম।

বিকেলে মৃগাঙ্ক তখনও ফেরেনি। দুপুরের ঘুমে কীসব বিদঘুটে স্বপ্ন হচ্ছিল। মনটা কেমন অস্থির হয়ে আছে। প্রিয়নাথ হাঁটতে হাঁটতে খামাবের পূর্বসীমা ঘুরে নদীর ধারে গেল। তারপর সোজা হাঁটল শ্মশানটার দিকে। বাঁধের নিচে পাড়ে একটা চটান জায়গা পাতলা একস্তর দূর্বাঘাসে ঢাকা। তার নিচেব অংশে শ্মশান। তাব নিচে জল। এদিকটা বেশ উঁচু। বন্যা হলেও জল উঠতে পারে না। বাঁধ থেকে প্রিয়নাথ দেখল, বিজয়েন্দু একা চুপচাপ বসে রয়েছে। তার কোলে একটা লম্বাচওড়া মোটা বই। প্রিয়নাথ দৌড়ে নেমে গেল। ঘরজামাই লোকটিকে তার সেদিন খুব ভালো লেগেছিল। কথায় সামান্য হিন্দি টান আছে। তাই কথা শুনতে এত ভালো লাগে হয়তো।

এই যে স্যার! একা বসে আছেন দেখছি!

বিজয়েন্দু তাকায়।—আরে! প্রিয়বাবু যে! আসুন, আসুন!

প্রিয়বাবু তার পাশে বসে।—কতক্ষণ?

অনেকক্ষণ এসেছি। মৃগাঙ্কদা কী কোরছেন?

নেই। বহরমপুর গেছেন। ফেরেন নি।...বলে প্রিয়নাথ সিগ্রেট বের করে। এগিয়ে ধরে প্যাকেটটা। করজোড়ে নমস্কাব করে বিজয়েন্দু।—মাফ কোরবেন। পিই না—মানে...একটু হেসে সে বলে—খাই না।

বাঃ! বলে প্রিয়নাথ সিগ্রেট ঠোঁটে রাখে।

বিজয়েন্দু ওর হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে বলে—আমি জ্বেলে দিচ্ছি। তারপর জ্বেলে দেয়। ফের বলে—হয়েছে তো? খুব জোরে জোরে টান দিন—জ্বলে যাবে।

ধুঁয়ো নদীর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে প্রিয়নাথ বলে—এখানটায় বেশ লাগে বসতে। তাই না? শ্মশানে এলে অনেকের নাকি ভয় করে। আমার তো বেশ লাগে। আপনারও লাগে দেখছি।

বিজয়েন্দু হাসে।—উঁহু। আমি এখানে ভয় পেতে আসি।

বলেন কী!

হাঁ। এটা কীরোকোম ভয় ঠিক ব্যাখ্যা কোরতে পারবোনা আপনাকে। মৃত্যু কীরোকোম, আপনার ধারণা?

কখনও ভাবিনি।

ভেবে দেখবেন, ভয় কোরবে। মৃত্যু একটা এ্যানিহিলেশান—বিনাশ। এই যে দেশলাই জ্বাললাম, নিবে গেল—ওইরোকোম। সেজন্যেতে আমার ইচ্ছে কোরে কী, কিছু—সার্টেন থিং, যাকে বোলবো ট্রান্সফরমেশন অফ লাইফ—একটা রূপান্তর কেন থাকবে না? আমার ইচ্ছে—পোকা দেখেছেন তো? মথ যাকে বলে। কীরোকোম ট্রান্সফরমেশান হয়—এভোলিউশান বলাই উচিত।

গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি হয় শুনেছি।

তাই বোলছি আমি। আমার কাছে এই বইটা দেখছেন—থিওসফির বই। প্রেততত্ত্ব। আমি কিছুদিন থেকে খুব পড়ছি এসব বই।

প্রিয়নাথ একটু অবাক হয়ে বলে—কেন? হঠাৎ প্রেততত্ত্ব নিয়ে পড়লেন যে?

আমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে খেয়ালটা মাথায় আসে। মায়ের সঙ্গে আমার খুবই কম দেখা হোয়েছে। ছেলেবেলা থেকে আমি মামার কাছে মানুষ। বাবা রেলে চাকরি কোরতেন। তাতে আমার পড়াশোনার অসুবিধে হোবে—সেজন্যেতে মামার বাড়ি ছিলাম। মা জব্বলপুরে মারা যান। তখন আমি সবেতে বি. এ. পাশ কোরেছি। পাটনা ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হবার চেষ্টা কোরছি।

তারপর?

স্বপ্নে দেখলাম, মা কাছে যেতে বোলছেন। আমি যাবার চেষ্টা কোরছি। পারছি না। তারপর মা চলে গেলেন। ঘুম ভেঙে আমার মন খুব খারাপ হোয়ে গেল। ভাবলাম, জব্বলপুরে যাব। কিন্তু সেদিনই এ্যাডমিশানের লাস্ট ডেট। পাটনা না গেলে চোলবে না। গেলাম। ভর্তি হলাম। ফিরে এসে রাত্রে শুনি, টেলিগ্রাম এসেছে। গিয়ে পৌঁছলাম পরদিন সন্ধ্যায়। মাকে দেখতে পাইনি।...একটু চুপ করে থাকার পর বিজয়েন্দু ফের বলে—এম. এ-টা আর ইচ্ছে কোরেই পড়িনি। নিজেকে খুব—খুউব—কী বলব? ব্যর্থ মানুষ মনে হয়েছিল। অফ কোর্স—এসব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার!

প্রিয়নাথ আড়চোখে দেখতে থাকে ওকে। বিজয়েন্দু নদীর স্রোতে কিছু দেখছে নিষ্পলক, তারপর প্রিয়নাথ বলে—ও নিয়ে ভাববেন না। ভেবে তো কোন লাভ নেই।

বিজয়েন্দু একটু হেসে মুখ ফেরায়।—কিছু ভেবে লাভ আছে বলুন তো, যদি মৃত্যুই মানুষের শেষ কথা হয়?

তাই কি?

কেন নয়?

তাহলেও মানুষ তো এত যুগ ধরে বেঁচে থাকছে। পৃথিবী নামে এত বড় একটা কারখানা চলছে।

আপনার কথা আমি বুঝেছি। আমার কথা আলাদা।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে। প্রিয়নাথ মনে মনে হাসে। ভদ্রলোকের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীর স্থায়ী মুড আছে। চোখ দুটি এত সুন্দর। আর বস্তুত সৌন্দর্য ব্যাপারটা যে খুব অকেজো আর নিরর্থক, তাতে প্রিয়নাথের সন্দেহ নেই। যাই হোক, খাবার মতো যথেষ্ট খাদ্য ইত্যাদি থাকলে এবং পয়সাকড়ি খরচ করার মতো নিরাপত্তা—মৃত্যু বা ভুতটুত নিয়ে গভীরভাবে ভাবা যায়। ঘর-জামাই সম্পর্কে সুপ্রাচীন বাঙালী ধারণা এই ভদ্রলোকের ওপর চাপিয়ে প্রিয়নাথ আরও কৌতুক অনুভব করে। সে ওকে তাতিয়ে দিতে চায়।

প্রিয়নাথ একটু হেসে বলে—তাহলে আপনি পরলোক খুঁজছেন এখানে এসে?

হেমন্তের হলুদ বিকেলে বিজয়েন্দুর মুখটা কেমন পাণ্ডুর মনে হয়। সে বলে—ঠিক তা নয়। ভাবতে কেমন লাগে। এ্যানিহিলেশান! শব্দটা মাথার ভিতর দিকে কাঁসরঘণ্টার মতো বাজে। বাজে না?

আপনি কুসুমের নাম শুনেছেন?

হুঁউ। খু-উব। কেন শুনবো না? চিনি তাকে।

তার ক্লেয়ারভয়েন্স না কী রকম শক্তি আছে জানেন তো?

অনেক জানি, অনেক। কুসুম তো প্রায়ই যায় আমাদের ওখানে···ফের সলজ্জ হেসে বিজয়েন্দু জানায়—আমার স্ত্রীর ওসব ভীষণ বিশ্বাস আছে, জানেন? ভীষণ।

বলেন কী!

কুসুম আমাকে কনভিনস করতে চায়। আমি থোড়াই শুনি তার কথা। সে বলে কী জানেন? আমি সাধু হোয়ে যাব।

মন খুলে হাসে বিজয়েন্দু। গোলাপী হয়ে ওঠে মুখটা এতক্ষণে। মাথা পেরিয়ে খুব নিচু দিয়ে একঝাঁক শালিখ উড়ে যায়। বটগাছের ডালে গিয়ে বসে। পাশের বাঁশবনে এবং ওই গাছটায় ইতিমধ্যে অজস্র পাখি ভিড় করেছে এবং চ্যাঁচামেচি জুড়েছে, এতক্ষণে কানে আসে প্রিয়নাথের। সে বটগাছটার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে—কুসুমের সত্যি কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে, বিশ্বাস করেন আপনি?

কুছ্—কিছুমাত্র নেই। স্রিফ পয়সা কমানোর ফিকির। ও সেদিন আমার স্ত্রীকে বলেছে, জন্মান্তরে কী ভীষণ পাপ করেছিল, তাই ছেলেপুলে হচ্ছে না!

কথাটা বলেই যেন অপ্রস্তুত হয় বিজয়েন্দু। ফের বলে—ফিকিরবাজ মেয়ে।

হ্যাঁ। আপনার শ্যালকমশাইও তাই বলেন।

কে? মৃগাঙ্কদা? ওকে দেখলে মেয়েটা ভেগে যায় এক দু মাইল তফাতে। গত মাসে এক সন্ধ্যাবেলা ও গিয়েছে আমাদের বাড়িতে। আমার স্ত্রী চালটাল সব দিচ্ছিল। সে সময় মৃগাঙ্কদা হঠাৎ করে হাজির হলেন। হয়ে সব দেখতে পেলেন। বোনকে খুব বকলেন। কুসুমকে এ্যাইসা তাড়া করলেন, চালটাল ফেলে ভাগল। সে নিয়ে দাদাবোনে বহুত ঝগড়া আর কতদিন কথাবলা বন্ধ ছিল!

শুনে প্রিয়নাথ হো হো করে হেসে উঠল।

হ্যাঁ। এই রেকোম হয়েছিল গত মাসে।

কিন্তু মেয়েটির চেহারা—মানে চোখদুটো লক্ষ্য করেছেন? কী আছে মনে হয় না?

করেছি। যৌবনে তো ওরোকোম থাকবেই মেয়েদের। তো অমন খুবসুরত—সুন্দর মেয়ে। ওর জাতের লোকগুলোর চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে পরখ কোরবেন—কোনো—কোনো মিল নেই।

ওর মা ধরিত্রীর কথা শুনেছেন?

হ্যাঁ, সব জানি আমি। আমি আপনার চেয়ে পুরানো লোক এখানে।···বিজয়েন্দু সকৌতুকে হাসল।—আমার শ্বশুরমশায়ের নামেও অনেক বদনাম—স্ক্যাণ্ডাল

শুনেছি। কিন্তু কুসুম ওঁর মেয়ে নয়। লোকে কত বাজে কথা বলে।
প্রিয়নাথ অবাক হয়ে বলে—তাই নাকি ?
হাঁ, শুনেছি।
প্রিয়নাথ ওর সরলতায় খুসি হয় আরও।—আর আপনি মশাই সাক্ষাত জামাই হয়ে এসব শোনাচ্ছেন আমাকে ? অদ্ভুত জামাইতো আপনি !
আপনাকে আমার ভালো লাগল প্রিয়বাবু। সত্যি কথা বলছি, এখানে মনের কথা বলে খুসি হবার মানুষ একটিও পাইনি। আমাকে জামাই 'বলছেন—কিন্তু আমি তো আউটসাইডার। এরা আউটসাইডারই ভাবে। ছাত্ররা আমার আড়ালেতে আমাকে নিয়ে তামাসা করে।
আপনি নিশ্চয় হিন্দি পড়ান ?
ঠিক বলেছেন।…
কথা বলতে বলতে সূর্য ডুবছিল। গাছপালায় পাখিদের চ্যাঁচামেচি আরও তীব্র হল। নদীর ওপারে নীল কুয়াসা জমতে থাকল। সারাদিন প্রচণ্ড গরমের পর এতক্ষণে জল ছুঁয়ে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে এল। জলে ছায়া আরও একটু কালো দেখাল, কোথাও কোথাও যদিও লাল নীল হলুদ চাপ চাপ রঙ তলায় খাপচাভাবে জমে রইল। এখনই শিশির জমে ওঠার ঝোঁকে ঘাসে-ঘাসে একটা নমনীয়তা আসতে শুরু করেছে। মাকড়সাগুলো সারাদিন জাল বুনছিল, কাজ সেরে ঘাপটি পেতেছে। তাদের দেখা যাচ্ছে না। একটু তফাতে বিষ পিঁপড়ের সার দেখা যাচ্ছিল। পা পড়লে কামড়ায় ওরা। ভীষণ জ্বালা করে। প্রিয়নাথ দেখল, সারটা বিজয়েন্দুর পাছার খুব কাছ দিয়ে ঘুরে গেছে। সাবধান করবে ভাবল। কিন্তু জামাই—বিশেষ করে ঘরজামাই গোবেচারা মানুষকে একটু উত্যক্ত করার বদমাইসি থাকায় কিছু বলল না।
বিজয়েন্দু পাটনা ভাগলপুর মুঙ্গের আরও নানা জায়গার গল্প করছে। প্রিয়নাথ শোনার ভান করছিল। আলো ফুরিয়ে যাবার আগেই সামনে পূবে ওপারে গাছ-পালার মাথায় বিশাল কাঁসর ঘণ্টার মতো চাঁদটা চোখে পড়ছিল। মনে হল গভীর ব্যাপক আর নিঃশব্দ ঘণ্টা বাজিয়ে এই ডাকিনী যোগিনীদের দেশে একটা রাত আসছে। একবার পিছনের শ্যাওড়া গাছে প্যাঁচা ডাকল। তারপর দূরে আখের জমিতে শেয়াল ডেকে উঠল। বেশ কয়েক মিনিট দলটা ডাকাডাকি করে চুপ করে গেল। তারপর নদীর ওপর দিয়ে ফের প্যাঁচাটা ডাকতে ডাকতে চলে গেল। তখনই কুসুমের কথাগুলো মনে পড়ে গা শিউরে উঠল প্রিয়নাথের। নিজের অজান্তে তার কান সতর্ক হল, কোথায় কি সাপ ব্যাঙ ধরেছে ?
কোন শব্দ নেই। নদীর ছল ছল শব্দটা এবার স্পষ্ট হয়েছে। চাঁদটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফিকে সোনালি রঙ চুঁইয়ে পড়ছে এবার—তা জ্যোৎস্না বলা ভুল। কাঁপা কাঁপা নদীর জলের তলায় তাকে দেখা গেল। মাঝে মাঝে হয়তো মাছ নড়ে ওঠার

জন্যেই জায়গায় জায়গায় গলানো ধাতুর হলুদ আভা ছড়াতে থাকল। সেই বিস্ময়কর প্রাতিভাসিক বিস্ফোরণের দিকে প্রিয়নাথের দৃষ্টি বারবার আটকে যেতে থাকল।

আর, মশা আসতে শুরু করেছে। সুঁই ফোটাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘাড় ও কপালে হাত চালাচ্ছিল প্রিয়নাথ—চুপি চুপি। ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে ছেলেবেলার গল্প করে যাচ্ছে। এ এক ঝামেলায় পড়া গেল। প্রিয়নাথ এতক্ষণে কাসল।—এবার উঠলে হত জামাইবাবু!

বিজয়েন্দুর দাঁত দেখা গেল। চাঁদের দিকে উজ্জ্বল মুখ।—আপনিও জামাইবাবু বললেন?

বারে! আপনি আমাদের জামাইবাবু না?

উঠতে ইচ্ছে করে না। বেশ শান্ত জায়গা। কিন্তু মশা সুঁই দিচ্ছে।

হ্যাঁ, মশা। আর শিশির পড়ছে প্রচণ্ড। মাথায় হাত দিয়ে দেখুন। চবচব করছে।

তাহলে ওঠা উচিত। কিন্তু কী লাভলি, গ্রেট!

প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়ায়।—কী? সিনারি?

চাঁদ।

আর চাঁদ! চাঁদে মানুষ যাচ্ছে আজকাল। চলুন। সাবধান—আপনার ওপাশে বিষ পিঁপড়ে দেখেছিলাম। এদিকে আসুন।

বিজয়েন্দু তাকে অনুসরণ করে। বাঁধে উঠে দুজনে পাশাপাশি ডাইনে চাঁদ নিয়ে হাঁটে। সোজা খেয়াঘাটের দিকে এগোতে থাকে। খামারের পথে ঘাস আর ঝোপ জঙ্গল পড়বে। সঙ্গে টর্চ নেই কারো। তবে পঞ্চাশ মিটার জঙ্গুলে পথটা পেরোলে আলো মিলবে খামারে—বৈদ্যুতিক আলো। একমাইল পথ ভগীরথপুর থেকে খামার অব্দি লাইন এনেছে মৃগাঙ্ক। অনেক হাঁটাহাঁটি অনেক সাধাসাধি এবং খরচখরচার পর এটা সম্ভব হয়েছে।

সোজা উত্তরে খেয়াঘাটের কাছে গিয়ে ওরা পাকা রাস্তায় ওঠে। বটতলার মাথায় কারা পাটের দর নিয়ে তর্ক করছে। 'সুপারি-গোলার হাট' কথাটা বারবার শোনা যাচ্ছিল। সে তো পদ্মার ধারে। প্রিয়নাথ শুনছে। মৃগাঙ্ক বলছিল, সেখানে ভীষণ জুয়ার আসর চলে। রাজ্যের জুয়াড়ী গিয়ে স্থায়ী ডেরা পেতে বসেছে। ফি রাতে গানবাজনার আসর বসায় তারা। লোকেরা এসে ভিড় করে এবং জুয়ার টানে ভেসে যায়।

ঘাটে বিদ্যুৎ নেই। পুরানো জ্যোৎস্না আর অন্ধকার ঘুরে ফিরে আসে। পশ্চিমমুখো পিচের পথের ওপর সটান শুয়েছে তারা—সেই জ্যোৎস্না ও অন্ধকার গলাগলি। তিন চারটে দোকানমাত্র। টিমটিমে আলো জ্বলছে। আলো ঘিরে অজস্র পোকা থিকথিক করছে—বাসটা গাছের নিচে হাতির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। পথে চলাফেরা করছে অল্পস্বল্প লোক—চাপা গলায় কথা বলছে তারা। সবই

ষড়যন্ত্রসঙ্কুল মনে হয়।

প্রিয়নাথেব চা খেতে ইচ্ছে করছিল হাওলাদারের দোকানে। দোকানটা পেরিয়ে গিয়ে সে জানাল কথাটা। বিজয়েন্দু বলল—তা চলুন না আমার সঙ্গে। গিয়ে চা আর গল্পসল্প করা যাবে। এখন তো কাজ নেই আপনার?

নেই।

তাহলে চলুন। একটা রিকশো নেওয়া যাক।

থাক। হাঁটতে হাঁটতে যাই। ভালো লাগছে।

আমাবও ভালো লাগছে।

সামনে একটা আলো দুলতে দুলতে আসছিল। কাছে এসে লোকটা হ্যারিকেন তুলল মুখের কাছে।—নতুন বাবু!

গগন হালদার। প্রিয়নাথ বলে—হালদারমশাই কোত্থেকে?

সত্যেন্দ্র গিয়েছিল ভগীরথপুর। ভাবলাম, আলো নিয়ে যাই—এগিযে আনি। তা শুনলাম, ও কখন আগেই চলে এসেছে। ঘাটের দিকে দেখলেন নাকি?

নাতো!

তাহলে হয় তো আপনাদের খামারেই গেল?

হয়তো। যাও, দেখে এস।

বিজয়েন্দু সরে এসে বলল—কী হালদারমশাই, আমাকে দেখতেই পাচ্ছ না!

গগন অমনি হ্যারিকেনসুদ্ধ ডান হাত কপালে ঠেকাতে চেণ্টা করে।—জামাইবাবু যে! ইস্কুলের মিটিঙে যান নি? সত্যেন্দ্র গিয়েছে।

বিজয়েন্দু মাথা দোলায়। তারপর প্রিয়নাথকে ডাকে—আসুন।

গগন বলে—এগিয়ে দিই জামাইবাবু?

না, না। জ্যোৎস্না আছে। তুমি সত্যেনকে দেখো হালদারমশাই।

উঁহু। পথে আজকাল ইনি সাপগুলো ওঠে বড্ড। তিন চারটে দেখলাম।··· গগন আগু বাড়িয়ে ওদের আলো দেখিয়ে হাঁটতে শুরু করে, যেদিক থেকে এসেছে ফের সেদিকেই।—তবে ইনি সাপের বিষ নাই। একপাশের নয়ানজুলি থেকে অন্যপাশের নয়ানজুলিতে যাবেই ব্যাটারা। পিচে উঠলে তখন যদি আকুলি-বিকুলি দশাটা দেখেন, হেসে বাঁচবেন না। এক সুতো এগোতে একশোবার ছটফট করবে।··· গগন খুব হাসে।

পচা জলের দুর্গন্ধ আর মশার একটানা আওয়াজের মধ্যে তিন জনে হাঁটে। গগনের খালি গা, হাঁটু অব্দি ধুতি পেঁচিয়ে পরা, খালি পা—হাঁসের মতো থ্যাবড়া আর ফ্যাকাসে। গগন বকবক করে সমানে। ইস্কুল, পাটের দর, তেজারত মোড়লের সঙ্গে ইনু পাইকারের মামলা, ইসলামপুরে তাঁতিরা রেশম পাচ্ছে না, ব্লক অপিস ঘেরাও করেছিল ইত্যাদি। তারপর গগন প্রিয়নাথকে জিগ্যেস করে—আপনি তো বাবু, রাঢ়ের লোক—না কী?

হ্যাঁ। কেন ?

কোন জায়গার ?

সিউড়ি।

সাঁইথে একবার গিয়েছিলাম আকালের বছরে। পঞ্চাশ সনে। তখন আমি বয়েসে কাঁচা।

মাছ বেচতে নাকি ?

মাথা খারাপ! তিরিশ কোশ রাস্তা পায়ে হেঁটে মাছ বেচতে? গিয়েছিলাম এক সাধুর সঙ্গে। তখন পয়সার দাম ছিল নতুনবাবু। মোটর বাসে চাপিনি। তখন সাধুরাও চাপত না—পায়ে হাঁটত।

বল কী হালদারমশাই! সাধুর সঙ্গে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ। খেয়াল হল, চলে গেলাম। সাধু পদ্মাপার থেকে এসেছিল। এসে শ্মশান-বটতলায় আখড়া করেছিল। খুব গাঁজা খেত। আমিও খেতাম। তখন ধরিত্তি বেঁচে। সবে মুখিয়ে উঠেছে। ডাঁটালো ছিপছিপে গড়ন। হ্যাঁ—আগের বছর টাট্টু চেপে ওর পুরুষকে নিয়ে কালুখাঁর দিয়াড়ে এসে জুটেছিল। ভেবেছিল, খেয়ে পরে বাঁচবে। নদীর ধারের ভরাট মাটি—সুফলা।

ফের ধরিত্রীর কথা! প্রিয়নাথের খারাপ লাগে। বুড়ো জেলে আর কোন কথা জানে না—শুধু ওই ধুয়ো নিয়ে বেঁচে আছে যেন।

বিজয়েন্দু আনমনে ছিল। সে বলে—ধরিত্রী ?

গগন বলে—হ্যাঁ, ধরিত্তি। তা সাধু বলেছিল, ধরিত্তি একজন ভৈরবীই বটে। তবে ওর জাত গিয়েছে। ওকে কাম জয় করেছে। না—ওর মাথার ঘিলুতে গোঁজ পুঁতেছে। ওর উদ্ধার নাই।

প্রিয়নাথ সকৌতুকে বলে—আর তুমি কি ওর উদ্ধারের জন্যে সাধুর সঙ্গে গেলে ?

কে কাকে উদ্ধার করে নতুনবাবু! আমি গেলাম একটা কাজে। এখন হাসি লাগে। যৌবনে মানুষ কী করে, কী মাথায় ঢোকে! এখন বলতে লজ্জা নাই। আমি গিয়েছিলাম বশীকরণ লতা আনতে।

ওরে বাবা! বশীকরণলতা! এরা দুজনে এক সঙ্গে হাসে।

হ্যাঁ। সাঁইথে থেকে আরও পশ্চিমে কী এক পাহাড় আছে। সেখানে অমাবস্যার রাতে লতায় ফুলটি ফোটে। ফুলসুদ্ধ লতা উপড়ে আনতে হয় এক নিঃশ্বাসে—সাধু বলেছিল।

তারপর, তারপর ?

সাধু বলেছিল, পাহাড়ে বিস্তর গাছপালা, জঙ্গল, জন্তু-জানোয়ার থাকে। কিন্তু অমাবস্যার রাতে লতায় যখন ফুলটি ফোটে, গন্ধে মউ মউ করে সারা পাহাড়। অচল হয়ে পড়ে থাকে জন্তু-জানোয়ার। তখন শুঁকে শুঁকে লতাটি খুঁজে বের করতে হবে। তা, সাঁইথের বাজারে ঢুকেই সাধু বললে—তাহলে এবারে আমার মূল্যটি

ধরে দে। আমার খটকা লাগল। কথা ছিল, সাধু লতা এনে দিলে তখন ওকে সাত টাকা সাত আনা সাত পয়সা দক্ষিণা দিতে হবে—আগে নয়। আমি ওই টাকা চুরি করেছিলাম সেই আকালের বছরে। তখন এই সারা বাগড়ী এলাকায় না খেয়ে পটাপট মানুষ মরছে। রাঢ়ে পালাচ্ছে সবাই ফ্যান চাইতে। বাবার নৌকোখানা দশ টাকায় বন্ধ রেখেছিল বংকুবাবু—মানে এই জামাইবাবুর শ্বশুরমশায়ের কাছে। পেটের জ্বালায়। আর আমি শালা—হুঃ! ওই যে বলে, ভাত কুরকুরায় না যৌবন কুবকুরায়? আমার যৌবন শালা!…গগন থুথু ফেলে।

সে ফের বলতে থাকে—সাধু বাজারে ঢুকেই টাকা চাইলে। আমার খটকা লাগল। বললাম, সে হবে। আগে পাহাড় কোথায়, নিয়ে চলুন। সাধু বললে, ঠিক আছে। খিদে পেয়েছে। আয়, খেয়ে নিই। দুজনে একটা সন্দেশের দোকানে ঢুকলাম। সাধুই রসগোল্লা লুচি নানারকম খাবার দিতে বললে। তখন অতটা ঠাওর করিনি। জীবনে কখনও খাইনি বললেও চলে, আর ক্ষিদের মুখে ওই সব খাবার—খুব খেলাম। তারপর সাধু বললে, ব্যাটা, দাম দে। আমি তখন তো আকাশ থেকে পড়েছি। মোটে আটটা টাকা চুরি করেছিলাম।…গগন করুণ হাসল।

প্রিয়নাথ বলল—তারপর?

তারপর বেজায় গণ্ডগোল হল। সবাই সাধুর পক্ষে। সাধুরা পয়সা কোথায় পাবে? এই ছোঁড়াটাই ওনাকে খাওয়াতে এনেছে। এনে এখন হিসেব দেখে বদমাইসি করছে। আমাকে মেরে ধবে ময়বা টাকাগুলো সব কেড়ে নিলে। আমি তো রক্তটক্ত নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। তিরিশকোশ! মরে যেতাম! বরাতের জোরে বাগড়ী এলাকার অনেক গাড়ি রাঢ়ে খন্দ ফিরি করতে যায়। তাদের সঙ্গে গাড়িতে শুয়ে আকাশ দেখতে দেখতে তিনদিন তিনরাত পরে বাড়ি ফিরলাম। বাবা আমার খুব ভালোমানুষ ছিল। টাকার জন্যে কিছু বলল না। বরঞ্চ প্রাণে বেঁচে ফিরেছি, এই নিয়ে কান্নাকাটি করল। বললে—সাধুটা ছিল নির্ঘাৎ নরখাদক—বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা বশীকরণ জানে কিনা!…গগন আবার ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে থাকে।

প্রিয়নাথ বলে—পরে তো ধরিত্রীর সঙ্গে ভাবটাব হয়েছিল হালদারমশাই?

হুঁউ হয়েছিল। খুব—খুব।

বিনা বশীকরণে তো?

হুঁউ। বশীকরণ লাগে না ওতে।

কী লাগে হালদারমশাই?

গগন আনমনে বলে—উঁ?

কী লেগেছিল ধরিত্রীকে জয় করতে?

গপ্পটা তো আপনাদের সেদিন বলেছি। ওর কারচুপি তুকতাক একমাত্র আমিই জানতাম, সব ধাপ্পা। আমার কাছে চাবিকাঠিটি ছিল। তাই আমার বশ হয়েছিল।

তবে সে খুব সহজ মেয়ে ছিল না। অমন মেয়ে দুটো একটা জন্মায়। ধরিত্রি হয়তো মানুষই ছিল না, নতুনবাবু।

প্রিয়বাবু বিজয়েন্দুকে বলে—বুঝতে পারছেন তো? হালদারমশাই ওকে আসলে ব্ল্যাকমেইল করত।

বিজয়েন্দু মৃদু হেসে চাপাগলায় বলে—আরেকজনও করতেন।

কে?

শ্বশুরমশাই।

রাস্তার ধারেই বিশাল এলাকা পাকা পাঁচিলে ঘেরা—'রায়ভবন।' গেটের মস্ত কপাট প্রায় ভাঙাচোরা—নির্জন ও নিঃশব্দ। ভিতরের প্রাঙ্গণে অজস্র গাছপালা—আম, লিচু, কাঁঠাল আর কিছু শিরীষ-আমলকী-কৃষ্ণচূড়া দেবদারু। ফুলবাগান একটা ছিল। এখন অযত্নে ঝোপঝাড় হয়েছে, তবু ফুল ফোটে। মিঠে গন্ধ ভাসে হাস্নুহানা আর শিউলির। বিদ্যুতের আলো আছে। একতালা বাড়ি। সামনেই ঠাকুরঘর ও ছোট্ট উঠোন। ধাপ আছে উঠোনের চারদিকে। মধ্যে একটা পুরনো হাড়িকাঠ পোঁতা আছে। সিঁদুরের ছোপে ভয়ংকর লাগে। একসময় একশো পাঁঠা বলি হত।

গগন ঠাকুরবাড়ির দরজায় গিয়ে বলে—তাহলে যাই?

আসুন। বলে বিজয়েন্দু পা বাড়ায়। কলিগের বাবাকে সে মর্যাদা দেয় যথেষ্ট। তারপর প্রিয়নাথের হাত ধরে টানে—আসুন প্রিয়বাবু।

ঠাকুর ঘরের বারান্দা দিয়ে অন্দরে ঢোকে ওরা। ফের একটা উঠোন। চারদিকে অনেকগুলো ঘর। দুটো ঘরে আলো জ্বলছে। বারান্দার একদিকে আলো আছে।

বিজয়েন্দু ডাকে—নিবারণ!

স্বাধীন বেরিয়ে বলে—নিবারণকে বাইরে পাঠিয়েছি।···পরক্ষণে ঘোমটাটা একটু তোলে। তারপর একটু হাসে।—ও, প্রিয়বাবু! আসুন, আসুন।

মৃগাঙ্কের সঙ্গে দুদিন এবাড়ি এসেছিলেন প্রিয়নাথ। স্বাধীন খুব আলাপী মেয়ে। সঙ্কোচের ধার ধারে না দেখেছে। আর সহজেই অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠাও হয়তো যায় তার কাছে।

বিজয়েন্দু বলে—তুমি টাকা নিয়ে এসো। আমার ঘরেই বসছি আমরা।

ঘরটা সুন্দর সাজানো গোছানো। অজস্র বই রয়েছে কয়েকটা সেলফে। হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা। কোণের টুলে খবরের কাগজের গাদা। জানলার ধারে একটা সেক্রেটারির টেবিল। ল্যাম্প আছে সুদৃশ্য। কলমদানী আছে। ফাইল, পেপার-ওয়েট, লিলিপুট ভাস্কর্য ইত্যাদিও আছে যথারীতি। দেওয়ালে কিছু পেণ্টিং, ক্যালেণ্ডার, ফোটো। এককোণায় উঁচু সেকেলে ছপ্পরঘাট মেহগিনি রঙ, পুরু গদী, তাঁতের বিশাল রঙীন বেডকভারে ঢাকা। নেটের ধবধবে মশারি আছে ওপরে চন্দ্রাতপের মতো। একটা আয়নালাগা স্টিলের আলমারি আছে। প্রিয়নাথ দেখল,

খাটে শুলে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখা যায় ওতে। উত্তম ব্যবস্থা। প্রিয়নাথ খুঁটিয়ে দেখে মনে মনে হাসে। কিন্তু ঈর্ষায় কাতরও হতে থাকে। কত লোক এই দেশে কত রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কাটাচ্ছে। প্রেততত্ত্ব ও মাতৃস্নেহ ইত্যাদি নিয়ে ভেবে অস্থির হচ্ছে। আর আমি শালা মিস্তিরি, ঘর পালানো, স্নেহভালবাসাবিহীন পরিবার থেকে এক ছন্নছাড়া হাভাতে মস্তান মাত্র। প্রিয়নাথ নিজের দিকে কড়া চোখে তাকাল।

ঘরটা বেশ বড়ো। লেখার টেবিলটার ওপাশে হাল্কা একটা সোফাসেট রয়েছে। প্রিয়নাথ ঢুকেই সেখানে গিয়ে বসে পড়েছিল। একটা ইজিচেয়ার আছে ডোরাকাটা —সেখানে বিজয়েন্দু হাত পা ছড়িয়ে আরামে বসল। বলল—এদেশে সব ভালো। শুধু মশাটাই যা খারাপ। ফ্যানটা বাড়িয়ে দেব? মশা কামড়াবে।

থাক। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে! তবু এত মশা কেন, কে জানে!

ওই দেখুন না, জানালায় সব নেট লাগানো হয়েছে। তাও রেহাই নেই। গান শুনবেন?

কে গাইবে? আপনি গাইলে শুনব।

না। রেকর্ড। আমি ওই নিয়েই আছি। দেশী বিলাইতী সবরকম গান অর্কেস্ট্রা আছে।

প্রিয়নাথ মনে মনে বলে—তুমি সব নিয়েই আছ আজ জামাইবাবু! সে সিগ্রেট ধরায় এবং এ্যাসট্রে খোঁজে। বিজয়েন্দু একটা কৌটোর ঢাকনা এগিয়ে দেয়, টেবিল থেকে। তারপর বলে—শেষ অব্দি ভেবে দেখেছি, সঙ্গীতই শ্বাশ্বত—সঙ্গীতই হয়তো ঈশ্বর।

প্রিয়নাথ মনে মনে বলে—সুখে আছ জামাইবাবু, ঈশ্বর টিশ্বর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। সে প্রকাশ্যে বলে—আপনাদের চিড়িয়াখানাটা আমার দেখা হচ্ছে না! কোথায় সেটা?

পিছনে। যাবেন এখন?

চলুন না!

ট্রেতে দুটো প্লেট নিয়ে ঢুকছিল স্বাধীন। বলে—এখন কি দেখবেন? দিনে আসবেন। তেমন কিছু নেই। মন দিতে পারিনে। হরিণের বাচ্চাটা আনালাম এত খরচা করে—বাঁচবেনা হয়তো।

প্লেট দুটো রাখবার সময় তার হাতকাটা ব্লাউজের অনেকটা পাশ থেকে দেখতে পায় প্রিয়নাথ। সে চোখ ফেরাতে পারে না। বিজয়েন্দু বলে—নিন, খাওয়া যাক্। স্বাধীন চমৎকার পায়েস করে।

প্রিয়নাথ আনমনে প্লেট তুলে নিয়ে খায়। স্বাধীনকে এত সুন্দরী তো মনে হয়নি আগের—আগের বার। দিনে দেখেছিল বলে? রাত্রি একটা মায়া আনে নিঃসন্দেহে। এখন স্বাধীন সেজেগুজে আছে। কপালে লাল টিপ, চোখে কাজলের রেখা চুলগুলো

অবশ্য এলোখোঁপা। সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। যেন লাল রঙের ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার কামড়ে বসে আছে, মরণকামড়। ক্রমশ সুন্দরতর হল স্বাধীন। দুধসাদা রডলাইটের আভায় ধবধবে পরীমূর্তি। সরু সরু সবুজ পোকাগুলো আলোর গায়ে থিকথিক করছে আর কিছু সাদা পোকা উড়ে এসে গায়ে বসছে, মুখে বসছে এবং স্বাধীন হাত দিয়ে তাড়াচ্ছে।

বসুন, চা আনি। বলে সে চলে যেতেই ঘরটা শ্মশান হয়ে গেল যেন। আসবাব-পত্রগুলো খসখসে পোড়াপোড়া দেখাল এবং ছন্নখান।

প্রিয়নাথ একবার ঘুরে আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখতে চেষ্টা করে। তার শরীরটা মোটামুটি বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্য প্রবল। সাদা হাতের ওপর নীলচে রোমগুলোয় সবুজ পোকা ঢুকেছিল, ছাড়িয়ে ফেলে। হঠাৎ তার মনে হয়, সে খুব অযোগ্য মানুষ নয় পৃথিবীতে। হাত বাড়ালে কিছু না কিছু তুলে আনতেই পারে। এতকাল হাত বাড়ায়নি, ভুল হয়েছে।

বাইরে কার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছিল স্বাধীন। বিজয়েন্দু হঠাৎ মুচকি হেসে চোখ টিপল প্রিয়নাথের দিকে। তারপর উঠল। পা টিপে টিপে জানলার কাছে গেল—ভিতর দিকের জানালায়। ওখান থেকে পর্দা ফাঁক করে কিছু দেখে ফের মুখ ঘুরিয়ে চোখ টিপল। তারপর ফিরে এল ইজিচেয়ারে! চাপা গলায় বলল—কুসুম।

প্রিয়নাথ সোজা হয়ে বসে—কুসুম!

হ্যাঁ। প্রায়ই আসে তো। রাত্রেই আসে।

কেন?

বলছিলাম তো। আমার স্ত্রী সুপারস্টিশনের ডেঁপো। ভূতপ্রেত মন্ত্রতন্ত্রের খুব ভক্ত।

ও! বলে চুপ করে যায় প্রিয়নাথ।

একটু পরেই চা নিয়ে আসে স্বাধীন। মুখটা এবার গম্ভীর। চা রেখে সে বাইরের দিকে কাকে গলা চড়িয়ে বলে—রসুর মা, বাইরে বসো। আমি যাচ্ছি। তারপর একটা মোড়া টেনে নিয়ে একটু তফাতে বসে। এবার তার মুখে হাসি ফোটে। স্বাভাবিক লাগে তাকে।

বিজয়েন্দু বলে—কী খোবোর কুসুমের?

এ্যাঁ! স্বাধীন চমকায় যেন। তারপর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বলে—এসেছিল। নতুন কাপড় চাইতে। নতুন কাপড় এখন কোথায় পাব? কাল আসতে বললাম।

কী হবে নতুন কাপড়?

সে তোমার শুনে কাজ নেই।

প্রিয়নাথ বলে—আপনি ওসব বিশ্বাস করেন বুঝি?

কী?

মন্তরতন্তর ?

স্বাধীন মুখ টিপে হাসে।—আপনি বুঝি করেন না ?

কীভাবে করব ? তেমন দেখাশোনার সুযোগ হয়নি। দরকারও পড়ে না।

স্বাধীনের চোখ দুটো মুহূর্তে চকচক করে উঠেছিল। সামলে নিল।—না জেনে কিছু বলা ঠিক নয়। আপনাদের মাস্টারমশায়কে জিগ্যেস করতে পারেন, কী হয় বা না হয়।

আপনি কি রাগ করলেন আমার কথায় ?

স্বাধীন ফের নির্মল হাসল।—না।

বিজয়েন্দু বলল—কুসুম একটা ম্যাজিক দেখিয়েছিল।

প্রিয়নাথ শুধোয়—কী ম্যাজিক ?

স্বাধীন তেড়ে মেড়ে বলে—ম্যাজিক ? ওটা ম্যাজিক ? বুঝলেন প্রিয়বাবু ? তখন বলছিল, সারাটা দিন শরীর খারাপ করেছে। আমি কত বললাম কুসুম এলে। তখন ও সব ঠিকঠাক করে দিল।

কী ব্যাপারটা শুনি ?

বিজয়েন্দু বলে—ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভাববার মতো। আমার দুই ভুরু মধ্যিতে আঙুল ছুঁইয়ে জিগ্যেস করল, কিছু টের পাচ্ছেন ? তখন সত্যি তাজ্জব হোয়েছিলাম কিন্তু। আমার সারা শরীর অবশ লাগছিল। জাস্ট ইলেকট্রিক শক !

বলেন কী ?

হ্যাঁ। তারপর আঙুল তুলে নিল। কিন্তু রাত্রে ভালো ঘুম হল না। খুব খারাপ সব স্বপ্ন দেখলাম। পরের দিনটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। স্কুলে যেতে পারলাম না। জ্বর ছেড়ে গেলে যেমন ল্যাগে ! মুখ বিস্বাদ। কিছু খেতে ভালো লাগল না। রাত্রে আবার কুসুম এল। ও বকাবকি করল। তখন ফের আঙুল রাখল আমার সেই জায়গায়। সেরাত্রে ঘুম ভাল হোল। শরীরও ঠিক হোয়ে গেল পরদিন।

আশ্চর্য তো !

পরে ভেবেছি। ব্যাপারটা স্পষ্ট সাইকোলজিক্যাল। নিজেরই সাবকনশাস মাইন্ডে উইকনেস ছিল কিছু। তাছাড়া এর ব্যাখ্যা হয় না। আমি আপনাকে একটা বই দেখাতে পারি। দা ফেনোমেনোলজি অফ পারসেপসান। মার্লো পন্টির লেখা। চমৎকার ব্যাখ্যা আছে এইসব ব্যাপারে। তাছাড়া হ্যালুসিলেসানের ব্যাখ্যা আছে। উইচডকটর বা ওঝা তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কেও ধারণা হবে। একে বলা হয় উইচ-কাল্ট। এদিকে সাইকোলোজিস্ট য়ুং বলেছেন—

স্বাধীন বলে—পণ্ডিতীটা রাখো। ওঁকে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনি। রাত বাড়ছে।

বিজয়েন্দু ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ যান প্রিয়বাবু, দেখে আসুন।

আপনি চলুন ?

ভয় নেই। মালিক নিজে যাচ্ছেন সঙ্গে। আর চিড়িয়াখানায় বাঘটাঘ পোষা তো হয় না!……হো হো করে হেসে ওঠে বিজয়েন্দু।
স্বাধীন বিছানার তলা থেকে একটা লম্বা টর্চ বের করে বেরিয়ে যায়। প্রিয়নাথ একটু ইতস্তত করে তাকে অনুসরণ করে। যাবার সময় বিজয়েন্দুর মুখটা দেখে যায়। সে চোখ বুজেছে। হাসিটা তখনও ধরা আছে ঠোঁটে।
বারান্দা ঘুরে খিড়কির দরজা খোলে স্বাধীন। নেমে যায় ওদিকে। টর্চ জেলে বলে—আসুন।
ওদিকে কোন আলো নেই। বাগানবাড়ি মতো। কিন্তু গাছপালা নেই বিশেষ। ঘাসের ওপর শিশির এবং জ্যোৎস্না। এদিকে ওদিকে দূরে গাছপালার ছায়া দুলছে অল্প হাওয়ায়। স্বাধীন হঠাৎ ঘুরে বলে—ও এল না?
না।
আসুন।
সে শিশিরের ভয়ে একটু কাপড় তুলে হাঁটে এবং টর্চের আলো প্রিয়নাথের উদ্দেশ্যে নিজের পা থেকে প্রিয়নাথের পা অব্দি গোলাকার করে রাখে। প্রিয়নাথ তার গোলাপী সুন্দর পা, আলতার দাগ, হাঁটুর নিচেকার সুদৃশ্য ডিমালো মাংসে কিছু রোমশ ভ্রূকুটি লক্ষ্য করে। কী ঘটে যায় তার মধ্যে। ওই পা দুটো বুকে নিতে ইচ্ছে করে। এই দুর্দান্ত ইচ্ছে তার ভব্যতা ও যুক্তিকে অনবরত উত্যক্ত করে মারে। সে বড়ো একটা নিশ্বাস ফেলে চাঁদের দিকে তাকায়।
তারের জালে ঘেরা একটা মস্তো আটচালার সামনে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বলে—এই দেখুন! এখন ডিসটার্ব করতে চাইনা বেচারাদের। ওই দেখুন হরিণটা। দেখতে পাচ্ছেন? আমার বড্ড নেওটা। ওই ময়ূর দুটো। বাঁদর দেখবেন? বেজায় দুষ্টু। বাবার আমলে বাঘও ছিল। কেষ্ট, ও কেষ্ট। ঘুমোলো নাকি?
ওপাশে একটা ছোট্ট টালির ঘর থেকে সাড়া আসে—যাই মা! তারপর হেরিকেন হাতে এক কালকুট্টে বুড়ো বেরিয়ে আসে।
স্বাধীন বলে—আমাদের মালী! বাবার আমলের লোক। আসলে দেখাশোনা ওই বেশি করে। কেষ্ট, ভারতীকে দুধটা খাইয়েছিলে? খেল?
কেষ্ট মাথা দোলায়। প্রিয়নাথ বলে—ভারতী কে?
স্বাধীন হাসে।—হরিণটার নাম। মাদী। বাবার আমলের সব তো মরে গিয়েছিল। কমাস আগে দাদা কলকাতা থেকে এনে দিয়েছে। এখন ওর একটা জোড়া আনতে হবে। শুধু ওর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আনছি না। আর দাদাও যা হয়েছে আজকাল!
চাপা কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। প্রিয়নাথ বলে—পাখি নাকি?
হ্যাঁ, মুনিয়াই বেশি।
সা নেই?

স্বাধীন ঘুরে দাঁড়ায়।—সাপ!
হ্যাঁ। সব আছে, সাপ নেই?
স্বাধীন হেসে ওঠে।—বলেছেন ঠিকই। সে ট্রেনিং তো বাবা দিয়ে যাননি। হ্যাণ্ডল্ করতে পারব না যে। তখন বেদে পুষতে হবে। কেষ্টদা, তুমি শোও গিয়ে।
কেষ্ট সম্ভবত গাঁজা খায়, প্রিয়নাথের মনে হল। লাল চোখে ঢুলতে ঢুলতে চলে গেল।
স্বাধীন তার চিড়িখানার সামনে আর একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলে—রাত্রে কী দেখবেন! অবশ্য দেখবারও কিছু নেই। বরং দিনে এলে বাঁদরটার দুষ্টুমি দেখে আনন্দ পাবেন! ওরে বাবা, কী বিচ্ছু কী বিচ্ছু! আমার কাঁধে উঠে একদিন পটাপট চুল ছিঁড়তে শুরু করল! কিছুতে নামানো যায় না · খিল খিল করে হেসে ঝুঁকে পড়ছিল সে।
প্রিয়নাথের নাকে একটা সুগন্ধ আসছিল কতক্ষণ থেকে। সেটা কোন ফুলের কিংবা স্বাধীনের ব্যবহৃত সেণ্টের, ঠিক করতে পারল না।—চলুন। বলে সে পা বাড়ায়। তারপর ফের বলে—ভারি সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি! কিসের?
ফুলটুল হবে! আচ্ছা প্রিয়বাবু!
বলুন?
আপনার ফ্যামিলি আনবেন না?
প্রিয়নাথ অবাক হয়।—কেন?
ওই খামার বাড়িতে মাঠের মধ্যে থাকতে ভালো লাগে আপনার?
লাগে বইকি। আপনার দাদাওতো থাকেন!
দাদার কথা ছেড়ে দিন, ও ছন্নছাড়া মানুষ।
আমিত ছন্নছাড়া।
যান!
হ্যাঁ। আমার কোন ফ্যামিলিট্যামিলি নেই!
টর্চ নিভিয়ে জ্যোৎস্নায় স্থির দাঁড়ায় স্বাধীন।—সত্যি?
মিথ্যে বলে কী লাভ?
বাবা মা?
নেই।
ভাইবোন?
ভাইটাই নেই। এক বোন আছে। রামপুর হাটে বিয়ে হয়েছে।
দাদারই মতো! উপযুক্ত দোসর জুটেছেন তাহলে! স্বাধীন হেসে ওঠে। তারপর ফের বলে—বিয়ে করছেন না কেন? বিয়ে করে ফেলুন। তাহলে দুঃখ-দুঃখ ভাবগুলো আর থাকবে না।

আমার দুঃখ-দুঃখ ভাব আছে নাকি ? বলেন কী ?
ওই রকম লেগেছিল প্রথম দিন। এখনও লাগে।
আপনার চোখের ভুল। আমি সুখী মানুষ।
কী বললেন ? আরেকবার বলুন, আরেকবার বলুন শুনি ?
সুখী মানুষ।
সুখী মানুষ, তাই অত আস্তে কথা বলেন—অমন নির্জীব ! চুপচাপ ! চালাকির জায়গা পাননি !
হঠাৎ প্রিয়নাথের মনে হয়, তার সামনে এই নির্জন বাগানের জ্যোৎস্নায় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটছে। রহস্যময় এক স্বাধীনতার নদী—তার পাশে সে, খুবই কাছে দাঁড়িয়েছে সে। নদীটি খরস্রোতা। বিপুল টান।
স্বাধীন একটা নিশ্বাস ফেলে। শোনা যায় তার শব্দটুকু। আর প্রিয়নাথ টের পায়, সে শুধু নাকের ফুটো দুটো দিয়েই শ্বাস প্রশ্বাস ফেলছে। দম আটকানো ভাব। সে হাঁ করে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করে।
কী হল হঠাৎ, প্রিয়বাবু ?
কিছু না। চলুন, উনি একা বসে আছেন।
দুজনে যখন ঘরে ঢুকল, দুজনেরই মুখটা গম্ভীর। বিজয়েন্দু টেবিলে বসে কী সব লিখছিল। ঘুরে বলে—দেখা হল ?
প্রিয়নাথ বলে—হ্যাঁ। এবার আমি চলি জামাইবাবু। রাত বেড়ে যাচ্ছে।
স্বাধীন বলে—আপনিও জামাইবাবু বলছেন ? বাঃ, বেশ !
প্রিয়নাথ একটু হাসে।—আসি তাহলে।
যাবেন ? কিন্তু আলোফালো তো আনেননি দেখছি ! টর্চটা নিয়ে যান বরং।
থাক্। জ্যোৎস্না আছে।
বিজয়েন্দু বলে—আচ্ছা, আসুন। স্বাধীন, প্লীজ—আমি এগিয়ে দিতে যাচ্ছিনে। ভীষণ মুড এসে গিয়েছে। কেটে যাবে। প্লীজ !
প্রিয়নাথ বলে—থাক, এগোনোর কী দরকার ?
স্বাধীন পা জড়িয়ে বলে—না। গোলকধাঁধাঁর ব্যাপার। বেরোতে পারবেন না। সে আমলে চোর ডাকাতের ভয়ে অদ্ভুত গোলমেলে বাড়ি করেছিলেন ঠাকুর্দা। ঢোকা সহজ, বেরুনো কঠিন।
ঠাকুরবাড়ি পেরিয়ে প্রাঙ্গনে নামে ওরা। গেট অব্দি নিঃশব্দে এসে টর্চটা হাতে গুঁজে দেয় স্বাধীন। বলে—এখান থেকে ফ্ল্যাশ করুন, আমি যেতে পারব।
আলোটা ধরে থাকে প্রিয়নাথ। সেই উজ্জ্বলতার মধ্যে পরীমূর্তি চলে যায়। তারপরও কতক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ হুঁস ফেরে তার। তখন আলো নিভিয়ে গেট খুলে রাস্তায় নামে। হনহন করে হাঁটে।
একটু পরে পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে সে ঘোরে। আলো ফেলেই স্তম্ভিত হয়।

কুসুম দুহাতে মুখ ঢেকে বলে—আঃ ! কী করছেন নতুনবাবু ?
প্রিয়নাথ বলে—তুমি ! এখনও কী করছিলে ? কোথায় ছিলে ?
আপনাদের কাছেই ছিলাম। আঃ, আলো নিভিয়ে ফেলুন না !
প্রিয়নাথ আলো নেভায়। কুয়াসা মাখা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে মনে হয়, যা কিছু দেখছে—কোনটাই বাস্তব নয়।
দাঁড়ালেন কেন ?
তুমি চলে যাও, তারপর আমি যাব।
পিছনে গেলে ভয় লাগবে বুঝি ? কুসুম অস্ফুট হাসে।
তোমাকে আমার ভয় লাগে না। বলে প্রিয়নাথ পা বাড়ায়।
বাগানে দুজনে কী করছিলেন বাবু ?
তুমি তো দেখেছ। চিড়িয়াখানা দেখছিলাম।
আপনি চিড়িয়াখানা দেখেন নি ? বলুন তো কী কী দেখলেন ? পারবেন না।
কুসুম, তুমি আমার পিছনে লেগেছ কেন ?
আপনার পিছনে ছায়া পড়েছে বাবু, তাই পিঠরকে করছি।
ফাজলেমি রাখো !
নতুনবাবু !
স্বাধীনদিকে কেমন লাগল ?
ভালো। কেন ?
জামাইবাবুকে ?
খুব ভালো। কেন একথা জিগ্যেস করছ ?
আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীনদি উঠোনে দাঁড়িয়ে আপনার কথা ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে চাঁদের গায়ে আপনার চেহারা দেখছেন।
বাঃ, চমৎকার। আর জামাইবাবু ?
তিনি লেখাপড়া করছেন, কিন্তু মন বসছে না। তিনিও আপনার কথা ভাবছেন। কাগজে আপনার নাম লিখছেন আর ঢ্যারা কেটে দিচ্ছেন। তাতে মানুষের ক্ষতি করা হয়।
শুনে খুশি হলাম, কুসুম।
আপনারা যখন বাগানে ছিলেন, একটা গন্ধ পাননি ? খুব মিষ্টি গন্ধ !
হুঁউ, পাচ্ছিলাম।
গন্ধটি আমি দিয়েছিলাম।
তাই বুঝি ? তুমি গন্ধ দিতে পারো ?
পারি। ওই গন্ধ শুঁকে আপনি স্বাধীনদিকে, স্বাধীনদি আপনাকে মনে মনে সব সময় খুঁজবেন। দুজনের চোখে ঘুম হবে না। একটু আধটু হলে স্বপ্ন দেখবেন দুজনে দুজনকে। কোন কাজে মন বসবে না। সব খারাপ লাগবে। একদণ্ড

কেউ কাউকে না দেখলে, কথা না বললে থাকতে পারবেন না। খুব কষ্ট হবে মনে।
ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছ তাহলে ?

প্রিয়নাথ কিছু ব্যঙ্গ ও কৌতুকে একথা বলেই পিছন ফেরে এবং কুসুমের জ্বলজ্বলে চোখ দুটো দেখতে পেয়ে ভড়কে যায়। আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য! এমন চোখ তো জন্তুদের দেখা যায়। সে আর তাকাতে পারে না। ঘোরে পূর্ববৎ। জামাইবাবুর ভুরুর মধ্যে আঙ্গুল ছুঁইয়ে অবশ করার কথাটা তার মনে পড়ে যায়।

ঠাট্টা নয়। আমি দুজনকার মধ্যে ভাব জন্মে দিয়েছি। আর তার সঙ্গে একটা কাজও করেছি বাবু। জামাইবাবুর মধ্যে ধোঁকা ঢুকিয়ে দিয়েছি। একটা গন্ধ পোকাকে বলেছিলাম, গন্ধ হ—হল। একটা কুচট পোকাকে বললাম, জামাইবাবু হাই তুললে মুখে ঢোক—ঢুকে গেল। আপনাদের ভাব হল আর জামাইবাবুর মনে কু ঢুকল।

তুমি অনেক কিছু পারো তাহলে !

পারি।

বল তো মৃগাঙ্কবাবু এখন কোথায়, কী করছেন ?

বহরমপুর থেকে বেরিয়েছেন। পাকা রাস্তায় ওনার গাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছি। খুব জোরে আসছেন।

তোমাকে সরকারের লাখ টাকা মাইনে দিয়ে রাখা উচিত।

বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা। দেখবেন পরে।

প্রিয়নাথ হঠাৎ দাঁড়ায়। ঘুরে বলে—তুমি জামাইবাবুকে আঙুল ছুঁয়ে অবশ করেছিলে শুনলাম। পারো আমাকে অবশ করতে ?

পরখ করবেন ?

হ্যাঁ।

কষ্ট পাবেন।

আমি পাবো। এস, দেখাও তোমার শক্তি।

কুসুম এগিয়ে এসে খুব কাছে মুখোমুখি দাঁড়ায়। ডান হাতটা ম্যাজিশিয়ানের মতো তোলে। তারপর তর্জনীটা চাঁদের ওপর দিয়ে এনে তার ভুরুর মধ্যে রাখতেই প্রিয়নাথ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ পায়। মুহূর্তে সে দিশাহারা হয়ে তাকে দুহাতে বুকে চেপে ধরে। কুসুম ব্রেসিয়ার পরেনি, টের পায় এবং তার কঠিন দুটি স্তন বুকে অনুভব করতে করতে সে তীব্র আবেগে ওর মুখের দিকে মুখ নিয়ে যায়। কুসুম এত জোরে তার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে যে অস্ফুট আর্তনাদ করে ছেড়ে দেয় প্রিয়নাথ। কুসুম সরে যায় না। জ্যোৎস্নায় তার চোখ দুটো আরও জ্বলজ্বলে নীল দেখায় এবং দাঁতগুলো ঝকঝক করে ওঠে। সে ফের কামড়াতে আসছে ভেবে প্রিয়নাথ সাবধান হয়। কুসুম কি হাঁফাচ্ছে ? সে বলে—আসুন। কী হল নতুনবাবু ? পারবেন না ?

ঠোঁটে হয়তো রক্ত। মুছে প্রিয়নাথও হাঁকাতে হাঁকাতে বলে—তুমি কি কাঁচা মাংস খাও? রাক্ষসী কোথাকার।
কুসুম নিঃশব্দে হাসছে। তার দাঁতগুলো আরও ঝকমক করছে। চোখের নীল আলো আরও জ্বলছে। চুলগুলো খুলে এলিয়ে কিছু বুকের দিকে কিছু পিঠে গিয়ে পড়েছে। প্রিয়নাথের এবার সেই পাটক্ষেতে যেমন হয়েছিল, একটা চাপা আতঙ্ক গুরগুর করে ওঠে মনে। সে দেখে, কুসুম ওইভাবে দাঁড়িয়ে এবার একটু একটু দুলছে—শরীরের উপর দিকটা শুধু। তারপর মাথাটাও দুলতে লাগল। তারপর আরও জোরে শুরু হল দোলা। চুলগুলো এদিক ওদিক জ্যোৎস্নায় ছলকে পড়তে থাকল। প্রিয়নাথ ভয়ে এদিক ওদিক তাকায়। কোথাও কোন মানুষ নেই। রাস্তার ওপর গাছের ছায়াগুলো দুলছে। দূরে কোথায় গরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। আবছা শোনা যাচ্ছে গাড়োয়ানের গান।
হঠাৎ কুসুম পড়ে গেল ঠাণ্ডা ভিজে পীচের ওপর। হাতেপায়ে খেঁচুনি হল একটুখানি। এই সময় তার কোলের কাছ থেকে একটা পুঁটুলি ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর টানটান শরীর ধনুকের মতো বেঁকে চিৎ হয়ে গেল। কিন্তু জ্বলজ্বলে নীল চোখ আর শব্দহীন হাসি রয়ে গেল, যেমন ছিল! তারপর প্রিয়নাথের মনে হল, সে বলছে—চাপা, বিড়াবড়, অস্পষ্ট কী সব কথা। পালাতে পারল না প্রিয়নাথ। ভয় পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার জেদ তাকে নড়তে দিল না। সে ঝুঁকে পড়ল। ডাকল—কুসুম, কুসুম। এই কুসুম।
কুসুম অস্ফুট বলতে থাকে—'তুই অপেয়ে, লক্ষ্মীছাড়া, হাভেতে। তোকে গন্ধ পোকার গন্ধ দিলাম। তুই আমাকে চিনলি না। তুই চলে যা দেশ ছেড়ে। তোর জন্যে আকাল লাগবে দেশে। বিষ্টি হবে না। নদীর জল শুকিয়ে যাবে। মড়ক লাগবে। পেঁচা ডাকবে। শেয়াল শকুন মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে। কামিখ্যের ডাকিনী এসে বাতাসের সুরে গান গাইবে। তুই যা, চলে যা। দূর দূর দূর। যা—যা।
কী একটা কষ্টের ঢেউ বুক থেকে ঠেলে ওঠে প্রিয়নাথের। সে ডাকে—কুসুম, কুসুম, এই কুসুম।
সেই সময় বাঁকের মুখ থেকে তীব্র আলো আসতে থাকে। মোটর সাইকেলের শব্দ শোনা যায়। প্রিয়নাথ সাঁত করে উঠে দাঁড়ায়। মৃগাঙ্ক নয় তো? ভাবতেই কুসুমের কথাটা মনে পড়ে যায়। সে নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ যে অসম্ভব ব্যাপার।
মোটর সাইকেলটা কাছে এসেই দাঁড়ায়।—প্রিয়বাবু। ও কি? কুসমি না? কী ব্যাপার?
জামাইবাবুর সঙ্গে এসেছিলাম। ফেরার পথে দেখি এভাবে পড়ে আছে।
মাগীর মৃগীটিগী আছে। চলে আসুন। ব্যাকে বসুন। ফিরতে দেরী হল—ঝা

ঝামেলা লেগেছে।
প্রিয়নাথ ইতস্ততঃ করে। কিন্তু ও এমন ভাবে……
হারামজাদীর ঢং। কী মতলব আছে। চলে আসুন তো মশাই।

সেরাতে ভালো ঘুম হয়নি প্রিয়নাথের। শুধু মনে হচ্ছিল, ওভাবে কুসুমকে ফেলে চলে আসা ঠিক হয়নি। রাস্তার ওপর, রাত্রিবেলা এবং শিশিরের মধ্যে মেয়েটি পড়ে থাকবে, একথা ভাবতে অনুশোচনায় দুঃখে সে অস্থির হচ্ছিল। বিশেষ করে মৃগাঙ্ক একটা গল্প বলেছিল আসার পথে, সেটা সাংঘাতিক। কোথায় নাকি—কোন গাঁয়ের পাশে এক রাস্তায় কয়েকটি বাউরী ডোম মানুষ শুঁড়িখানা থেকে আসতে আসতে মাতাল হয়ে শুয়ে পড়ে এবং অঘোর ঘুমে কাঠ হয়। রাতটা ছিল অন্ধকার। একদল গাড়োয়ান আসছিল গরু-মোষের গাড়ি নিয়ে। গাড়িতে খন্দের বোঝা ছিল। তলায় লণ্ঠন ছিল শুধু সামনের গাড়িটার এবং তাই-ই থাকে। বাকিগুলো আলো ঝোলায় না। আর সে আলোও অস্পষ্ট, দুলন্ত কাঁপা কাঁপা। প্রথম লোকটির পেটের ওপর চাকা উঠতে সে ককিয়ে ওঠে। এতে ভয় পেয়ে গরু বা মোষ দুটো দৌড় দেয়। পিছনের ঘুমকাতর গাড়োয়ানগুলোও কিছু বুঝতে না পেরে জন্তু-গুলোকে তাড়া লাগায়। এর ফলাফল খুব সাংঘাতিকই হল। তিনজন মাতাল মারা গেল, বাকি দুজনের হাত পা ভেঙে নুলো হয়ে পড়ল বাকী জীবনের মতো। আর, এই ভয়ংকর গল্প বলার পর উদ্দাম হেসেছিল মৃগাঙ্ক। সারারাত এই গল্পটা তাড়িয়ে মেরেছে প্রিয়নাথকে। একবার দেখেছে, চোখ ঠেলেওঠা কুসুমের বীভৎস মড়া একহাত জিভ বের করে রাস্তায় পড়ে আছে। আবার দেখেছে, নুলো পাকাটা কুসুমের দেহ ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে হাসতে হাসতে তার দিকে এগোচ্ছে। প্রিয়নাথ স্বাধীনের কথা ভেবেছে এবং সেই অচেনা মিষ্টি গন্ধটা হাতড়েছে, কিন্তু পলকে কুসুমের প্রবাহ সব নষ্ট করেছে। তবে বেশি করে মনে আটকেছে, কুসুমের সেই পুঁটলিটা। ছিটকে পড়ে যা একপাশে অবহেলায় চুপ করে রইল। কী ছিল ওতে? একটা নতুন কাপড় কি দিয়েছিল স্বাধীন? কিছু চাল বা ছোলামুসুর গম ও নিশ্চয় দিয়ে থাকবে। কুসুম আসলে গরীব মেয়ে। ভিক্ষে করতে বাধে বলেই হয়তো ওভাবে বেঁচে থাকে। প্রিয়নাথ দারিদ্রের কষ্ট জানে…

আর, সম্ভবত কুসুমের হিস্টিরিয়া বা মৃগী রোগ আছে—মৃগাঙ্ক ঠিকই বলেছে। প্রিয়নাথের বাবা নামকরা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে এসব অসুখের অনেক গল্প ছেলেবেলায় সে শুনেছে। দেখেছেও অনেক। স্মৃতি হাতড়ে দুটো নাম মনে আসছিল : বেলেডোনা, ইগ্নেসিয়া। হ্যাঁ, বাবা এই দুই নিদানের কথা

বাংলাতেন বটে। এবং এইসব মনে আসায় প্রিয়নাথ প্রায় ল্যাফয়ে উঠেছিল। তারপর টের পেল, সে কে এবং কোথায় কী করছে। সে ট্রাকটার চালায়। চাষবাস মোটামুটি বোঝে। বর্ধমানের একটা এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটিতে বছর দুই চাকরি করেছিল। ডিরেক্টরদের মধ্যে দলাদলিতে ফার্ম শেষঅব্দি লিকুইজেশনে যায়। কী কাণ্ড! সেখানেও তাকে কে যেন বলেছিল—আপনিই মশায় বড্ড অপয়া! এত ভালো চলছিল সব—এলেন আর উচ্ছন্নে গেল! হ্যাঁ—তাই গিয়েছিল বটে। সেবার ভালো ফলনই হল না। ক্যানেল জল দিল না। খরা ছিল। পাম্পিং সেটগুলো বিগড়ে রইল। অদ্ভুত ব্যাপার, তদন্ত বসল। গাজিয়াবাদের কোম্পানীর নামে মামলা করা ঠিক হল—তারাই পাঠিয়েছিল সব যন্ত্রপাতি। আর ট্রাকটারের পিছনে হ্যারোর তলায় কীভাবে অরুণ নামে তার সহকারী ছেলেটি···আঃ, সে সব বড় ভয়ঙ্কর ঘটনা।

তারও আগে প্রিয়নাথ যেখানে-যেখানে ছিল, যা যা করেছে, খুঁটিয়ে দেখছিল। কুসুম ঠিক বলেছে—তার পয় নেই। তার পিছনে প্রকৃতই একটা মারাত্মক ছায়া আছে। রাহু আছে। এবং ফের উঠে বসতে চেয়েছে প্রিয়নাথ। তার জন্মকোষ্ঠিতে তো এখন রাহুর দশা চলেছে! কোষ্ঠিটা বাকসে আছে। কাল একবার কোন জ্যোতিষীর কাছে যাবে নাকি?

পরক্ষণে ফের কুসুম এসে তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস-কৌতূহলকে ঝেঁটিয়ে শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে দিচ্ছিল। তার কানে ভেসে এলঃ আপনার জন্মের সময় ঈশান কোণায় প্যাঁচা ডেকেছিল। বায়ু-কোণায় শেয়াল ডেকেছিল। আপনার মায়ের প্রসব যন্ত্রণার সময় সাপে ব্যাঙ ধরেছিল। টিকটিকির লেজ খসে পড়েছিল। আর কামাখ্যার ডাকিনী এসে শুকনো ডালে বসে বাতাসের সুরে গাইছিল।···

ফার্মের নৈঋতকোণে যে গাব গাছটা আছে, শেষরাতে ঘুম ও জেগে থাকার কুয়াসাময় আচ্ছন্নতার মধ্যে প্রিয়নাথ গান শুনছিল। ডাকিনীটা চেরা গলায় কী বলতে চেষ্টা করছে—কাঁপা কাঁপা সুর, পোকামাকড়ের ডাকের মতো গভীর।

সকলে প্রিয়নাথ মৃগাঙ্ককে শুধিয়েছিল—কাল কিসের শব্দ হচ্ছিল বলুন তো কেমন যেন অদ্ভুত আওয়াজটা···

মৃগাঙ্ক জবাব দিয়েছিল—পাখিটাখি হবে।

কিন্তু কুসুমের তেমন কিছু ঘটেনি, তা পরে জানতে পারল। ঘাটের মাচায় বসে গগন হালদারের মুখে শুনল, কুসুম রেজলাপাড়ার হাটে গেছে। মাথায় শাকশব্জির ঝাঁকা ছিল। পরনে নতুন কোরা শাড়ি—তার পাড় ডগমগে লাল। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা ছিল বড়। সকালে ভৈরব চান করেছিল। ভিজে চুল এলিয়ে দুমাইল দূরের হাটে বসতে গেছে সে।

কয়েকটা দিন চৈতালীর জন্যে ফার্মে ব্যস্ততা চলেছে। বিকেলেও মৃগাঙ্কের সঙ্গে জমিতে নামে প্রিয়নাথ। ধনচে বোনা হয়েছিল সারের জন্যে। সব উল্টে দেওয়া

হয়েছিল। পচধরা ভুটভুটে মাটি শুকিয়ে এসেছে। মাটি পরখ করা হচ্ছে প্রতিদিন। মজুর-মজুরনীরা মাষকলাই তুলছে। ভুট্টার গাছগুলো সাদা হয়ে রয়েছে। একট্রাক ভুট্টা চালান গেছে কদিন আগে। শুকনো গাছগুলো কাটা হচ্ছে। কাতকে-লঘু নামক ধান হার্ভেস্টার কম্বাইনে কেটে মাড়াই করা হল। এসব নিয়ে প্রিয়নাথ ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মনে সেই গন্ধপোকার গন্ধ। মন মউ মউ করে।

এক সন্ধ্যায় আর পারে না সে। সোজা চাঁইপাড়া চলে যায়। চাঁদ উঠতে দেরী আছে অনেক। ধোঁওয়া আর কুয়াসায় পাড়ার আকাশ ঘন নীল হয়ে রয়েছে। দাঁত বের করা ছোট ছোট কুঁড়েঘর সব। হতশ্রী। খড়, তালপাতা বা কোঙাপাতার চাল। দেয়াল পাটকাঠির—ওপরে মাটির চাবড়া আছে। ঝগড়াঝাঁটি বেলায় বেলায় ভীষণ হয় এ পাড়ায়, গগন বলেছিল। বলেছিল, একহাজার শাকচুন্নী আর ডাকিনীর বাসা। চিল শকুন ওড়ে সব সময়। সেটা ঠিক। সুর ধরে গাল দিচ্ছে কে কাকে, নেচে নেচে খোট্টাই ভাষায় খিস্তি করছে। পুরুষগুলোর পাত্তা নেই। হয়তো এখনও গাঁওয়াল সেরে আসেনি।

প্রিয়নাথকে কেউ গ্রাহ্যও করে না। আজকাল এমন মানুষ সবখানে দেখে দেখে চোখ ভোঁতা হয়ে গেছে। একটা কমবয়সী মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল—ঘাটকা পাশ। হুই গাছকা তলাসে—হুই ঘরঠো।

গেলনা সঙ্গে। কুসুম একঘরে, প্রিয়নাথ শুনেছে। তার আগুন জল বন্ধ। কিন্তু আজকাল এ দিয়ে কেউ জব্দ হয় না, সবাই জানে। প্রিয়নাথ একটা পোড়ো জমি, ঝোপঝাড় আর একটা শব্জী ক্ষেতের আল দিয়ে পাটকাঠির বেড়ায় ঘেরা বাড়িটিতে পৌঁছোয়। এ দেশে এত গাব গাছ কেন জন্মায়, কে জানে! গাব গাছটা উঠোনের কোণায়। বিশাল আর অন্ধকার। নির্জন খাঁ-খাঁ চারদিক। আলো কমে গেছে দিনের। বেগুন ক্ষেতে একটা মড়ার খুলি লাঠিতে লটকানো দেখছিল। বেড়ার একখানে আগড়। কাঁটার আগড়। এবং চমকে উঠে প্রিয়নাথ দেখল, আগড়ের মাথাতেও একটা মড়ার খুলি। উঠোনটা ঝকমক করছে। দুধারে লঙ্কাগাছে লঙ্কায় লাল টুকটুকে রঙ এখনও মোছেনি অন্ধকার। শশা লাউ ইত্যাদির মাচান এবং মড়ার খুলি। আর অনেক ফুলের গাছ। জবা, জুঁই, টগর, কাঠমল্লিকা—নানারকম। তারপর উঁচু ছোট্ট দাওয়া—দাওয়ার পিছনে পরিচ্ছন্ন ঘরের দেওয়ালে কী সব আঁকা রয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। প্রিয়নাথ ইতস্ততঃ করে ডাকতে। ঘরে কোন আলো নেই, বাইরেও নেই। কুসুম আছে তো? সে ভাবল, গগনকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল। কে কী ভাববে হয়তো।

হঠাৎ কানে এল গুনগুন করে কে গেয়ে উঠেছে—

সাঁঝ দে লো সনঝেমণি
সাঁঝ বইয়া যায় গে···
সাঁঝ দে লো।

সুরটা অদ্ভুত—খুব পাড়াগেঁয়ে, খুবই পুরনো, রহস্যময়। কারণ, এ যেন অন্ধকারের গান, অন্ধকার ছাড়া এ মানায় না, অর্থবহ এ হয় না। আর গাব গাছের ওপবে প্যাঁচা ডেকে উঠল। ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও। কতকগুলো জোনাকি জ্বলে উঠল ঝোপঝাড়ে। পোকামাকড়ের ডাক বেড়ে গেল। তারপর ফস করে দেশলাই জ্বলল গাবতলায়। হ্যাঁ, কুসুম। হেঁট হয়ে একটা পিদিম জ্বালছে।

জেবলে করজোড়ে প্রণাম করে এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। তাপর 'এই মা গে, মা! বলে খিল খিল করে হাসতে হাসতে প্রায় লাফ দিয়ে ফাঁকা উঠোনে চলে এল।

প্রিয়নাথ তখনও চুপ। সে ভাবছিল, কুসুমের ব্যাপারগুলো কি সত্যি লোক-দেখানো, ধোঁকাবাজী, রোজগারের ধান্দা? আর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিছু একটা নিয়ে ও আছে, এটা ঠিকই। সে কাসবে ভাবল, পারল না। কুসুমকে চমকে দিতে ইচ্ছে করছিল না তার।

তারপর সে দেখে, কুসুম হন হন করে আগড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। সামনে এসেই সে থমকে দাঁড়াল। তখন প্রিয়নাথ দেখল, তার হাতে একটা বাঁকামতো কী রয়েছে, কাটারি!

ওঃ! নতুনবাবু! আমি ভাবলাম···আসুন। বলে সে কাঁটার জটিল আগড়টা সরাল।

প্রিয়নাথ ঢুকলে সে আগড়টা বন্ধ করল। প্রিয়নাথ বলল—থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। সেরাতে তোমাকে অমনভাবে রাস্তায় ফেলে চলে আসতে হল। তুমি কি রাগ করেছিলে?

কুসুম কিছু জবাব না দিয়ে দাওয়ায় একটা চটের আসন বিছিয়ে দিল।—বসুন নতুনবাবু।

কুসুম, আলো জ্বালবে না?

আলো আমার ভাল্লাগে না।

কুসুম!

কুসুম দরজার কাছে সরু ধাপটায় বসল।—উঁ?

সে রাতে···

তাই বলতে এসেছেন নাকি? অমন হয়। ছোটলোকের মেয়েরা সব পারে, তা জানেন না? কুসুম একটু হাসে।

এখন তো চমৎকার কথা বলছ দেখি। মাঝে মাঝে অমন পাগলামি কেন করো কুসুম?

কুসুম তারও জবাব দেয় না। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে—একটা সিগ্রেট দিন না, টানি।

খাপ তুমি?

মাঝে মাঝে।

প্রিয়নাথ সিগ্রেট দেয় ওকে। কুসুম তার বুকের কাছ থেকে দেশলাই বের করে বলে—আপনি খাবেন না? থামুন, দেশলাই আছে—জেবলে দিই।
প্রিয়নাথেরটা জেবলে দেয়। তখন প্রিয়নাথ তার মুখের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তেই কুসুম হাসে। এত সুন্দর লাগে ওকে। এ কি ভালবাসা, না নিতান্ত কাম? প্রিয়নাথ আনমনা হয়ে পড়ে।
কুসুম সিগ্রেট টেনে বলে—সিগ্রেট আমি ভালবাসি।
কুসুম, তোমার সেই গন্ধপোকা তো কোন কাজ দিল না। আমি স্বাধীনকে বা স্বাধীন আমাকে পাবার জন্যে মোটেও ছটফট করছে না।···প্রিয়নাথ সকৌতুকে বলে কথাটা।
সে জন্যেই এলেন নাকি?
ধরো, তাই।
কাজ হল না বলছেন?
উঁ হুঁ।
তাহলে আমার আর কিছু করার নাই, নতুনবাবু।
এমনভাবে কুসুম একথা বলে যে প্রিয়নাথ চমকে তার দিকে তাকায়। অন্ধকার দাওয়া। মশা কামড়াচ্ছে শুধু সিগ্রেটের আগুন ছাড়া আলো নেই। কিন্তু কোথায় গেল ওর সেই জবলজবলে নীল তীব্র চোখদুটো। সেই অমানুষী ডাকিনী হাবভাব একটুও নেই কেন।
প্রিয়নাথ বলে—বোঝা গেল তোমার ক্ষমতার দৌড়!
কদিন থেকে আমার মন ভাল নাই, ওকথা ছেড়ে দিন।
কেন মন ভালো নয়। কী হয়েছে শুনি।
বাণ মারা কি জানেন?
শুনেছি।
কেউ আমাকে বগাবাণ মেরেছে। বগাবাণ।
সে আবার কী!
দুরকম বাণ আছে ঃ বগাবাণ, বগীবাণ। বগাবাণ মারলে পালটা বগীবাণ মারতে হয়। আচ্ছা নতুনবাবু, সেরাতে রাস্তায় যখন আমাকে ধরলেন, মাথার ওপর কী ধারে কাছে সাদা বক দেখেছিলেন?
লক্ষ্য করিনি।
আমার পরে মনে হয়েছে, আপনি যখন আমাকে চেপে ধরলেন, মাথার ওপর বক উড়ে গেল।
আবার তুমি হেঁয়ালী করছ কুসুম?
না নতুনবাবু। আমি···আমি কদিন থেকে অবশ হয়ে আছি। মাথা ঘোরে, বমিবমি লাগে, কিছু ভাল্লাগেনা।

তোমাকে কি কেউ কোনদিন ধরে ফেলেনি কুসুম—আমার মতো। মিথ্যে বলোনা।
হুঁউ মিথ্যে কেন বলব। গরীবগুরবো মেয়ে—পেটের দায়ে, বনবাদাড়ে যাই, হাটে-মাটে যাই। বাগে পেয়ে অনেকে ধরতে এসেছে—ধরেছেও। পারেনি। আমার জোর আছে। কিন্তু কেউ আমাকে চুমো খায়নি। আমাকে আপনি এঁটো করে দিয়েছেন যে! আমার এঁটো হওয়া বারণ···কুসুম অস্পষ্ট শব্দে হাসে।
কুসুম, আমি হয়তো তোমাকে···
হুঁ, বলুন।
আমি তোমাকে হয়তো ভালবেসে ফেলেছি।
ও কথা অনেক বাবু অনেকবার বলেছে আমাকে। আমার শরীরটা ওদের খুব পছন্দ—তা বুঝতে পারি। আমি লেখাপড়া জানি না, ছোটলোক জাত। তবু বুঝি সব। আমার আরেকটা চোখ আছে। ফাঁকি দিতে পারবে না। খিদে পেলে সবাই যা পায়, খায়। কিন্তু বাবুরা সখ করে বনের ফল পেড়ে খেতে চায়। বন ফল দেখতে সুন্দর, বনে ফলে—কিন্তু বিষের কোয়ায় ভরা।
বাঃ, তুমি এখন কত ভালো কথা বলছ কুসুম। কিন্তু মাঝে মাঝে ওসব এলোমেলো বকো কেন?
কী বকি?
আমি অপয়া। আমার জন্মের সময় কী সব ডেকেছিল···
আমি বলি?
হ্যাঁ, মনে পড়ছে না বুঝি?
কে জানে। শিকারে বেরিয়ে সাপ সামনে ছায়া পড়লেও দংশায়।
তুমি তখন শিকারে বেরিয়ে ছিলে তাহলে? কী শিকার? সেদিন পাটক্ষেতে—তারপর রাতে রাস্তার ওপর······
মাঝে মাঝে আমার কেমন হয়! আর কী বলব?
কুসুম?
উঁ?
তুমি এখানে একা থাকো! এমনি করে চিরকাল একা থেকে যাবে? ভালো লাগে?
বাঁজা ডাঙায় কাঁকর ছাড়া কিছু কি ফলে নতুনবাবু?
ভ্যাট! তুমি অত ভালো মেয়ে!
পাথরে জল শোষে না, তা জানেন তো? আমি পাথর।
কেন?
আমাকে জ্বালাবেন না। অন্য কথা বলুন। চা খান তো বলুন, করে দিই। দুধ চিনি চা সব আছে ঘরে। আমি চা না খেয়ে থাকতে পারি না। আমি গেলেই স্বাধীনদি বড়ো গেলাসের এক গেলাস চা করে খাওয়ায়। ওই একজনই আমাকে সত্যি করে ভালবাসে।···বলে কুসুম ওঠে।

থাক। চা খাবো না। তুমি বসো।

কুসুম বসে পড়ে।

তোমার মায়ের কথা বলো।

হঠাৎ ও কথা কেন শুনি ?

তোমার মায়ের সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনেছি।

হুঁ, শুনবেন। মা ডাকাতের দল করেছিল। জেল খেটেছিল—সে সব তো মিথ্যে নয়। মা বহুরূপী সাজত। মা ডাইনী ছিল—কচি ছেলের রক্ত চুষে খেত। সেও মিথ্যে নয়। মায়ের কাছে কী সব ছিল। আমাকে কিছু কিছু দিয়ে গেছে মা।

কী সেগুলো ?

অত বুঝিয়ে বলতে পারিনে। ওই গাব গাছটার তলায় সেজন্যেই তো সাঁঝ জ্বালি। আচ্ছা কুসুম, তোমার মায়ের মড়া কেউ ফেলেনি। তুমি নাকি পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে···

হঠাৎ কুসুম দু-হাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে উঠল। প্রিয়নাথ অপ্রস্তুত। কী বলবে, ভেবে পায় না।

একটু পরে সে হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ ছোয়।—কুসুম, কুসুম !

কুসুম মুখ তোলে। আঁচলে চোখ ও নাক মোছে। তারপর বলে—আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন ?

চলে যাব বলছ ?

হ্যাঁ। লোকে দুষবে আপনাকে।

আমি পরোয়া করিনে, কুসুম। আমি এক ছন্নছাড়া মানুষ। সংসার করিনে যে ভয় পাব। তুমি ঠিকই বলেছিলে—আমি অপয়া, লক্ষ্মীছাড়া, হাভেতে। সেজন্যেই তো মরীয়া হতে পারি। তুমি ভেবো না।

একদমে কথাগুলো বলে প্রিয়নাথ টের পায়, সেদিনের মতো শুধু নাকেই শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে তার। তখন সে একটু হাঁ করে বাতাস ভরে নিতে থাকে।

কুসুম বলে—একটা ছোটলোকের মেয়ের মধ্যে এত কী পেলেন নতুনবাবু ? মনটা বেঁধে রাখতে এত সাধ কেন তার কাছে ?

জানি কিংবা জানি না।

আপনাকে স্বাধীনদি খুব ভালবাসে। বিশ্বাস করুন। সব সময় আপনার কথা বলে। আমি বুঝতে পারি। আপনি তার সঙ্গে ভাব করুন না। খুব সুখ পাবেন।···একটু হাসে সে।

সুখ। কী আছে সুখে.···বলে ফের সিগ্রেট বের করে প্রিয়নাথ।—তুমি আর খাবে ?

না। আপনি খান। আমি জেলে দেব ?

দাও।

সিগ্রেটটা জেবলে দিয়ে কাঠিটা মেঝেয় ঘষে নেভায় কুসুম। তারপর বলে—আপনি মদ খান না ?

একটু আধটু। কেন ?

খাবেন ?

প্রিয়নাথ অবাক হয়।—তুমি কোথায় পাবে মদ ? খাও নাকি তুমি ?

আপনার মতোই একটু-আধটু খাই।

বল কী !

ছোটলোকের মেয়ে তাড়ি মদ খাবে না ? এ দেশে সবাই খায়। খরার সময় তো তাড়িই আমাদের খাবার। তবে মদ আমি নিজে তৈরী করি। চাল কলা গুড় লাগে। এক বোতল হলেই আমার মাস চলে যায়। বেশি তো খাইনে। আমাদের খেতে হয়—নিয়ম আছে। মা শিখিয়েছিল। খাবেন ? দেব ?

দাও।

কুসুম উঠে ঘরে ঢোকে। দেশলাই জবালে। একটা লম্ফ জবলে ওঠে। ঘরের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পায় না প্রিয়নাথ। একটু পরে কুসুম ফুঁ দিয়ে লম্ফ নিবিয়ে বেরিয়ে আসে। একটা বোতল তার হাতে আবছা দেখা যায়। একটা কাচের গেলাস সামনে রাখে সে। তারপর কিছু ঢেলে দিয়ে বলে—খান। সুপুরি আছে, দেব ? আমি সুপুরি মুখে না দিলে পারিনে।

প্রিয়নাথ গেলাসটা তুলে গন্ধ শোঁকে আগে। দিশী মদ। উৎকট ঝাঁঝ। খুব জোরালো জিনিস, তা সে বুঝতে পারে। একটু ইতস্ততঃ করে গলায় ঢেলে দেয়।

কেমন বলুন তো ? ভালো জিনিস না ?

তোমার হাতের জিনিস। অমৃত ছাড়া কি হবে ?

সুপুরি নিন।

হাত বাড়িয়ে সুপুরি নিতে গিয়ে কুসুমের হাতটা সে ধরে।—কুসুম, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

কুসুম খিলখিল করে হাসে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—ভালবাসার চেষ্টা করলেই আমার ভর উঠবে। ভয় পেয়ে যাবেন—নতুন মানুষ। ও কথা থাক নতুনবাবু।

প্রিয়নাথ বলে—আরও খেতে ইচ্ছে করছে।

খান। কিন্তু মানী মানুষ—নতুন মানুষ। নিজের মান রেখে চলবেন, সাবধান।

হ্যাঁ। সে তুমি ভেবোনা। এতটুকুতে কিছু হয় না আমার। কুসুম আরও খানিকটা ঢেলে দিয়ে বলে—কিন্তু এ জিনিস খুব সহজ নয়। সামলাতে পারবেন না। এর বেশি আপনাকে দেবও না। নিন।

প্রিয়নাথ খায়, সিগ্রেটটা জোরে জোরে টানে। এত অল্পে এত শিগগির নেশা ধরে গেল। কী—আছে ওতে ? সাংঘাতিক কিছু নেই তো ? সে একটু অস্বস্তিতে পড়ল। হ্যাঁ, নেশাটা বেশ তেজী মনে হচ্ছে। আফশোস হল, ঝোঁকের মাথায় না

খেলেও পারত।
বাবু, ও নতুনবাবু? কী ভাবছেন গো?
তোমার কথা।
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই কুসুম খালি? যার কথা ভাববার, তাকে ভাবুন।
কুসুম, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?
কোথায়?
যেখানে খুসি্। আমি তোমাকে ভালবাসি কুসুম।
আপনার নেশা হয়েছে! চলে যান।
কুসুম।···ওর দিকে হাত বাড়ায় প্রিয়নাথ।
কুসুম দ্রুত সরে বসে। ওর কণ্ঠস্বরে একটা আতঙ্ক আছে মনে হয় ও বলে—বাবু, নতুনবাবু! দোহাই আপনার—আপনি ওসব কথা বলবেন না! সে আসছে। গাব গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে, ওই শুনুন। না—না, ছোঁবেন না আমাকে, ছোঁবেন না।
প্রিয়নাথ চাপা গর্জায়।—ওসব আমি মানিনে!
আর সেই মুহূর্তে গাছের পাতায় সর সর আওয়াজ হতে থাকে। প্যাঁচাটা ফের ডেকে ওঠে ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও। হঠাৎ কী হয়, গাবতলার পিদীমটাও নিভে যায় দপ করে। নদীর ধারে খুবই কাছে শেয়াল কিংবা কোন জানোয়ার চেঁচায়—আ উ উ-উ। জোনাকিগুলো ছোটাছুটি শুরু করে ঝোপঝাড়ে।
কুসুম হাঁসফাঁস করে বলে—পালান, আপনি পালান!
সেই সময় বেড়ার বাইরে একটা লম্ফ হাতে কে এসে ডাকতে থাকে—কুসমি, ও কুসমি গে। তেরা ছাগলঠো ছুট গেইলা গে, সব বিনাশ কারলে। দেখ্‌গে বেটিয়া!
প্রিয়নাথ অবশ হয়ে খুঁটিটা জড়িয়ে ধরে। সোজা হয়ে বসে। কুসুম লাফ দিয়ে নেমে যায়।—কোন গে? সরলা মাসি?
হাঁ বেটিয়া, দেখ্‌না ইধার।
মেরা ছাগল নেহী মাসি। বাঁধকে রাখা গোহিলমে।
সাচ?
তেরা কিরিয়া মাসি।
তো ফির দেখ্ গে, ভাগ্‌সে গিয়া মালুম···
আ রী নেহি মাসি। তেরা চোখ অন্ধা। যা যা, ঘর চলা যা। উও শোন্ না, চিল্লাইসে।
চিল্লাইসে? কাঁহা রী?
তু কানমে ভি কালা। যা, যা, ঘর যা, ভাগ্।
বুড়ি হাড়গিলের মতো লম্ফ হাতে চলে যায়। কাকে গাল দিতে দিতে যায়। কুসুম উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে মুখ তুলে নক্ষত্র দেখে হয়তো। প্রিয়নাথ টলতে টলতে

নামে দাওয়া থেকে। সত্যি, প্রচণ্ড নেশা হয়েছে। এতটুকু মদে এমন অবস্থা হয়ে গেল? সে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর ভারি গলায় বলে—তুমি কী খাওয়ালে কুসুম? মনে হচ্ছে, শুধু মদ নয়—আরও কিছু ছিল ওতে। মদে তো এমন লাগে না।

আপনার শরীর খারাপ করছে?

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। দম আটকে আসছে!

জল খাবেন?

তোমার হাতে জল খেতে ইচ্ছে করছে না আর। তুমি কী খাওয়ালে আমাকে?

বিষ! বলে চাপা হাসে কুসুম।

বিষ! আঁতকে ওঠে প্রিয়নাথ!

বিশ্বাস করতে পারছেন না তো কী বলব?

প্রিয়নাথ অন্ধকারে ওর মুখ দেখার চেষ্টা করে। মাথা ঘুরছে, অজস্র স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে যেন, সব কালো মনে হচ্ছে। তাকে কী খাওয়াল কুসুম? সে স্থির থাকবার চেষ্টা করে।

যেতে পারবেন না মনে হচ্ছে? তাহলে খানিক শুয়ে থাকুন, ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা প্রিয়নাথের সঙ্গত মনে হয়। সে টলতে টলতে ফের দাওয়ায় চলে যায়। মেঝেতেই শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে থাকে।

একটু পরে কুসুমের সাড়া পায়।—কই, জল খান। হাঁ করুন, ঢেলে দিচ্ছি।

শিশুর মতো হাঁ করে প্রিয়নাথ। জল খেতে গিয়ে উঠে বসে। কাসে। তারপর 'থাক, আর না' বলে গড়িয়ে পড়ে।

এইবার প্রিয়নাথের মনে হয়, সে শূন্যে ভাসছে। তার চারপাশে নক্ষত্র। পালে পালে রঙীন মেঘ—লাল নীল হলুদ সবুজ, এসে তাকে ঘেরে। মেঘ কখনও সবুজ হয়? মেঘগুলো সরে যায়। একটা লম্বা ছড়ালো ডালপালাওলা শুকনো মরা গাছ শূন্যে দাঁড়ানো দেখতে পায়। তার ডালে বসেছে কুসুম, হাসছে, এলোমেলো চুল, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আতঙ্কে বোবাধরা গলায় চেঁচায় সে। পালাতে পারে না। আবার লাল নীল হলুদ সবুজ মেঘগুলো এসে পড়ে। না, মেঘ নয়। গগন হালদারের জাল। গগন ভয়ঙ্কর চেহারায় কিছু বলছে। হালদার মশাই, হালদার মশাই, আমি এখানে! প্রিয়নাথ চেঁচায়। জিভ জড়িয়ে যায়। হাড়গিলে লম্ফহাতে বুড়ি, ধরিত্রী। ধরিত্রী এসে বলতে থাকে চেরা গলায়—এই নে বাদুড়ের নখ, আর প্যাঁচার ঠোঁট আর ভালুকের রোঁয়া। এই নে টিকটিকির লেজ আর সাপের চোখ আর কাকলাশের ঠ্যাঙ। তোকে আমার সব দিলাম, তুই কি দিবি শুনি বাছা? ধরিত্রী একপা করে এগোয় আর বলে—দিবি না? দিবি না? তোর চোখ গেলে দেব। তোর রক্ত শুষে খাব। তোর নাড়ি ভুঁড়ি খামচে বের করব। দক্ষিণমাঠের বাজপড়া গাছটার ডালে রোদ্দুরে শুকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব। প্রিয়নাথ গোঁ গোঁ

করে।···

কখন একবার প্রিয়নাথ শোনে, মিহিগলায় চাপা স্বরে কে কাছে গান করছে। কী মিষ্টি সুর।

পুব থেক্যে ডাকিনী এসে
বসল গাছের ডালে
অবেলাতে ডাকে কাগা (কাক)
কী আছে কপালে ॥
উখুসুখু (রুক্ষ শুষ্ক) মাটি কাটে
মাঠে নাইকো ধান
নদীমে জল নাইকো মাগে
কোথায় করব চান ॥
সাঁঝ দে লো সনঝেমণি······

প্রিয়নাথ হাত বাড়ায়—হাতড়ায়।—কুসুম, কুসুম। শিয়রে নরম কিসে হাত পড়ে। হাতটা সরিয়ে নেয় না। বোলায় সেই নরম জিনিষটার ওপরে। ওরা কেউ সরিয়ে দেয় না। গানটা কানে আসে একটানা।···সাঁঝ দে লো সনঝেমণি সাঁঝ বইয়া যায় গে···

আবার শূন্যে ভেসে যায় প্রিয়নাথ। লাল নীল হলুদ সবুজ মেঘ। শুকনো গাছটা।···

মধ্যে আর একবার টের পেয়েছিল, তাকে কে বা কারা ধরাধরি করে শূন্যে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করেছিল। বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে মনে হয়েছিল। কারা সব কথা বলছিল। একবার কী একটা শব্দ হয়েছিল প্রচণ্ড—বন্দুকের আওয়াজ? মৃগাঙ্ক বলছিল—ছেনাল, কুত্তীন, খানকী।

মৃগাঙ্কই কি? এবার প্রিয়নাথ সব ছেড়ে রঙীন মেঘের মধ্যে চলে গিয়েছিল ছেঁড়া শুকনো পাতার মতো।

অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে প্রিয়নাথ দেখে, সে তার বিছানায় শুয়ে আছে। পাশের বিছানায় মৃগাঙ্ক বসে গেলাসে চা খাচ্ছে। তাকে তাকাতে দেখে সে হেসে বলে—উঠে পড়ুন। আবার কী?

ঘড়ি খোঁজে সময় দেখবার জন্যে—হাতে বেঁধেই শোয় প্রিয়নাথ। না দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু কী অবশ শরীর। মগজ নেই মনে হয়। সে হেলান দেয়। বাইরে তাকায়। কার্তিকের উজ্জ্বল রোদে কজন মেয়ে মাষকলাই ঝাড়ছে কুলো দিয়ে।

মৃগাঙ্ক বলে—ঘড়ি খুলে রেখেছি। উঠতে পারবেন না? কী মনে হচ্ছে?

পারব। বলে প্রিয়নাথ সাবধানে পা দুটো বিছানা থেকে নিচে নামায়। চটি খোঁজে।

নাড়ু ডাক্তারকে খবর দিয়েছি। এসে যাবে'খন।

প্রিয়নাথ সপ্রশ্ন তাকায়।

মৃগাঙ্ক ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে এবং হেসে বলে—আর মেয়ে পেলেন না দেশে, ওই হারামজাদীর বাড়ি গেলেন? ভ্যাট্! দেশঘোরা এক্সপিরিয়েন্সড মানুষ মশাই আপনি! এমনি করে যার তার কাছে মালফাল খায়? আজকাল কত মাতাল মারা পড়ছে, কাগজে পড়েন না? ভ্যাট্, ভ্যাট্! আপনাকে অত করে বললুম সেদিন, মেয়েটা ভালো নয়। ওর মধ্যে মার্ডার ম্যানিয়া আছে। ওর চোখ দেখেই টের পাওয়া যায় তা। কী? পারবেন—না কি ডাকব কাকেও?

প্রিয়নাথ টলতে টলতে বেরোয়। মৃগাঙ্ক ওঠে না। ডাকে—নবীন, নবীন! তোদের বাবুকে ধর্। বাইরে জল রেখেছিস তো? পেস্ট ফেস্ট নিয়ে যাস।

নবীন দৌড়ে এসে প্রিয়নাথকে সাহায্য করতে হাত বাড়ায়। প্রিয়নাথ বলে—থাক। ল্যাট্রিনটা সামান্য দূরে। সেদিকে যেতে যেতে সে একটা হরগৌরীর গাছের কাছে একবার দাঁড়ায়। দিগন্ত অব্দি মাঠের পারে কুয়াসা তখনও জমে রয়েছে। আকাশ শূন্য ঘন নীল। কিছু শকুন উড়ছে অনেকটা উঁচুতে। একটা প্লেন যাচ্ছে—আবছা আওয়াজ কানে আসে। অড়হরের ক্ষেতের পাশে কয়েকটা গরু চরছে। শনের ক্ষেতে হলুদ ফুল ধরেছে থরে থরে। এতদূর থেকেও প্রজাপতি ওড়া দেখা যায়। একটি বাচ্চা মেয়ে শনফুল তুলছে। শনফুল খায় লোকে। প্রিয়নাথও খেয়েছে সেদিন। একটু পরে সে টের পেল, মনের ব্যালান্সটা নেই।

ল্যাট্রিনে অনেকক্ষণ অকারণ থাকার পর সে বেরিয়ে এল। উঁচু বারান্দায় বসে দাঁতে ব্রাশ করতে থাকল। তখন গগন হালদারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিজয়েন্দু এল। গগন নিচে সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে দেখতে থাকল। বিজয়েন্দু উঠে গেল বারান্দায়। ঘর থেকে মৃগাঙ্ক বলল—এস মাস্টার।

বিজয়েন্দু শ্যালকের দিকে মিষ্টি হেসে প্রিয়নাথের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বলে—কী ব্যাপার মশাই? চাব্দিকে তো ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে। আমি—

প্রিয়নাথ ঘুরে বলে—কিসের?

গগন বলে—এ পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন। একটুতেই তিলটি তাল হয়। কুসমি নতুনবাবুকে তুক করতে গিয়ে মেরে ফেলার দাখিল করেছে নাকি!… গগন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে থাকে।…আর বলবেন না। সেই রাতদুপুরে মিগাংবাবু গিয়ে আমাকে বিছানা থেকে ওঠাল। তা পরে তো কুসমির বাড়ি গেলাম। টর্চের আলো পড়তেই দেখি, কুসমি আপনার মাথার কাছে বসে শকুন-টকুনের ডানা বুলোচ্ছে আপনার কপালে। মিগাংবাবু যেই ডেকেছে আপনার নাম ধরে, মেয়েটা লাফিয়ে ঘরের পিছন দিয়ে বেড়া টপকে পালাল। আমরা গিয়ে দেখি, আপনি অজ্ঞান। চোখের তারা থির। গোঁ গোঁ করছেন, কথায় ফেনা জমেছে। তা, মিগাংবাবু থানায় খবর দিতে যাচ্ছিলেন। বলে কয়ে থামালাম। ও লাইন

আমার তো ভালো জানা আছে। মদে এক রকম শেকড়বাটা দেয়। খুব বড়ো মাতাল ছাড়া তা সামলানোর সাধ্যি কারো নাই। ধরিত্রীর আমলে আমিও তো খেয়েছি মশাই—বিষফিষ না। তুকতাকও নয়। তবে বেভ্যম (বিভ্রম) লেগে যায় বটে। কতরকম আজগুবি ওলট পালট দেখা যায়। ও কিছু না। সরষের তেল মেখে কষে চান করুন, তারপর খেয়েদেয়ে ঘুমোন। ওবেলায় ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

বিজয়েন্দুর দিকে মুখ তুলে গগন বলে—মেয়েটা মিগাংবাবুকে জমের মত ডরায়। হয়তো এখন একটা দুটো দিন বাড়িই ঢুকবে না ভয়ে। ওপারে বনজঙ্গল কাটাবে।

মৃগাঙ্ক বলে—হালদারমশায় থাকতে ওর ভাবনা? খানিক পরেই দেখা যাবে, হালদারমশাই গিয়ে ছুঁড়ির ছাগল-টাগল বের করছে। নদীর ধারে খুঁটি পুঁতে চরতে দিচ্ছে।

গগন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে—করতে হয় বাবা, করতে হয় ওটা। আপনারা একালের ছেলেছোকরা মানুষ, অনেক জিনিস বোঝেন না। আর কটা দিনই বা বাঁচব—করে যাই।

কিন্তু হালদারমশাই, ধরিত্রী যখন জেলে গেল—বাবা তার মেয়েকে নিতে বলেছিল, তুমি নাও নি।...মৃগাঙ্ক সকৌতুকেই বলে কথাটা।—তখন সত্যেনের মা বেঁচে ছিল তো। জালের খেঁটো দিয়ে পেটাত। হাড়গোড় ভেঙ্গে দিত।

না, না। অসুবিধে ছিল অন্যরকম। মান্যবর মণ্ডল বেঁচে থাকলে বলত, আমিও কুসমিকে খোরাক পত্তর দিয়েছি কি না। পুজোয় জামাকাপড় দিয়েছি কিনা।

মুখ ধুয়ে প্রিয়নাথ উঠে যায়। বিজয়েন্দু তার বিছানায় গিয়ে বসে। গগন একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়—মুখটা গম্ভীর।

মৃগাঙ্ক বলে—বুড়ো খচে গেছে। মরুক গে। তা ওহে মাস্টার, স্কুল নেই আজ? বিজয়েন্দু বলে—আছে। ছুটি নেব। একবার বহরমপুর যাব ভাবছি। সাড়ে দশটায় বাসটা ঘাট থেকে ছাড়ে না? তুমি নবীনকে একবার পাঠাও। সামনের দিকে সিট বলে আসুক।

মৃগাঙ্ক নবীনকে ডেকে ভগ্নীপতির সিটের ব্যবস্থা করতে পাঠায়। যাবার আগে নবীন এক জগ চা রেখে যায় টেবিলে। মৃগাঙ্ক দুটো কাপে চা ঢেলে বলে—প্রিয়বাবু, আসুন। মাস্টার, নাও। বিস্কুট বের করি। প্রিয়বাবু, খালি পেটে চা খাবেন না কিন্তু। এক মিনিট।

ড্রয়ার থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বার করে সে প্রিয়নাথের বিছানায় ছুঁড়ে দেয়। তারপর বলে—নাড়ু ডাক্তার দেরী করছে কেন? আমাকেও একবার বেরোতে হবে। চকইসলামপুর যাব।

বিজয়েন্দু চা খেতে খেতে বলে—প্রিয়বাবু, একেবারে নীরব!

প্রিয়নাথ হাসি মুখে বলে—কী বলব?

হোয়েছিল কী বলুন তো? স্বাধীন কোন মেছো না মেছুনীর কাছে ভোরে

শুনেছে। শুনেই বলে, তুমি একবার খোবোর নাও দিকি। প্রিয়বাবুকে কুসুম না কে বিষ খাইয়েছে নাকি—

প্রিয়নাথ আড়চোখে দেখল, মৃগাঙ্ক বিজয়েন্দুর দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আছে। স্বাধীনের ধারণা, কুসুম নয়, অন্য কেউ। আসল ব্যাপার তো বুঝতে পারছি, কুসুম নিরপরাধ কিনা জেনে এসো, এই হচ্ছে ওর মোটিভ।

মৃগাঙ্ক বলে—স্বাধীনকে নিয়ে আর পারলাম না। এবার দেখছি বোনের জন্যই আমাকে জেলে যেতে হবে।

বিজয়েন্দু আঁতকে ওঠে।—কেন, কেন মৃগাঙ্কদা?

ডাইনী মাগীটাকে দেশ ছাড়া না করলেই নয়। তুমি তো সদাশিব ভোলানাথ হে মাস্টার। কবে মাগী স্বাধীনকে পটিয়ে-পাটিয়ে তোমাকে কিছু খাওয়াতো না বলে।

সর্বনাশ। কেন? আমাকে কী খাওয়ানোর দরকার হবে?

মৃগাঙ্ক জবাব দেয় না। কিন্তু প্রিয়নাথ বুঝতে পাবে, সেটা কী। স্বাধীন ছেলেপুলে চায়। এবং বিজয়েন্দুও টের পায় নিশ্চয়। তাই শুধু হাসে—হাসিটার তলায় কী করুণতা ছিল। প্রিয়নাথ টেব পায়।

মৃগাঙ্ক বাইরে যায়। কার সঙ্গে কথা বলছে শোনা যায়। প্রিয়নাথ কাপটা রেখে বিজয়েন্দুর দিকে ঘোরে।—তাহলে আমার খবর নিতেই এলেন?

হ্যাঁ। যাবার পথে বাস থামিয়ে গেটে বলে যাব। নিবারণ দাঁড়িয়ে থাকবে। বলব, প্রিয়বাবু অসম্ভব সুস্থ আছেন। বিষ যে-ই খাওয়াক, হজম করেছেন। প্রিয়বাবু নীলকণ্ঠ!...তারপর একটু ঝুঁকে আসে বিজয়েন্দু। সত্যি কী হয়েছিল বলুন তো?

কিছু না। মদ খেয়েছিলাম খানিকটা। অভ্যেস নেই, তাই একটু ইয়ে হয়ে পড়েছিলাম।

কুসুমের কাছে?

হ্যাঁ।

আপনি গিয়েছিলেন ওর বাড়ি?

হ্যাঁ।

একটু পরে বিজয়েন্দু বলে—না, যাওয়াটা তেমন কিছু নয়। মেয়েটি রিয়্যালি ইন্টারেস্টিং টাইপ! আমারই তো ওকে প্রশ্ন করে জানতে ইচ্ছে হয় কত কিছু। কিন্তু বুঝতেই পারছেন—আমার ঘরে স্বয়ং স্বাধীনতা, অথচ আমার কোন স্বাধীনতা নেই! জামাই রায় বাড়ির। ঢি ঢি পড়ে যাবে। তো—আমি একটা বই লিখছি। ডাইনী, প্রেততত্ত্ব, ক্লেয়ারভয়েন্স, বাংলাদেশের রুরাল উইচ কাল্ট ইত্যাদি নিয়ে। কিছু ওঝাকে ইন্টারভিউ করেছি ইতিমধ্যে। ইন্টারেস্টিং নিশ্চয়—অনেকে ভাববার ব্যাপার আছে। শিমুলিয়া নামে ওদিকে একটা গ্রাম আছে—এই ভৈরব নদেরই পাড়ে। ছোট গ্রাম। প্রতি পরিবারে একজন করে ওঝা। একজন ওদের সর্দার।

সে প্রেত নামাতে পারে নাকি। না—প্ল্যানচেট নয়। এ অন্য জিনিস। অন্ধকার ঘরে প্রেত বা 'চ্যাড়া' আসে। নাকি স্বরে কথা বলে। আমার মনে হয়েছে, ভেণ্ট্রিলকুইজম! স্বরযাদু যাকে বলে! তো কুসুমের ব্যাপার আমার একটা ইণ্টারেস্ট করার ইচ্ছে আছে।

সে তো আপনাদের ওখানে যায়!

যায়। কিন্তু ওকে একলা না পেলে তো চলে না। দেয়ার আর সাইকোলজিকাল থিংস টু অবজার্ভ! স্বাধীন ইণ্টারফিয়ার করে—এগোয় না।

নাড়ু ডাক্তার এলেন সাইকেল চেপে। বারান্দায় সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে উঠে আসেন।—কই রে মিগাং, কোথা গেলি? তোর পেসেণ্ট কোথা?

মৃগাঙ্কের সাড়া আসে বাইরে থেকে।—সিধে ঢুকে যান। পেয়ে যাবেন। আমি যাচ্ছি।

ঘরে ঢুকে ডাক্তার বলেন—আরে, আরে! জামাই যে!

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু। বসুন।

কার কী হয়েছে?

এই যে, আমাদের প্রিয়নাথবাবুর।

ডাক্তার তড়াক করে এগিয়ে প্রিয়নাথের কপালটা ধরে ঠেলে শুইয়ে দেন। তারপর চোখ, জিভ, নাড়ী, পেট এবং স্টেথিসকোপ। প্রিয়নাথ হাসি মুখে টেপাটিপি সয়। এসময় মৃগাঙ্ক এসে বলে—মলো ছাই। টেপাটেপি না করে আগে শুনুন, কী হয়েছে?

নাড়ু ডাক্তার কানে স্টেথিসকোপ রেখেই চশমার ওপর দিয়ে তাকান।—কী হয়েছে?

বিষাক্ত মদ খেয়েছিল রাত্রে। অজ্ঞান—মরার দশা একেবারে।

এখন তো দিব্যি আছে।

তা তো আছে। ফার্দার কোন রিঅ্যাকশান যাতে না হয়, ওষুধ বা ইনজেকশান যা লাগে দিন।

কী বললে? বিষাক্ত মদ খেয়েছিল? কোথায়?

খেয়েছিল এক জায়গায়। সে শুনে কাজ নেই আপনার।

বিকৃত মুখে নাড়ু ডাক্তার বলেন—কেন যে ছাইপাঁশ যেখানে সেখানে গেলেন মশাই? চোলাই নিশ্চয়?

মৃগাঙ্ক বলে—হ্যাঁ।

তাহলে তো বমি করাতে হবে!

রাত্রে বমি অনেক হয়েছে।

হয়েছে বলছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে।

মিগাং তোর একরোখা স্বভাবটা সিধে কর্‌দিকি। বয়স বাড়ছে। না কী?

কী করলাম ?

এত ধমকাচ্ছিস কেন ? ও মশাই, ইঞ্জেকশান নিতে পারবেন ?

প্রিয়নাথ সশব্যস্তে বলে—না। খাবার ওষুধ দিন।

পায়খানা হয়েছে ?

হয়েছে।

মিগাং, পাঁচটা টাকা আর শিশি নিয়ে কাকেও আমার ডিসপেন্সারিতে পাঠিয়ে দে। একটু দেরী করে পাঠাবি। আমি একবার চাঁইপাড়ার কলটা সেরে যাব।

নাড়ুবাবু চলে গেলেন তখুনি। তিনজনে খুব হাসাহাসি করল। তারপর মৃগাঙ্ক বলে—এখন অবশ্য হাসছি। আমার ছেলেবেলায় তল্লাটে এই একটিমাত্র ডাক্তার। বাবা ওকে এনেছিলেন। বাস্তুজমি শুধু নয়, ঘরবাড়ি মায় ডিস-পেন্সারিও করে দিয়েছিলেন। পাশকরা ডাক্তার নন—ছিলেন ডিসট্রিক বোর্ডের এক দাতব্য হাসপাতালের কম্পাউন্ডার। তখন লোকে অসুখ বিসুখে ওঝা বদ্যিই ডাকত। বেশিদিন আগের কথা বলছিনে—মাত্র পনের কুড়ি বছর আগে। দেশের সবচেয়ে নেগলেক্টেড এরিয়া তো ! বনবাদাড়-ভূত-প্রেত-ওঝা-ডাইনী শালা সমানে রাজত্ব করে এসেছে। এতদিনে না হয় অনেক চেষ্টার পর একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার হল। তো শালা, সেও এক নাবালক ব্যবস্থা। না আছে ওষুধ, না ভালো ডাক্তার। তার চেয়ে আমাদের নাড়ুবাবুই ধন্বন্তরী ! নবীন এলি রে ? ও নবীন !

এসেছি।

সীট বলেছিস ?

হ্যাঁ।

একটু পরে টাকা আর শিশি নিয়ে ভগীরথপুরে যাবি বাবা। প্রিয়বাবুর ওষুধ আনবি।

প্রিয়নাথ বলে—না, না। ওষুধ কী হবে ?

পাগল ! খান না খান, ফেলে দেবেন। কিন্তু ওষুধ না আনলে নাড়ু ডাক্তার ক্ষেপে যাবে। নবীন, যাস বাবা—কেমন ? সাইকেলটা নিয়ে যাস। পেছনের টায়ারে হাওয়া নেই মনে হচ্ছে। ঘাটে হাওয়া ভরে নিস মোটর অফিসে। কিচেনে একটা শিশি খুঁজে সাফ করে নে। কী হে মাস্টার উঠবে না কী ?

বিজয়েন্দু ঘড়ি দেখে বলে—দশটা। এখনও আধঘন্টা।

তাহলে তুমি গল্প করো। আমি বেরোই। ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে প্রিয়বাবু, বুঝলেন ? খাবার বারণ করেছি। আপনি খেয়ে নেবেন। বড় বড় সরপুটি মাছ দিয়ে গেছে হেমন্ত জেলে। মাংস হলে ভালো হত আপনার। ঠিক আছে, ওবেলা এসে দেখব।

প্যান্ট-জামা বদলে ধুতি পাঞ্জাবী পরে নেয় মৃগাঙ্ক। বন্দুকটাও পিঠে নেয়।

বেরিয়ে যায়। একটু পরে তার মোটর সাইকেলের আওয়াজ পাওয়া যায়।

বিজয়েন্দু বলে—আজ আর হাঁটাহাঁটি করবেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

প্রিয়নাথ হাই তুলে বলে—হ্যাঁ!

আরও কিছুক্ষণ প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার পর বিজয়েন্দু উঠে যায়।…

দুপুর থেকে বিকেলে গভীর ঘুম হল প্রিয়নাথের। স্বপ্নবিহীন ঘুম। সূর্য ডুবতে যাচ্ছে, তখনও মৃগাঙ্ক ফিরল না। তখন সে খামারের পূবদিকের বেড়া গলিয়ে ভৈরবের ধারে চলে গেল। সেই শ্মশানের কাছে দূর্বাঘাসের ওপর বিষ পিঁপড়ের সার থেকে তফাতে বসল। মাথার ভিতর শূন্যতা। শরীর দুর্বল হয়ে রয়েছে এখনও। সে রাতের ঘটনাটা ভাবতে চেণ্টা করল। একটু পরে সূর্য ডুবে গেলে ঠাণ্ডা ধূসর একটা অন্যরকম আলো কালুখাঁর দিয়াড়ের মাঠে এসে দাঁড়াল। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জলহাঁস উড়ে গেল। প্রিয়নাথ ওপারের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, গাছপালার ফাঁক দিয়ে কে এগিয়ে আসছে। পাড় ধসে রয়েছে ওদিকে। শেকড় উঁচিয়ে কিছু ঝোপ জলে পড়েছে, স্রোতে তাদের কাঁপন এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। সেখানে এসে সে সড়াৎ করে কুমীরের মতো পিছলে জলে পড়তেই প্রিয়নাথ চিনল—কুসুম!

নদীর জলের তলায় চোখ পড়ল এবার। আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য! লাল নীল হলুদ সবুজ রঙ বেরঙের মেঘ চাপ চাপ জমে আছে। তাকে ছত্রখান ভাঙচুর করে ভেসে আসছে কুসুম। ব্যাপারটা আকাশে ঘটছে এবং জলের তলায় তার প্রতিবিম্ব পড়ছে কিনা দেখতে—নাকি প্রিয়নাথ নিজেই তার পৃথিবীশুদ্ধ উল্টে রয়েছে, টের পাবার জন্যে সে আকাশে তাকায়। কিছু বুঝতে পারে না। গতরাতের ঘটনাগুলো স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে ঘণ্টায়, একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে আনাগোনা করে কুসুম যত কাছে আসে, তত সে বিচলিত হয়ে পড়ে। মাঝামাঝি এসে কুসুম একবার মুখ তোলে। চুল বেঁধে নেয় তারপর। এবার কিছু ভাঁটিতে সরে যায় সে। দক্ষিণে দহর কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে আকন্দ গাছটা টেনে ধরে। তারপর সাপের মতো বুক পেড়ে ওঠে। বাঁধের নীচে একবার বসে। হয়তো দম নেয়। তারপর উঠে দাঁড়ায়। এবং প্রিয়নাথের দিকে এগোতে থাকে।

পাটবনে যেমন দেখেছিল, সেই রকম ভিজে শরীর কুসুমের! স্তন দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কাঁপছে, দুলছে। কাপড় কাচের মতো স্বচ্ছ এবং আব্রু বিনষ্ট। তার মতোই যেন শুধু নাক দিয়েই শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছে কুসুম।

প্রিয়নাথ নিষ্পলক তাকায়। কুসুম ধুপ করে সামনাসামনি একহাত দূরে বসে পড়ে। দূর্বাগুলো ভিজে প্যাচপেচে হয়ে যায়। সে এখনও হাঁফাচ্ছে।—আর কোন কষ্ট হয়নি তো? ভাঙা গলায় এই প্রশ্নটা করে সে বুকটা ডবল কাপড়ে ঢেকে ফেলে।

নতুনবাবু! প্রিয়নাথ কথা বলেনা দেখে সে ফের ডাকে।

উঁ ?
শরীর কেমন ?
ভালো।
কুসুম এদিক ওদিকে তাকিয়ে বলে—কাল রাত থেকে বাড়ি ঢুকিনি। ওপারে একটা গাঁ আছে, মকুনপুর—সেখানে আমার পাতানো মা আছে। তার বাড়িতে ছিলাম। ছাড়লে না, দুপুরে খেয়েদেয়ে ভাতঘুমটা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমলাবাগে সন্ধে কাটিয়ে বাড়ি যাব ভাবলাম। তা হঠাৎ চোখ গেল এখানে—দেখি, আপনি বসে আছেন একা। মিগাংবাবু আসবে না তো ?
ওকে এত ভয় কেন তোমার ?
এমনি। সত্যি বলুন না—আসবে নাকি মিগাংবাবু ?
জানিনা। সে সকালে চকইসলামপুর গেছে। বিকেলে ফেরার কথা—এখন ফিরেছে কিনা জানিনা।
কুসুম হাসিমুখে ওর দিকে তাকায়।—আমার ওপর রাগ করেছেন, নতুনবাবু ?
উঁহু।
না, আপনি রাগ করেছেন। ভালো করে কথা বলছেন না। আপনার দিব্যি, আমি জেনেশুনে কোন ক্ষতি তো আপনার করিনি। কতক্ষণ মাথায় মুখে জলের ঝাপটা দিয়েছি, বাতাস করেছি,…
করেছ, জানি।
তাহলে কেন রাগ করছেন, বলবেন ?
আমার রাগ নিজের ওপর, কুসুম।
হুঁ, আমারও কি নিজের ওপর রাগ কম হয় ? আমি মাথা ঠুকি নতুনবাবু, চৌকাঠে মাথা ঠুকে শাপশাপান্ত করি। জ্বালা তো আমার কম নয়। কিন্তু আমি যে অন্যের হাতে ধরা আছি, উপায় কী ? যদ্দিন না মরব, তদ্দিন এই ছটফটানি। কুরে কুরে খাবে শত্তুর পোকা।
প্রিয়নাথ তাকায়। কুসুম কি কাঁদছে ? মুখ নামিয়ে কাপড়ের পাড় খুঁটছে সে।
একটুখানি চুপচাপ থাকার পর প্রিয়নাথ বলে—কার হাতে ধরা আছ তুমি ?
কুসুম মাথা দোলায়।—জানি না। মা মরার সময় বলে গেল, তোকে তার হাতে জিম্মা দিয়ে রেখেছি জন্মের সময় থেকে। খবর্দার, তুই কোন পুরুষ নিসনে কুসুম, অপঘাত হবে।
তুমি তো বিয়ে করেছিলে ?
হ্যাঁ। মায়ের কথা অমান্যি করেছিলাম। মাকে বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম, দেখি না কী হয়। আর—আমিও তো মেয়ে বটি, আমার সাধআহ্লাদ ঘর সংসার ছেলেপুলে…দম টেনে সামলে নিয়ে সে ফের বলতে থাকে—তা পুরুষ আমার সইল না।

কেন, কী হল ?
বিশ্বাস করবেন বললে ?
করব ।
প্রথম রাতেই শুতে গিয়ে দেখি ঘরে সাপ ঢুকেছে । শোওয়া হল না । সাপটা খুঁজে বের করতে পারলাম না । দরজা বন্ধ করে দাওয়ায় শোব, আমি মাদুর পাতছি, আমার পুরুষ গেল পেচ্ছাপ করতে উঠোনের গাব গাছের কাছে—হঠাৎ কী দেখলে সেখানে, ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল । সারারাত ওকে নিয়ে কেটে গেল—জ্ঞান হল না । তখন শিমুলিয়ার ওঝা ডেকে আনলাম । ওঝা বললে, অমানুষের ছটা লেগেছে । আর আমাকে বকাবকি করে বললে, তুমি গুনিনের বেটি গুনিন হয়েও অসুখ চিনতে পারছ না ? এ বাঁচবেনা । এর গায়ের রক্ত হলদে হয়েছে । আর সাতদিন মেয়াদ । বিকেলে একবার পেটের ধান্দায় স্বাধীনদির বাড়িতে গেলাম—ফিরে এসে দেখি পুরুষ পালিয়েছে ।
আর সাপটা ?
সাপটা ? ঘরের কপাট খুলে চৌকাঠে লম্ফ জেনলে রেখেছি । উঠোনে রান্না চাপিয়েছি । বসে থাকতে থাকতে আড়চোখে দেখি, সাপটা লম্ফর সামনে ফণা তুলল । ফণাটা অনেকক্ষণ দোলাল । তারপর মুখ নামিয়ে সরসর করে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল । দাওয়া থেকে নেমে গাবতলায় গিয়ে ঝোপে ঢুকল ।
তুমি তোমার পুরুষের সঙ্গে চলে গেলেই পারতে ? কোথাকার লোক সে ?
বহরমপুরের । সেখানে রিকসা চালাত । ভেবেছিলাম, এখানেও রিকসাটিকসা চালাবে । আমি যা করে খাচ্ছি তাই করব । চলে যাবে হেসেখেলে ।
আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি ?
না । শুনেছিলাম, রোগে ভুগেভুগে নাকি মারা পড়েছিল ।
কতদিন আগের কথা ?
তা দেড়-দুবছর হল ।
কুসুম !
উঁ ?
আমি একবার দেখতে পারি, তুমি যদি রাজী হও !
কী ?
তোমাকে বিয়ে করি !
কুসুম মুখ নামিয়ে বলে—ছিঃ ! আমি কি আপনার যুগ্যি মেয়ে ? আপনি উঁচু জাত—ভদ্রলোক, শিক্ষিত মানুষ । আমি ছোট জাত—লেখাপড়া জানিনে…
ওসব কিছু নয় । কথা বলি শোন । এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব । এমন জায়গায় নিয়ে যাব…
কোথায় ?

অনেক দূরে। ধরো—কলকাতা।

হুঁ, তারপর সাধ মিটে গেলে গলাধাক্কা দিয়ে পথে বের করে দেব।···কেমন হাসে কুসুম।—এদেশে অনেক এমন হয়েছে, নতুনবাবু—অনেক। চণ্ডী চৌকিদারের মেয়েকে এক শহুরে বাবু এসে নিয়ে গেল। এখন শুনি, সে মেয়ে বাজারের গলিতে সেজেগুজে সাঁঝ সকালে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমাকে কি তুমি তাই ভাবছ?

আমি মানুষকে বিশ্বাস করি না, নতুনবাবু। মায়ের শিক্ষা। মা পইপই করে বলে গিয়েছে—অমানুষকে বিশ্বাস করিস কুসুম, মানুষকে নয়।

প্রিয়নাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে—ঠিক আছে। বিশ্বাস করো না। করবে না। তাহলে কেন আমাকে জ্বালাতে এলে এখন? বেশ তো বসে ছিলাম চুপচাপ।

সন্ধ্যা নেমে গেছে। অন্ধকার হয়েছে কিছুটা। কুসুমের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে পড়ছে।

হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে প্রিয়নাথ। সেই জ্বলজ্বলে নীল চোখ! তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে কুসুম। প্রিয়নাথ মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে বলে—সিগ্রেট খাবে?

কুসুম বলে—বাসায় যান নতুনবাবু। স্বাধীনদি আপনাকে দেখতে এসেছে।

কুসুম! ধমক দেবার চেষ্টা করে প্রিয়নাথ।

স্বাধীনদি লোক পাঠাচ্ছে, আপনাকে খুঁজতে। এক্ষুনি এসে পড়বে—চলে যান।

তুমি কী করবে?

নতুনবাবু, পালান।

বিরক্ত হয়ে প্রিয়নাথ বলে—ড্যাট্! তুমি মাঝে মাঝে পাগলামি কর কেন কুসুম? বেশ বুঝতে পারছি, আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করছ। সব তোমার বদমাইসী—মিথ্যে!

কুসুম হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তারপর শ্মশানবটের দিকে দৌড়ে চলে যায়। প্রায় শূন্যে ভেসে যাওয়ার মতো—এবং অন্ধকারে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই সময় জোরালো টর্চের আলো পড়ল বাঁধের ওপর কিছুটা দূর থেকে।

প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়ায়।—কে?

প্রিয়বাবু, আসুন। অন্ধকারে একা কী করছেন ওখানে?

মৃগাঙ্ক। বাঁধে উঠে প্রিয়নাথ বলে—কখন ফিরলেন?

এইমাত্র। স্বাধীন এসেছে। কে ওকে বলেছে—প্রিয়বাবুর অসুখ বেড়ে গেছে। ওর আবার ওইরকম স্বভাব। আমার লোকজনের কার অসুখ, কার কী সমস্যা—সব খোঁজ ওর পাওয়া চাই। ভাবখানা এমন—যেন আমি কোন কর্তব্যই করিনে!···

হো হো করে হাসে মৃগাঙ্ক।

প্রিয়নাথ চুপচাপ হাঁটে।

প্রিয়বাবু!
বলুন?
কে ছিল আপনার কাছে? কুসুম না?
হ্যাঁ।
বিপদে পড়বেন, এখনও বলছি—ওকে এ্যাভয়েড করুন। ও ভীষণ ডেঞ্জারাস মেয়ে! যদি সত্যিসত্যি প্রেমালাপ করতে চান—বলুন না খুলে, মেয়ে যোগাড় করে দিচ্ছি।…মৃগাঙ্ক অমানুষের মতো হাসতে থাকে। ফের বলে—আশ্চর্য সাহস ওর! রাতে অত কাণ্ডের পর ফের আপনার কাছে চলে এসেছে! আমার তো ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে—ও কেন আপনাকে সব সময় ফলো করবে? গতবছর এখানে এক গ্রামসেবক এলেন—ইয়ং ম্যান। তারপর বেচারা কুসমিকে সব্জীচাষের সায়েণ্টিফিক প্রসিডিওর বাংলাতে গেলেন। কদিন পরে শুনি রিকশো করে হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে—সোজা বহরমপুর। কুসমির হাতে এক গ্লাস জল খেয়েছিলেন নাকি। যাই হোক, ভদ্রলোক কেসফেস করেননি। রাতারাতি চাকরি ছেড়ে পালালেন। নাকি বদলী হয়েছিলেন। আমি ব্লকটুকের ধার ধারিনে। স্বাধীনভাবে চাষবাস করি। যা শুনেছি, বললাম।
মৃগাঙ্ক বাড়াবাড়ি করে বলছে, তা প্রিয়নাথ বুঝতে পারে। একরকম কী ঘটেছিল, তা বিকৃত করে বর্ণনা করছে—তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু কুসুমের কাছে কোন অলৌকিক শক্তি আছে, তা এবার টের পেয়েছে প্রিয়নাথ। আশ্চর্য, সেরাতের মতো ঠিকঠাক বলে দিল, স্বাধীন তাকে দেখতে এসেছে! আর ওই নীল রঙটা চোখে কোত্থেকে আসে ওর? গতরাতে তো একটুও ছিল না। এখন এল হঠাৎ। এ রহস্যের কী সূত্র আছে?
যত একথা ভাবল, গা শিউরে উঠতে লাগল প্রিয়নাথের। সেই সঙ্গে এক অজানা বিপদের আতঙ্কে সে ক্রমশ কুঁকড়ে গেল। মৃগাঙ্ক ঠিকই বলেছে, ওকে এড়িয়ে চলাই ভালো।
কিন্তু ওই দুর্লভ মায়ায় ভরা সুন্দর শরীর! তার ঠোঁট, নাক, শ্বাসপ্রশ্বাসের কীরকম মিষ্টি গন্ধ, তার স্তনদুটি—
গগন ঠিকই বলেছে—ও মেয়ে পৃথিবীর নয়, আকাশের।…

সেরাতে স্বাধীন বেশিক্ষণ বসেনি খামারে। প্রিয়নাথকে শরীরসংক্রান্ত দুচারটে প্রশ্ন করে সব জেনে রিকশোয় বাড়ি ফিরে যায়। স্বাধীনের ঠোঁটে একটা বিশেষ ধরনের হাসি ছিল তা লক্ষ্য করেছিল প্রিয়নাথ। অর্থাৎ—কী, এখন টের পেলেন

তো কুসুমের সত্যিসত্যি অলৌকিক শক্তি আছে না নেই ? অবশ্য মদ খাওয়াটা চেপে জল খাওয়ার কথাটাই মৃগাঙ্কের বুদ্ধিমতো চালাতে হয়েছিল। স্বাধীন মদের ব্যাপারে ভীষণ চটা নাকি, মৃগাঙ্কের হুঁশিয়ারি ছিল।

পরদিন দুপুরে প্রিয়নাথের নেমন্তন্ন ওবাড়ি। মৃগাঙ্ককেও পই পই করে বলে যায় স্বাধীন। মৃগাঙ্ক বলেছিল, সময় পেলে যাবো। মাষকলাই পাঠাবো একট্রাক। সঙ্গে হয়তো আমাকেই যেতে হবে।

তাই দাঁড়ায় শেষ অব্দি। সোনারপুর মার্কেটিং কোঅপারেটিভের দিকে ট্রাকের সঙ্গে রওনা দেয় মৃগাঙ্ক। প্রিয়নাথ একটা রিকশো করে ভগীরথপুর গেল নেমন্তন্ন রাখতে।

ভেবেছিল, বিজয়েন্দু নিশ্চয় থাকবে—বাড়িতে অতিথি আসছে যখন। কিন্তু সে স্কুলে গেছে। এটা ভালো মনে নিল না প্রিয়নাথ। ঠাকুরবাড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল স্বাধীন—অপেক্ষা করছিল তার? একটু বিস্মিত হল প্রিয়নাথ। সে তো 'অমানুষ' নয়—নিতান্ত মানুষ। কুসুমের অলৌকিক তার কাছে নেই—চোখে নেই উজ্জ্বল নীল কোন বাতি! তার দৃষ্টি শূন্য—খসখসে, শুকনো গাছের মতো নিরর্থ। স্বাধীন কি সত্যিসত্যি কিছু পেল তার মধ্যে ?

নাকি কুসুমের গন্ধপোকার মউ মউ করা সৌরভে আপ্লুত স্বাধীন অনুরাগিনী ? মনে মনে হাসে প্রিয়নাথ।

আসুন, আসুন! দাদা এল না ? স্বাধীন আজ আর ঘোমটাটা তোলেনা মাথায়। এলোচুল পিঠে একটা প্রগলভতার মতো ঝাঁকালো।—হুঁউ, জানতুম আসবে না। এদিকে আমার কর্তাবাবুও ছেলে ঠ্যাঙানো ছাড়া থাকতে পারেন না। কাল একটা কামাই করেছে, মাস্টারি চলে যাবে না ?

শ্বশুরের স্কুলে জামাইয়ের মাস্টারি চলে যাবে কী ?

স্বাধীন দারুণ হাসে।

সে-ই নিয়ে যায় তাকে। বিছানার দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে।—আরামে হাত-পা ছড়িয়ে বসুন। চানটান তো করেছেন মনে হচ্ছে।

প্রিয়নাথ একটু ভদ্রবেশে এসেছে। নতুনকাচা প্যান্টশার্ট পরনে, পালিশকরা কুয়োভেডিস জুতো। সে একটু ভেবে নিয়ে বিছানাতেই বসে—তাকিয়া টেনে নেয় কোলে। মিষ্টি হাসে।—একা একা যাবো! কী কাণ্ড দেখুন তো! মৃগাঙ্কদা অদ্ভুত মানুষ—

বাধা দিয়ে স্বাধীন বলে—অদ্ভুত তো আপনাদের মাস্টার ভদ্রলোকটিও। জেনে শুনে—মরুক গে। আপনি এসেছেন তো—তাহলেই হবে।

একটা এ্যাসট্রে চাই।

দিচ্ছি। বলে স্বাধীন কোণার শোকেস খুলে পুতুলের রাজ্য থেকে একটা শামুকের এ্যাসট্রে এনে দেয়। তারপর সামনে মোড়ায় বসে। পায়ের ওপর পা তুলে দেয়।

রান্নাটান্না একঘণ্টা আগে শেষ। এখনই খাবেন—না একটু দেরী করব?
খাচ্ছি। বলে প্রিয়নাথ সিগ্রেট ধরায়।
স্বাধীন ঠোঁট টিপে হাসছিল। যতক্ষণ প্রিয়নাথ প্রথম ধুঁয়ো নিজের ডানদিকে সাবধানে ছড়িয়ে দিতে থাকল, কিছু বলল না। প্রিয়নাথ ঘুরলে তখন বলে সে—কুসুম কী খাইয়েছিল? স্রেফ জল? আরেক বার বলুন তো, শুনি?
প্রিয়নাথ মিটিমিটি হাসে শুধু।
আপনি মদ খান কেন?
না, তেমন কিছু নয়। একটু আধটু। সেও কেউ অফার করলে। আমার কোন হ্যাবিট নেই।
কুসুম ডেকেছিল, নাকি নিজে থেকে গিয়েছিলেন ওর বাড়ি?
ডাকেনি। নিজেই গিয়েছিলাম—নিছক কিউরিসিটি।
স্বাধীন হাসতে হাসতে বলে—হুঁউ, কিউরিসিটি! ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?
এ্যাঁ! প্রিয়নাথ চমকে ওঠে এবং হতবাক হয়ে পড়ে।
লজ্জার কিছু নেই। আপনি সত্যি কথাটা বলুন না মশাই, তারপর আমি যা বলার, বলছি। বিয়ে করবেন বলেছিলেন ওকে?
কে বলল আপনাকে? কুসুম?
আমিও কুসুমের মতো ডাকিনীবিদ্যা জানি। আপনি স্বীকার করুন আগে।
হ্যাঁ। বলে থাকতে পারি। মদের নেশায়।
মদের নেশায়? সজ্ঞানে নয়—তাই না?
তাছাড়া কী বলব?
আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। কুসুমের কোন উপায় নেই। ওর এই বয়স—ফ্র্যাংকলি বলছি, ভোগ আহ্লাদের বয়স। কিন্তু ওর মা হারামজাদী ওর সর্বনাশ করে গেছে। আপনারা তো সুপার নেচারাল পাওয়ারে বিশ্বাস করেন না—আমি করি। ওর জন্মের পরই কোন প্রেতশক্তিই বলুন কিংবা অন্য কিছু, তার কাছে জিম্মা দিয়ে রেখেছে ওকে। কুসুমকে সে কিছুতেই অন্যপুরুষের ছায়া লাগতে দেবে না। আপনি—পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।...স্বাধীন কণ্ঠস্বরটা চাপা করে এবার।—দুষ্টবদমাসের তো অভাব নেই দেশে। অজস্র লম্পট ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ওই বুনো মেয়ে মাঠেজঙ্গলে ঘোরে। অনেকে এ্যাটেম্পট নিয়েছিল, কুসুমই বলেছে—তারা কী ভীষণ শাস্তি পেয়েছে, ভাবতে পারবেন না। আগে নদীর ওপারে জঙ্গলে বাউরীদের একটা লোককে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গায়ের রঙ কেমন কালো—বাজ পড়লে বা সাপে কাটলে যেমন হয়। সবাই তো সাপে কাটা ভেবে আর উচ্চবাচ্য করলে না। পরে কুসুম আমাকে যা বলল, শুনে আমি তো ভয়ে কাঠ। হতভাগিনী কুসুম! কী সর্বনাশের সঙ্গে ওকে ঘর করতে হচ্ছে!
প্রিয়নাথ চুপচাপ সিগ্রেট টানে।

ওকে রেপ করতে গিয়েছিল লোকটা। আর—রেজলাপাড়ার সেই মুসলমান ছেলেটি ? বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বন্দুক আছে ওদের। বিলে গেল পাখি মারতে। ফিরল। বোবা একেবারে। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কথা বলতে পারে না। জড়-ভরত হয়ে গেল দিনে দিনে। এখন তো চলাফেরাও করতে পারে না। হাত পা প্যারালেসিসে অবশ। কত খরচা করল চিকিৎসায়—কলকাতায় গিয়ে থাকল কতদিন। কিছু হল না।

প্রিয়নাথ মুখ তোলে।

আবার কী ? কুসুমের কীর্তি। কুসুমকে ধরেছিল ! পরে কুসুম ডিটেলস ঘটনাটা বলে আমাকে। এগুলো কিন্তু কেউ জানে না। জানলে হতভাগিনী মেয়েটাকে খুন করে ফেলবে। আরও ইনসিডেন্ট আছে এরকম। সাবধান, আপনি কিন্তু ভুলেও এসব বলবেন না কাকেও।

মৃগাঙ্কদাকে ও কেন অত ভয় করে ?

স্বাধীন কেন কে জানে, মুখটা নামায়। তারপর আস্তে বলে—আমি জানিনে। দাদাকেই জিজ্ঞেস করবেন।

করেছিলাম। স্পষ্ট জবাব পাইনি।

আপনার খাবার ব্যবস্থা করি।···বলে হঠাৎ ওঠে স্বাধীন। বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ডেকে নিয়ে যায় নিবারণ নামে চাকরটা। পাশের ঘরে ডাইনিং টেবিল রয়েছে। সম্ভবত বিজয়েন্দুর জীবনযাপন প্রণালী শহুরে এবং 'মর্ডান' যাকে বলে। প্রিয়নাথ বসে পড়ে।

একা খাবো ? আপনি বসবেন না ?

নিশ্চয় বসব। আমারও খিদে পেয়েছে।··বলে স্বাধীন মৃদু হেসে সামনাসামনি বসে।

রান্না আপনি করলেন, না ঠাকুর ?

কিছু আমি, কিছু ঠাকুর। নকড়ি ! ও ঠাকুর মশায় ! স্বাধীন ডাকে।—একবার বাবুকে শ্রীমুখটা দেখাও।

পনের ষোল বছরের একটি সুন্দর চেহারার ছেলে, খালি গা, পৈতে রয়েছে, কোমরে গামছা জড়ানো, হাসিমুখে এগিয়ে আসে।

ইনিই আমার নকড়ি চন্দ্র। আপনাদের বীরভূমেরই ছেলে !

প্রিয়নাথ বলে—তাই বুঝি ? বীরভূমের কোথায় ভাই ?

নকড়ি বলে—লাভপুরের দিকে।

স্বাধীন বলে—ওর সামনে প্রশংসা করতে চাইনে। ওকে পেয়ে কী বাঁচা যে বেঁচেছি, ভাবতে পারবেন না। রান্নাটান্না আমি পারিনে—শিখিও নি। গেছো মেয়ের মতো কাটিয়েছি। তবে হ্যাঁ, পিকনিকের রান্নায় আমি এক্সপার্ট। মাঝেমাঝে বহরমপুর থেকে আমার বন্ধুরা আসে ভৈরবের ওপারে পিকনিক করতে। সে এক থ্রিল ! শীত

পড়ুক—তখন দেখবেন।

কেষ্ট মালী এসে দাঁড়ায় বারান্দায়। হাতে একটা বাটি।—ভারতী খাচ্ছে না গো। এ এক সমিস্যেতে পড়া গেল। ব্লকের পশুডাক্তোরবাবুকে খবর দেবেন নাকি একবার?

স্বধীন এঁটো হাতে ওঠে।—আর পারা যায় না বাবা! ব্লকের পশুটশুর কর্ম নয়। তারা হরিণের কী বোঝে? চল তো—দেখি। অত অধৈর্য হলে তো চলে না। প্রিয়বাবু, এক মিনিট।

স্বাধীন বেরিয়ে যায়। ততক্ষণ নকড়ির জীবনীসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন করে সময় কাটায় প্রিয়নাথ। মাঝে মাঝে দুএককুচি স্যালাড কামড়ায়।

স্বাধীন ফিরে আসে দু মিনিট পরে। এসে ভাত মাখতে মাখতে বলে—কেষ্টকেও ভূতে ধরেছে। খায় না ভারতী! খাবে না কেন? আসলে কি হয় বুঝলেন? জন্তুরাও বুঝতে পারে ভালবাসার সত্যি মিথ্যে। আজ সকালে কতক্ষণ আমার সঙ্গে ছোটাছুটি করে গেল। যেই কেষ্ট সামনে এল, অমনি ব্যাজার হয়ে কোলে ঢুকল। মাইনে করা লোক দিয়ে তো এসব হয় না। বুঝলেন প্রিয়বাবু, ছেলেবেলা থেকে আমিও কিন্তু কুসুমের মতো একটা বিদ্যে রপ্ত করেছি। আমি ওদের কথা বুঝতে পারি। ব্যাপারটা কমিউনিকেশান মিডিয়ামের। বাবা এটা দারুণ জানতেন। আমি অতটা নয়—অল্পস্বল্প।

দেয়ালের একটা টিকটিকি দেখিয়ে প্রিয়নাথ বলে—বলুন তো, ওই টিকটিকিটা কী বলছে এখন?

স্বাধীন মুখ ঘুরিয়ে প্রাণীটা দেখে নিয়ে শুধু চোখে হাসে। ও কী হাসি! প্রিয়নাথের বুকের ভিতরটা কেমন করে। ঠোঁটে আলগোছে একটু ভাত নিয়ে আস্তে ঠেলে দিতে দিতে স্বাধীন উজ্জ্বল চোখে হাসি রেখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। চিবুনো ও গেলা শেষ হলে আস্তে বলে—পারি বলতে। নকড়ি, হাঁ করে কী দেখছিস? আর কীসব আছে নিয়ে আয়।

নকড়ি বেরিয়ে গেলে সে বলে—টিকটিকিটা বলছে, আহা, কী হাস্যকর দুর্ঘটনা। প্রিয়বাবু নামক ভদ্রলোকটির দুর্দশা দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত।…হাসতে হাসতে চেয়ারে চিতিয়ে বসে স্বাধীন। মাথাটা ঘষা খায়। চুলগুলো দুপাশে প্রচণ্ড দোলে।—কী? আর শুনবেন?

তাই বলছে বুঝি?

বলছে।…হাসির চোটে চোখে জল এসে গেছে স্বাধীনের।

প্রিয়নাথ অন্যমনস্ক ভাবে জানলার দিকে তাকিয়ে বলে—কিন্তু প্রিয়বাবু তো অস্বাভাবিক কাজ করে নি। যা স্বাভাবিক, যা মানুষের পক্ষে সঙ্গত—তাই করেছে! ফুল ফুটলে সবাই আকৃষ্ট হয়।

নিশ্চয় তো। ফুল বাগানেও ফোটে, বনেও ফোটে। বনজ কুসুম!

হ্যাঁ,, বনজ কুসুম। ঠিক বলেছেন।
কিন্তু স্যার প্রিয়বাবু, বনজ কুসুম দেখতে চমৎকার হলেও তা থেকে বিষফল হয়।
এ প্রগলভতা বাড়াবাড়ি মনে হয় প্রিয়নাথের। সে বলে—দেখুন, মানুষ—একমাত্র মানুষই বোধ হয় এটা পারে। ইচ্ছে করেই—ডেলিবারেটলি অমৃতের বদলে বিষ খেয়ে জ্বলে জ্বলে মরতে চায়।
আমি আপনাকে বারণ করছি নে। জ্বলুন, পড়ুন, আপনার ইচ্ছে।
রাগ করলেন?
না। হিংসে।
প্রিয়নাথ চমকে তার দিকে তাকায়। স্বাধীন কিন্তু হাসছে।—কী বললেন?
হিংসে।
কিসের?
কুসুমের প্রতি হিংসে হচ্ছে বললে কি ভালো লাগবে আপনার?
কে জানে ভেবে দেখিনি।
আপনি অত আস্তে নির্জীব মানুষের মতো কথা বলেন কেন?
হয়তো আমি দুঃখবাদী মানুষ, তাই। হয়তো বেশি দম নিয়ে পৃথিবীতে আসিনি, তাই অল্পেই হাঁপিয়ে পড়ি।
নকড়ি এসে প্লেটগুলো রাখে টেবিলে। স্বাধীন নিঃশব্দে সেগুলো বিলিবণ্টন করতে থাকে। কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না। প্রিয়নাথও চুপচাপ আলগোছে খায়। নকড়ি সরে গেলে সে কৌতুকের ছলে বলে—আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আপনি ফ্র্যাঙ্কলি আলোচনা করছেন যখন, কুসুমকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। এ আমার অকপট স্বীকারোক্তি। কী করব? আপনার কুসুমের মতো আমিও আমার ভালবাসার ইচ্ছের কাছে ধরা আছি। আমারও হয়তো কোন উদ্ধার নেই।
বেচারী কুসুম! যে ওকে দেখে, সেই ওকে ভালবেসে ফেলে।
সেটা তাদের অপরাধ নিশ্চয় নয়।
নয়ই তো। নেচার'স্ কল্।
কী বললেন?
নেচার'স্ কল। স্বাভাবিক কথায় মানুষ যে জন্যে ল্যাট্রিনে যায়, খায়, ঘুমোয়।
আপনি আমাকে নিয়ে হয়তো জোক করছেন। আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি।
স্বাধীন হাসতে হাসতে ফের চেয়ারে চিতিয়ে বসে। মাথা এদিক-ওদিক দোলে। তারপর সে উঠে দাঁড়ায়। বলে—ওখানে বেসিন রয়েছে। তোয়ালে সাবান আছে। হাতমুখ ধুয়ে ওঘরে চলে আসুন। পান খাওয়া অভ্যেস আছে?
একটু আধটু।
সবই আপনার একটু আধটু? পুরোটা নয়? তাহলে ভালবাসাটাও নিশ্চয় ওই

রকম একটু আধটু !…বলে স্বাধীন বেরিয়ে যায়।…

খানিক পরে আগের মতো সেই বিছানায় হেলান দিয়ে বসেছে প্রিয়নাথ। স্বাধীনও ইজিচেয়ারটা টেনে হেলান দিয়েছে ! দুজনেই পান চিবোচ্ছে। স্বাধীনের ঠোঁট শিগগিব লাল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে সে জিভ বের করে রঙ দেখে নিচ্ছে। এ অভ্যাস অনেকের থাকে। প্রিয়নাথ পায়ের দিকে জানলার পর্দা টেনে দিয়ে এল। সূর্য ঢলেছে—রোদ আসছিল।—মাস্টারমশাই কখন ফেরেন ?

পাঁচটা হয়ে যায়। বসুন, এসে পড়বেন এক্ষুণি।

এক্ষুণি কী ? মোটে তো তিনটে বাজে !

ভাতঘুমের অভ্যেস নিশ্চয় আছে ? একটু-আধটু। আপনার ভাষায় !

অবশ্যই।

শুয়ে পড়ুন।

আপনি ?

আমি একবার আমার চিড়িয়াখানায় যাবো।

ঠিক আছে। উইথ ইত্তর পারমিশান—গড়িয়ে নিই।

হ্যাঁ, একটু আধটু।

হাসতে হাসতে বালিশে মাথা রাখে প্রিয়নাথ। চোখ বুজে বলে—প্লীজ, বেশি ঘুমিয়ে পড়লে জাগিয়ে দেবেন কিন্তু। আপনার কর্তাবাবু এসে নিজের বিছানায় অন্য লোককে শুয়ে ঘুমোতে দেখলে ঘাবড়ে যাবেন। তাছাড়া মাস্টারমশাইদের আমি ভীষণ ভয় করি।

মনে হয় না। হয়তো আপনাকে দেখতেই পাবেন না।

প্রিয়নাথ চোখ বুজে থেকে টের পায় স্বাধীন বেরিয়ে গেল। বাইরে নানারকম পাখির ডাক, গ্রামীন শব্দপুঞ্জ—ধীর, সুদূর ও গভীর, গাভীর হাম্বা, ফের পাখির ডাক…প্রিয়নাথ ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর স্বপ্ন আসে। ভৈরবের জলে সে ভেসে চলেছে। মৃগাঙ্ক পদ্মার সঙ্গমে চরে পাখি মারতে যাচ্ছে, প্রিয়নাথকে নিল না সঙ্গে। স্বাধীন তাকে বলছে, কী মশাই, কুসুমকে বিয়ে করবেন ? কুসুম কোথাও পালিয়ে গেছে। প্রিয়নাথ পাগল হয়ে খুঁজছে। কী যে কষ্ট…

প্রিয়বাবু, প্রিয়বাবু ?

লাল চোখে তাকায় প্রিয়নাথ। স্বাধীনের আঙুল এইমাত্র তার বুক থেকে সরে গেল বুঝতে পারে। কিছু কি তুলে নিল ? একটুখানি খালি লাগে, দেহের ভিতরে কোথাও একটা ছোট্ট গর্ত হল।

উঠুন। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ! আর কতক্ষণ ঘুমোবেন ?

প্রিয়নাথ ধুড়মুড় করে উঠে বসে।—উনি ফিরেছেন ?

না। হয়তো স্কুল থেকেই কোথায় বেড়াতে বেরিয়েছেন। খেয়ালী মানুষ।

প্রিয়নাথ অপ্রস্তুত মুখে বলে—ইস্, কী বিচ্ছিরি ঘুম ! চলি।

যাবেন'খন। চা ফা খান তো।

চায়ের কাপ স্বাধীনের হাতে। বিছানায় রেখে সে বেরিয়ে যায়। একটু পরে এসে বলে—চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! জল দেবেন মুখে চোখে?

থাক। বলে চাটা কয়েক চুমুকে শেষ করে ফেলে প্রিয়নাথ। নেমে আসে বিছানা থেকে। সিগ্রেট জেবলে সোজা দাঁড়ায়। স্বাধীন তার চেয়ে কত ইঞ্চি ছোট আন্দাজ করে!

চলুন বাগানে যাই।…স্বাধীনের চোখে ইচ্ছেটা ঝলমল করে ওঠে।

দেরী হয়ে গেল বড্ড। আজ আর বাগানে নয়।

কাজ কাজ কীই বা আছে এমন! চলুন, গল্পসল্প করি। তারপর বেরোবেন।

না গিয়ে পারে না প্রিয়নাথ। কিন্তু ক্রমশ তার মনে একটা সংশয় খচখচ করতে থাকে—তাকে নিয়ে কী যেন নিষ্ঠুর খেলা খেলছে মৃগাঙ্কবাবুর বোন। স্বাধীনের নির্বিকার আচরণ বা ভদ্রতা বা অতিথি সৎকারের মধ্যে একটা খেলা-খেলা ভাব মাথা নাড়া দিচ্ছে যেন। কুসুমকে ভালটালো বাসাব সরল স্বীকারোক্তি কি সত্যিসত্যি কোন রকম অদ্ভুত হিংসে ঈর্ষা জাগিয়ে দিয়েছে মহিলার মনে? এ যেন লেজে খেলানোর ব্যাপার। এ যেন খর উগ্র অভিসন্ধি নিয়ে বোঝাবুঝির চক্রান্ত। আরও গভীরতর স্বীকারোক্তি চাই কি আপনার, স্বাধীন? প্রিয়নাথ মনে মনে উদ্বেগ নিয়ে বলে। আপনি কি মারাত্মক আঘাত দেবার চূড়ান্ত সময়ের অপেক্ষা করছেন. পাচ্ছেন না—তাই এবার নির্জন বাগানে জন্তুজানোয়ারদের খাঁচার কাছে নিয়ে এলেন আমাকে?

বাঁদরের খাঁচা খুলতেই বাঁদরটা একলাফে এসে কোলে চাপে স্বাধীনের। পিটপিট করে তাকায় সে প্রিয়নাথের দিকে। স্বাধীন হাসতে হাসতে বলে—কী মটরবাবু, ভদ্রলোককে দেখে কী মনে হচ্ছে? উঁ?

সে বাঁদরটার মুখের কাছে কান রেখে তারপর ফের বলে—হুঁ, কী বলছে জানেন? বলছে—ভদ্রলোকটি অতিশয় গোবেচারা লাজুক মানুষ। সে কী মটরবাবু? ও কী বলছিস? মোটেও না—মোটেও না। উনি কী করেছেন জানিস?…স্বাধীন প্রিয়নাথের দিকে একবার চটুল তাকিয়ে ফের শুরু করে—উনি এদেশে এসেই কেউটে সাপ ধরতে হাত বাড়িয়েছেন। না রে বাবা, না—তুই জানিস নে, বিষাক্ত সাপ ধরা অভ্যাস ওঁর আছে। তাই ধরতেই তো এসেছেন!

প্রিয়নাথ এইসব কথা কানে না নিয়ে ময়ূরদুটো দেখতে থাকে। অনর্গল ওইধরনের চটুল রসিকতার পর বাঁদরটা আচমকা প্রিয়নাথের গায়ে ফেলে দেয় স্বাধীন। প্রিয়নাথ শসব্যস্তে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারে না। বাঁদর তার কাঁধে চড়ে বসে। অস্বস্তিতে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রিয়নাথ—আর স্বাধীন হাসিতে লুটোপুটি খায়।

হঠাৎ প্রিয়নাথ লক্ষ্য করে বাঁদর তার কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সে রোমশ ছোট্ট

হাতটা সরিয়ে দেয়। কিন্তু দুপায়ে কাঁধ আঁকড়ে দুটো হাত চালিয়ে ব্যাটা তার গলায় নাকে মুখে হালকা খামচা-খামচি শুরু করে। প্রিয়নাথ বিরক্ত হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, কিন্তু মুখে হাসি রাখতে হয়। স্বাধীন হেসে ভাঙে। তার শাড়ি পিছলে যায়, ফুটে ওঠে গলার নিচের উজ্জ্বল মাংস আর সবুজ ঢাকনা ঠেলে ওঠা স্তনদ্বয়, বগল আর সরল বাহু জোরালো অনুরাগ ছড়াতে থাকে—মনে হয় নারীত্বের নোনা স্রাবে ভিজে উঠছে ঘাস। তারের মরচেধরা খাঁচা, দিনশেষের বাগান, আর নির্জনতা স্যাঁতসেতে হয়ে উঠছে সেই তীব্র নারীত্বের ক্ষরনে।

চকিত বিহ্বলতায় প্রিয়নাথ তখন করে কী, সে দুহাতে বাঁদরটা ধরে শরীর থেকে ছাড়িয়ে, গাছ থেকে ডালপালা ছাড়ানোর টানে ঝুঁকে যায় স্বাধীনের দিকে—কড়া গলায় বলে, আপনার মটরবাবুকে নিন তো !

এর ফলে তার ও স্বাধীনের একটা অনিবার্য শারীরিক সংযোগ ঘটে যায়। স্বাধীন বাঁদবটা নিতে গিয়ে একবাব প্রিয়নাথের চোখ দুটো দেখে, মুখ নামায। বাঁদর তার বুকে যায় ফের।

একটু সরে যায় প্রিয়নাথ। জামা ঝাঁড়পোছ করে রুমালে। চুল ঠিকঠাক করে। যা বলেছিলেন ! ভীষণ দুষ্টু তো আপনার মটরবাবু !

আপনার লাঞ্ছনার এখনও বাকি রইল।

বুঝতে পেরেছি।

আরেকদিন হবে।

পাগল ! আর আমি ওর ত্রিসীমানায় আসছিনে।

না এসে পার আছে ভাবছেন ? জন্তুজানোয়ারের সংস্পর্শে একবার গেলে বারবার না গিয়ে উপায় থাকে না। একটা কিছু চরম ঘটে না যাওয়া অব্দি রেহাই নেই।

কে জানে !

খাঁচায় বাঁদরটা ভরে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে স্বাধীন বলে—ওদের বেলাতেও তাই। বাবা বলতেন, বুনো জন্তু একবার কোনভাবে মানুষের টাচে এসে পড়লে তাকে অনবরত আসতে হয়, যতক্ষণ না মারা পড়ে। বাবা বড় শিকারী ছিলেন—দাদার চেয়ে। আমলাবাগে অনেক বাঘ শুওর হায়েনা থাকত সে আমলে। হায়েনার দাঁতের বিষেই বাবার ঘা পচে গিয়েছিল। তিনচার মাস ভুগে কলকাতার হাসপাতালে মারা যান।

শুনেছি।

আপনি জানেন, বুনো হিংস্র জন্তুরা অসুখবিসুখ হলেও অনেক সময় মানুষের কাছে চলে আসে ? রোগা বাঘ একটা নাকি এসেছিল, ঠাকুর্দার আমলে। ঠাকুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে মেরে ফেলেন বাবা। পরে পস্তেছিলেন। তখন বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম। 'ঠাকুর্দা ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আর—আমি নিজেও অনেক বার দেখেছি রোগা খরিস সাপ ঘরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। ভৈরবে ফ্লাড হলেও এমন

ব্যাপার হয়। নদীর এলাকায় যারা থাকে, তারা জানে।...

প্রিয়নাথ এ সময় আড়চোখে দেখতে পায়, উত্তরের জানলায় পর্দার ফাঁকে কে মুখ রেখেছে। কুসুম নাকি? কুসুম ভেবে সে চকিতে দৃষ্টি পুরো ফেলল সেখানে। না—বিজয়েন্দু। তার ধবধবে সাদা চিবুক, লাল ঠোঁট ও কুচকুচে কালো গোঁফ দেখা গেছে। পর্দা সরে ঠিকঠাক হল ফের। সরে গেল বিজয়েন্দু।

স্বাধীন উল্টোদিকে তাকিয়ে ছিল। সে দেখল না। প্রিয়নাথের মাথার ভিতরটা আবার খালি লাগে। শরীরে ক্লান্তি নামে। কিন্তু সে স্বাধীনকে বলতে পারে না—আপনার স্বামী এসে আড়ি পেতেছেন! সে শুধু বলে—বিজয়েন্দুবাবু এতক্ষণ এসে গেছেন নিশ্চয়।

কে? ও—হ্যাঁ। বলা যায় না।

এবার চলি তাহলে?

কেন? সন্ধ্যাবেলায় চাষে নামবেন নাকি?...স্বাধীন বাগানের অন্যদিকে পা বাড়ায়।—এই চাষাভূষো মানুষ নিয়ে আর পারা যায় না। শুনুন, এবার কাজের কথা। আপনি তো শুনেছি সয়েল টেষ্ট করতে এক্সপার্ট। মাটি হাতে নিয়েই নাকি ধন্বন্তরীর মতো সব বাৎলাতে পারেন?

একটু-আধটু।

সেই একটু-আধটু! বাবারে বাবা! পুরোটা কিছুই পারেন না! চলুন, আমার কিছু মাটিতে পোঁতা গোলাপ কাটিং দেখবেন। টবে চমৎকার বাড়ে। কিন্তু মাটিতে কীরকম মিইয়ে যায় কেন বলুন তো? মাটিটা দেখবেন, চলুন। আর এবার অজস্র ডালিয়ার কলম করেছি। শীত আসতে আসতে আমার বাগান আলো হয়ে যাবে। দেখবেন, চলুন।...একটু পরে বলে—চন্দ্রমল্লিকাও আছে।

আলো কমে গেছে। এখন সঙ্গে সঙ্গে টেষ্ট করা কঠিন। বরং খানিকটা মাটি নিয়ে যাব।

আপনার ল্যাবরেটরি নেই ফার্মে? না থাকলে, দাদাকে বলুন—করে দেবে। যা যা দরকার আনিয়ে নেবেন। দাদা ওই নিয়েই তো পাগল। দেখবেন আস্ত গন্ধমাদন বয়ে আনবে।

বলব।

তাহলে একটা কাগজ-টাগজ এনে দিই। এক মিনিট।

স্বাধীন চলে যায়। প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে থাকে—চোখ উত্তরের জানলার দিকে। কেউ নেই আড়ি পেতে—নাকি আছে? বিজয়েন্দু বড় অদ্ভুত তো! সুশিক্ষিত পণ্ডিত মানুষ—অথচ...

স্বাধীন কাগজ নিয়ে এসে চাপা স্বরে বলে—আপনাদের মাস্টারমশাই এসেই লিখতে বসেছেন চুপচাপ। দারুণ মুড এসেছে নিশ্চয়। তাই আর ডাকলাম না।

অন্ধকার একটু তাড়াতাড়ি নামল কি? পাঁচিলের বাইরে বড়ো সব গাছপালায়

সহস্রচক্ষু প্রাণীর মতো তাকাচ্ছিল। শিশির জমছিল ঘাসে। মাটির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে প্রিয়নাথ বলে—কাল সকালের দিকে খবর দেব।

প্রিয়বাবু ?

বলুন।

না বলেও থাকা যায় না। অথচ নতুন মানুষ আপনি, সব এখনও বুঝে ওঠা সম্ভব নয় এত শিগগির।

নির্দ্বিধায় বলুন না !

বেচারা কুসুমকে আপনি আর তাতাবেন না। ও কষ্ট পাবে।

প্রিয়নাথ হাসে একটু।—কী মুসকিল !

ওকে রেহাই দিন।

প্রিয়নাথ গুম হয়ে যায়।

আজ সকালে এসেছিল কুসুম। আপনার ব্যাপারটা খুলে বলেছে ও। আমাকে কিছু লুকোয় না। মনে হল, ওর মনে চাঞ্চল্য এসে গেছে। সে তো স্বাভাবিক। ও আমাব পরামর্শ চাইছিল।

কিসের ?

আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন ওকে !

সে কী !

চালাকি করবেন না প্রিয়বাবু। আপনি বলেন নি ওকে, কলকাতা নিয়ে যাবেন ?

ও, হ্যাঁ।

কেন এ লোভ দেখালেন ওকে ? পারবেন ওই অশিক্ষিতা গ্রাম্য জংলী মেয়েটাকে স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিতে সমাজে ? পারবেন ওর সঙ্গে মন মিলিয়ে ঘরসংসার করতে ? একটা সাংঘাতিক ফারাক কী দিয়ে ভরাবেন বলুন তো ? শুধু প্রেমভালবাসা দিয়ে ? তা হয় না। আর—তাছাড়া, ও তো মোটেই সুস্থ ব্রেনের মেয়ে নয়, অস্বাভাবিক ওর সব কিছু ! মেজাজ রুচি চালচলন—কোনটাই মিলবে না আমাদের চেনাজানা জীবনের সঙ্গে। বারবার তাল কাটবে। তখন নিজেই সমস্যায় পড়বেন—লজ্জা পাবেন। ওকে ঘৃণা করবেন।

একথা বলার জন্যেই কি এতক্ষণ সময় নিলেন ?

সে কথার জবাব না দিয়ে স্বাধীন বলে—এদিকে যা বুঝতে পেরেছি, কলকাতা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা মেয়েটার মনে জোর লেগেছে। অস্থির হয়ে পড়েছে। সত্যি তো, ও যেভাবে বেঁচে থাকে—তা কি কেউ পছন্দ করবে ? ও উদ্ধার পেতে চায় ! আফটার অল, ও মানুষ—মেয়ে। আর আপনি ওর চোখে একজন জোরালো—কী বলব ? সুন্দর পুরুষ ! আপনাকে অনেক মেয়ে মনে মনে চাইলে তাদের দোষ দেব না।

হ্যাঁ, হয়তো আমি কন্দর্প !

দুজনেই একটুখানি চাপা হাসে এখন। তারপর স্বাধীন পা বাড়িয়ে বলে—কী?
যা বললাম মনে থাকবে?
দিব্যি করাতে চান নাকি?
অত জোর কোথায় আমার?
আপনি কি কুসুমের মরাল গার্জেন? আপনার বাবার মতো?
শেষ বাক্যটা বলা হয় তো উচিত হলনা—প্রিয়নাথ বলার পর বিব্রত হয়ে ভাবে। কিন্তু স্বাধীন ওটা বিশেষ গায়ে মাখল না যেন। সে বলে—হ্যাঁ। বাবা আমাকে বলে যান, ওকে যতটা পারি সাহায্য করতে—সব ব্যাপারেই। দাদাকেও বলে যান। মরার সময় আমি পাশে ছিলাম না—দাদা গিয়েছিল কলকাতা। ওকে বাবা কী সব বলেছিলেন। কিন্তু দাদা অদ্ভুত ভোলানাথ মানুষ। অগত্যা, আমি যা পারি, করে যাই। তবে কুসুম আমার তত ধার ধারে না—ও নিজের খুসিতেই চলে। নাকি ওর মায়ের দেওয়া প্রেতশক্তির ইচ্ছে মতো ওকে চলতে হয়।
প্রেতশক্তি! চমৎকার বলেছেন। বলে জোরে হাসতে হাসতে প্রিয়নাথ সিঁড়ি বেয়ে খিড়কিতে ওঠে।
বারান্দায় আলোতে পায়চারি করছিল বিজয়েন্দু। ঘুরে দাঁড়ায় সে। হাসিমুখে বলে—শুনেছি, আপনি রয়েছেন। কিন্তু ভীষণ মুড এসে গিয়েছিল। প্রেতশক্তি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা হচ্ছিল নাকি?
স্বাধীন পাশ কাটিয়ে কিচেনের দিকে যায়।—নকড়ি, কী সব হচ্ছেটচ্ছে রে?
প্রিয়নাথ বলে—হ্যাঁ। ভূতপ্রেতের দেশে এ ছাড়া আর কী আলোচনার আছে বলুন! গতকাল বহরমপুর গিয়েছিলাম তো। একটা বইয়ের অর্ডার দেওয়া ছিল। অদ্ভুত সাবজেক্ট। প্যারা-সাইকলজির কথা আজকাল খুব ছড়াচ্ছে দেশেবিদেশে। খুব ইণ্টারেস্টিং। প্যারা-সাইকলজি মানুষের অতিরিক্ত একটা শক্তি—আই মিন, সুপ্রা-সেনসুয়াল ব্যাপার নিয়ে গড়ে উঠেছে। অতীন্দ্রিয় বলতে পারেন। টেলিপ্যাথির কথা নিশ্চয় শুনেছেন? চাঁইপাড়ার মেয়েটি মাঝে মাঝে অদ্ভুত টেলিপ্যাথির নমুনা দেখায়। আমি তো তাজ্জব হোয়ে গিয়েছিলাম। প্যারাসাইকলজি বলছে—আসলে আমাদের ভাবনাগুলো একরকম ব্রেনওয়েভ। বুঝলেন? জাস্ট আলো যেমন একধরনের ওয়েভ। শব্দ যেমন আরেকধরনের ওয়েভ। ব্রেনওয়েভেরও মাপ আছে। রেডিওর মতো স্পেসে ছড়িয়ে যেতে পারে।
প্রিয়নাথ ফিকে হেসে বলে—চলি?
সে কী? আর বসবেন না? ও স্বাধীন, প্রিয়বাবু চলে যাচ্ছেন!
স্বাধীন বেরোয় না। এক মিনিট অপেক্ষা করে দুজনে। তারপর প্রিয়নাথ পা বাড়ায়। বিজয়েন্দু ঘরে ঢুকে টর্চ নিয়ে দ্রুত হেঁটে তাকে ধরে ফেলে ঠাকুরবাড়িতে—চলুন, একটু এগিয়ে দিই।
থাক। বলে প্রিয়নাথ চলে যায়।

বিজয়েন্দু দাঁড়িয়ে থাকে সদর দরজার সিঁড়িতে। আলো ফেলে রাখে গেট অব্দি। খুব লম্বা পা ফেলে প্রিয়নাথ আলোটা এক নিশ্বাসে পেরিয়ে যায়।···

মৃগাঙ্ক ফিরেছে। দাবা খেলছে গগন হালদারের ছেলে সেই মাস্টারমশায় সত্যেনের সঙ্গে। দাবার ছকে চোখ রেখেই বলে—কেমন হল খাওয়া-দাওয়া? আমি তো ভাবছিলাম, আবার নাড়ু ডাক্তারকে না ডাকতে হয়। ওরে নবীন, তোর বাবু এসেছে। সুস্থ না অসুস্থ দেখে যা।

রাতে খেল না প্রিয়নাথ। মৃগাঙ্ক আর সত্যেন পাশের বিছানায় দাবা খেলল একটানা রাত বারোটা অব্দি। চোখ বুজে প্রিয়নাথ ততক্ষণ এলোমেলো ভেবেছে, স্বাধীনের ওটা আদেশ না অনুনয়। ভেবেছে কুসুম আব রঙীন সব হ্যালুসিনেসানের মেঘগুলোর কথা। বিজয়েন্দুর চোখ দুটো পর্দার ফাঁকে কেন দেখছিল তাদের?···

তারপর কখন ওদের খেলা শেষ হয়েছে। মৃগাঙ্কের মাথার কাছের টেবিলে ঢাকা বাতিটা জ্বলছে, ঘরময় ধূসর আলো। মৃগাঙ্ক হয়তো সত্যেনকে এগিয়ে দিতে বেরিয়েছে। প্রিয়নাথ ভাবছিল, যথেষ্ট ভাবা হল—এবার না ঘুমোলে তার কষ্ট হবে। সে তখন কাত হল।

সেই সময় বাইরে মৃগাঙ্কর চাপা হাসির শব্দ শোনে সে। সত্যেনের গলা শোনা যায়। এখনও ফার্মেই আছে ওরা? তারপর মৃগাঙ্ক বাইরে থেকে ডাকে—ও প্রিয়বাবু, ঘুমোলেন নাকি মশাই?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়নাথ সাড়া দেয়।

আরে, আসুন, আসুন! ভূত দেখে যান—শিগগির! ও মশাই—প্রিয়বাবু!

প্রিয়নাথ ওঠে।

কুইক! মৃগাঙ্ক ডাকে ফের। চাপা হাসির শব্দ হয়।

অগত্যা প্রিয়নাথ বেরোয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলে—কী ব্যাপার?

মলো ছাই! এখানে আসুন। দেখে যান।

প্রিয়নাথ নিচে নামে। মৃগাঙ্ক ও সত্যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঁদিকে নদীর ওপর আধখানা চাঁদ সবে উঠেছে। ঘন কুয়াসা জমে আছে দূরে। প্রিয়নাথ বলে—কই ভূত?

মৃগাঙ্ক দেখায়।—ওই শ্মশানের দিকটা দেখুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?

কী?

আলোর চালচিত্তির! আমাদের দেশের ভূতগুলোর কী আইডিয়া! ভাবা যায় না।

প্রিয়নাথ এতক্ষণে দেখতে পায়। তার মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে একটা বিদ্যুৎ—তারপর বুক থেকে নেমে পা অব্দি ছড়িয়ে পড়ে। শিরশির করে সারা শরীর। শ্মশানবটের কাছে—হয়তো বাঁধের ওপর কী একটা অর্ধবৃত্তাকার ছোট্ট চালচিত্রের মতো আলোর স্ফুলিঙ্গ এদিক ওদিক আনাগোনা করছে। হঠাৎ সেটা চোখে পড়া কঠিন। কারণ এখনও জোনাকি জ্বলার মরশুম শেষ হয়নি নিসর্গে।

আলোর চালচিত্রটা স্থির হল একটুখানি। তারপর দ্রুত চলতে থাকল দক্ষিণে। কিছুদূর গিয়ে থামল। আবার ফিরল উত্তরে। মিনিট পাঁচেক চুপচাপ তিনজনে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখল।

তারপর সত্যেন বলে—চলি মিগাংদা। খুব দেখা হল ভূতের খেলা।

যাবে? এগিয়ে দেব?

না, না। রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ুন।

সত্যেন টর্চ জ্বালতে জ্বালতে চলে যায়। প্রিয়নাথ বলে—আপনার টর্চটা জ্বালুন না! কী ওটা?

ভূত মশাই, সেণ্টপারসেণ্ট ভূত। কখনও দেখেন নি, ভৈরবের পাড়ে দেখলেন। সারাজীবন গল্প করবেন।

ওটা ভূত নয়।

চলুন না, দেখে আসি।

পাগল হয়েছেন? আমার আর কাজ নেই, দুপুর রাতে ভূতের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে মরি। আসুন, শুয়ে পড়া যাক্।

প্রিয়নাথ গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। মৃগাঙ্ক হাসতে হাসতে ওকে ফের ডাকলেও নড়ে না। তখন মৃগাঙ্ক বলে—মজা দেখবেন? ভূতটাকে ভয় পাইয়ে দেব?

সে দ্রুত ঘরে যায় এবং বন্দুক নিয়ে আসে। প্রিয়নাথ কিছু বলাব আগেই সেদিকে নল তুলে গুলি ছোড়ে। প্রচণ্ড আওয়াজে রাতের কুয়াসা জ্যোৎস্না ও স্তব্ধতা ভাঙচুর হয় কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর আর আলোটা দেখা যায় না। অনেক খুঁজেও কিছু দেখতে পায় না প্রিয়নাথ।

খামারবাড়ির লোকেরা অবশ্য নির্বিবাদে ঘুমোতে থাকে। ফসল-চোরদের সতর্ক করতে প্রায় রাতে মৃগাঙ্ক বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে। কালু খাঁর দিয়াড় এতে অভ্যস্ত। প্রিয়নাথও।

মৃগাঙ্ক বন্দুক নামিয়ে চাপা গলায় বলে—দেখলেন তো? ভূতও ভয় পেতে জানে।

এতক্ষণ ধরে যে সংশয় খোঁচা দিচ্ছিল প্রিয়নাথকে, এবার তা তীব্রভাবে নাড়া দেয়। সে বলে—মৃগাঙ্কবাবু! ব্যাপারটা কী, বুঝেছি মনে হচ্ছে।

বুঝেছেন তাহলে?

হুঁউ।

খুব দেরি হল বুঝতে।

কিন্তু ও কেন এসব করে?

মৃগাঙ্ক তার হাত ধরে টানে।—আসুন, ভীষণ শিশির পড়ছে। তারপর ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে বলে—কেন করে, তা বলা মুসকিল। হয়তো আমাকে ভয় দেখাতে চায়, কিংবা নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে মজা পায়। পার্ভার্সান এক ধরনের। হয়তো সেক্সুয়াল পার্ভার্সান।

এর আগে কখনও দেখেছেন ?

হ্যাঁ। অনেক বার। আরও অনেকে দেখেছে। তারা অবশ্য ভূতপ্রেত বলেই মনে করে।

হালদারমশাই কী বলে ?

সেটা কাল ওকে জিজ্ঞেস করবেন। ও একবার ধরিত্রীঠাকরানকে ধরে ফেলেছিল নাকি। ওই শ্মশানের ওখানটাতেই।

আলোটা কিসের ?

বুঝলেন না ? স্রেফ জোনাকি ! একগাদা জোনাকি ধরেছে। একটা মুকুটের গড়ন হাল্কা শোলাটোলা দিয়ে ফ্রেম বানিয়েছে। তাতে আঠা দিয়েছে। তারপর জোনাকি গুলি বসিয়ে দিয়েছে সার সার। এবার ওই আলোর মুকুট মাথায় পরে মাঠেঘাটে বেরিয়ে পড়লেই দারুণ একটা অলৌকিক ব্যাপার হয়। যতঃসব ! শুয়ে পড়ুন।

প্রিয়নাথ শুয়ে আস্তে বলে—এসময় ও সুস্থ বা স্বাভাবিক থাকে কী না, কে জানে ! হাতেনাতে তো ধরেন নি কখনও। ধরেছেন ?

না। ধরতে পারিনি। আমি এগোলেই লুকিয়ে পড়ে কীভাবে টের পায়, এটাই আশ্চর্য। মাগীর আরেকটা ইলেকট্রনিক চোখ আছে যেন। অন্ধকারেও দেখতে পায়। আর সুস্থ বা স্বাভাবিক থাকে কি না বলছেন—আমার তো মনে হয় ও সজ্ঞানে ডেলিবারেটলি ওসব করে।

আচ্ছা মৃগাঙ্কবাবু, এমনতো হতে পারে যে ওটা ওর কোন অনুষ্ঠান ? কোনরকম আচারও হতে পারে ?

ভুট্, ভুট্ ! কিসের আচার মশাই ? আমের—না, কুলের ?

না, বিজয়েন্দুবাবু উইচ-কাল্ট বলে একটা কথা বলছিলেন সেদিন।

মাস্টারের কথা ধরবেন না। ও একটা পাগল, পাগল।

মৃগাঙ্কবাবু !

উঁ ? শুতে শুতে জবাব দেয় মৃগাঙ্ক। চোখ বোজে। পা দোলায়।

এমন তো হতে পারে, যা করছে, ও টের পায় না—অবসেসানে থাকে।

আপনাকে খেয়েছে মেয়েটা। ঘুমোন। শরীর ভালো থাকলে সকাল সকাল উঠবেন। একবার মই-ফই দিয়ে গমটা ছড়াতে হবে। ক্যালিফোর্ণিয়ার সীড বলে তো দিলে। জাগও ধরেছে ভালো। সামার কাল্টের গম। আপনাদের উইচ কাল্ট, আর আমার সামার কাল্ট। বাই দা বাই···হঠাৎ মৃগাঙ্ক কনুই ভর করে মাথা তোলে।—প্রিয়বাবু, গমের ব্যাপারে বর্ধমানে কী এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন—শুনেছি। আমি কি আপনার শত্তুর মশাই ?

হ্যাঁ। মাথায় আছে।

মাথা থেকে নামাবেন তো ? কালই আমাকে একটা লিস্ট্‌টিস্ট্ বা স্কিম করে দিন। কলকাতা যাব ভাবছি শিগগির—তখন সব এনে ফেলবো। গোডাউনের লাগোয়া

একটা শেড করে দেব। ওখানে আপনি এ সব কাজ করবেন। ব্লকওয়ালাদের মগজে ঘুণ ধরিয়ে দেব শালা!
দেব।
আর ও মশাই, পোল্ট্রির স্কিম কী হল? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। ব্যাঙ্ককে আগেভাগে বলেকয়ে রাখতে হবে তো!
দেব।
প্রিয়বাবু!
উঁ?
আপনি কেমন যেন মিইয়ে পড়েছেন। যখন এলেন, টগবগে তেজী ছেলে—ভাবলাম, আর আমাকে পায় কে। শালা, এয়ার কনডিশনড ঘরে বসে সবুজ বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা আর মাঠের মাটিতে নাক ঠেকিয়ে সবুজ বিপ্লবের গন্ধ শুঁকে শুঁকে মা বসুমতীর ভাঁড়ার ঘরে ঢোকা অন্য জিনিস। আমি লাস্ট 'একজিবিসানে তো বলে এসেছিলাম ওদের, যাবেন ভৈরবের পাড়ে—চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে! তা গতিক বড় ভালো ঠেকছে না প্রিয়বাবু। কী হয়েছে আপনার, বলুন তো? থাকতে চান না এখানে? ভালো লাগে না?
প্রিয়নাথ ব্যস্ত হয়ে বলে—না, না।
দেখুন প্রিয়বাবু, আমার ভগ্নীপতি পণ্ডিত মানুষ—ঠাট্টা করে বলে, আমি জোতদার—আমার ক্ষেতে ভালো ফসল হলে এলাকার গরীবদের কী আসে যায়? আমি কিন্তু ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনে, সমাজ-পৃথিবী-দেশ গোল্লায় গেলেও আমার মাথাব্যথা নেই। অন্য দিকে—আমি মানি-মেকারও নই। মুনাফাবাজ নই। আমি বেশি টাকা নিয়ে কী করব? বড়লোক হবার জন্যে আমি ফার্ম খুলি নি। লোকসানে লোকসানে তো ফতুর হয়ে গেলাম মশাই! মেকানাইজড চাষে এক পয়সা পড়তা হয় না, আমি ছাড়া হাড়ে হাড়ে কে বুঝেছে বলুন? ইনডিভিজুয়াল ফার্মে তো লাভ হবেই না এদেশে। ডুলির কড়ি যোগাতে বউ বিকিয়ে যাবে। তবু আমি তাই করছি। কেন করছি? এ আমার নেশা বলুন—নেশা। জেদ বলুন—জেদ। এই নিয়ে আমি আছি, থাকতে ভালবাসি—এই হল আমার কথা। আমি খুব প্রিমিটিভ মানুষ প্রিয়বাবু। মাঠঘাট বনবাদাড় চাষবাস ফসল নিয়ে আমার জগত। এর বাইরে কোথাও গেলে আমি দম ফেটে মরে যাব। খুব ছেলেবেলা থেকে এই পরিবেশ আমার ভালো লেগে গেছে। এর মধ্যে জন্মেছি, এর মধ্যেই মরতে চাই। যখন মরব, ফসলের ক্ষেত থেকে আমার মড়া তুলে নিয়ে ভৈরবের জলে ফেলে দেবেন।
প্রিয়নাথ চোখ বুজে শোনে। মৃগাঙ্ক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।
আপনাকে পেয়ে আমি কী যে সাহস অনুভব করছি, বোঝাতে পারব না। আমি মানুষ চিনি। শালা, দুনিয়া ভরে গেছে যত সব বাটপাড় জোচ্চোর মানিমেকারে। টাকার জন্যে টাকা! তার জন্যে কসাই হও। আমি সব শালাকে ঘেন্না করি।

আমি—বুঝলেন প্রিয়বাবু, শেকলবাঁধা বাঁদরদের মধ্যে আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম। রিয়েলি! কেউ আগুপিছু ধরার নেই—স্বাধীন, যেখানে খুশি ঝাঁপ দিতে পারে বিনি প্রফিটে। অতএব এই আমার নিজের মানুষ—আমার রাইটহ্যাণ্ড। দুই ভাই মিলে শালা ভৈরবের পাড়ে সবুজ পতাকা উড়িয়ে বসে থাকব—ব্যোম ভোলা! খাবদাব, শিকার করব, হাঁটু দুমড়ে কাদায় নামব—থোড়াই কেয়ার দুনিয়াটাকে। যে-যেখানে পারিস তোরা ধস্তাধস্তি মারামারি কর, জাহান্নামে যা—আমরা দু ভাই এখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মজা দেখছি। তাই তো?

ব্রিলিয়াণ্ট! প্রিয়নাথ আস্তে বলে।

আমি কি ভুল বলছি?

না।

এক চুমুক খাবেন?

প্রিয়নাথ চোখ খুলে বলে—নাঃ, থাক।

তাহলে আমি খাই!··· বলে মৃগাঙ্ক হাত বাড়িয়ে দেয় তক্তাপোষের তলায়। একটা বোতল বের করে চিত হয়। ঢকঢক করে কিছুটা খেয়ে বোতলটার ছিপি আঁটে। বুকে বসিয়ে রাখে।

মৃগাঙ্কদা!

তাও ভালো। এ্যাদ্দিনে দাদা বললেন! হাতে হাত দিন।··· হাত বাড়ায় মৃগাঙ্ক

প্রিয়নাথ হাতটা কিছুক্ষণ ধরে থেকে বলে—আপনার যা কথা, আমারও তাই। জীবনে খুব ছেলেবেলা থেকে যে তেঁতো অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, মানুষকে আমারও খুব বিশ্বাসযোগ্য প্রাণী মনে হয় না। তবে কী—পৃথিবীটা তো এভাবেই চলছে চলবে।

নাঃ, ওই দুঃখুদুঃখু ঢঙটি আমার বরদাস্ত হয় না। কিসেব দুঃখ?

মৃগাঙ্কদা, আপনি কখনও প্রেম করেন নি?

ভ্যাট, ভ্যাট! ও তো শালা মাগীমুখোদের কারবার। বেড়ালেব কলজে যাদের।

আপনার সেক্সইনষ্টিংকট তো আছে।

আলবাৎ আছে। আমি কি পুরুষ নই?

তাহলে?

মাইরি, বিলিভ মি। দেখিয়ে নিয়ে আসব—শিমুলিয়ায় আছে। নাখু ওঝার মেয়ে। সাত আটটা স্বামীর ঘর করেছে। বেশি খায় বলে লোকেরা ওকে ডিভোর্স করে। খাবে না? স্বাস্থ্য ভালো, একা তিনজনের আহার তো গিলবেই। লোকে বলে, নাখু ওষুধ খাইয়ে মেয়ের পেটটা নষ্ট করছে। উদ্দেশ্য? না—যতবার বিয়ে দেবে, কনে পণ পাবে। ওদের আবার কনে পণের কারবার কিনা। এদিকে ছেলেপুলে না হলেই মঙ্গল।

নাখু টের পায় না?

কী? আমার ব্যাপার? ও শালা ভাগাড়ের শকুন। মাঝে মাঝে দু এক বস্তা ধান-খন্দ দিই। মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। এ তো কোন লুকোছাপার ঘটনা নয়। এলাকার সবাই জানে।

আপনার দেখছি, সবই প্রিমিটিভ কারবার।

নিশ্চয়। তবে ব্রাদার, তুমিও লাইনে এসেছ। ভালো—আই কনগ্রাচুলেট। কিন্তু বিষাক্ত বুনো ফলে হাত বাড়িয়েছ। দেখতে সুন্দর, কিন্তু কোয়ায় কোয়ায় বিষপোকা গিজগিজ করছে।

কেন? ঘুম আসছিল প্রিয়নাথের। জড়ানো স্বরে প্রশ্নটা করে সে।

একরাতে কিছু টের পেয়েছ নিশ্চয়। পাও নি?

নাঃ!

ব্রাদার!

উঁ?

কাজকম্ম কিছু কি হয়েছিল সে রাতে? নাকি খামোকা হয়রানি হল?

কিচ্ছু না।…প্রিয়নাথ সুখী প্রেমিকের গলায় মিটিমিটি হেসে জবাব দেয়।

বেঁচে গেছো। ব্লাডটা একবার চেক করিয়ে এসো কাল বহরমপুরে।…মৃগাঙ্ক ফের খানিকটা গেলে। তারপর ছিপি এঁটে তক্তাপোষের তলায় চালান করে দেয়। চোখ বুজে পা দোলায়।

কতক্ষণ পরে প্রিয়নাথ ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে শোনে, মৃগাঙ্ক কী সব বিড়বিড় করছে। কাকে গাল দিচ্ছে। মাতাল হয়ে গেছে নির্ঘাৎ।…

কয়েকটা দিন চৈতালি খন্দ বোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকল প্রিয়নাথ। মৃগাঙ্কও গায়ে ঘাম নিয়ে সমান খেটেছে। মাঝে মাঝে ট্রাকটারে বসে বিকেলের দিকে প্রিয়নাথ দেখেছে, বিজয়েন্দু শ্মশানের দিকে যাচ্ছে। ফার্মে আসে না আর। স্বাধীনেরও খবর নেই। কুসুমেরও না। গগন এসে দূরে দাঁড়িয়ে জাল বুনতে বুনতে চাষবাস দেখে। খামারে ফিরলে কিছু রাত অব্দি গল্প গুজব করে বাড়ি ফেরে গগন। সত্যেন আসে। দাবায় বসে মৃগাঙ্কের সঙ্গে। প্রিয়নাথ চুপচাপ শুয়ে থাকে।

একটা ল্যাবরেটরি না বানিয়ে মৃগাঙ্ক থামবে না। যা একবার মাথায় ঢোকে, তার করা চাই। প্রিয়নাথকে নিয়ে একদিন কলকাতা যায় সে। পরদিন ফেরে জিনিস পত্র কিছু রেলে বুক করে দিয়ে।

সেই সন্ধ্যায় প্রিয়নাথ দেখল, গগন হালদার নবীনের সঙ্গে গল্প করছে। তাকে দেখে গগন এগিয়ে আসে।—কোথায় গিয়েছিলেন নতুনবাবু?

তারপর, খবর কী? প্রিয়নাথ এমনি কথার কথা বলে একটা।—কলকাতা গিয়েছিলুম।

গগন চাপা গলায় বলে—কুসমি আপনার খোঁজ করছিল।

তাই নাকি?

হুঁ বিশেষ দরকার বলছিল। খুলে কিছু বলল না।
আমার সঙ্গে কী দরকার ?
আছে হয়তো কিছু। সময় মতো একবার দেখা করবেন। এখানে তো আসতে পারবে না।
আমার সময় হবে না, বলবেন।
গগন একটু দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। তারপর বলে—আমাকে বলতে বলেছিল, বললাম। এখন আপনার ইচ্ছে। তবে কী—মেয়েটাকে কেউ বুঝতে পারল না। ওর কপাল !
গগন চলে যায়। মৃগাঙ্ক মুখ তোলে প্রিয়নাথকে দেখে।—কী বলছিল হালদারব মশাই ?
কিছু না।
সে রাতে আর ঘুম আসে না প্রিয়নাথের। শ্মশানের দিকে কারা মড়া পোড়াচ্ছে। হরিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। একবার ভাবল, কুসুমের বাড়ি যাবে—টানটা তীব্র হচ্ছিল, পরে আলস্য এল। মৃগাঙ্ক অবশ্য অঘোরে ঘুমোচ্ছে মশারির মধ্যে।
প্রিয়নাথ শিশিরে দাঁড়িয়ে রইল। শিগগির শীত এসে যাবে মনে হচ্ছে! কুয়াসা বেড়েছে। অন্ধকার রাত চলেছে এখন। হয়তো আজ কিংবা কাল অমাবস্যা। শেয়াল ডাকল কিছুক্ষণ। পেঁচাও ডাকল দু'চারবার। নবীন শুতে যাবার আগে ল্যাট্রিন থেকে ফেরার সময় বলে যায়—উঠে আসুন স্যার, খুব হিম পড়ছে।
প্রিয়নাথ শ্মশানের দিকে তাকিয়ে ছিল।
হঠাৎ একটা কিছু চোখে পড়ে তার। সে রাতের মতো একটা ছোট্ট আলোর চালি কিংবা ওই রকম কিছু—যা নড়াচড়া করছে।
কাঠের বেড়ার কাছে গিয়ে সে দেখতে পায়, আলোটা ফার্মের দিকেই আসছে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়। মৃগাঙ্ক ঠিকই বলেছিল। জোনাকি গাঁথা রয়েছে বড়ো মুকুটের ফ্রেমে। প্রিয়নাথ দাঁতে দাঁত চেপে দেখতে থাকে।
বেশ কিছুটা কাছে এসে আলো দাঁড়ায়। অন্তত তিন চার মিনিট। তারপর ফের এগোয়। তখন প্রিয়নাথ বেড়ায় ওঠে। ওপাশে খাল আর ঝোপঝাড়ে ভরা জমি খানিকটা। খালটা পরিখাবিশেষ। ফার্মে ভৈরব থেকে জলও আনা হয়। এক কোমর জল থাকা স্বাভাবিক। তবে ডাইনে দক্ষিণে জমি ঘুরে গেলে একটা ছোট্ট গেট মতো আছে। ওখানে একটা কাঠের তক্তা পাতা রয়েছে। ওই পথে বাঁধে বা শ্মশানের দিকে যাওয়া যায়।
কিন্তু ঝোঁকের বশে খালেই নামল প্রিয়নাথ। প্যান্ট উরু অব্দি ভিজল। সাবধানে পেরিয়ে পাড়ে ভর দিয়ে ওপারে উঠল। ঝোপের ওপাশে সেই অলৌকিক তখনও স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে মনে প্রিয়নাথ বলে—কী, টের পাচ্ছ না কিছু ? আমি এত কাছে চলে এসেছি, তাও বুঝতে পারছ না ?

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতেই সে দেখে, অলৌকিক দ্রুত সরে যাচ্ছে। তখন উঠে দাঁড়ায় প্রিয়নাথ। দৌড়ে তাকে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু আর দেখতে পায় না। বাঁধে গিয়ে চারপাশে খোঁজে। আশ্চর্য তো! এবার প্রিয়নাথ একটু ভয় পায়। মৃগাঙ্ক যা বলেছিল, তা কি সত্যি? মৃগাঙ্ক নিশ্চয় ভুল বলেছে। সে গোঁয়ার—কিছু বিশ্বাস করে না।

গতকাল শ্মশানে মড়া পোড়ান হয়েছে। কে জানে, আজ রাতটা অমাবস্যার কিনা। ভূতের ভয়ে সত্যি আচ্ছন্ন হয় সে।

কিন্তু না—ফের সেই আলোটা দেখা যাচ্ছে। নদীর একেবারে ধারে চলেছে। প্রিয়নাথ নিশি পাওয়া মানুষের মতো দৌড়ে যায়। তারপর চাপা গলায় ডাকে—কুসুম, কুসুম!

অলৌকিক থামে না। সেই দূর্বাঘাসে ঢাকা চটান পেরিয়ে দক্ষিণে বাঁকের দিকে এগোয়। প্রিয়নাথ বাঁধ থেকে নামে। আছাড় খায় মাঝে মাঝে, হাঁচড় পাঁচড় করে ওঠে, তারপর দৌড়ায়। কিন্তু আশ্চর্য, নাগাল পায় না। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে সে। সবটাই চোখের ভুল নয় তো?

আলোটা থেমেছে। যেন তাকে যেতে বলছে। প্রিয়নাথ ফের দৌড়ে যায়।—কুসুম কুসুম!

আলো স্থির। একেবারে কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় প্রিয়নাথ। অমনি জলে ঝাঁপ দেবার শব্দ হয়। অন্ধকার জলে আলোর চালিটা ডুবে যায়। ফের ভেসে ওঠে।

রাগে দুঃখে প্রিয়নাথ ছটফট করে। এখানটার দহ। বারোমাস গভীর জল থাকে নাকি। ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক্ষুনি। বুজরুকি ভেঙ্গে দেয় মেয়েটাব। এসবের মানে কী? ওই আলোর মুকুটপরা, ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপ!

সে ফের ডাকে—কুসুম, কুসুম!

স্রোতে একটাকিছু ধস্তাধস্তি করছে, টের পাওয়া যায়। নক্ষত্রের আলো তিরতির করে কাঁপছে। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কালো কিছু নড়ে উঠছে। কিন্তু তার বেশি কিছু বোঝা যায় না।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ একটা আতঙ্ক প্রিয়নাথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে সে? মানুষ নয়—নিশ্চয়ই মানুষ নয়। ভৈরবের পাড়ে এক অন্ধকার রাতে দাঁড়িয়ে জীবজগতের পুরানো—অনেক পিছনের একটা আদিম সত্বার সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজ নয় তার পক্ষে। সে-ভাষা তার জানা নেই। সে নতুন পৃথিবীর বাসিন্দা। পুরানো পৃথিবীতে পা বাড়ানোই তার ভুল হচ্ছে। যেকোন মুহূর্তে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতে পারে ওরা।

আচমকা প্রচণ্ড ভয় আর দুঃখ নিয়ে প্রিয়নাথ দৌড়ে পালিয়ে যায়। তার সারা শরীরে কাঁপুনি থামে না। আছাড় খেতে খেতে সে প্রাণ হাতে করে পালাতে থাকে…

মৃগাঙ্ককে ঘটনাটা বলেনি প্রিয়নাথ। কিন্তু মাথার ভিতর কুরে কুরে মগজ খেতে থাকে কী একটা বিষপোকা। একদিন ঘাটের মাচায় দুপুরবেলা গগনের সঙ্গে দেখা হয় তার। গগন জাল বুনছিল অভ্যাস মতো। ঘাটটা তখন প্রায় নির্জন বলা যায়। গগন তাকে দেখে একটু হাসে।—কী বাবা, আর দেখিনা যে আজকাল? খুব চৈতেলি করা হচ্ছে বুঝি?

প্রিয়নাথ পা ঝুলিয়ে বসে।—কী জাল এগুলো?

বেসাল। দেখেন নি? দুদিকে দুখানা বাঁকা হালকা বাঁশ, মধ্যিখানে জাল?

দেখেছি।

এ আমার নেশা। মরার সময় হাতে দেখবেন সুতোর তকলি ধরা আছে।

হালদার মশায়ের বাড়িতে তো এ পাট নেই। তবে জাল বুনে কী হয়?

গগন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—হুঁ, অভ্যাস। তবে বেচি—যা দুপয়সা হয়।

তোমার আবার পয়সার অভাব হালদার মশাই? ছেলেরা চাকরী-বাকরী করছে!

আমি ছেলেদের পয়সা নিইনে। আপনাব মিগাংবাবু জানে—শুধোবেন। থাকি সাবেক পাটকাঠির ঘবে। সত্যেন্দ্রবা ইটের একতালা বানিয়েছে। মহেন্দ্র তো দুর্গাপুরে থাকে। সত্যেন বউ ছেলেপুলে নিয়ে দালানে থাকে। আমি নিজের জায়গায়। হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাই।

প্রিয়নাথ অবাক হয়।—সে কী! তাহলে বলব—বউমার সঙ্গে শ্বশুরের ভাবটাব নেই।

গগন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে।···নাঃ। কথাটা তা নয়। সত্যেন্দ্র খুব সাধাসাধি করে। আমি বাবা পারিনে। চিরকাল যা খেয়েছি, তা ছাড়া ভালো খাবার পরার দ্রব্য আমার সয়না। আমি তো জলের জীব, ডাঙার নই। জল আমাকে টানে। তাই এখানটায় এসে তাকিয়ে বসে থাকি।

তাহলে নৌকোয় থাকলেই তো ভালো হত হালদারমশাই!

সে আর বলতে? সারাজীবন প্রায় নৌকাতেই কেটেছে। তখন তো পুবপাড়ে বাঁধটাধ ছিল না। বেবাক ছিল জলা আর জঙ্গল। মনের সুখে রাজত্ব করেছি বাবা!···দীর্ঘশ্বাস ফেলে গগন।—তবে কী, লোভ মানুষকে খেলে। আর মানুষও ক্রমে ক্রমে বেশি জন্মাতে লাগল। এরপর কী হবে, ভেবে ভয় পাই! আমি বুঝিনে গো, সত্যি বুঝিনে—মানুষের এত বুদ্ধিই বা ক্যানে, ক্যানেই বা এত লটবহর! এত সব মোটরগাড়ি বিদ্যেবুদ্ধি—হুঁ! কিসে লাগে?

হঠাৎ প্রিয়নাথ বলে—আচ্ছা হালদার মশাই, তুমি তো ডাইনীর কারবার অনেক

দেখেছ। মাথায় জোনাকির টোপরপরা কাকেও দেখেছ ?

হ্‌ঁউ। ধরিত্তি পরত। অমাবস্যার কদিন আগে থেকে ওদের একটা ব্রত-ব্রত আছে। অমাবস্যার রাতে তা শেষ হত তখন ওরা চানটান করে চুল এলিয়ে উলঙ্গ শরীরে বাড়ি ফিরত। কপালে সিঁদ্‌রের ফোঁটা দিত মস্তো। অনেক দেখেছি। এসময় ধরিত্তির কুচুটে ভাবটা থাকত না। আহা, মাটির মান্‌ষ তখন। যে যা চায়, দিতে দেরী করবে না।

তার মানে ?

মানে ?…গগন ম্‌খ নামিয়ে বলতে থাকে।—সে একটা গ্‌হ্যকথাও বটে। ধরিত্তি বলত। অমাবস্যার নিশিপালনে ওদের পরপ্‌র্‌ষের সঙ্গ করতেই হবে। না হলে ভষ্টো (ভ্রষ্ট) হবে। তাই মনের মতো প্‌র্‌ষটিকে ডাক দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বলবেন—পাবে কোথায় অত রাত্তিরে ? তাই না ?

হ্যাঁ।

পায়। পেয়ে যায়। যাকে পছন্দ থাকে, তার বাড়ির আনাচে-কানাচে গিয়ে আলোর মট্‌ক পরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কিছ্‌ একটা হয়—আজও বলতে পারব না, বশীকরণের টান না কী মন্তর-তন্তরের কাজ, প্‌র্‌ষটি স্‌ড়স্‌ড় করে চলে আসে। ঘোর লাগে চোখে। নিশির ডাক, নতুনবাব্‌।

নিজে দেখেছ, নাকি সব শোনা কথা বলছ ?

গগন রহস্যময় হেসে ভুর্‌ কুঁচকে তাকায় তার দিকে। তারপর বলে—আমার নিজের কাণ্ড শ্‌নতে চান ?

নিশ্চয় !

হ্‌ই দহে নৌকো বেঁধে আছি। ফি'রেতে দেখি এদিক ওদিক আলোর মট্‌ক মাঠে নেচে বেড়াচ্ছে। সেরাতটা ছিল অমাবস্যার—জানতাম না। নৌকোর খ্‌ব কাছে এল যখন, লাফ দিয়ে ডাঙায় নামলাম। দেখি তো মাগীর দৌড় !

ধরিত্তি তা জানতে পেরেছিল ?

গগন রাতবিরেতের মান্‌ষ, বাবা। আজ-না হয় চোখের সেই আগ্‌ন নিভে রাত কানা হয়েছে।

তারপর ?

কিছ্‌দ্‌র দৌড়ে জলে ঝাঁপ দিল। আমিও দিলাম। ধরলাম। দেখি, শালীবেটি উলঙ্গ একেবারে।

তারপর, তারপর ?

বললাম, ডাঙায় ওঠ। ও যাবে না। বলে—জলেই। মাটি ছোঁবে না—ওই অবস্থাতেই ধরিত্তি প্‌র্‌ষকে ভোগ করবে। ওই নাকি নিয়ম।

ব্রিলিয়াণ্ট ! তারপর ?

হল। তারপর হঠাৎ দেখি, ধরিত্তি অন্যম্‌র্তি। পিশাচী একেবারে। আমার

গলা টিপে ডুবিয়ে মারতে চেণ্টা করল। প্রথমে ভেবেছিলাম, খেলা—পরে বুঝলাম, না, অন্য সাংঘাতিক মতলব মাগীর মাথায়। ভয়ে শিউরে উঠলাম। কিন্তু তখন আমি যোয়ান মানুষ, গায়ে আটন'টা হাতির জোর ছিল। বেকায়দা দেখে ও স্রোতে ভেসে পালাল। আমি হাঁফাতে হাঁফাতে পাড়ে উঠলাম। অন্য কেউ হলে ঠিক মেরে ফেলত ধরিত্তি।

কেন, কেন ?

সেটা আজও সমিস্যে, নতুনবাবু। বলতে পারব না ক্যানে।

প্রিয়নাথের হৃদপিণ্ডে খিল ধরে গেল যেন। গলা শুকিয়ে গেল। সেরাতে কুসুম কি তাহলে তাকে ভোগ করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল ?

পরে কথাটা একশোবার শুধিয়েছি ওকে। বলেছে—ছি, ছি! ও কী কথা! পায়ে হাত দিয়ে কেঁদেও ফেলেছে। আসলে—হয়তো তখন মানুষ থাকে না ওরা। জানতেও পারে না যে কী ভালমন্দ করছে!

অবসেসন? প্রিয়নাথের মনে পড়ে বিজয়েন্দুর কথা। 'অবসেসন' 'নিজ্ঞান মনে হত্যার বাসনা', এইসব কী আলোচনা করছিল একদিন ওই শ্মশানের ধারে। কিছু কান করেছিল—কিছু করেনি প্রিয়নাথ। কিন্তু সেক্সের সঙ্গে হত্যার কী সম্পর্ক ? সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

নতুনবাবু, কী ভাবছেন ?

ভাবছি, তাহলে ধরিত্রী তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল ?

তাছাড়া কী ?

পারল না বলে নিশ্চয় ভ্রষ্ট হল ? ডাকিনীবিদ্যা কী বলে ?

গগন হাসে আবার।—ধরিত্তি তো ডাকিনীকুলে ভষ্টো মেয়ে ছিল! ও না হল খাঁটি ডাকিনী হতে—না পারল মানুষ হতে! ওর মধ্যে মানুষের লোভটাই ওজনে বেশি ছিল। তাই শেষ অব্দি ডাকাতদলের সর্দারনী হল। কিন্তু কোথায় সোনাদানা ? এক পয়সাও তো রেখে যায় নি! কুসুম মেঝে খুঁড়েছিল—মাটিতে কিছু পোঁতা আছে নাকি দেখতে। বেচারী একটা কানাকড়িও পায় নি। আমার ধারণা, ধরিত্তি ডাকাতদের শুধু খোঁজখবরই যোগাত। বুঝলেন? হিস্যে হয়তো পেত সামান্য কিছু। পোড়া পেট মানুষের। ওকে ঠকিয়ে ভূট করেছে ডাকাতব্যাটারা!

কুসুম আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, বলেছিলে। কেন? আর দেখা হয়নি ওর সঙ্গে ?

হয়েছে।

বলেছিলে, আমি দেখা করতে চাইনি ?

হঁউ।

তখন কী বলল ?

হাসল!

হাসল ?

হুঁউ। তারপর চলে গেল। ওর ছাগলটার অসুখ হয়েছে। বাঁচবে না।

হালদার মশাই, ডাকিনীরা—মানে ধরিত্রী, গায়ে এত জোর পায় কোথায় যে পুরুষ মানুষকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে ?

গগন একটু ভেবে বলে—সেটা সমিস্যে। তবে দেখেছি, ভূতে ধরা রোগা লিকলিকে মেয়ে দাঁতে জলভরা পেতলের কলসী কামড়ে দৌড়ে যায়। মলিন্দ মণ্ডলের বউকে একবার ভূতে ধরল। শিমুলিয়ার নাথু ওঝাকে ডাকা হল। ওদের বাড়ির সামনে পাড়বাঁধানো কুয়ো আছে। ভূতটা ছেড়ে যাবার সময় নাথু হুকুম দিলে—কুয়ো পেরিয়ে যা! বউটা অমনি একলাফে কুয়ো পেরিয়ে গেল। সবাই দেখেছে। কোত্থেকে অত জোর আসে গায়ে বলতে পারব না। ভূতের ব্যারাম উঠলে চার পাঁচ জন বলবান পুরুষ আটকে রাখতে পারে না রুগীকে। এও কত দেখেছি।

প্রিয়নাথের মনে পড়ে যায়, তার বাবার চিকিৎসার কথা। হিস্টিরিয়ার কথা। বাবা বলতেন—হিস্টিরিয়া নীলবর্ণা সুন্দরী, সরল ছিমছাম হিলহিলে গড়ন, পাতলা ঠোঁট। ইগ্নেশিয়া প্রথম আক্রমণের মোক্ষম ওষুধ। ইগ্নেশিয়া মাত্র ছয় শক্তির। বাবা চড়া ডায়ালুসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে চোখের তারা বড়ো, ভুল বকছে, এসব লক্ষণে বেলেডোনা-৬ কাজ দেয় অব্যর্থ। বেলেডোনা আবার হ্যালুসিনেসন দিতে ওস্তাদ। প্রাচীনকালে মিশরের পুরুতরা গায়ে বেলেডোনা মাখিয়ে দিলে লোকে মেঘরাজ্য পেরিয়ে স্বর্গ দেখতে পেত। আজকাল এল এস ডি তাই করে নাকি! ভাং গাঁজা আফিম চরসও ওই জিনিস। মধ্যপ্রাচ্যের হেকিমরা একরকম সুর্মা চোখে পরালে লোকে বাঁদরকে দৈত্যের মতো বিশাল দেখতে পেত।··

ছেলেবেলায় শোনা কথা বরাবর মনে থাকে। বিজয়েন্দুর সঙ্গে এসব নিয়ে আলাচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে যেতেও ইচ্ছে করে না আর। ওরা স্বামীস্ত্রী দুজনেই হঠাৎ কেন যেন এড়িয়ে চলছে প্রিয়নাথকে। কুসুম বলেছিল গন্ধপোকার গন্ধ আর কুচট পোকার কু'য়ের কথা। অবিশ্বাস্যভাবে সেই কারবার! কিন্তু স্বাধীন তাহলে কেন এড়িয়ে থাকবে ?

গগন কথকের ঢঙে বলে ওঠে—এ হল ভূতিনী-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীর দেশ, নতুন বাবু। এই নদীটা দেখছেন, ভৈরব। বাবা ভৈরব। মা গঙ্গা ওখানে শুলেন উত্তর শিয়রে, তো বাবাও এসে একটু ফারাকে মজা করে উত্তর শিয়রে শুয়ে পড়লেন। বাবার সাঙ্গপাঙ্গ—ওইসব ভূতিনী ডাকিনী যোগিনী বাবার সঙ্গে এসে জুটল। বাবা এলেন, ওরা না এসে পারে ? আপনি ভৈরবের যন্দুর যাবেন, ওঝা তন্তরমন্তর ডাক-ডাকিনীর বাসা দেখবেন দুই পাড়ে। তবে কী, আজকাল উচটান হয়ে গেল। লোকে মানে না, বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসই তো মূল কথা! বিশ্বাস পালালে সব ছেড়ে পালায় মানুষকে। মানুষ তখন শূন্যি গোয়ালে লেজকাটা এঁড়ে হয়ে গাঁক গাঁক করে।

তুমিও তো বিশ্বাস কর না কিছু, হালদার মশাই !

আগে ভৈরবের ওপারে বিলখালজঙ্গলে বিস্তর আগুনের খেলা দেখতাম নিশিরেতে। হাউই উড়ত। আগুনের ডেলা ঘুরে বেড়াত। লোকে বলত, ভূলো। মুসলমানরা বলত, জিনের রাজার বিয়েসাদি হচ্ছে। আজকাল কিছু দেখি না। বুনো জন্তুজানোয়ারও কোথায় পালাল কে জানে! বাঘগুলো আর ডাকতেও শুনিনে। আগে সাঁঝ সকালে ওপারে আমলাবাগের দিকে বাঘ ডাকত। আর কিছু রইল না নতুনবাবু। মানুষ শ্মশানে বাস করেছে। ন্যাড়া হয়ে গেল ভগবানের রাজত্বটা। আমি কিন্তু কিছু বুঝি না—ক্যানে এত সব, ক্যানে ?

গগন চুপ করে যায়। প্রিয়নাথ ওর ঘোলাটে চোখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে, গগন জেলের চোখের সামনে ছত্রখান মায়া-জগতটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে, ধ্বংসাবশের মধ্যে ও খুঁজছে কাকেও—ধরিত্রীকেই হয়তো।

প্রিয়নাথ একটু পরে বলে—কুসুমের সঙ্গে আমি দেখা করব, হালদারমশাই।

উঁ? ক্যানে ?

দেখা করতে চেয়েছিল, বলছিলে যে ?

ও।

এখন কি বাড়িতে আছে সে ?

গগন মাথা দোলায়। জানে না। তারপর জাল বুনতে শুরু করে সে। গম্ভীর হয়ে গেছে হঠাৎ।

প্রিয়নাথ উঠে পড়ে। ঘাটে পাটবোঝাই নৌকো ভিড়েছে। লোকেরা উদোম ভিজে গায়ে ওপারে পাট কেচেছে সকাল থেকে। হাতে কাঠের বৈঠা। এখন বাড়ি ফিরছে। ঝলসানো মুখ।

প্রিয়নাথ নদীর ধারে ধারে ঝোপজঙ্গলে ঢুকে এগিয়ে যায়। সেরাতের ঘটনাটা ওকে এতক্ষণে খুবই উত্তেজিত করে তোলে। কুসুম কি তাহলে ওদের প্রথামতো উলঙ্গ ছিল? জলে নামতে পারেনি প্রিয়নাথ—সে গগন নয়। এতখানি বন্য আবেগ তার রক্তে নেই। জলে ঝাঁপ দিলে কি কুসুম তাকে আমন্ত্রণ জানাত এবং তারপর মেরে ফেলত? অবিশ্বাস্য লাগে। আবার বিশ্বাস করতেও সাধ যায়। স্বাধীন বলেছে কুসুমকে রেহাই দিন—লোভ দেখাবেন না। কিন্তু লোভ তো কুসুমই দেখাচ্ছে তাকে। পাল্টা নালিশ করে এলে কী হয় স্বাধীনের কাছে ?

সব্জীক্ষেতের বেড়া ঘুরে গাবগাছটার কাছে পৌঁছয় প্রিয়নাথ। দিনদুপুরে গাছটা এবং কুসুমের কুঁড়েঘরের সব রহস্য মুছে গেছে। একটা প্রচলিত দারিদ্র ঘিরে আছে ওখানটা। একটু সঙ্কোচ লাগে।

সেরাতে ঘর বা পরিবেশ স্পষ্ট ছিল না। এখন স্পষ্ট। প্রিয়নাথ কোন মায়া দেখে না সেখানে। ওই পাটকাঠির বেড়ার ঘর—কাদার ছিটে দেওয়া দেয়াল, কোঙাপাতা আর খড়ের চাল, হতশ্রী, তার মধ্যে কুসুম থাকে! একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য এখানে

বনের অন্ধকারে পচে শেষ হয়ে যাবে, নির্জ্জন বাসনার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে ছারখার হবে! চোয়াল আঁটো হয় প্রিয়নাথের। মনে মনে বলে—কার হাতে ধরা আছো কুসুম? তাকে আমি দেখতে চাই মুখোমুখি। তার সঙ্গে লড়তে চাই! আর, সেইসময় ঘর থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে কুসুম এদিকে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ে যায়।

প্রিয়নাথ বেড়ার ওপারে থেকে একটু কেসে বলে—ডেকেছিলে?

কুসুম বেশ দেরি করে জবাব দিতে। সে লঙ্কাঝাড়ের মধ্যে পা ফেলে এগিয়ে আসে ওর দিকে। তারপর একটু হাসে।—আসবেন না বলেছিলেন। কেন এলেন?

কথা আছে।

আমার কথা ছিল, শোনেন নি। আমি কেন শুনব নতুনবাবু?

তুমি আমাকে ভেতরে ডাকছ না, কুসুম!

আপনি কি আর আসবেন ভেতরে? জাত যাবে না? মিগাংবাবু বন্দুক নিয়ে হামলা করতে আসবে না?

না।

একটু চুপ করে থাকার পর কুসুম চাপা হেসে বলে—পারেন তো বেড়া টপকে আসুন! সদরদরজায় আস্টেপিস্টে কাঁটা দিয়ে রেখেছি। ওদিকে এলে আমি কথা বলব না আপনার সঙ্গে।

প্রিয়নাথ বেড়ার দিকে তাকায়। কাঁটায় ভর্তি। প্রায় বুকসমান উঁচু। হাইজাম্প অভ্যাস ছিল কিশোর বয়সে। এখন আর সে দম হয়তো নেই।

কী? পারবেন না?

এখানেও তো কাঁটা তোমার।

একটু কাঁটার চোট লাগবে না কুসুমের কাছে আসতে? কুসুম কি কাঁটা ছাড়া গাছের ফল?

প্রিয়নাথ তার হাত আর ঠোঁট দেখায়।—এই তো লেগেছে। এই চেরা দাগগুলো কিসের চিনতে পারছ না?

কিসের?

যেরাতে পাকারাস্তায় ধস্তাধস্তি করলাম তোমার সঙ্গে! কটা চুড়ি ভেঙেছিল কুসুম?

দাম দেবেন নাকি?

চাইলে দেব।

দেরি হয়ে গেছে। কই, চলে আসুন! লাফ দিন না!

প্রিয়নাথ সদর দরজা অর্থাৎ আগড়টা খোঁজে। সেরাতে ওই কাঁটার আগড় পেরিয়ে ঢুকেছিল। ডাইনে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। চারদিকে শুধু ঝোপঝাড় গাছপালা আর মাঝে মাঝে সজ্জীক্ষেত। সে ঘুরে যেতে পারে—সেটা কোন কথা নয়। কিন্তু কুসুম তার সঙ্গে কাঁটার বেড়া নিয়ে খেলা করতে চাচ্ছে জেনেই সে পিছিয়ে যায় এবং

দৌড়ে এসে লাফ দেয়। প্যাণ্ট জুতো কাঁটার আঁচড় থেকে বাঁচাল তাকে। কিন্তু কিছু লঙ্কা গাছ তার শরীরের তলায় চাপা পড়ে দুমড়ে গেল। অমানুষিক ধরণের খেলা যেন।

কুসুম খিলখিল করে হাসে।—বাঃ! পারলেন! আপনি অনেক কিছু পারবেন। অপয়া মানুষ সবই পারে। বলে ধুলোমাটি খড়কুটো আর কাঁটা ঝেড়ে ফেলে প্রিয়নাথ।

কুসুম লঙ্কা গাছগুলো সযত্নে সোজা করে দেয়।—দিলেন তো সব নষ্ট করে!

দুজনে দাওয়ায় ওঠে। তারপর কুসুম বলে—ভেবেছিলাম, রাগ করে চলে যাবেন। কাঁটার বেড়া টপকে কি ভদ্রলোক আসে? কিন্তু এলেন।

আমি ছোটলোকে, তাই।

ছিঃ, আমি তা বলিনি।···বলে মাদুর পাতে কুসুম।—বসুন।

প্রিয়নাথ বলল।—তুমি সেরাতে জোনাকিব টোপর পরে কী করছিলে?

মুহূর্তে কুসুমের মুখটা ছাই হয়ে গেল। সে চোখ রাখল নিজের পায়ের দিকে। তুমি যেন আমাকে ডাকছিলে। আমি গেলাম। দৌড়ে ধরতে পারলাম না। তুমি ঝাঁপ দিলে। তখন আমি ফিরে এলাম। যদি ঝাঁপ দিতাম, কী করতে কুসুম?

সে মুখ তুলল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চোখের পাতা দ্রুত কাঁপল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

প্রিয়নাথ জেদের স্বরে বলে—তোমার রাতের খেলার সঙ্গী হতে পারিনি আমি। হয়তো সে সাহস আমার ছিল না। কিন্তু ও কী খেলা কুসুম? কেন তুমি অমন করো? কেন তুমি মানুষের মতো আমার সঙ্গে মিশতে পারছ না?

একটু চুপ করে জবাব শোনাব চেষ্টা করে? কেন তুমি মানুষের মতো আমার সঙ্গে মিশতে পারছ না?

একটু চুপ করে জবাব শোনার চেষ্টা করে সে। কুসুমের চুলগুলো হঠাৎ বুকের ওপর ডান কাঁধ পেরিয়ে খুলে পড়ে—কুণ্ডলী ছাড়িয়ে সাপের সোজা হবার মতো। কিন্তু সে মুখ ফেরায় না। বাঁকাঁধে চিবুক রেখে মুখটা ঘুরিয়ে চুপ করে থাকে।

প্রিয়নাথ ফের বলে—তোমার স্বাধীনদি আমাকে নিষেধ করেছেন তোমাকে যেন এড়িয়ে চলি। তোমাকে রেহাই দিতে বলেছেন উনি। আমি কোন জবাব দিইনি তাঁকে। কী জবাব দেব? আমি তোমাকে মানুষের মতো পেতে চেয়েছি। এ চাওয়া থেকে আমাকে কেউ ফেরাতে পারবে না।···বেশ। ধরে নিলাম, আমি তোমার অযোগ্য। তাহলে বলো, কীভাবে তোমার যোগ্য হবো?

কুসুম কাঁপাকাঁপা স্বরে বলে—আপনি শিগগির চলে যান নতুনবাবু।

কেন? তোমার ভূতটার ভয়ে? আমি আজ মরীয়া হয়ে এসেছি, কুসুম।

কেন এলেন?

কেন তুমি সেরাতে অমন করে আমাকে ডাকলে?

আমি ডাকিনি।
মিথ্যে বলো না। দেখ, কুসুম—একটা মনগড়া মিথ্যের ফাঁদে পড়ে থেকে অমন তাজা জীবনটাকে কেন তুমি নষ্ট করবে ?
কুসুম পলকে ঘোরে। চোখে জল, তীব্র চাহনি—কিন্তু ডাকিনীর নীল উজ্জ্বলতা অবশ্য নেই এখন। ফোঁস করে ওঠে সে।—মিথ্যে।
হ্যাঁ মিথ্যে। ভীষণ মিথ্যে।
কুসুম তীব্রভাবে মাথা দুলিয়ে বলে—না, মিথ্যে নয়। আপনি জানেন না, কে আমার কাছে আছে। এসব কথা বললে আপনার বিপদ হতে পারে নতুনবাবু, বলবেন না।
প্রিয়নাথ হাসে।—এই তো আমি বসে আছি, হোক না বিপদ।
কুসুম কী করবে ভেবে না পেয়েই যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মুখটা ফের ঘুরিয়ে নেয়। ভাঙা গলায় বলে—আমারও সাধ যায়, ভালো কাপড় পরি, সেজেগুজে থাকি, শহরে যাই, সিনেমা দেখি, স্বামীর ঘরসংসার করি। পেটেকোলে দুটো আসুক। আমাকে মা বলুক। কিন্তু আমার সে পথে মা কাঁটা দিয়ে গেছে, নতুনবাবু। আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। কী দিয়ে বোঝাব ? আপনি যান, আমাকে আর লোভ দেখাবেন না।
প্রিয়নাথ নিষ্পলক চোখে তাকে দেখতে থাকে।
কুসুম ফের বলে—আমারও কত সাধ ইচ্ছে আছে, আপনার যেমন আছে। যখন থেকে আপনাকে দেখেছি, কী যেন মনে হয়েছে—বুকটা কেঁপেছে, বিশ্বাস করুন। বলতে লাজ নেই আমার।—কুসুম বেহায়া মেয়ে, সবাই জানে। হ্যাঁ, আমারও লোভ হয়েছে আপনাকে দেখে। কিন্তু তার জন্যে সাজা তো কম পাচ্ছিনে সেদিন থেকে। আমার রক্ত কালি করে দিলে। যখনই আপনার কথা ভাবি, অমনি কী সব হয়। কী যেন···
কী কুসুম ? কী হয় ?
মাথার ভিতর ঠাণ্ডা বরফের হাত পড়ে। যেন মগজটা তুলে ফেলবে মনে লাগে। আমাকে থির থাকতে দেয় না।
কে সে ?
তাকে কি চিনি, না দেখেছি ? তবু সে আছে। তার চোখ থেকে একদণ্ড তো বাইরে যাবার যো নেই ! মা আমার কী সর্বনাশ করে গেছে, জানেন না !
প্রিয়নাথের হঠাৎ মনে হল, গাবগাছটায় কোত্থেকে এতক্ষণে বাতাস এল ! হলুদ কিছু পাতা ঘুরতে ঘুরতে নেমে গেল ঝরঝর সরসর খরখর। কোথায় টানা সুরে চিল ডেকে উঠল। কী যেন ধূসরতা বাড়িটাকে ঘিরে ফেলল আস্তে আস্তে। রোদ ফিকে হলুদ হয়ে পড়ল। প্রিয়নাথ একটা অশরীরী অস্তিত্বকে ঝেড়ে ফেলতে সোজা হয়ে বসল। কিন্তু কিছুতেই এই বিদঘুটে ভাবটা এড়ানো গেল না। নিজের সঙ্গে এক

তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকে তার।

পরক্ষণে প্রিয়নাথ আরও চমকে ওঠে। ও কি! কুসুমের ভিজে চোখদুটো আবার এখন সেইরকম নীল হয়ে উঠেছে যে! তার ঠোঁটে এখন কেমন হাসি। নিষ্পলক নীল চোখে সে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এ হাসি সহজ নয়। মানুষেরও নয়। মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডে রক্ত শিসিয়ে উঠেছিল। তক্ষুনি সামনে নেয় প্রিয়নাথ। দ্রুত চারদিকটা দেখে নেয়। কেউ কোথাও নেই।

সে কুসুমকে দুহাতে ধরে ফেলতেই কুসুম কাঁপতে কাঁপতে সেরাতের মতো পড়ে যায়। তখন তাকে এক হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে ঘরে নিয়ে যায় সে। ছোট্ট ঘর। সুন্দর নিকানো মেঝে। একটা বেদী রয়েছে কোণে। মাটির পিদিম আছে। সিঁদুরের ছোপ। একটা মড়ার মাথা। ধরিত্রীরই মাথার খুলি সম্ভবত।

ওকে শুইয়ে দরজাটা এঁটে দেয় প্রিয়নাথ। হাঁফাতে হাঁফাতে নিজেকে তৈরি করে নেয়। অলৌকিকের সঙ্গে একটা চরম নিষ্পত্তি তাকে করতেই হবে। কুসুমের চোখদুটো খোলা রয়েছে—তেমনি উজ্জ্বল নীল। আশ্চর্য সুন্দর লাগে মেয়েটাকে। বুকের কাপড় সরে ফিকে লাল জামা আঁটো দেখা যায়। হয়তো স্বাধীনেরই জামা।

তারপর সে কুসুমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তারপর সত্যিসত্যি কী এক অমানুষিক শক্তির সঙ্গে তার অনিবার্য লড়াইটা শুরু হয়ে যায়। কুসুমের নখের আঁচড়ে তার মুখ গলা বুক ফালাফালা হয়ে যেতে থাকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে ছিটকে পড়তে হয়। ফের সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফের ধস্তাধস্তি চলতে থাকে। শব্দহীন দুটি ঠোঁটই—কিন্তু বিকৃতি ফোটে মুহুর্মুহু। শ্বাস-প্রশ্বাসের চরম শব্দে ঘরটা যেন বেলুনের মতো টান টান ফুলে ওঠে। তাপে তেতে ওঠে। জানালাবিহীন এসব ঘর। তাই ভিতরে এখন আবছা অন্ধকার দিন দুপুরেই। তার মধ্যে মরাবাঁচার বীভৎস-ধরণের লড়াইটা দুপক্ষ সমানে চালিয়ে যায়। একসময় প্রিয়নাথ কুসুমের দুটো বাহু চেপে মাটির সঙ্গে প্রাণপণে ধরে থাকে এবং পেটের ওপর হাঁটুর চাপ দিলে কুসুম হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে যায়। নাকি স্বরে কী সব বলতে থাকে অস্ফুট উচ্চারণে—নাকি ওদের খোট্টাই চাঁই বোলিতে—কিছু বোঝা যায় না। তখন প্রিয়নাথ আদর করে জাগাতে চায় ডাঁকে।···

একটু পরে প্রিয়নাথ বেরিয়ে আসে।

দরজা ফাঁক করে আগে দেখে নিয়েছে, কেউ কোথাও আছে কি না। কেউ নেই। এদিকটা গাঁয়ের প্রান্ত। নদীঅব্দি ঝোপঝাপ রয়েছে।

নদীতে নেমে সে হাতমুখ ভালো করে খোয়। প্রচণ্ড জ্বালা করতে থাকে, নাক, গাল আর গলার কাছটা। বিষিয়ে যাবে কি না কে জানে। বাসায় ফিরেই এ্যান্টিসেপটিক কিছু লাগাতে হবে। ফার্স্টএডের বাকসো একটা আছে ফার্মে। ওরা শুধোলে কী বলবে?

হ্যাঁ, ওপারে বেড়াতে গিয়েছিল আলমাবাগে। হায়েনার পাল্লায় পড়েছিল। সম্প্রতি শিমুলিয়ায় হায়েনার উৎপাত হয়েছে। মৃগাঙ্ক বলেছিল। তার হায়েনাটা মারতে যাবার কথা আছে। একটা জাঁকালো গল্প বলা যাবে।

অনেক ঘুরে ফার্মের দক্ষিণ গেট হয়ে ঢোকে প্রিয়নাথ। সোজা কেউ দেখার আগে প্রায় দৌড়ে নিজের ঘরে ঢোকে। ভাগ্যিস, মৃগাঙ্ক নেই। নাটকটা থেকে আপাতত রেহাই পাওয়া গেল। এখন ওষুধ লাগিয়ে চুপচাপ শোবে। চাদর মুড়িও দেওয়া যায়। মৃগাঙ্ক এলে তখন দেখা যাবে বরং।

যথাসময়ে প্রিয়নাথ শোয়।

কিন্তু জ্বালা, ডাকিনীর নখের বিষ, মৃত্যুভয়, অনুশোচনা—যা এতক্ষণ নদীর ধারে তাকে অনুসরণ করেছিল, সব ক্রমশঃ মুছে যায়। এবং অতি ধীরে জেগে ওঠে একটা গভীর তৃপ্তির ভাব। মনে হয়, জীবনে এই এক আশ্চর্য পাওয়া মিলে গেল! গাঢ় তৃপ্তিতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে প্রিয়নাথের। প্লাস্টার করা মুখ নিয়ে সে যেন হিস্টিরিয়ার ফিটে তলিয়ে যায়—নির্জ্জান দেশে।

এবং যাবার শেষ মুহূর্ত অব্দি একটি ভাব তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়ঃ কুসুমকে তার ভাল লেগেছিল।

তাই ঘাসের ফুলের মতো একটা খুবই ছোট্ট হাসি তার বিক্ষত নিচের ঠোঁটের কোণায় লেগে থাকে কতক্ষণ।···

নবীন এসে জাগায় তাকে। তখন কালু খাঁর দিয়াড়ের মাঠে সন্ধ্যা নেমেছে।—স্যার, নতুনবাবু! উঠুন, চা খান।

প্রিয়নাথ তাকায়। প্রথম কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারে না, কোথায় শুয়ে আছে। তারপর সব মনে পড়ে। সে বলে—রাখো। মৃগাঙ্কদা কোথায়?

পাটের সঙ্গে বহরমপুর গেছেন, সেই দুপুর বেলা। আপনাকে খুঁজলেন, পেলেন না। ট্রাক-ড্রাইভার তাড়া লাগাল। অমনি চলে গেলেন। কোথায় ছিলেন?

ওপারে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ নবীনের চোখে পড়ে প্লাসটারের ফালিআঁটা ক্ষতচিহ্নগুলো। সে চমকে ওঠে।—আরে, ও কী? অত কটাকুটি করলেন কিসে?

প্রিয়নাথ একটু পরে জবাব দেয়—দাড়ি কাটতে কেটে গেছে।

হায়েনার চেয়ে এটাই স্বাভাবিক—অন্তত আঁচড়ের দাগ যেভাবে রয়েছে। নবীন চলে যায়। উঠতে গিয়ে শরীর কেমন আড়ষ্ট লাগে প্রিয়নাথের। একটু শীত শীতও করছে। কার্তিকের শেষ সপ্তাহের দিকে সন্ধ্যাবেলা হিমেল হয়ে পড়ছে ক্রমশ। বাইরে পাখিদের প্রচণ্ড হল্লা হচ্ছে গাছপালায়। বছরের এ সময়টা ওরা-সন্ধ্যাবেলায় এত চেঁচামেচি করে কেন, ভাবতে ভাবতে প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নেয়। হাতটারও ওজন হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে।

দরজার বাইরে ফার্মের বিশাল ক্ষেতখামার এখন ধূসর। মজুর-মজুরনীদের ছায়া।

ছায়া ক্রমশ সরে যায় একেএকে। তারপর আলো জ্বলে ওঠে কিছু অংশে। ধবধবে সাদা মাটি কিছু, কিছু মাষকলাইয়ের স্তূপে ঢাকা—তার ওপর একটা কুকুর দৌড়ে পালায়। নবীনের আওয়াজ শোনা যায়—ভাগ্, ভাগ্, পালা! তারপর থলথলে গরিলার মতো প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে গগন হালদারকে দেখা যায় আসতে।

প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে ইচ্ছে করে না। অবসাদ আর আড়ষ্টতা শরীরকে ভারি করেছে এতক্ষণে। ক্ষতগুলো টনটন করছে। গগন দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে দেখতে বলে—এখনও শুয়ে আছেন?

এস হালদার মশাই।

গগন ঢুকে দুই বিছানার মাঝখানে একটা টুলে বসে পড়ে। প্রিয়নাথের দিকে কেমন চোখে তাকায়।

প্রিয়নাথ হেসে বলে—কী দেখছ?

গগন সে কথার জবাব দেয় না অবশ্য। গম্ভীর হয়ে ঘরের দেয়ালগুলো মুখ ঘুরিয়ে দেখার পর বলে—জ্বরটর নাকি?

নাঃ। কেন?

চাদর গায়ে চড়িয়েছেন!

একটু শীতশীত করছিল। তোমার শীত করে না? দিব্যি খালি গায়ে রয়েছ দেখছি।

শীতবর্ষা আমার নাই, নতুনবাবু। আমি জলমানুষ।

প্রিয়নাথ একটা আড়মোড়া দেয়। তারপর মনেমনে অবাক হয় যে গগন তার ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কোন প্রশ্ন করছে না। তাই সে মুখে হাত বুলিয়ে বলে—কী সব বাজে ব্লেড বেরিয়েছে। দাড়ি কাটতে গিয়ে আজ সাংঘাতিক কাটাকুটি করে ফেলেছি।

ওষুধ দিয়েছেন দেখছি।

হ্যাঁ। বলা যায় না, সেপটিক হতে পারে।

পারে বই কি।...গগন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে—ওটা বঙ্কুবাবুর ছবি না?

হ্যাঁ।

উঠে গিয়ে মৃগাঙ্কের বিছানার পিছনের দেয়ালে জানালার ওপর বঙ্কুবাবুর বড়ো ছবিটার দিকে ঝুঁকে পড়ে। থ্যাবড়া আঙুল বুলিয়ে কিছু পরখ করে। তারপর সরে এসে বলে—কাচে ঢাকা।

প্রিয়নাথ শুধু হাসে।

বঙ্কুবাবু মারা গিয়েছিল ঘা বিষিয়ে। অমনি—আপনার মতো সারা মুখ গলা ফালাফালা হয়েছিল। নাড়ু ডাক্তার ওষুধও দিয়েছিল। কিন্তু কিছু হয় নি। রাতারাতি মুখ হাঁড়ির মতো ফুলে গেল। জ্বর হল প্রচণ্ড। ভুল বকতে লাগল সারাটা রাত। তারপর সকালে শহরে নিয়ে গেল। আর দেখা হয়নি আমার সঙ্গে ৷

সেখানে কিছু হল না বলে কলকাতার বড় হাসপাতালে তুলল মিগাং। কদিন পরে মারা গেল।

প্রিয়নাথের বুকটা ঢিপঢিপ করতে থাকে। আড়ষ্ট হেসে সে বলে—বাঁদরে আঁচড়ে না কামড়ে দিয়েছিল শুনেছি।

বাঁদর? বলে একটু চুপ করে থাকে গগন। ফের বলে—তাই রটানো হয়েছিল বটে।

প্রিয়নাথ একটু অবাক হয়।—রটানো হয়েছিল মানে?

হ্যাঁ। মানী লোক। মানের দাম লাখ টাকা তার।

বাঁদর নয় তাহলে?

গগন মাথা দুলিয়ে নিষ্ঠুর আর চাপা হাসে।—নাঃ, বাঁদর নয়।

তাহলে কী?

মানুষ।

মানুষ! সে কী?

মানুষ বলতে পারেন, আবার অমানুষও বলতে পারেন। একই কথা।

প্রিয়নাথ আধখানা উঠে বসে।—হালদার মশাই, খুলে বল তো কী হয়েছিল বঙ্কুবাবুর?

আপনি ডরাবেন নতুনবাবু।

কেন? আমি ডর পাব কেন হালদার মশাই?

পাবেন না তো?

না।

ধরিত্তি তখন জেলে আছে। কুসমি মান্যবর মোড়লের বাড়ি থাকে খায়, বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে মায়ের কুঁড়েঘরেও আসে। ঘরের মধ্যে থান আছে, তন্তরমন্তর পালন করতে হয় তাকে মায়ের হুকুম। তা এক খরার নিঃঝুম দুপুর-বেলা তাক বুঝে বঙ্কুবাবু সেখানে হাজির হল। কুসমি তখন বেশ ডাগর। বুক উঠেছে। শাড়ি ধরেছে। দেখলে মানুষের চোখ সরে না। ধরিত্তির গাছের ফল—যেন মায়ের চেয়েও ঝলমল করে। বাঘের লোনায় টসটস করে জলে ঝরে। বঙ্কুবাবুর কুবুদ্ধি—মাথায় কমের পোকা কটকট করছিল। তাকে বাগে পেয়ে ধরল। আমি সেই সময় নতুন জালে গাবের কষ মাখানো বলে ওদের গাবগাছে চড়ে আছি ঘন ডালপালার মধ্যে। গাব পাড়ছি ঠুসি (একরকম আঁকসির মাথায় ছোট্ট জালে থলি) নিয়ে। সব দেখছিলাম। হায় রে কাম! তোর আপনপর নাই—সব সমান! কুসমি তো তোমারই জম্মো দেওয়া মেয়ে হতে পারে বঙ্কুবাবু, তুমি তা ভুলে গেলে। মনেমনে গাছ থেকে সেই কথাটি বললাম বঙ্কুবাবুকে।

প্রিয়নাথ আস্তে বলে—তোমারও মেয়ে হতে পারে! বলার পর সে ভেবে পেল না, কেন একথা হঠাৎ মাথায় এল তার।

গগন বলে—হ্যাঁ, তাও হতে পারে। সে ধাঁধা আমার এখনও ঘোচেনি। ধরিত্তির পুরুষ ছিল হেঁপো রুগী। অক্ষম অথব্ব।

তারপর ?

তারপর আর কী ? বঙ্কুবাবুকে দেখলাম মুখখানা ফালা ফালা লাল করে বেরিয়ে আসতে। নদীর দিকে দৌড়লেন। গিয়ে ধরে ফেললাম। এ কী হল বাবুদাদা, সুন্দর মুখখানা অমন হল কিসে গো ? বঙ্কুবাবু দুহাত চেপে ধরল। গগন, তোর কত উপকার করেছি, এখনও করছি—ঠিক কিনা বল। আমার মান তুই বাঁচা ভাই। হ্যাঁ, উপকার করেছিল বটে। ছেলেদুটোকে লেখাপড়া শেখানোর সব ভার নিয়েছিল সে। আমি কথা রাখলাম। আজ অব্দি কাকেও বলিনি।

আমাকে বললে যে ?

ক্যানে বললাম জেনেও কি জানেন না নতুনবাব ? আমি সব দেখেছি আজ।

প্রিয়নাথ তার দিকে তাকিয়ে মুখ নামায়।

তো সেকথা থাক। আপনার কপাল আপনার নিজের। বঙ্কুবাবুর কথা শুনুন। সে তো কলকাতার হাসপাতালে মারা গেল। সেখানে মরার সময় বুদ্ধির ভুলে কী বলতে কী বলে বসল ছেলে মিগাংকে। মিগাং ফিরে এসে একদিন ওপারের বিলে কুসমিকে বন্দুক নিয়ে তাড়া করল। গুলিও ছুড়েছিল—লাগেনি। কুসমি পালিয়ে এসে আমার পা ধরে ভেঙে পড়ল। তো কী কবতে পারি আমি ? সামান্য মানুষ। মিগাং বড়লোক জোতদার। তাকে একলা পেয়ে হতভাগী মেয়েটার হয়ে ক্ষমাভিক্ষে করলাম। মিগাং শুনবেই না। তখন আমি বললাম—মিগাং, তাহলে পস্টাপস্টি কথা শোন বাবা। যদি কুসমির কিছু ভালমন্দ হয়, আমি ইসলামপুর থানায় দারোগাবাবুর কাছে ডাইরি এপোট (রিপোর্ট) করে আসব।

প্রিয়নাথ অস্ফুট স্বরে বলে—ব্ল্যাকমেল !

গগন কান করে না।—মিগাং জব্দ হল। বলল—ঠিক আছে। তোমার কথা রাখলাম। কিন্তু কেউ যেন আর শোনে না। বাবার নাম আছে তল্লাটে। সে নাম যেন নণ্ট হয় না হালদার খুড়ো। কথা আমি রেখেছি, নতুনবাবু।

আমাকে কেন বললে ?

বললাম। আপনি সাবধান হোন। এক্ষুনি বড় ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়ে আসুন। কুসমির নখে সাংঘাতিক বিষ আছে।

প্রিয়মাথ কী বলবে, বুঝতে পারে না।

ব্যথা আছে নাকি ? জ্বরটর লাগছে ?

প্রিয়নাথ রুষ্টভাবে বলে—কিছু নেই। বাজে কথা বলোনা হালদারমশাই। আমার কিছু হয়নি, তোমাকে অত ভাবতে বলিনি তো আমি।

গগন উঠে দাঁড়ায়। দরজার দিকে এগিয়ে ফিরে আসে। তারপর বলে—একটা গরীব গুরবো ছোট জাতের মেয়ে। আপনারা শিক্ষিত ভদ্রলোক। আপনারা কত

ভালো ভালো কথা বোঝেন নতুনবাবু, শুধু বুঝতে পারেন না—ভগবান কিছু কিছু জিনিস নিজের জন্যে রেখেছেন। তাতে কারো দখল চলে না।

গগন তার কালো বিরাট শরীরটা নিয়ে হাঁসের মতো থ্যাবড়া পা ফেলে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। প্রিয়নাথ কাঠ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর ক্রমশ তার অস্বস্তি হতে থাকে। অস্বস্তি বেড়ে চলে। বঙ্কুবাবু মারা গিয়েছিলেন কুসুমের নখের আঁচড়ে? এই জোরালো কথাটা তার ওপর আছড়ে পড়ে। সে ছটফট করে—হয়তো ভয়ে, হয়তো দুর্ভাবনায়। আর নিয়তির মতো কী যেন তাকে একটা গভীরতর যন্ত্রণার দিকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে চলে।···

মৃগাঙ্ক ফিরে এল, তখন রাত দুটো প্রায়।

সে এসেই চমকে ওঠে। নবীন গণেশ আর আতাহার প্রিয়নাথের হাত পা শক্ত করে ধরে বসে রয়েছে। প্রিয়নাথ বিছানায় ছটফট করছে। তার চোখদুটো অস্বাভাবিক লাল। গোঁ গোঁ করছে। কী সব ভুল বকছে। আর তার ঠোঁট, গাল, গলা—সবখানে ছত্রখান ওল্টানো প্লাস্টারের ফালি, রক্ত চোঁয়াচ্ছে টানা সব ক্ষতচিহ্ন থেকে। বীভৎস! মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে প্রিয়নাথের।

নবীন রুদ্ধশ্বাসে বলে—সাংঘাতিক কাণ্ড দাদাবাবু। নতুনবাবুর গোঙানি শুনে এঘরে এসে দেখি, দরজা হাট করে খোলা—ঘরে আলো জ্বলছে। আর উনি দুহাতের নখে মুখখানা আঁচড়াচ্ছেন। গায়ে আগুন জ্বলছে একেবারে। এ কী কাণ্ড হল হঠাৎ?

মৃগাঙ্ক প্রিয়নাথের ক্ষতচিহ্নগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে। কপালে হাত রেখে ডাক—প্রিয়, প্রিয়নাথ! প্রিয়নাথ!

অনেক ডেকেও সাড়া পায় না সে। তখন নবীনকে তেড়ে যায়।—হতচ্ছাড়া! ত এতক্ষণ নাড়ু বাবুকে খবর দিস নি কেন?

আপনার অপেক্ষায় ছিলাম দাদাবাবু!

মৃগাঙ্ক চেঁচিয়ে ওঠে—যত শালা অমানুষ বুদ্ধু জুটেছে আমার চারপাশে! আতাহার! শিগগির আমার গাড়ি বের করে দে! শালারা আর মানুষ হল না!

মৃগাঙ্ককে অমন ক্ষেপে গেল কেন, এরা বুঝতে পারেনা। আতাহার দৌড়ে বেরিয়ে যায়। নবীন কাঁচুমাচু মুখে বলে—বিকেলে না—বিকেলে না তে—সন্ধ্যায় চা দিতে এসে ঘা দেখলাম। বাবু বললেন, ব্লেডে কেটেছে!

থাম্ শালা।

মৃগাঙ্ক লাফ দিয়ে বেরিয়ে যায়। গাড়ি উঠোনে বের করেছে আতাহার। মৃগাঙ্ক বেগে মোটর সাইকেলটা নিয়ে গেটের কাছে যায়।—আরে উল্লুক! ফটক খুলবি না কী?

আতাহার ফটক খুলে দিয়ে ভয়ে-ভয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

পাকা রাস্তায় একটা হেরিকেনের আলো। মৃগাঙ্ক কাছে গিয়ে দেখে গগন হালদার। কী? মাথায় টনক নড়েছে বুড়ো ঘাগীর? মহাকালের চেলা যেন!
বলেই সে বোঁও করে চলে যায়। স্তব্ধ হেমন্তের রাত মোটর সাইকেলের শব্দে গুরুগুরু কাঁপে। আলোর ফালিতে কুয়াশা দুলতে দেখা যায়। গগন একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে ফার্মের দিকে হেঁটে আসে।
কে? হালদার মশাই নাকি?
আতাহার? কী হয়েছে রে? মিগাং কোথায় গেল এত রেতে?
নতুনবাবুর প্রচণ্ড অসুখ।
হুঁ।
গগন দ্রুত হেঁটে বারান্দায় গিয়ে ওঠে। দরজার কাছে, বাইরে হেরিকেন রেখে ভিতরে ঢোকে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে গভীর দুঃখে মাথাটা দোলায় সে। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে ফের মাথা দোলায় আপনমনে।
প্রিয়নাথ বিড়বিড় করছে তখন।...তুই অপয়া। তুই চলে যা—পালা এদেশ ছেড়ে। তুই থাকলে নদীর জল শুকোবে। মাঠে ফসল ফলবে না। মাটি ফাটবে। শেয়াল শকুন মানুষের মড়া খাবে কচমচিয়ে। আর কামিখ্যের ডাকিনী এসে শুকনো ডালে বসে বাতাসের সুরে কথা বলবে।...
কার কথা এসব? গগন কান করে শোনে। এ নতুনবাবুর কথা নয়। কুসমির বুলি!
প্রিয়নাথ হিহি করে হাসে। হাসতে হাসতে হাত তুলে মুখের কাছে আনবার চেষ্টা করে। নবীন আর গণেশ শক্ত করে ধরে রাখে হাত দুটো।
আমি তার হাতে ধরা আছি গো! মা আমার কী সর্বনাশ করে গেছে, জানোনা তোমরা? নযতো—আমারও তো কত সাধ-আহ্লাদ ছিল। ভাল কাপড় পরি, সেজেগুজে থাকি, পেটে কোলে একটা এসে মা বলে ডাকে! আমার কিছু হল না মা গে (গো), কুছ নেহী হুয়া—সাঁঝ দেতে দেতে দাঁঝ চালি গেইলা মা গে! উঃ...
ককিয়ে কেঁদে ওঠে প্রিয়নাথ। ফুঁপিয়ে কাঁদে।
আর গগনের দুচোখ ছাপিয়ে জল নামে কেন। সে লম্বা নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে।
নবীনের চোখ দুটো বড়ো হয়ে উঠেছিল। সে গণেশ আর আর গগনের দিকে পালাক্রমে তাকাচ্ছিল। এবার চাপা গলায় বলে ওঠে—হালদারমশাই!
উঁ?
বুঝতে পারলে কিছু?
হুঃ!
কুসমি বান মেরেছে নতুনবাবুকে। ডাক্তার টাক্তারের কাজ নয় হালদারমশাই, শিমুলিয়া থেকে নাথুকে ডেকে আনতে হবে।

গণেশ রাগে ফুঁসে ওঠে।—মা তল্লাটকে জ্বালিয়ে খেয়েছিল। মেয়েও যে জ্বালতে শুরু করলে রে বাবা! এর একটা প্রতিবিধান করা উচিত।

নবীন বলে—একালটা যে অন্যরকম। সে আমলে এমন হলে হেঁটেকাঁটাওপরে কাঁটা দিয়ে সবাই পুঁতে ফেলত। আজকাল সবাই হেসে উড়িয়ে দেবে। আইনের ভয় দেখাবে। তবে আমাদের বাবুর হাতে এবার আর নিস্তার নাই মাগীর। বাবু খুব ক্ষেপে গিয়েছেন।

গগন শুধু বলে—কে? মিগাং?

হ্যাঁ। আরে, আরে! ধর্ ধর্, গণশা! শক্ত করে ধর্!

প্রিয়নাথ উঠে বসতে চেষ্টা করছিল। তারপর শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে যায় বারবার। গোঙানি বাড়ে। দুজনে সামলাতে পারে না।…

কতক্ষণ পরে নাড়ু ডাক্তারকে ব্যাকে বসিয়ে মৃগাঙ্ক ফিরল। ডাক্তার এসেই থমকে দাঁড়ায়।—সর্বনাশ! এ যে টিটেনাস! খেয়েছে! ও মিগাং, শিগগির ব্যাগপত্তর দে। এই ছোঁড়া, জল গরম করতে পারবি? এক্ষুনি!

নবীন বলে—হ্যাঁ। হিটার আছে।

যা, শিগগির নিয়ে আয়।

মৃগাঙ্ক গগনকে বলে—কেমন দেখছ হালদার মশাই? বাঁচবে না—না?

গগন মাথাটা দোলায় শুধু। কী তার কথা ঘোলাটে চোখ দেখে বোঝা কঠিন।

গণেশ চাপা গলায় মৃগাঙ্ককে বলে—দাদাবাবু, নতুনবাবুকে কুসমি বাণ মেরেছে।

মৃগাঙ্ক তার দিকে লাল চোখে তাকায়।

একটু আগে চাঁইবুলিতে কথা বলছিল নতুনবাবু।

কী বলিতে?

কুসমিদের জাতের বুলিতে।

মৃগাঙ্ক চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে তার সারা মুখে আগুন আর ধোঁওয়া নাচানাচি করে। সে হঠাৎ তার বিছানার মাথার দিক থেকে হ্যাঁচকা টানে বন্দুকটা বের করে। তারপর প্রায় লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তখন গগনও থপ থপ করে বেরোয়। বারান্দায় রাখা তার হেরিকেনটা তুলে দম বাড়িয়ে দেয়। তারপর উঠোনে নেমে ডাকে—মিগাং, মিগাংবাবু!

মৃগাঙ্ক হন হন করে গেট পেরিয়ে চলেছে। গগন দৌড়তে থাকে।—মিগাং, মিগাংবাবু, কোথা যাও? হেই মিগাংবাবু!

বুড়ো গলার হাঁকডাকে অন্ধকার নিঝুম রাতটা কেঁপে ওঠে, কালো ড্রামের মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত আওয়াজ গম গম করে। মৃগাঙ্ক এবার ঘুরে দাঁড়ায়। চোপ শুয়োরের বাচ্চা! তোকে শুদ্ধ গুলি করে মারব!

তা মারো! মারবে বৈকি মিগাং! তোমার হাতে বন্দুক, বাবা। তবে কথাটা

তো শোন।…গগন হাঁফায়। সত্তর বছরের ফ্সফ্স হাপরের মতো ফোঁস ফোঁস করে।—কাকে মারতে যাচ্ছ মিগাং? কুসমিকে? হুঁ—তার ওপর তোমার অনেক রাগ। তোমার বাবাকে খেয়েছিল। এবারে তোমার প্রিয়বাবুকে খেলে। আর কুসমিকে ছাড়া যায় না। কেমন কি না? তো বাবা মিগাং, এ্যাদ্দিন কোন অমানুষী (অলৌকিক) মানিনি—তুমিও মানোনা। আজ এই শেষ রেতে আমি তাকে মেনেছি—তুমিও তাকে মানো। সে আছে বাবা, তাকে আমি আজ এ্যাদ্দিনে দেখেছি। দেখেই তোমার খামারে আবার গিয়েছিলাম। সেই কথাটাই বলতে গিয়েছিলাম, বাবা।

মৃগাঙ্ক কোন কথা না বলে হন হন করে এগোয়। তার পায়ের চাপে শুকনো পাটকাঠি মচ মচ করে ভাঙে। ঝোপে ঘাসে শিশির চবচব করে আর ছপ ছপ শব্দ হয়। গগন হেরিকেন হাতে তার পিছনে পিছনে দৌড়ায়। থ্যাবড়া পায়ে ভিজে খড়, পাটের ফেঁসো আর ঘাস জড়িয়ে যায়।

গগন কথা বলতে বলতে যায়।—কুসমির মা ধরিত্তি আমাকে বলেছিল, কামিখ্যে থেকে এক ডাকিনী গাছের ডালে বসে গাছ উঁড়িয়ে নিয়ে এসেছিল ভৈরবের পাড়ে। নিশিরেতে তার নাম ধরে বাতাসেব সুরে ডেকেছিল। সেই ডাক শুনে ধরিত্তি নাকি গেল। আর ডাকিনী এলোচুলে উলঙ্গ শরীলে তার ওপর ঝাঁপ দিলে। ধরিত্তি সেই থেকে দেয়াশিনী হল। আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আর মিগাং, এখানেই কোথায় সেই অচেনা গাছটা নাকি আছে বলে সবাই বিশ্বাস করে। ধরিত্তি আমাকে চিনিয়ে দেয়নি। কিন্তু আজ আমি চিনলাম বাবা!

ভাঙা গলায় কেঁদে ওঠে গগন। মৃগাঙ্ক একবার ঘুরে তাকায়। হঠাৎ দাঁড়ায়।

মিগাং, তোমাকেও সেই গাছটা চিনিয়ে দেব। এসো, আমার সঙ্গ ধরো। এদিকে এসো—না, না! এদিকে!

বুড়ো মৃগাঙ্কের একটা হাত ধরে ফেলে।—তবে কথা কী, ভয় পেয়ো না। মিগাং, তুমি আমার গানের সখা বঙ্কুবাবুর ছেলে। তোমার সাহস আছে। তুমি বন্দুকবাজ। বাঘ মেরেছ, শুয়োর মেরেছ, হায়না মেরেছ। আমলাবাগের জঙ্গল খালি করে দিয়েছ। তুমি বড় বীর। তবে কথা কী, ভয় পেয়োনা।

বাঁদিকে ঘোরে গগন। মৃগাঙ্ক চিনতে পারে। কুসমির বাড়িই বটে। কুসমির বাড়ির চারপাশে পুরু কাঁটার বেড়া দিয়ে রেখেছে বরাবর। ওই কাঁটা আনতেই সে প্রতিদিন নদীর ওপারে যেত। মৃগাঙ্ক হেরিকেনের আবছা আলোয় ঘন জমাট কাঁটার বেড়া দেখতে পায়। এই কাঁটার দুর্গে লুকিয়ে থাকত ডাইনীটা! কেন? কার ভয়ে? মৃগাঙ্কের? মনে হয় না তা।

বাবা মিগাং! এবারে তাকাও। এই সেই গাছ। এর তলায় সাঁঝবাতি দিত কুসমি। এ্যাদ্দিন বুঝিনি, আজ বুঝলাম এই গাব গাছটাই ডাকিনী এনেছিল কামিখ্যে থেকে। মিগাং, বুকে বল বাঁধো। এবারে মুখ তুলে তাকাও। হুঁ,

ভয় পেওনা বাবা। তুমি সেই উলঙ্গ ডাকিনীকে দেখতে পাবে—এলোচুলে ডাল থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে মনে হবে। কিন্তু ভয় পেয়োনা। তাকাও, তাকাও!

হেরিকেনটা তোলে গগন। মুহূর্তে মৃগাঙ্কের শরীর শক্ত হয়ে যায়। তার মাথা ঘুরে ওঠে। হৃদপিণ্ডে খিল ধরে যায়। সে চোখ বুজে আতঙ্কে অস্ফুট চেঁচিয়ে ওঠে। তার মনে হয়, সত্যি-সত্যি এইমাত্র উলঙ্গ এক ডাকিনী এলোচুলে ডাল থেকে ঝাঁপ দিল তাঁর দিকে। সে চেঁচিয়ে উঠল—ও কে? কে ও?

গগন ভাঙাস্বরে বলে—দেখলে মিগাং? দেখলে? কুসমিকে দেখবে?

মৃগাঙ্ক চোখ খোলে। ওপরের দিকে তাকায়। না—ডাকিনী ঝাঁপ দিতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেছে। ঝুলছে। মৃগাঙ্ক বন্দুকের নল দুহাতের মুঠোয় ধরে মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। চোখ বুজে থাকে!

গগন ডাকে—আর কী! চলে এস মিগাংবাবু।···

শঙ্খবিষ

সেই একদিন আর আজ।

তেমনি ধূলিধূসর রাস্তা, রুক্ষ মাঠ, উন্মাদ ঝাঁঝাল বাতাস আর আকাশের বিশালতার সামনে নিজেকে তুচ্ছ লাগছে। তেমনি ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকাল। যখন জিভ শুকিয়ে খড়ের মতো লাগে, বুকে খিল ধরে যায়, মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। বারবার জল খেলেও গলার জ্বালা একটুও কমে না।

সব অবিকল তাই আছে। অন্তত তার মনে হচ্ছিল, বাইরে-বাইরে সবকিছু সেদিনের মতোই অবিকৃত। সেদিনও এই রাঙামাটির কাঁচা রাস্তাটার দুপাশে ছিল নিশিন্দা-গাছের ঝোপঝাড়। দূর মাঠে দাঁড়িয়েছিল ওই বাজপড়া নেড়া তালগাছটাও। চারপাশের দিগন্তে মিশে থাকা অচেনা গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে সেদিনও মনে হয়েছিল—তাহলে চারদিকে মানুষভরা পৃথিবীটা এখনও রয়েছে; নির্জনতায় নির্বাসন নয়—সামনে মানুষ আছে।

কিন্তু সেদিন সে আজের মতো একা চলছিল না এ রাস্তায়। ছ্যাকড়া গরুর গাড়িটা তাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সে পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল পাশে-পাশে। গাড়িতে ছিলেন তার বাবা আর মা। উৎকট গরমে মায়ের অসুখটা এই ভয়ঙ্কর মাঠের মাঝামাঝি এসে হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছিল। বাবা ছইয়ের সামনে কথা বলতে বলতে আসছিলেন। বাবার ওই স্বভাব। কথা বলতে থাকলে বাবা সবকিছু ভুলে যান। তাই পিছনে তাঁর রুগ্না স্ত্রীর দিকে খেয়াল ছিল না। তার ফলে…

অবশ্য খেয়াল থাকলেও কি কিছু লাভ হত? মা কি বাঁচতেন? মোটেও না। তাঁর সময় হয়ে এসেছিল, তিনি বুঝতে পারেন নি।…উঁহু, হয়তো বুঝেছিলেন। তা না হলে আগের দিন বিকেলে যখন সব বাঁধাছাদা হচ্ছিল, তিনি স্বামীকে কেন জিগ্যেস করেছিলেন যে ওখান থেকে গঙ্গা কতদূর? কেন তিনি তার আগেও অনেকবার স্বামীর আপত্তিতে কান দেননি? আড়াল থেকে সে শুনেছিল, মা কেঁদে-কেটে বলছেন—কোনদিন কোন একটা রাত্তিরও কি আমি তোমার পাশটি ছাড়া শুয়েছি? বল, কখনও পরস্পর দূরে থেকেছি আমরা? এ আমার ইচ্ছে, মরার সময় তোমার কোলে মাথা রেখে যেন মরতে পারি। ওগো দোহায় তোমার, এ ইচ্ছেয় বাদ সেধো না! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে রেখে তুমি যেও না।

বাবা বিরক্ত হয়েছিল। তাঁর আপত্তির যুক্তি ছিল। রাহুলের ফাইনাল পরীক্ষা তখন সামনে। ওই নতুন জায়গায় গেলে পড়াশুনার গোলমাল হবে—শুধু তা নয়, ওই নতুন পাণ্ডবর্জিত দুর্গম এলাকায় আদতে কোন হাইস্কুল নেই। কাজেই রাহুলের কী হবে? তুমি গেলে, ও থাকবে কোথায়? খাবে কার কাছে? ওর

কেরিয়াটা তুমি মা হয়ে নষ্ট করতে চাও ?
মা তবু শোনেননি। আজ ভাবতে অবাক লাগে, মায়ের মাথায় সেদিন কি দারুণ জেদ চেপেছিল স্বামীর সঙ্গে থাকার। বাবা ও রাহুল দুজনেই ভেবেছিল, অনেকদিন অসুখে ভুগে মায়ের মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। গতিক দেখে রাহুল সব মিটিয়ে ফেলল। সে বলেছিল, কিছু অসুবিধে হবে না। সে দিব্যি রাঁধতে পারবে। ও অভ্যাস তো তার আছেই। গরীব সংসারে রাঁধুনী রাখবারও ক্ষমতা নেই। বাবা সামান্য প্রাইমারি শিক্ষক—কাজেই দুবেলা একগুচ্ছের টিউশানি না করলে চলেই না। হয়তো চলত কোনরকমে। কিন্তু মায়ের অসুখের ওষুধ-বিষুধ, রাহুলের পড়ার খরচ।—এত সব চালাতে একজন প্রাইমারি শিক্ষকের মাইনেতে কুলোয় না। যাই হোক, শেষ অব্দি দেখা গেল জেদটা মায়ের চেয়ে রাহুলেরই বেশি। মা বাবার সঙ্গে চলুন, সে একাই থাকবে। আর তাই শুনে মা ছলছল চোখে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা পাবে বাবা। যদি মন খারাপ করে মাঝে মাঝে গিয়া দেখে এসো। ছুটি পেলে উনিও আসবেন।
সন্ধ্যার ট্রেনে যাত্রা হবে সুরু। হঠাৎ মা বলেছিলেন, বরং ও আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক না গো! কী বলো তুমি? জায়গাটা ওর চেনা হবে। তাছাড়া···
বাকি কথাটা বলেন নি মা। তাছাড়া আর কী হবে, জানতেও চায়নি বাবা আর ছেলে। আজ মনে হচ্ছে, কথাটা অনুমান করা উচিত ছিল। আজ মায়ের সেই অনুক্ত কথাটা টের পাচ্ছে রাহুল। মা জানতে পেরেছিলেন, হয়তো পথের মাঝেই মরণ এসে হাত ধরে বলবে, চলো। তাই যেমন স্বামীর সঙ্গ ছাড়তে চাননি, তেমনি ছেলেকেও শেষ মুহূর্তে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেছিলেন।
এই জায়গাটাতেই কি? বাবা দূরের দিকে তাকাতে তাকাতে বলেছিলেন, কি ভয়ংকর তেপান্তর মাঠ রে বাবা! মনে হচ্ছে যেন নির্বাসনে চলেছি জনমানুষহীন কোন দেশে। রাহুল, তুমি কি বলো? মনে হচ্ছে না তোমার?
রাহুল তখন কী ভাবছিল, মনে পড়ে না আজ। বাবার পরের কথাটা আজও কিন্তু ভোলেনি। কারণ, কথাটা ছিল বেশ তাৎপর্যময়। বাবা পরক্ষণে বলেছিলেন, দ্যাখো, যেখানেই যাও—যত রাগ করে তুমি যত দূরেই যাও, মানুষকে ফেলে কোথাও হয়তো যাওয়া যায় না। আর গেলেও মানুষের ওপর রাগটা আর থাকে না। তখন মানুষকেই মনে হয় একমাত্র আশ্রয়। কোন গাছ নয়, পাহাড়ের গুহা নয়—মানুষই মানুষের অন্তিম আশ্রয়। ···তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে বলেছিলেন, মানুষের কাছে সারাজীবন অনেক দুঃখ পেয়েছি, রাহুল। মানুষ নামটা সময়ে-সময়ে আমায় প্রচণ্ড ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। মানুষের কাছে প্রবঞ্চনা আর আঘাতের যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে বেয়েই তো আজ দূরে পালিয়ে যাচ্ছি—অথচ রাহুল, দ্যাখো যাচ্ছি কোথায়? না—মানুষেরই কাছে।

বাবা অস্ফুট হেসেছিলেন। ফের বলেছিলেন, অথচ এমন যদি হত যে এই রাস্তাটার শেষে কোন জনপদ নেই, তাহলে? এই কথাটাই ভাবছিলাম, রাহুল। চারদিকটা দ্যাখো—ধু-ধু দিগন্তজোড়া প্রান্তর বললেই চলে। কোথাও জল নেই এ গ্রীষ্মে। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ নিজেকে এখানে দেখে ভয়ে বুক ঢিপ-ঢিপ করে ওঠে। কিন্তু দূরে ওই ধোঁয়াটে গ্রামগুলোর দিকে তাকালে মনে জোর বাড়ে। বুঝতে পারা যায়, ওখানে আশ্রয় আছে আমার। কারণ মানুষ আছে।······

আজ দশবছর পবে সেই একই রাস্তায় হাঁটছে রাহুল। সময়টাও গ্রীষ্ম। সেই দিনের মতো আজও এখানে নিজেকে দেখে সন্ত্রাসে বুক কেঁপে ওঠে, পরক্ষণে দূরের জনপদরেখা লক্ষ্য করে মনে জোর যায় বেড়ে।

আজ সে একা। পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। একটা সাইকেল যোগাড় করে নিলেও পারত সে—কিন্তু ফেরাটা অনিশ্চত বলে কারো কাছে সাইকেল চেয়ে নেয়নি। ধুলোয়-ধুলোয় রাঙা হয়ে গেছে কাবুলী চপ্পল, প্যাণ্টটাও হাঁটু-অব্দি রেঙে গেছে। কাঁধে ঝোলা আর হ্যাভারস্যাক। হ্যাভারস্যাকটা বুদ্ধি করেই সে চেয়ে এনেছে এক বন্ধুর কাছে। বন্ধুটি বলেছে, বরং তোকে ওটা প্রেজেণ্ট করলুম, রাহুল। বড়দা সেকেণ্ড গ্রেটওয়ারে মিলিটারিতে চাকরী করতেন—সেই আমলের জিনিস। খাঁটি বিলিতি। আজকাল এমন জিনিস আর কোথাও পাবি না।

হ্যাভারস্যাকের জল বুঝি শেষ হয়ে এল। রাঢ়বাংলার এই এলাকাটার ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ তার জানা। এই গ্রীষ্মের দিনে এদিকে পা বাড়ালে সঙ্গে জল ছাড়া চলে না, সে আগেরবারেই টের পেয়েছিল। শুধু একটা ব্যাপারে এখন তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। রোদ! দারুণ ঝাঁঝাল গনগনে রোদ! বাতাস বইছে উদ্দাম হু হু। কিন্তু বাতাসে রোদের তাপ প্রচণ্ড। আর ঘাম হচ্ছে না গায়ে। ফোস্কা পড়ছে খোলা জায়গাগুলোয়। গলার চামড়ায় নুন জমে রয়েছে। মাথায় চাপানো ময়লা লুঙিটা আর উত্তাপ থেকে রক্ষা করতে পারছে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ তার হৃদপিণ্ড ধুক-ধুক করে উঠছে—সে পৌঁছতে পারবে তো? পথে যদি হঠাৎ তার মায়ের মতো—

থমকে দাঁড়াল রাহুল। সে জায়গাটা আর কতদূরে, যেখানে বাবা কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘুরে স্ত্রীকে মৃতা আবিষ্কার করেছিলেন। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, রমা রমা! রাহুল, তোর মা হয়তো নেই।

বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তার ধারে কোন গাছ নেই—ছিল না। কিন্তু দূরের ধূসর-গ্রাম রেখাটা চেনা যাচ্ছে। ওখানেই একটা ছোট্ট নদী আছে। সেই নদীর ধারেই অবশেষে দাহ হয়েছিল মায়ের। গ্রামের লোকগুলো ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীর—চাষাভুষো-বাগদী-কুনাই তারা। খুবই গরীব। তাদের কাছেই জানা গিয়েছিল, পরের গ্রামটা ও তাদের মতো ছোটলোক-টোটলোক গরীব মানুষের বসতি। রুক্ষ্ম শুকনো পাথুরে মাটি, ফসল ফলে খুব সামান্যই। আর সম্বল বলতে ওই সরু

নদীটা। বর্ষার পর দুটো মাস তারই দানে ওরা বেঁচে থাকে। বাবু ভদ্রলোক-বড়লোকের গ্রাম বলতে ওখান থেকে আর ছ মাইল দূরে সেই ময়নাচক। গরুর গাড়ি পেঁছিতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে। রাস্তাঘাট তো ভালো নয় মোটে।
তখন বাবা এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। বললেন, রাহুল, বাবা, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। বুঝতে পারছ তো অবস্থাটা? এরা যদি এখানে সাহায্য করে, তাহালে নদীর ধারেই তোমার মাকে—
রাহুলের ইচ্ছে করছিল, সে লাফিয়ে বাবার ঠোঁটদুটো চেপে ধরে। তার শুকনো ক্লান্ত বুকটা ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল। কেন আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারছেন না বাবা? মায়ের মৃতদেহটা কি এত ভারি হয়ে উঠেছে? নাকি স্ত্রীর প্রতি তাঁর উত্তাল ভালবাসাই তাঁকে মৃত স্ত্রীর সঙ্গবাসে অস্থির করে ফেলেছে?
তখন তার বয়স সত্যি কম। আজ দশবছরে সে অনেক দেখেছে, জেনেছে, বুঝেছে এ পৃথিবীকে। মানুষ ও তার সমাজের সব সত্যই সে টের পেয়েছে। তাই তার আজ এ পথে পাড়ি দেওয়া। কিন্তু সেদিন কিছু তলিয়ে বোঝেনি।
তার শুধু মনে হয়েছিল যে বাবার এ আচরণে কিছু উৎকট ধরনের অসঙ্গতি রয়ে গেছে। এ যেন চুপি চুপি কাকেও খুন করে পালিয়ে যাওয়া! বাবা শাস্ত্র-টাস্ত্র আচার-বিচার মানবার মতো মানুষ নন সেটা ঠিকই। বরং, হয়তো বা সারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই মানুষ সম্পর্কে সংশয়ী শুধু নয়, ঈশ্বরেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের নাস্তিক্যের বিষয়ে বাবার খুব গর্বও রয়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আস্থাও ভারি দৃঢ়। তাঁকে রাহুলের যুক্তিবাদী মানুষ বলেই মনে হয়। তা সত্ত্বেও কোন মানুষের পক্ষে ওই আচরণ কি সম্ভব ছিল? অন্য কেউ নয়—নিজের স্ত্রী! স্ত্রীর মৃতদেহ।
সেই ছোট্ট গায়ের গরীব লোকগুলো ভারি সরল আর উৎসাহী। তাদের পরোপকারী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করে অবাক হয়েছিল রাহুল। নদীর ধারে তাদের নির্দিষ্ট শ্মশানেই দাহ করা হল মাকে হল মাকে। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন ময়নাচকে পেঁছিতে রাত দুপুর হয়েছিল। তখন আরেক সমস্যা। কেই বা ভবানীবাবুর বাড়ী দেখিয়ে দেবে তখন? সারা গ্রাম নিঃঝুম ঘুমন্ত।······
সেদিন তো ভুলে গিয়েছিল মায়ের মুখে শোনা প্রশ্নটা—ওখান থেকে গঙ্গা কতদূর গো? বাবাও কি ভুলে গিয়েছিলেন?
এই মুহূর্তে মায়ের প্রশ্নটা তীব্র হয়ে বাজছে কানের কাছে। ঋজু হাঁটছে, তার মনে হচ্ছে, গঙ্গা কতদূর? আঃ, গ্রীষ্মের দুরন্ত দহন-জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে তৃষ্ণার্ত মুমূর্ষু মা হয়তো গঙ্গার কথাটা ভাবছিলেন। গঙ্গা! স্নিগ্ধ-সুন্দর কালোজলের অপ্রমেয় শান্তি—সে নদী হয়ে বয়ে চলছে। তাদের গ্রামের নিচেই বয়ে যাচ্ছে সে। তাকে ফেলে স্বামীর সঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল মাকে। কেন?···তবে এ প্রশ্ন এখন থাক। রহস্যের কিছু জানা হয়তো যাবে না। কিন্তু শুধু ভাবতে হাতদুটো

মুঠো হয়ে যাচ্ছে রাহুলের, মা মৃত্যুর মুহূর্তে—চেতনা ফুরিয়ে যেতে যেতে হয়তো চোখের সামনে দেখেছিলেন স্বপ্নের মধ্যে শান্তির প্রতিমা প্রবাহিনী গঙ্গাকেই। আর কাকেও নয়—না স্বামীকে, না ছেলেকে।

গঙ্গা !···হঠাৎ আরেকটা দৃশ্য ভেসে এল রাহুলের সামনে। ভেসে এল আরেক গঙ্গা। ময়নাচকের ভবানীবাবুর মেয়ে গঙ্গা।

কী আশ্চর্য ! গঙ্গার কথা তো তো আসবার সময় মনেও ছিল না। সারা পথও পড়েনি তাকে। সে কি এখনও ওখানে আছে, নাকি অন্য কোথাও গেছে ? থাকা তো উচিতই—অল্পবয়সে বিধবা হয়েছে যে, মোটামুটি বড়লোকের ঘরের মেয়ে—যাবে আর কোথায় ? ওই সব গ্রামে বিধবা বিয়ের সম্ভবনাও আশা করা বৃথা। সে ঠিকই আছে। আব এই দশটা বছরের পর সে আরও বড় হয়েছে। আরও বুদ্ধিমতী হয়েছে। সে চঞ্চল ছটফটে স্বভাবটাও নিশ্চয় এখন নেই। রাহুল অনুমান করেছিল, তখন তাব বয়স বড়জোর ষোল—তার নিজের বয়সী। এখন তাহলে সে ছাব্বিশ। পূর্ণ যুবতী গঙ্গাকে সে দেখে কি আজ খুবই খুশি হবে সেবারের মতো ?

নিজের মনের মুখোমুখি হল রাহুল। সত্যিকার-প্রেম-ভালবাসা যা পুরুষ ও মেয়ের জীবনে একটা সময়ে ভারি জরুরী, যা যৌবনেব বিশাল অগ্নিকুণ্ডে স্বতঃক্রিয় হাপরেব মতো বাতাস জোগায়—তা কি গঙ্গা ও রাহুলের মধ্যে দেখা দিয়েছিল সেদিন ? সমবয়সী দুজন কিশোর-কিশোবী ছিল তারা। ঐ সময়টা মোটেও অনুকূল ছিল না প্রেম-ভালবাসার পক্ষে। অথচ কী একটা ঘটে গিয়েছিল। একটা নিষ্ঠুর টান যেন দুজনকে বারবার কাছাকাছি হতে বাধ্য করেছিল। আর টের পাওয়া যাচ্ছে যে সেটা ছিল নিছক প্রকৃতির ষড়যন্ত্র। সেটা ছিল ভীতু বোকা-বোকা আড়ষ্ট যৌনতা মাত্র। সুযোগ যদিও বা ছিল নিরঙ্কুশ, তাকে কেউই চমৎকারভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই ঘরে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকলেও কেউ এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না। আর টানটা ছিল গঙ্গারই বেশি। সে উত্যক্ত করে মারত রাহুলকে। নখে আঁচড়াত। কামড়াত। রাহুলের মতো ছেলেকেও সে ভয় পাইয়ে দিতে পারত।

কিন্তু একটা পাপবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলত রাহুলকে। হ্যাঁ—মাত্র রাহুলকেই। গঙ্গা যেন কিছুই পরোয়া করে না। বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে। মা নেই। ছেলেবেলায় মারা গেছে। তার মা মারা যাবার আগেই—গঙ্গার বয়স তখন সাত, রোগশয্যায় শুয়ে মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে চেয়েছিল। কীর্তিচকের উকিল সত্যনারায়ণ বাবুর স্ত্রী ছিল গঙ্গার মায়ের সই—একই গাঁয়ের মেয়ে ছিল তারা। ছেলেবেলাতেই একঘড়া গঙ্গার জল ছুঁয়ে দুই সই দিব্যি করেছিল যে যদি তাদের ছেলেমেয়ে হয়, তাদের বিয়ে দেবে, আর যদি দুজনেরই ছেলে বা মেয়ে হয়—তাদের·

মধ্যে বন্ধুতা থাকবে। গঙ্গাকে বুঝতে পারলে তার মাকেও নাকি বোঝা যায়। জেদী বেপরোয়া একরোখা মেয়ে ছিল গঙ্গার মা। আর গঙ্গা ফিক করে হেসে চাপাস্বরে বলেছিল, এই, জানো? আমার বাবা স্ত্রৈণ। রাহুল বলেছিল, স্ত্রৈণ মানে? গঙ্গা অবাক! সে কি গো! তুমি স্ত্রৈণ মাণে জানো না? তুমি না উঁচু ক্লাশে পড়ো! হুঃ, আমি তো সেই পাঠশালা বাদে আর যা পড়েছি, তা বাড়িতে মাস্টারের কাছে —আমি কথাটার মানেজানি, তুমি জানো না?…রাহুল লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। আর, আর একদিন কী কথায় গঙ্গা হঠাৎ তাকে বলে ফেলেছিল, এই! তুমি বড্ড স্ত্রৈণ। তখন থেকেবলছি—আমার আজ কিচ্ছু ভাল লাগে না, তবু তুমি সঙ্গ ছাড়ছ না!…রাহুল শুধু লজ্জা নয়—রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে চলে এসেছিল। গঙ্গা হঠাৎ অকারণ এমনি করে বসত তাকে। গঙ্গার যেন কোন দুঃখ নেই। কোন হতাশা নেই। সে নির্বিকার। সে জানত, আর তার বিয়ে হবে না। কোন পুরুষকে সে এ জীবনে পাশে পাবে না। তবু তার কোন ভাবনা নেই।

একমাস মাত্র রাহুল ওখানে ছিল। তারপর তাকে চলে আসতে হয়েছিল। আসবার সময় গঙ্গা তাকে বলেছিল, আবার এসো কিন্তু? আসবে তো? আমার বড্ড খারাপ লাগছে। ছাই, কেন যে তোমার সঙ্গে মিশেছিলুম! আর শোন, চিঠি-টিঠি লিখো না কিন্তু। আমি বিধবা। ঢি ঢি পড়ে যাবে চান্দিকে।

রাহুল বলেছিল, লিখবো না।

হঠাৎ গঙ্গা তার হাত ধরে বলেছিল, তুমি তো কিছু বলছ না?

কী বলব?

আমাকে তোমার কেমন লাগল, শুনি? ভাল, না মন্দ? তেঁতো না মিষ্টি?

রাহুল একটু হেসে বলেছিল, উঁহু বড্ড ঝাল!

শুনে গঙ্গার সে কী হাসি!…ও মা গো! আমি ঝাল! কিসের ঝাল শুনি? ধানী লঙ্কার তো! গলাবুক জ্বালা করছে বুঝি!

হাসতে হাসতে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটু পরে তার মুখের রঙ বদলে যেতে দেখেছিল রাহুল। গঙ্গা বলেছিল, তুমি বড্ড কম কথা বলো। যাক্ গে, শোন। আমি আমি আবার খুব একলা হয়ে গেলুম।…আচ্ছা, এসো। তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সে চলে গিয়েছিল। বাবার নতুন বাসা—একতালা পুরনো ঘরের বারান্দায় উঁকি মেরে রাহুল দেখেছিল, গঙ্গা আগাছার জঙ্গলে ভরা ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে হনহন করে চলে যাচ্ছে। বাবা তখন বাইরে ছিলেন। ভবানীবাবুর সঙ্গে মাঠের দিকে বেরিয়েছিলেন। বাবার সময় ছিল না, তাকে বিদায় দেবার। বলে গিয়েছিলেন, ঘরের চাবিটা গঙ্গার কাছে রেখে যাস। রাস্তার মাটিকাটার জরীপ আছে কিছু—কাল সন্ধ্যা অব্দি শেষ করা যায়নি। আমি চললুম। কেমন? অসুবিধে হবে না তো?…

ঙ্গাকে চাবিটা দেবে বলে ডেকেছিল, অথচ গঙ্গা হুট করে চলে গেছে। তাই ফের যেতে হয়েছিল তার কাছে। গঙ্গা নির্বিকার মুখে হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিয়েছিল। আর একটিও কথা বলে নি। সে স্থির মৌন দাঁড়িয়ে থেকেছে।

তারপর যতদূর গেছে রাহুল, তার মনে হয়েছে গঙ্গা যেন তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কষ্টটা তখনই এসেছিল মনে। যেন গঙ্গাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে এল সে। সারা জীবন সে দাঁড়িয়ে রইল অমনি করে।

আর এই দুঃখময় অনুভূতিই কি প্রেম? কিন্তু তখন সে কিশোর। দেহের তীব্রতাটা নিয়েই সে ছিল ভাবিত, মনের তীব্রতা সে স্পষ্ট টের পায় নি। গঙ্গা তার অপরিণত ষোলবছরের শরীরে একটা জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল—সে জ্বালা শরীর ঘুরে-ঘুরে একদা একসময় নিভে গেল। মন ছিল আরও দূরে—আগুনের নাগালের বাইরে। মনে একটুও আঁচ লাগে নি।……

হ্যাভারস্যাকের ছিপি খুলে ঢকঢক করে জল খেল রাহুল! চোখ দুটো জ্বালা করছে। একটা গগলস থাকলে এত ভালো হত! সামনে-পিছনে দু'পাশে শস্যহীন ঢেউখেলানো ধুধু মাঠ আগুনে পুড়ে যেন ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এত ক্লান্তি এত কষ্টের বিনিময়ে শুধু কিছু টাকা পাবার আশা আছে বলে এতক্ষণ উৎসাহী ছিল সে। কিন্তু এখন গঙ্গার কথা মনে পড়ে গেলে সে দেখল, টাকা পাওয়াটা খুবই তুচ্ছ লাগছে। একটু করে চঞ্চলতা তার মধ্যে জেগে উঠছিল। গঙ্গা আছে, গঙ্গা! আজ গিয়ে তাকে দেখবে যুবতী হয়ে উঠেছে। সম্ভবত আরো সুন্দর আরোও মারাত্মক হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু এখনও কি সে তেমনি আছে আর? তেমনি উদ্দাম বেপরোয়া আর দেহের দিকে অতি-সাহসিকা? সে-বয়েসে নিজের নারীদেহের গুরুতর পরিণতি নিয়ে গঙ্গা একটুও উদ্বিগ্ন ছিল না যেন। আজ অবশ্যই তার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। আজ নিশ্চয় সে জেনেছে যে, তার দুরন্ত মনের তৃষ্ণার কাছে ওই দেহটাই ভীষণ বৈরী। নিজের রক্তমাংসের অস্তিত্ব আজ তার সামনে দিক-বোধকারী বিশাল পাহাড়। দুর্গে নিঃসঙ্গ বন্দিনীর মতো তার আজ কালযাপন!

গঙ্গার জন্যে আশ্চর্য সমবেদনায় অভিভূত হল রাহুল। তাকে দেখবার চেষ্টা করল। শ্যামবর্ণা ছিপছিপে অথচ নিটোল শরীর—দুটি টানা উজ্জ্বল চোখ, ডিমালো মুখ। ওর চেহারা দেখে রাহুলের মনে পড়ে যেত ইতিহাস বইতে দেখা অজন্তা গুহাচিত্রের সেই মা ও মেয়ে ভিখারিনীর কথা। গঙ্গার সঙ্গে মায়ের চেহরোর আশ্চর্য মিল! রাহুলের রঙটা বেশ ফরসা। গঙ্গা তার হাতে নিজের হাতটা মিশিয়ে বলত, ছ্যাঃ, আমি কী কালো দেখছ? রাহুল সান্ত্বনা দিয়ে বলত, না—তুমি ঠিক কালো নও তো। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ওই রঙটাই তো ভালো! আমি যদি তোমার মতো রঙ পেতুম, খুব ভাল লাগত। গঙ্গা বলত, যাও। তোমার শুধু মনরাখা কথা।……

সেই গঙ্গা! তাকে কেমন করে ভুলে গিয়েছিল রাহুল? আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইণ্ড, কথাটা তাহলে মিথ্যা নয়।

কিংবা আসলে সেটাও তুচ্ছ—রাহুলের জীবনে পরবর্তী ঘটনাগুলোই এই বিস্মৃতির জন্যে দায়ী।

কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিতে হল। বাবা আর এলেন না, সেই যে গেলেন। মাঝেমাঝে চিঠি লিখতেন—কিছু টাকা পয়সা পাঠাতেন। রাহুল কোন চিঠির জবাব দিত, কোনটার দিত না। সে টের পাচ্ছিল, বাবা যেন আস্তে আস্তে অন্য মানুষ হয়ে উঠছেন। একটা আবছা দূরত্বের স্পর্শ অনুভব করত রাহুল। দুঃখ বা অভিমান? হয়তো পেত—হয়তো পেত না। ততদিনে তার জীবনেও একটা পরিবর্তন সুরু হয়েছিল। সেই পরিবর্তন একসময় নাটকীয়ভাবে তাকে অন্য চরিত্রের ভূমিকা দিল। এই ভূমিকার সঙ্গে সে এখন একাকার। তার বাইরে নিজের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পেতে কষ্ট হয় মাঝে মাঝে।

বহরমপুরে আজ তার একটা তীব্রধরনের পরিচিতি আছে। কলেজে পড়ার সময় সেই যে নিজের গ্রাম ছেড়ে তাকে এই শহরে যেতে হয়েছিল। তখন থেকে গ্রামের ভিটেটা পোড়ো হয়ে গেছে। বহরমপুরেই বাস করছিল সে। কুখ্যাত নেপাল দাস—নেপো গুণ্ডার ডান হাত হয়ে উঠেছিল রাহুল। সে এক বিচিত্র উত্তেজনায় ভরা জীবন! আজ রাহুল আর সে-রাহুল নয়—কুখ্যাত 'রাহুল' গুণ্ডা। বার দুই ছোটখাটো জেল খেটেছে সে। তার দুর্দান্ত স্বভাব আরও দুর্দান্ত হয়েছে দিনে দিনে। জেল থেকে বেরিয়ে শুনেছিল, তার নেপালদা খুন হয়ে গেছে পুলিশের গুলিতে। বন্ধুরা কেউ জেলে, কেউ ফেরার। সে অসহায় হয়ে পড়ল। দাঁড়াবার জায়গা নেই কোথাও। কেউ তাকে আশ্রয় দিতে চাইবে না। অগত্যা গ্রামে ফিরতে চেয়েছিল। একেবারে নিঃস্ব তখন সে। চা খাবার পয়সাও নেই। টাকা পয়সা যা কিছু ছিল, তা নেপালদার হাতে। ক্লান্ত শরীরে সে যখন ব্রীজ পেরোচ্ছে, হঠাৎ একটা আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে গেল। একটা জীপ যেতে যেতে থেমেছিল তার পাশে। আই. বি. র বড়কর্তা রাজেনবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। রাজীববাবু তাকে ডেকেছিলেন—রাহুল না?···

ঘটে গেল এই অদ্ভুত যোগাযোগ। রাহুলকে ময়নাচকের পথে পাড়ি দিতে হল। দায়িত্বটা গুরুতর। এর যে কোন পরিণতি ঘটতে পারে। মৃত্যুর যন্ত্রণা কিংবা জীবনের আনন্দ। মাঝামাঝি কোন পরিণতি কল্পনা করা যায় না এ কাজে। রাজেনবাবু বলেছেন, এ তুমিই পারবে। কারণ, আফটার অল—তুমি শিক্ষিত ছেলে, বুদ্ধিমান। তা ছাড়া সেবার ঝণ্টুর মাগলিং র‍্যাকেট ভাঙতে যে সাহায্য তুমি করেছিলে, তা আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই—এক্ষুনি তৈরি হও। মাইণ্ড দ্যাট, কাজ শেষ হলেই তুমি নগদ পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছ। তখন একটা ছোটখাট ব্যবসা করে সৎভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে পারবে। আমি তোমাকে

সাহায্য করব—আই এ্যাসিওর।……

রাজেনবাবু জানতেন, রাহুলের বাবা ময়নাচকে আছেন। রাহুলের সব ইতিহাসই তাঁর নখদর্পণে। কলেজে পড়ার সময় গুণ্ডামিতে রাহুল রপ্ত হয়ে গেলে বাবা তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন—অবশ্য সেটা চিঠিতেই। বাবার কাছে তার কীর্তিকলাপের খবর কে নিয়মিত পোঁছে দিত কে জানে! এটাও রহস্যময় ব্যাপার। আজ বাবার কাছেই সে আশ্রয় নেবে। নিতে হবে তাকে। কারণ, কাজটা কতদিনে শেষ করা যাবে—কিছু ঠিক নেই। বাবা তাকে আশ্রয় না দিলে কিন্তু সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। ময়নাচকে সে থাকবে কোন অছিলায়?……

মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে রাহুল। বাবা তার আবেগবিহ্বল অপরাধ-ক্ষমা-চাওয়া লম্বা চিঠিটা পেয়েছেন তো? যদি না পেয়ে থাকেন। এইসব অজ পাড়াগাঁয়ে চিঠি পৌঁছতে এখনও অনেক বেশি সময় লেগে যায়। এই এলাকায় সরকারী উন্নয়নের কাজ খুব দ্রুত হয়নি। অশিক্ষিত চাষাভূষো মানুষের সংখ্যাই বেশি। দশ বছর আগে একটা হাইওয়ে বানানো হচ্ছিল। ময়নাচকের ভবানীবাবু তার পাঁচ মাইলের কণ্ট্রাক্ট নিয়েছিলেন। ভবানীবাবুর সঙ্গে কী সূত্রে পরিচয় ছিল বাবার। তার একজন বিশ্বস্ত লোক দরকার ছিল। ভাল মাইনে ও থাকার জায়গা পাওয়া যাবে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে চাকরী ছেড়ে ময়নাচকে চলে গিয়েছিলেন।

রাহুল একটু হেসে ভাবল, চিঠি না পেলেও—বাবা ইজ বাবা। ছেলেকে কি মুখের ওপর তাড়িয়ে দিতে পারবেন? রাহুল তাঁর পা জড়িয়ে ধরবে। কান্নাকাটি করবে। বলবে যে সে জেল থেকে বেরিয়ে পুরো সৎমানুষ হয়ে গেছে। আর পাপের ছায়াটিও মাড়াবে না। বাবা তাকে এবার ইচ্ছেমতো নিজের পথে চালান। তা ছাড়া বাবারও বয়স হয়েছে—একজন দেখাশোনার লোক দরকার। তার মত যোয়ান ছেলে থাকতে বাবার অসুবিধে কিসের! বরং ভবানীবাবুকে বললে একটা কিছু কাজও জুটে যেতে পারে। আর সেইটাই মস্তো সুবিধে। শক্ত প্ল্যাটফরম পাওয়া যাবে পা রাখবার এবং গোপনে কাজ করবার।

অন্যমনস্কতা কেটে গেল রাহুলের। সামনে সেই ছোট নদীটা। একটুও জল নেই। সেদিনের মতো ধুধু বালির চড়া। ওপারে সামান্য দূরে সেই শ্মশানটা। ঝোপঝাড়গুলো পিঙ্গল রঙ ধরেছে। একটা ঘোরতর রুক্ষতার ছাপ সবখানে। একটুও রস নেই—যেন প্রাণের চিহ্নও নেই কোথাও। এই নিরস নিষ্প্রাণ মাটিতে তার মায়ের দাহ হয়েছিল!……

দ্বিতীয় উত্তেজনা হঠাৎ তাকে নাড়া দিল। সে নদীর খাড়া পাড় বেয়ে এক দৌড়ে নেমে গেল বালির ওপর। কোথাও একটু জল নেই। ধুধু শুকনো বালি উড়ছে ঝাঁঝাল হাওয়ায়। জুতো না থাকলে পায়ে ফোস্কা পড়ে যেত। সে ওদিকের ঢালু পাড় বেয়ে উঠে গেল। খয়েরী বা পিঙ্গল সব ঘাস কাঁটাঝোপ এখানে ওখানে রোদে

ধুঁকছে। তার মধ্যে পোড়া কাঠের টুকরো আর মাটির সঙ্গে জমাট হয়ে যাওয় কালো ছাই দেখে শ্মশানটা চিনতে পারল সে। যেখানটায় মায়ের চিতা সাজানো হয়েছিল, তার পাশে সেই ভেঙেপড়া প্রকাণ্ড শ্যাওড়া গাছটা এখনও রয়েছে। আর কী যেন ছিল! একটু খুঁজতেই মনে পড়ল, হ্যাঁ—একটা শিমুল গাছ। সেটা নেই। শিমুল গাছটার গায়ে দীর্ঘ কয়েকফালি কালো দাগ দেখে বুঝেছিল ওটা বাজ্রহত। তাহলে পরে একদিন শিমুলগাছটা শুকিয়ে মরে গেছে। তখন গাঁয়ের লোকরা কেটে নিয়ে গেছে তাকে। হেলেপড়া শ্যাওড়াগাছের খসখসে সরু সরু পাতার ঝাঁপি—ছায়ার আয়তন সামান্যই, তবু সেদিনের মতো আজও রাহুল তার নিচে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা দেহ মন জুড়িয়ে গেল। এতক্ষণে পকেট থেকে সিগারেট বের করল সে। ধরাল। হ্যাভারস্যাক খুলে শেষ জলটুকুও খেয়ে নিল।

তাহলে সে এজন্যেই পায়েহাঁটা দুর্গম ওই তেপান্তর মাঠের পথ পাড়ি দিয়েছে তার মায়ের শ্মশানটা একবার দেখবার ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসেছিল। জানে—কি আর পাবার নেই। কোন স্নেহবিহ্বল কণ্ঠস্বর কোন সাড়া আশা করা বৃথা তবু কী দুর্দমনীয় আকর্ষণ তাকে এই পথে টেনে এনেছে। ময়নাচকে পায়ে হেঁটে পেঁছিতে হলে হয়তো অনেকটা ঘুরে যেতে হয়—ট্রেনে কটোয়া, কাটোয়া থেকে ছোটলাইনে কিছুদূর—তারপর আজকাল সেই হাইওয়েতে বাস চলছে সারাক্ষণ-কোন অসুবিধে ছিল না। দিব্যি চোখবুজে রাজার হালে আসা যেত।

তাহলে যেন মায়ের অতৃপ্ত আত্মা তাকে এখানে ডেকেছিল। রাহুলের চোখ ফে জল এল। বাবার প্রতি দুঃখে ঘৃণায় অস্থির হচ্ছিল সে। হয়তো এ দুঃখঘৃ নতুন নয়—দশ বছর আগের সেই মর্মান্তিক দিনটিতে যে বীজ তার মনে পোঁত হয়েছিল, আজ সেটা বিষাক্ত ফলের গাছ হয়ে মাথা তুলেছে। সে ঠিক করতে পার না বাবার সামনে কীভাবে দাঁড়াবে সে! বাবাকে সইতে পারবে কতখানি, তাও স্প নয় নিজের কাছে। তাকে তো মুখোস পরে থাকতেই হবে—কারণ, রাজেন হাজ তার হাতে একটা মুখোস দিয়েছে, কিন্তু বাবার সামনে এ মুখোসটাও যথেষ্ট নয় আরো একটা বড্ড জরুরী। বাবাকে টের পেতেও দেবে না সে তাঁর ওপর মা দরুন ক্ষুব্ধ—কোনদিনও বলবে না যে তার তরুণ জীবনের এই পরিণতির জ আসলে দায়ী তার বাবার নির্বিকার মনোভাব। কোনদিন যদি একবারের জন্যে বাবা তার কাছে যেতেন, আদর করতেন—সে সৎ হয়ে উঠত।

সেই কৈফিয়তই কি আজ সে প্রকারান্তরে বাবার কাছে নিতে যাচ্ছে? সেইজন্যে কি রাজেনবাবুর প্রস্তাব শুনে সে নেচে উঠেছিল? টাকা তার দরকার, শুধু দরক নয়—জরুরী। কিন্তু টাকা যেন একটা নিছক উপলক্ষ।

মনে মনে মায়ের আত্মার উদ্দেশ্যে সে বলল, শান্তিতে থাকো। আমাকে ক্ষ করো। তখন আমি ছোট ছিলাম। কিছু বুঝিনি। আজ বুঝতে পারি। এ

নির্বিকার নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের পাল্লায় পড়ে তোমার মনে কোনদিন শান্তি ছিল না। এই লোকটা যতখানি ছিল বাক্যবাগীশ ততখানি আন্তরিকতা তার ছিল না। না—দারিদ্র্য নয়, তার নির্বিকার আচরণই তোমাকে সারা জীবন কষ্ট দিয়েছে। আজ আমার সব মনে পড়েছে, মা। স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে ছেলেবেলার সব ঘটনাগুলো। রাতে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতুম—আর তোমাদের সেই তেঁতে বেচ্ছিরি বচনগুলো শুনতাম। তোমরা টের পেতে না পরস্পর সন্দেহের বিষে তোমরা জ্বলেপুড়ে মরতে। পরস্পরকে আঘাত করতে কিন্তু আমার সামনে দিব্যি চমৎকার মুখোস পরে কাটাতে, আমি সব জানি।······

বাবার সঙ্গে মায়ের বয়সের তফাৎ ছিল অনেক। পনের ষোল বছর কিংবা তারও বেশি। মায়ের মুখেই শুনেছে সে। আজ সে বুঝতে পারে ওদের মধ্যে এই বয়সের অসামান্য পার্থক্যটাও হয়তো গুরুতর কাজ করেছে। কিন্তু না তো খুব শান্ত সহজ মনের মানুষ ছিলেন। সামঞ্জস্য করে নিতে জানতেন নানা ব্যাপারে। শুধু বাবা—বাবা বড় জটিল, সন্দিগ্ধ আর হিংস্র প্রকৃতির মানুষ যেন। পাড়ার মানুষ সরিৎকাকার সঙ্গে মায়ের একটু মেলামেশা ছিল। সে নিয়ে এক রাত্রে······

হঠাৎ কোথায় গুড় গুড় করে চাপা শব্দ হল। চমকে উঠে রাহুল দেখল, বাতাস কখন থেমে গেছে। বিশাল আদিগন্ত মাঠের ওপর খসখসে ধূসর একটা ছায়া পড়েছে। পশ্চিমের আকাশটা চাপচাপ মেঘে ঢেকে যাচ্ছে—সে মেঘের রূপ ভয়ঙ্কর। কোথাও কালো কোথাও রক্তিম—দীর্ঘ বিস্তৃত একটা রুদ্র ব্যাপকতা ক্রুদ্ধ জন্তুর মতে ফুঁসছে। কালবোশেখি! কালবোশেখি আসছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে এসে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর।

যেন লক্ষ লক্ষ বুনো মোষের পাল গাঁক গাঁক করে দৌড়ে চলল পশ্চিম থেকে পূর্বে। পৃথিবী কাঁপতে লাগল তাদের ক্ষুরের আঘাতে। ধারাল শিঙে উপড়ে যেতে থাকল গাছপালা। টলতে টলতে দৌড়চ্ছিলে সে। আঁধির আড়ালে সেই ছোট্ট গ্রামটা লক্ষ্য করা গেল না। রাহুল দৌড়াচ্ছিল। চোখ খুলতে পারছিল না।

তারপর শুরু হল শিলাবৃষ্টি। মেঘের গর্জন বাড়ল। রাহুল দিশেহারা হয়ে ছুটে যাচ্ছিল। বৃক্ষবিরল নির্জন মাঠ পেরিয়ে যেতে যেতে তার মনে হল, আর পৌঁছনো যাবে না। দিকচিহ্নহীন উত্তাল একটা ধ্বংসের ব্যাপকতায় সে মরীয়া বেঁচে থাকবার চেষ্টে করেছিল। তার মনে হচ্ছিল—যেভাবেই হোক তাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন। ভিজে মাটির একটা গন্ধ উঠছে। আকাশে নক্ষত্র ফুটছে। বছরের প্রথম বৃষ্টির স্বাদে আনন্দিত কীটপতঙ্গের জগতে একটা বিপুল সাড়া পড়ে গেছে। বজ্রাহত গাছ, ভাঙা পাখির বাসা, মরা খেঁকশিয়াল আর দল পাকানো খড়কুটোর মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সে।

একটা আলো আসছিল দূরে। কাছে এলে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। রাহুল জিগ্যেস করল, ময়নাচক আর কতদূর বলতে পারেন ?

লোকগুলো আসছিল, সেখান থেকেই। ময়নাচকে হাইওয়ের ধারে আজকাল বাজার বসেছে। সে পড়াগাঁ আব নেই। পয়সাওলা লোকেরা সবাই ওখানে গিয়ে বাড়ি করেছে। ইলেকট্রিকের আলোয় সেজেগুজে ময়নাচক আজ একালের সুন্দরী। সামনের গাছগুলো পেরোলেই দেখতে পাবেন আলোর ঝিকিমিকি। ভবানীবাবুর কথা বলছেন ? তিনি মারা গেছেন। তবে তার মেয়ে আছে—ভালই আছে। যদি বলেন কেমনভাল—কিসের ভাল—অত কৈফিয়ৎ দিতে পারব না মশাই। নিজে গিয়েই দেখুন। বড়রাস্তার ধারে নতুন বাড়ি। জিগ্যেস করবেন, মুক্তকেশী হোটেলটা কোথায়। ভূতে দেখিয়ে দেবে। আজ্ঞে হ্যাঁ—ওটা ভবানীবাবুর মেয়েই খুলেছে। সবরেজেস্টরী আপিস, ব্লক-আপিস—কত সব রয়েছে কিনা ! তাই নানা গাঁয়ের লোক ওখানে এসে দিন রাত্রি পড়ে থাকে। পেটটা তাদের যখন আছে তখন একটা সুব্যবস্থাও করা চাই তার।

যে জবাব দিচ্ছিল, সে বাড়ির জন্যে হয়তো ব্যস্ত। হড়বড় করে বলে যাচ্ছিল কথাগুলো।

···বহরমপুর থেকে আসছেন ? তা এ হাঁটা পথে কেন ? মশাই সুপথ দূর ভালো। কার কথা বললেন ? হৃষিকেশবাবু ? কেউ হয় নাকি ? হয়-না ? আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি আর ভবানীবাবুর মেয়ে একজায়গাতেই থাকেন। থাকবেন না তো যাবেন কোথায় ? হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ ! আর বলবেন না স্যার—সে এক মজার কাণ্ড !

রাহুল একপা এগিয়ে উত্তেজিতভাবে জিগ্যেস করল, কী, কী কাণ্ড বলুন তো ?

লোকটা বলল, হৃষিকেশবাবু এখন নতুন রঙ্গে মজে আছেন। ভবানীবাবুর বিধবা মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে যে ! হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁ !

মাথা ঘুরে উঠেছিল—কতক্ষণ পরে রাহুল দেখল, সে একা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। আলোটা নাচতে নাচতে দূরে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। এটা একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে সে জেগে ওঠার জন্যে ছটফট করতে থাকল। গঙ্গা, সেই গঙ্গা !

হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে রাহুল মনে মনে হিসেব করছিল। রাজেনবাবু আসবার সময় দশটা মাত্র টাকা দিয়েছেন রাহাখরচ বাবদ। রাত্তিরটা এখানে না কাটিয়ে সোজা ফিরে যাওয়া যায় কিনা তাকে খোঁজ নিতে হবে। সে লক্ষ্য করছিল, কিছুক্ষণ পর-পর অনেক ট্রাক আনাগোনা করছে। বাস না পেলে একটা ট্রাকেই স্টেশন অব্দি পৌঁছনর ব্যবস্থা করা হয়তো সম্ভব হবে। রাতের দিকে ট্রেন না থাকলেও ক্ষতি

নেই। স্টেশনে রাত কাটাবে। কিন্তু এখানে নয়। কখনো নয়।

রাগে দুঃখে ঘেন্নায় তার মনটা তেঁতো। ক্ষিদেতেষ্টাও ভুলে গেছে। ময়নাচক তার পায়ের নিচে যেন কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। তাকে পালাতেই হবে এখান থেকে। এখুনি। ফিরে গিয়ে রাজেনবাবুকে বলবে—ও আমার দ্বারা হবে না স্যার। কারণ স্বরূপ বানিয়ে কিছু বলবে সে। তারপর ?

রাহুলের শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ তার মনে হল—যে অন্ধকারের মধ্যে এতকাল সে বাস করেছিল, সেই অন্ধকারটা ফের তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। নেপালদা হীরু খোকা মনা—সকল অন্ধকারের সহচর তাকে তার মধ্য থেকে হাতছানি দিচ্ছে। পলকে-পলকে নিজের ভিতর সে অন্ধকারে স্বাদ স্মৃতির ঘর ভেঙে বেরিয়ে এল। ব্যাগের ভিতর হাত ভরে অটোমেটিক রিভলবারটা আছে কিনা দেখে নিল সে। এই যন্ত্রটা তার ব্যাগের ভিতর একটা মোজার প্যাকেটে মোড়কবাঁধা অবস্থায় রাখা ছিল—জেলে যাবার কিছুদিন আগে, যে দিন সন্ধ্যায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সেদিন বিকেলে পানওয়ালা ভুজুদার কাছে জিম্মা দিয়েছিল ভাগ্যিস ! বুড়োমানুষ ভুজুদা সেটা খুলেও দ্যাখেনি অবিকল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে গতকাল। ত্রিশটা কার্তুজ ছিল—একটাও খোওয়া যায়নি। কিন্তু কাজে লাগবে কিনা কে জানে ! পুরনো হয়ে গেছে তো বটেই—তার ওপর সদ্য জলঝড়ে ভিজে যায়নি তো ? পরীক্ষা করবার জন্য তার মনটা চনমন করে উঠল। এখন আফশোস লাগে—সেই বিশাল নির্জন মাঠে চমৎকার সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু আশ্চর্য, একবারও এটার কথা তার মনে ছিল না। সারাপথ তার মনটা জুড়ে ছিলেন মা আর বাবা—তারপর গঙ্গা।

প্যাকেটটা পীচবোর্ডের। হাত ছুঁইয়ে টের পাচ্ছিল, সেটা বেশ ভিজে উঠেছে। কিন্তু তাহলেও এতক্ষণে তার মনে একটা বিপুল সাহস অভাবিত পরাক্রমে ফুঁসে উঠেছে। জেল থেকে বেরিয়ে ভুজুর কাছে ওটা ফেরত নিয়ে তখন তো তার মনেই হয়নি যে সে শক্তিমান? আসলে, তখন একটা ক্লান্তি তাকে নিরাসক্ত করে তুলেছিল। ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতার বোধে সে ভেঙে পড়েছিল। অথচ এই ছঘরা অটোমেটিক পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের অস্ত্রটা যতক্ষণ তার হাতে আছে, ততক্ষণ তার বেঁচে থাকার আর ভাবনা কিসের ?

শুধু জানা দরকার, কার্তুজগুলো কাজ দেবে কি না। যদি কাজ দ্যায়, সে ফের শক্তিমান। উৎসাহে চাঙ্গা হল রাহুল। দুধারে ছোটখাটো বাজার। আলো ঝলমল পরিবেশ। খুব ভিড় না হলেও লোকজন খুব কম নেই। একটা চায়ের দোকান লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল সে। ক্ষিদে পেয়েছে এতক্ষণে। কিন্তু তার আগে এক কাপ চায়ের তেষ্টা তাকে অস্থির করছিল !

কজন লোক আড্ডা দিচ্ছে দোকানটায়। ভিতরে দু দেয়ালে ঘেঁষে দুটো কাঠের বেঞ্চ। সামনে হাতখানেক উঁচু প্ল্যাটফরমে চা-ওলার কাজকারবাব। বাইরেও

বাঁশপাতার দুটো বেঞ্চ পাতা রয়েছে খোলা আকাশের নিচে। আবহাওয়ায় স্নিগ্ধতা আজ। বৃষ্টির ফলে উৎকট গরমটা কমে গেছে। রাহুল বাঁশের বেঞ্চে বাইরেই বসে বলল, চা দিন। বিস্কুট নেই? দিন।

চা-ওলা তাকে দেখছিল। বলল, মশায়ের নিবাস?

রাহুল একটু বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, বহরমপুর।

বহরমপুর!……চা-ওয়ালা ছাকনিতে এক চামচ চা দিয়ে বলল, অ। কেমন যেন চেনাচেনা ঠেকছিল, তাই কইতাছিলাম।

রাহুল ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। অন্য লোকগুলো সম্ভবতঃ ব্যবসায়ী —ছোটখাট ব্যবসা-ট্যাবসা করে। তারা সেই ধরনের কথাবার্তায় জমে রয়েছে।

চা-ওলা ফিক করে হাসল হঠাৎ।…মশায়ের মুখের লগে আমাগো ঋষিবাবুর মিল আছে। নাই চন্দ্রদা? দ্যাহ না চাইয়া। আছে না? এক্কেরে ঠিকঠাক।

কালো কুচকুচে লোকটি—সাদা গোঁফ, ছোট ছোট কদমকেশর কাঁচাপাকা চুল, একবার দেখে নিয়ে বলল, তা মাইনষের লগে মাইনষের মিল থাকবে না ক্যান?

চা-ওলা বলল, জিগানেই বা দোষ কী? আমাগো ঋষিমাষ্টার মশায়ের একগো পোলা আছিল। মাষ্টারমশায়ের মুখেই গল্প শুনছি তেনার।

রাহুল চমকে উঠেছিল। লোকটা ভীষণ গায়েপড়া তো! সে বলল, একটু তাড়াতাড়ি দিন। আমার তাড়া আছে।

চা-ওলা অতৃপ্ত মুখে চায়ের কাপ আর দুটো বিস্কুট এগিয়ে দিল। তারপর বলল, ঋষিবাবু কেউ হন না আপনার? তেনার পোলা কিন্তু বহরমপুরেই থাকেন শুনছিলাম।

রাহুল বিরক্তমুখে বলল, আপনাদের ঋষিবাবুকে আমি চিনি নে। তার ছেলে হলে এখানে বসে চা খাচ্ছি কেন?

হ—সে তো ঠিকই।…চা-ওয়ালার মুখটা নীরস দেখাল। সে কালো লোকটির দিকে ঘুরে বলল, মাষ্টারমশাই সেদিন কইছিলেন—হোটেলটা তুলে দেবেন। বুঝলে চন্দ্রদা? পোষায় না। পোষাবে কেমন কইরা? সব নিজের হাতে না রাখলে লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাইয়া ফেলব। বাস্‌ বে, সাক্ষাৎ মা কালী রয়েছেন ঘরে, তার ওপর কথা চলবে না।…চা-ওলা হাসতে লাগল।

চন্দ্রদা লোকটি বলল, আরে ছাড়ান দ্যাও, ও খানকি ছেনালডার কথা। অন্য কথা কও, শুনি।

রাহুল ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল। বলল, আচ্ছা, এখন এখান থেকে অমলাহাট স্টেশনে যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে বলতে পারেন!

চা-ওলা বলল, আর তো বাস নেই এ্যাহন। আবার সেই ভোরবেলা। সন্ধ্যা ছটায় লাস্ট ট্রিপ ছাড়িয়্যা গেছে' অনে। তবে ট্রাক পাইলে পাইতে পারেন।

সেই চন্দ্র বলল, এক কাম করেন। সোজা মুক্তকেশী হোটেলে চলিয়া যান' গিয়া।

ওহানে অনেক ট্রাকড্রাইভার পাইবেন। ট্রাক নামাইয়া খাইয়া লয় তারা।

রাহুল হনহন করে চলে এল রাস্তায়। আশ্চর্য, তার বাবার সঙ্গে তার চেহারার এত মিল আছে, সে ভুলে গিয়েছিল। তার অস্বস্তি হতে থাকল। ময়নাচকে সে খুব সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে যেন। এখানে তার বাবাকে আগের সূত্র ধরে সবাই মাষ্টারমশায় বলে সে জানত। শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে না, বাবা কেন সব থাকতে হোটেল খুলে বসলেন! এটাও একটা রহস্য। ভবানীবাবু মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তাহলে তো তার মেয়ের বেশ পয়সাকড়ি থাকার কথা। বোঝা যায়, কিছু একটা ঘটেছিল—যাতে ভবানীবাবুর মৃত্যুর পর গঙ্গা সম্ভবতঃ খারাপ অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আপাতত কোন কৌতূহল নয়—তাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতেই হবে। যে মেয়েব দেহমনে একদা তার দেহমনের একটা ছাপ পড়ে গিযেছিল—তাকে সে মায়ের আসনে দেখতে পারা তো দূরের কথা, সইতেও পারবে না। তাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

পা বাড়াল সে। সতর্কচোখে দু পাশটা দেখতে দেখতে এগোল। মুক্তকেশী হোটেলটা এড়িয়ে যেতে হবে। গঙ্গা তাকে সাত বছর পর দূর থেকে চিনতে পারবে হয়তো—কিন্তু বাবা? রাহুল টের পেল, একটা গোপন কষ্ট তার অস্বস্তিকে ভেঙে বেবিয়ে আসতে চাইছে। সেই কষ্ট—সেই অবরুদ্ধ যন্ত্রণা উত্তরোত্তর তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল।

ডাইনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তার ওপাশে মাঠ দেখা যাচ্ছিল। অন্ধকার মাঠটায গিয়ে দাঁড়াল সে। এ এলাকায় মাঠগুলো খুব বড়ো—দিগন্তবিস্তৃত। সে পিছু ফিবে দেখে নিল, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না। না। জায়গাটা নির্জন। সে হনহন করে চষা ক্ষেত পেরিয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে থামল। এখানে একটা কার্তুজ পরীক্ষা করা যেতে পারে। আওয়াজ বাজার অব্দি পেঁছিবে বলে মনে হয় না। কারণ মাঠে বাতাস বইছে উল্টো দিকে। সে বসে পড়ল। ব্যাগ থেকে অস্ত্রটা বের করল।···

বিস্ফোরণের আওয়াজটা তার কানে নতুন শোনাল। এ শুধু রিভলবারের গর্জন নয়, তার ভিতর সেই ঘুমন্ত বিশ্রামরত অমানুষিক শক্তিটা হঠাৎ জেগে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করল যেন। রক্ত নেচে উঠল রাহুলের। একটা নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর হননের ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল আগের মতো। গঙ্গাকে খুন করে পালাবে সে? নাকি দুজনকেই। ক্রূর সেই ইচ্ছা তার আঙুলে নিসপিস করে উঠল। ছটা কার্তুজ পুরে রিভলবারটা সে ব্যাগে খোলা রেখে দিল। তারপর বেশ খানিকটা ঘুরে বাজারের শেষপ্রান্তে এসে রাস্তায় উঠল।

একটা কিছু করা দরকার। অমানুষিক শক্তিটা তাকে অবিশ্রান্ত খোঁচা দিচ্ছে। সে দুপাশে তাকিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল। নানা জিনিসের দোকান রয়েছে। খুব

সহজেই হানা দেবার সুযোগ আছে। দোকানে লোকজন বিশেষ নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা জুয়েলারী। রেলিঙঘেরা গারদের মতো ওই দোকান দেখলে তার হাসি পায়। চিড়িয়াখানার মতো। দোকানটায় দুজন লোক অবিকল বানরের মতো গম্ভীরমুখে আলমারি গোছাচ্ছে। আর কেউ নেই সেখানে।

পা বাড়াতে গিয়ে থামল সে। কাজটা খুব সহজ হবে। কিন্তু সারাদিনের ওই প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজটা করতে গেলে তাকে অজানা মাঠের দিকে অনেকক্ষণ দৌড়নোর ঝুঁকি নিতে হয়। সারাটি রাত তাকে ফের হাঁটতে হয় বিদেশ-বিভুঁয়ে। অনেক কষ্টের ব্যাপার। তাছাড়া, কী পরিমাণ পাওয়া যাবে—তাও জানা নেই।

সামান্য দূরে ম্লান আলোয় একটা ইটখোলা আর টালি ভাটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার পাশে স্তূপীকৃত ইট আর টালি জড়ো করা আছে। দেখতে দেখতে মতলব বদলে রাহুল। একবার বহরমপুরের ওদিকে এমনি ইটখোলায় হানা দিয়ে অভাবিত টাকা পাওয়া গিয়েছিল। ইটখোলা মালিকের ঘরটা সচরাচর রাস্তা থেকে দূরে ভিতরের দিকেই থাকে। এটাও সেই রকম মনে হচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা সুঁড়িপথ নিচে নেমে গেছে অন্ধকারে। শেষপ্রান্তে ঢিবির ওপর ঘর—আলো দেখা যাচ্ছে।

রাহুল রাস্তা থেকে নামল। ওদিকে মজুরদের ছাউনি থেকে ঢোলের বাজনার সঙ্গে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওরা টের পাবার আগেই কাজ হয়ে যাবে। রাস্তার দিকে বাজারে খবর তক্ষুনি পেঁছিবে বলে মনে হয় না। সেবারও ঠিক এরকম হয়েছিল। সকাল অব্দি কেউ জানতেও পারেনি। মজার কথা—সেই লোকটির একটা বন্দুকও ছিল দোনলা। কিন্তু কোন ফল দ্যায়নি সেটা। এর কি আছে? লোকই বা কজন? দুজনের বেশী থাকলে একটু বিপদ আছে। দেখা যাক্। অবস্থা অন্যরকম বুঝলে রাতের মতো আশ্রয় নেবে। একটি ভদ্রচেহারার ছেলেকে নিশ্চয় ওরা আশ্রয় দেবে। তারপর……

ঘরটার কাছাকাছি যেতেই তার গায়ে টর্চের আলো পড়ল। একটা কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার জুড়ে দিল। হাতে চোখ আড়াল করে সে থামল। কে ভারি গলায় বলে উঠল—কাকে চাই?

রাহুল একটু হেসে জবাব দিল, ইয়ে—দেখুন। আমি বহরমপুর থেকে আসছি। এখানে নতুন—তাই……

তার বলা শেষ হবার আগেই লোকটা দৌড়ে এল।…আরে রাহুল না?

কে?…রাহুল চমকে উঠেছিল। পরক্ষণেই চিনে ফেলল।…অরুণদা! তুমি এখানে!

কী কাণ্ড! আমি যে দু তিন বছর ধরে এখানে মাটি পোড়াচ্ছি হে, জানতে না? কুমড়োদহ—বাজারসাউ রোডে ইটের কণ্ট্রাক্ট ছিল। কাজ শেষ। বাড়তি রিজেকটেড ইটগুলোর কিনারা করতে শেষ অব্দি থেকেই গেলাম। এস, এস! ইস্, চেনাই

যাচ্ছে না। কদ্দিন তোমায় দেখিনি বলতো?

অরুণ সাঁতারা তার হাত ধরে টেনে ঢিবির ওপর নিয়ে গেল। বারান্দায় চেয়ার রয়েছে। সে বলল, বসো। তারপর, আছো কেমন? এখানে কী ব্যাপার? দুষ্টমি-টুষ্টুমি কমিয়ে—না সামনে চলছে? চলছে?···হাসতে লাগল সে।···ভাল আছ হে! এদুনিয়ায় শালা যার বিষদাঁত নেই, তার কিস্যু নেই। থাক্‌গে, তোমায় দেখে মনে বড় জোর পেলাম ভাই। সব বলব'খন।··তা হ্যাঁ রাহুল? বাবার খবর জানো তো? নাকি এসেই টের পেলে? হুঁস—সে তো আমার এখানে তোমার আসা দেখেই বুঝেছি—কোন মুখেই বা সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! ভদ্রলোককে খুব নিরীহ সহজ মানুষ বলেই জানতাম। এ বয়সে আর ·যাক্‌ গে, মরুকগে। আমার ঠিকনা কে দিল?

রাহুল শুকনো হেসে বলল, পেযে গেলাম।

অরুণ বলল, খুব খুশি হলাম ভাই—খু-উ-ব। তুমি যে আমার কথা মনে রেখেছ ভাবতেই পারি নি। ওরে নেত্য, বাবুকে জলটল দে। ওঠ, কাপড়চোপড় বদলে নাও।

রাহুলের শরীর এতক্ষণে বিশ্রামের জন্যে ছটফট করে উঠেছে।

গভীর ঘুমে রাত কেটে গিয়েছিল। এমন সুন্দর ভদ্র বিছানায় অনেক রাত তার শোওয়া হয়নি। এমন চমৎকার খাওযাও জোটেনি অনেকদিন। খুব ভোরে কোথায় মোরগ ডাকল। পাখপাখালি ডাকতে থাকল। ঘুম ভেঙে সে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল চুপচাপ। গত রাতটা কোথায় নিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ দ্রুত বাঁক ঘুরে কোথায় এনে ফেলেছে। এই অরুণ সাঁতরার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল কিছুটা। ভাবতে পারা যায়নি কোনদিন যে সে তাকে এতখানি খাতির করবে। জামাই আদরে বরণ করে নেবে। হয়তো সময় আর অবস্থায় গুণে মানুষের মনমেজাজেরও হেরফের ঘটে। চরিত্র আর আচরণে অনেক রদবদল এসে পড়ে। মনে নাকি বড্ড জোর পেয়েছে অরুণ তাকে দেখে—এবং অনর্গল আরও কী সব বলছিল, ঘুম শুনতে দ্যায়নি কিছু। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্ত অব্দি রাহুল মনে মনে হাসছিল—তুমি শালা উঁচুদেঁতো কিপটের ধাড়ি অরুণ ইটবাবু, তুমি এখন আমাকে খাতির করছ,—অবশ্যই কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে তলায়-তলায়। তা না হলে- আমাকে রাত্রিবেলা এই নির্জন ইটখোলায় দেখে তুমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে ফেলতে। নিশ্চয় কোন মতলব তোমার আছে হে! আমাকে তুমি তোষক-চাদর বালিস যুগিয়ে পুরোদমে ফ্যান চালিয়ে ঘুমোবার সুযোগ দিচ্ছ, আমি জানি—এ তোমার আতিথেয়তা নয়। কারণ রাহুলকে যারা চিনে, তারা এসব কোনটাই দ্যায় না।·········

এটা বাইরের ঘর। এ ঘরে সে একা ঘুমিয়েছে। ভিতরে আরো দুটো ঘর রান্নাঘর

উঠান নিয়ে এটা অরুণ সাঁতরার বাড়িই বটে। পুরোদস্তুর ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। রাধারঘাট ইটখোলাতে অরুণ একা থাকত। দরমাবেড়ার ঘর, টালির ছাউনি—নেহাত অস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সেখানে। রাহুল জানত, বেথুয়াডহরিতে অরুণের পৈতৃক বাড়ি আছে। সে নানা জায়গায় সরকারী রাস্তার ইট যোগানের কন্ট্রাক্ট নেয়। কাজেই বছরে-বছরে বীরভূম-মুর্শিদাবাদের নানা জায়গায় তার ডেরা বদলাতে হয়। কিন্তু ময়নাচকে আজ যেন স্থায়ী ডেরা বেঁধে ফেলেছে। পনের ইঞ্চি ইটের দেয়ালে এই একতালা বাড়ীটা তুলেছে। জায়গাটা হয়ত সত্যি বসবাসের পক্ষে ভালো। অন্তত যারা গৃহস্থ কারবারী মানুষ—দুপয়সা রোজগার করে ভালভাবে বাঁচতে চায়, তাদের পক্ষে তো বেশ ভাল। অরুণের ফ্যামিলির সব খবর রাহুলের জানা ছিল না। বউ আছে, সেটা না বললেও জানা হয়ে যায়—আটকায় না। কাল রাত্রে অল্পস্বল্প জানা গেছে। ওর বউয়ের নাকি শরীর খারাপ—বিছানায় পড়ে থাকে সারাক্ষণ। অসুখটা কী, তা জানতে উৎসাহ প্রকাশ করেনি রাহুল। ওটা তার স্বভাব নয়। যে তার খাবার পরিবেশন করছিল, যে অরুণের দূর সম্পর্কের কী রকম বোন। মেয়েটি একটু লাজুক মনে হচ্ছিল। পলক ফেলার জন্যে চোখের পাতা স্বভাবত দ্রুত ওঠে পড়ে, রাহুল লক্ষ্য করেছিল—অরুণের এই বোনের চোখের পাতা খুব আস্তে পড়ে এবং ওঠে। খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে কি? স্বাস্থ্যটি বেশ ডগমগে। এমন তাজা সুস্বাদু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে না কেন অরুণ? নাকি রোগা বউর ভবিষ্যত বিকল্প? ও শালা সব পারে। আদিরসের ক্ষিস্তি করতে তো ওর জুড়ি নেই। নেপালদা বলত, অরুণটা একটা ঢ্যামনা—আগের জন্মে বারোয়ারী পাঁঠা ছিল।.........

জানালার বাইরে অনেকটা জায়গা নিয়ে লাল পোড়ামাটি আর ইটের এলোমেলো পাঁজা দেখা যাচ্ছে। ইতিউতি দু একটা গাছপালা, ঝোপঝাড়, ঢিবির ওপর আদিবাসী মজুরদের সারবন্দি কুঁড়েঘর। তার ওদিকে প্রসারিত মাঠের সঙ্গে আকাশটা মিলে গেছে। সাতবছর আগে এই 'গ্রাম নগরীর' (অরুণ বলছিল কথাটা) কোন চিহ্নই ছিল না। একটা কাঁচা রাস্তা, ময়নাচকের পাশ দিয়ে আমেদপুরের দিকে চলে গিয়েছিল। সেটাই এখন হাইওয়ে। পশ্চিমে নদীর ওপর মস্তো ব্রীজও নাকি হয়ে গেছে। দিনেদিনে মালপরিবহনের কাজ বেড়ে চলেছে। কলকাতা ও অনেক জায়গার বড়-বড় ডিস্ট্রিবিউটার্স, সাপ্লাই এজেণ্ট, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর আর সাধারণ ব্যবসায়ীদের এক অখণ্ড স্বার্থের প্রবাহ চলেছে এই নতুন পথে। সার্থের স্বার্থ!...রাহুল হাসল। তার মাস্টার মশাই বাবা ছেলেবেলায় এইসব শব্দভেদ ও অর্থভেদ বোঝাতেন পই পই করে। সার্থ ও স্বার্থ! এখন ময়নাচকের আপ কিংবা ডাউনের ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে প্রায়ই। পুলিশ সামলাতে পারছে না। কারণ নাকি বড়-বড় পলিটিকাল ঘুঘু অমনি ডাকতে সুরু করে।......রাজেনবাবু বলেছিলেন। এই র‍্যাকেটের পিছনে ওনাদের সোজাসুজি কোন হাত

নেই। কিন্তু র‍্যাকেটে যারা আছে—তারা ব্যক্তিগতভাবে ওনাদের কারো-না-কারো লোক। শুধু ইলেকসানের সময় তাদের দরকার হয় তাই নয়, বেদলের সাথে সংঘর্ষ বাধলে তারাই ওনাদের পিঠ বাঁচায়। কাজেই তাদের আইনত কোন ব্যবস্থা করা যাবে না। হাইওয়েতে মালচলাচলের ব্যাপারে যাঁদের স্বার্থ—অর্থাৎ সেই ডিসষ্ট্রিবিউটার্স সাপ্লাই এজেণ্ট—ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী—সাধারণ ব্যবসায়ী, তারা সরকারের মন্ত্রীপর্যায়ে দরবার করেও কোন ফল হয় নি। রাহাজানি একটুও কমছে না। এই চক্রটা আইনত ভাঙার অসুবিধা আছে—তা এবার ওরা টের পেয়ে গেছে। অতএব যেমন বুনোওল, তেমনি বুনো তেঁতুলের বন্দোবস্ত করা ছাড়া উপায় নেই। আপাতত পাঁচহাজার টাকা ওরা দেবে যে চাকাটার কেন্দ্রে ঘা মেরে ওটা টুকরো করে ফেলতে পারবে। তার সোজা মনে হচ্ছে খতম। হ্যাঁ নির্ভেজাল খতম। হাতে যা খবর আছে, তাতে বোঝা গেছে কেন্দ্রে আছে মোট তিনজন লোক। তিনজনের একজনও বেঁচে থাকলে ফের নতুন চক্র গড়ে ফেলবে। তাই তিন তিনটি খতম সম্পন্ন করা চাই। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে ওই তিনজনের নামধাম পরিচয় পুলিশের অজ্ঞাত। কারণ, যে সূত্র খবরটা দিয়েছিল সে ওই তিনজনকে অস্পণ্ট দেখছে, রাতের অন্ধকারে আবছা চেহারা মাত্র। অনেক রাত্রি ধরে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে, আড়ি পেতে থেকে, মাত্র ওইটুকু জানা গেছে—তারা তিনজন। তিনজনই দলের পাণ্ডা। বাকিরা সব হুকুমের চাকর। ওরা তিনজন দৈবাৎ একজায়গায় সে রাতে মিলেছিল আলোচনা করতে—নয় তো সেটুকুও জানা যেত না। বোঝা যায় কী ভীষণ সাবধানী ওরা।

যাই হোক, এই সামান্য চাবিকাঠিটা দিয়ে দরজা খুলবে কিনা রাহুল জানে না। শুধু সম্বল—তার সামান্য অভিজ্ঞতা, কিছু বুদ্ধি আর সাহস। আবছা চেহারা-গুলোর একটু নমুনাও সে পেয়েছে রাজেনবাবুর কাছে। একজন ঢ্যাঙা, বিশাল শরীর—অন্যজন মাঝারি গড়নের, রোগা, তৃতীয়জন……

তৃতীয়জন সম্পর্কে ইনফরমারের নিজেরই সংশয় আছে। তার উচ্চতা আরও কম। প্রথমে ভেবেছিল—মেয়ে, পরে মনে হয়েছিল কমবয়সী ছেলে—পরে ফের মেয়ে মনে হাওয়ার একটু এগোনর চেণ্টা করেছিল। সেই সময় হঠাৎ তার কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে কী চলে যায়। সহজাত প্রবৃত্তিবশে সে মাটিতে শুয়ে পড়ে। গুলির আওয়াজ শোনে। কতক্ষণ পরে মাথা তুলে চারপাশে তাকায়। দ্যাখে, কেউ নেই। অন্ধকারে রাস্তাটা চকচক করছে—নক্ষত্রের আলো পড়েছে। সে কতকটা বুকে হেঁটেই পালিয়ে আসে। সে শেষঅব্দি বলেছে যে তৃতীয় জন মেয়ে হতেই পারে না।—কারণ, সাড়িটাড়ি পরা ছিল না। সাড়িপরা মানুষ অন্ধকারে বোঝা যেত। ওর পরনে ছিল ফুলপ্যাণ্ট অথবা পাজামা। শুধু মাথার দিকটা……

অবশ্য বাবরীচুল আজকাল অনেকেই রাখে।

তাহলে এই হচ্ছে মোট তথ্য। না—আর একটু আছে। ইনফরমারের নামধাম

রাজেনবাবু তাকে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বলে জানাতে পারেন নি। শুধু বলেছেন, সে ময়নাচকের লোক। তাকে জানানো হবে যে র‍্যাকেট ভাঙতে একজন যাচ্ছে, দরকার হলে সে যেন তাকে যতটা সম্ভব হবে তার পক্ষে, আড়াল থেকে সাহায্য করে। রাহুলের পরিচয় যথারীতি তাকে দেওয়া হবে। কাজেই আকস্মিক-ভাবে কোন ব্যাপারে অভাবিত সাহায্য বা সহযোগিতা কোন নেপথ্যচারী লোকের কাছ থেকে পেলে রাহুল যেন মাথার ঠিক রাখে। বি ভেরি—ভেরি কেয়ারফুল টু দিস পয়েণ্ট।

কতদিন লাগতে পারে এটা চুকিয়ে ফেলতে ? কিছু ঠিক নেই। একঘণ্টা অথবা পুরো একটি বছর। তার থাকা-খাওয়া ইত্যাদির খরচ কিন্তু আপাতত এক পয়সাও দেওয়া হচ্ছে না রাজেনবাবু বলেছেন, সেইজন্যেই তো অনেকদিন থেকে তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। কারণ, এইভাবে অনিশ্চিত অবস্থার দরুণ কড়ি যোগানের অসুবিধে আছে। বুঝতেই পারছ—আমরা সরকারী ভাণ্ডার থেকে কিছু দিতে পারছিনে। কোন স্যাংসান আপাতত নেই এক্ষেত্রে। যা দেবার—দেওয়া উচিত ওইসব কোম্পানীর। সে ভাই পাঁচভূতের কারবার। বুঝতেই পারছ! ইনটারেস্ট আছে সব শালার—কিন্তু ভয় তো কম নেই। ধরো তুমি ফেল করলে—তখন কী হবে ? তোমাকে পোষার জন্য কড়িকে কড়ি গচ্চা তো গেলই—উপরন্তু র‍্যাকেটের শয়তান ক্ষেপে গিয়ে আরও ক্ষতি করতে থাকবে। এই ব্যবসায়ীদের আমি সত্যি বুঝতে পারিনে। এরা হাসিমুখে ব্যবসার লোকসান সইবে—কিন্তু তার বাইরে একপয়সা নগদ খসালে বুক চচ্চড় করবে। আমি ওদের বলেছিলাম, আরে মশাই, এও তো ব্যবসার খাতে একটা ইনভেস্টমেণ্ট! ওরা বুঝতে চায় না। যাই হোক, আমি কড়া হয়ে চাইলে যে তোমার খরচ-খরচা দিত না, তা নয়। হয়তো জরুরী কিছু বুঝলে, ভেবো না—আমাকে তাই করে তোমার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা পরের কথা। তোমাকে সিলেক্ট করার একটা বড় কারণ হচ্ছে—তোমার বাবা আছেন ওখানে। তোমার একটা চমৎকার নিরাপদ শেলটার আছে। তোমার ওপর কারো সন্দেহ হবে না। অতএব লেগে যাও। তেমন অবস্থা বুঝলে আর্থিক সাহায্য তুমি পাবে—আই এ্যাসিওর। কিন্তু সেটা নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবে তোমার প্রগ্রেসের ওপর। ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকলে তো কিছু করা যাবে না! আবার অন্যদিকে—তোমার কতটা কী প্রগ্রেস হল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও আমি কোণ আর্থিক ব্যবস্থা করতে পারব না—আমি তোমাকে জানি হে—খুব ভালভাবেই জানি। জানি বলেই তোমার উপর বিশ্বাস আছে।······

সব শালা চালিয়াৎ! স্বার্থের চাকর। তিনতিনটে মানুষ মারব আমি, তুমি শালার হবে প্রমোশন। ব্যবসায়ীদের মুনাফা উঠবে ফেঁপে। আর আমি শালা সেই কুত্তার মতো লেজ নেড়ে ঘুরে বেড়াব এ ড্রেন সে ড্রন! গোল্লায় যাও খানকির বাচ্চা!

রাগে মেজাজ গরম হয়ে গেল রাহুলের। বাইরে লালচে রোদের আভাষ দেখা দিয়েছে। অরুণ তখনও ঘুমুচ্ছে নাকি? এক কাপ চা পেলে এখন মেজাজটা ঠান্ডা হত। হ্যাঁ, রাগ-টাগ ছাড়তে হবে পুরোপুরি। মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। কাল রাত্রে ভেবেছিল, ময়নাচক তার পায়ের নীচে কাঁটা পুঁতে রেখেছে—পালাতে ইচ্ছে কয়ছিল। একটা লম্বা ঘুমের পর ভিতরে ওলটপালট ঘটে গেছে হয়তো। রাজেনবাবুর মিশন নিয়ে ভাবছে। তার মানে, থাকার সুযোগ হয়ে গেলে সে যেন থেকে যাবে। র‍্যাকেট ভাঙতে? মানুষ মারতে? শুধু সেজন্যেই?

নাকি একটা তীক্ষ্ণ চাপা কৌতূহল তার ভিতরে শিসিয়ে উঠেছে যন্ত্রণার চেহারা নিয়ে? একটা গভীরতর কণ্ঠ আলোড়িত হচ্ছে এতক্ষণে। গঙ্গাকে একবার দেখতে—বাবাকে একবার মুখোমুখি ঘেন্না জানাতে—আর সাতবছর আগের একটি সুন্দর গোপন স্মৃতির ওপর পেচ্ছাপ করে দিতে তার বড় সাধ হচ্ছে।

তার আগে এক কাপ চা পেলে ভাল হত!

আপনার চা।

লাফিয়ে উঠে বসল রাহুল। মাথার কাছে টুলে জলের গেলাস আছে। সেটা সরানোর শব্দ, তারপর শোনা গেছে মৃদু কণ্ঠস্বর—আপনার চা।

ভারি অদ্ভুত তো! বলে সে অস্ফুট হাসল।...শুনুন।

অরুণের বোন দরজা ঠেলে চলে যাচ্ছিল তেমনি নিঃশব্দে, যেমন সে এসেছিল—টেরও পোয়নি রাহুল। দাঁড়াল একটু।...বলুন!

আপনি কি কল্পতরু? ঠিক যখনি চায়ের তেষ্টা পাচ্ছিল, তখনি এসে গেল—তাই বলছি।...রাহুল চায়ে চুমুক দিল।...অরুণদা ওঠেনি?

মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল—এক মুহূর্তের হাসি ফুটেছিল ঠোঁটের কোণে। মাথা দুলিয়ে সে চলে যাচ্ছিল ফের।

রাহুল বলল, আপনি কিন্তু খুব কম কথা বলেন।

কোন জবাব এল না। কিন্তু সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

বেহায়ার মতো রাহুল বলল, আপনার নামটা ভুলে গেছি—অরুণদা কি যেন বলছিল...শী...শী...

শীলা।...বলে চলে গেল অরুণের বোন।

রাহুল খুসি হয়ে দুলতে দুলতে চা খেতে থাকল। শীলা বলে ডাকছিল না অরুণদা? শীলা! ঢ্যামনার ধাড়ি অরুণদাটা। রাধারঘাটে একটা রক্ষিতা পুষত নাকি। এ শালাদের জুটেও যায় বেশ। হয়তো এমন ছিমছাম গোবেচারা মেয়েটিকে তলে তলে নষ্ট করে ফেলেছে। ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। আর আজকাল তো কতরকম চমৎকার ওষুধপত্তর বেরিয়েছে। বাচ্চাটাচ্চা গজাবার উপায় নেই। মেয়েটাকে অরুণ ব্যবহার করে ভাবতেই রাহুলের মাথাটা ফের গরম হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্থির বসে চা খাবার পর সে অবাক হল নিজের দিকে তাকিয়ে।

কাল ওই মাঠের পথে আসতে আসতে একমুহূর্তের জন্যেও সে তার বর্তমানের মধ্যে বাস করছিল না যেন—সবটাই ছিল তার মোটামুটি নিষ্পাপ সরল সহজ ছেলেবেলা। কাল সারাটি দুপুর ও বিকেল। কালবোশেখির ঝড়টা ফুরিয়ে যাবার পর অব্দি, সে কিশোর রাহুল হয়ে পড়েছিল। এখন সে ভিন্ন মানুষ। এখন ফের তার বর্তমানকে ফিরে পেয়েছে সে। চোখদুটো আবার যা ছিল তাই হয়েছে। কাল কিছু সময়ের জন্যে কি তার মা তাকে ছেলেবেলাটা পাইয়ে দিয়েছিলেন? স্মৃতির বিষাদ তাকে সারাক্ষণ ঘিরে রেখেছিল সব পাপ থেকে। সব কদর্যতা থেকে। সবরকম ভয়ংকর ইচ্ছা থেকে মা তাকে বাঁচাচ্ছিলেন।

শূন্য কাপপ্লেটটা হাতে ধরে সে নিষ্পলক কিছুক্ষণ বসে রহিল। জানালার বাইরে নরম রোদে ভরা পৃথিবীটা দেখে তার মনে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা এসে যাচ্ছিল। কি যেন করার প্রতিশ্রুতি দায়বদ্ধ ছিল সে—দূর বাল্যে তা করা যায়নি। যাবে না হয়তো। তা রাজেনবাবুর মিশনের মতো ভয়ংকর নয়, তা ছিল খুবই সহজ আর সুন্দর। অথচ কেন এমন হল? সে অবচেতন বিহ্বলতায় হাতড়াতে থাকল সে প্রশ্নের জবাব।

খানিক পরে অরুণ এল।…মুখটুখ ধুয়েছ? ধোওনি? তুমিও দেখছি আমাব মাসতুতো ভাই। বাইরের দরজাও খোলনি দেখছি!

বলে সে দরজাটা খুলে দিল। তারপর বারান্দায় গিয়ে ডাকল।…এসেছ তো রাত্রে। জায়গাটা দ্যাখোনি। দেখে যাও। এখানটা উঁচু বলে—ফুল ভিউ দেখতে পাবে।

রাহুল বেরোল। সত্যি, ভাবা যায় না—সাতবছরে ময়নাচকে কী হয়েছে! রাস্তার দিকটা এরই মধ্যে ভিড়ে গিজগিজ করছে। বাস লরী রিকসাও চলছে অজস্র। পুরনো গ্রামটা গাছপালার আড়ালে রয়েছে। সেই শিবমন্দিরের ত্রিশূল চূড়াটা পরিষ্কার দেখা যচ্ছে। ওখানেই ছিল ভবানীবাবুর বাড়ি।

অরুণ কাছে ঘন হয়ে আঙুল তুলে বলল, তোমার বাবার হোটেলটা চিনতে পারছ? ওই যে লাল বাড়িটার পাশে—হ্যাঁ, হ্যাঁ,…রিকশোর ষ্ট্যাণ্ডটা, ওই যে সাইনবোর্ড।

রাহুল তীক্ষ্নদৃষ্টে তাকাল। একটা একতালা হলুদ রঙের ঘর—তার মাথায় সাইনবোর্ড আছে মনে হচ্ছে। পড়া সম্ভব নয় এতদূর থেকে।

অরুণ বলল, কাল বাবার ওখানে তাহলে সত্যি যাওনি?

রাহুল মাথা দোলাল।

যাওনি—বেশ করেছ। তবে…একটু ভেবে অরুণ হেসে বলল, তবে বাবা আর ছেলে! বাবার ত্রুটি ধরতে নেই হে। তোমার কর্তব্য তুমি করবে—তাতে দোষ কী? যেও—একবারটি যেও। বরং তোমাকে আমিই নিয়ে যাব সাথে করে। অনেকদিন আমার সঙ্গেও দেখা হয়নি মাষ্টারমশায়ের।

রাহুল গম্ভীর মুখে বলল, এখনও সবাই মাষ্টারমশাই বলে নাকি?

হ্ন—তাই তো বলে। আমি যদ্দিন এসেছি, তদ্দিন ওইনামেই সবাইকে ডাকতে শুনেছি। শুনে আমিও তাই বলে ডেকেছি। আসলে লোকটা বড্ড ভালো ভাই—তোমার বাবা, বুঝলে রাহুল? উনি মেয়েটাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন—তুমি হয়তো জানো সেকথা।···

রাহুল বলল, কিস্যু জানিনে। দশ বছর পরস্পর দেখাই নেই। চিঠিপত্র বন্ধ হয়েছে অনেকদিন—মনে পড়ছে না কখন থেকে বন্ধ হয়েছে। আর চিঠিতে ওসব খবর ছিল না।

অরুণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সে কি! জানে না? ঠিক আছে। বলব'খন। ওই মেয়েটা যে কী সাংঘাতিক কল্পনা করা যায় না ভাই। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তো ওর বাবারও বনিবনা ছিল না। বাপ যেই স্ট্রোক হয়ে মরল—অমনি মেয়ে নিজের মূর্তি ধরল। বাপের যা কিছু সম্পত্তি বা টাকাকড়ি ছিল, দুহাতে বিলাস-ব্যসনে ফুঁকে দিলে একবছরেই। আজ কলকাতা কাল দিল্লী, পরশু বোম্বে। এবেলা কাটোয়া, তো ওবেলা চল পাকুড়ে মেলা বসেছে দেখে আসি। উচ্ছৃঙ্খল ভোগী প্রকৃতির মেয়ে আসলে। এদিকে মাষ্টারমশাই ছিলেন কতকটা ওদেব ফ্যামিলির গার্জেনেব মতো। ভবানীবাবু ওনাকে সেই চোখে দেখতেন। মাষ্টারমশাই সরল ভীতু গোবেচারা মানুষ। দুহাতে মেয়েটাকে আর তার সম্পত্তি আগলানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শেষ অব্দি সামাল দিতে পারলেন না। মেয়েটির গার্জেন-টারজেন থাকা তো দূরের কথা—তখন যেন চাকরেরও বেশি হয়ে পড়লেন। বয়সও হয়েছে—বুদ্ধিভ্রম ঘটা স্বাভাবিক তো বটেই। তাছাড়া দুর্বলতাও থাকতে পারে—সেটাও বলতে সংকোচ দেখছিনে। যাই হোক, শেষ অব্দি ঘটল এক কুচ্ছিত কেলেঙ্কারী। মেয়েটা নিজেই রটাল—বোঝ ব্যাপারটা।

রাহুল কৌতূহলী হয়ে শুনছিল। বলল, কী রটাল?

অরুণ চাপা গলায় বলল, পেটে বাচ্চা। আর এ জন্যে নাকি মাষ্টারমশাই দায়ী। অতএব তাকেই বিয়ে করতে হবে। বালবিধবার এ রকম-সকম দেখে তো সবাই তাজ্জব। হলে কী হবে? এ তো আর সে পুরনো পাড়াগাঁ নেই—গ্রামনগরী। ছত্রিশ জায়গার ছত্রিশ জাতের নতুন নতুন লোক এসে জুটেছে। সমাজ বলে কিছু নেই টেই। তারপর মাষ্টারমশাই বিয়েতে রাজী হলেন।

···অরুণ ফিক করে হেসে বলল, রাগ করছ না তো রাহুল?

কেন?

ভাবছ না তো ছেলের কাছে বাবার কেলেঙ্কারী শোনাছি? অবশ্যি, এ তোমার বাবার কেলেঙ্কারী মোটেও নয়, ভাই—এ কেলেঙ্কারী সবটাই ভবানীবাবুর মেয়ের। থাকগে মরুকগে, বিয়ে চুকে গেল রাতারাতি। রেজিষ্ট্রি হয়েই চুকল। বাচ্চাও হল সত্যি-সত্যি। বাচ্চাটা আমি দেখিনি। লোকে বলেছে—ওর চেহারা নাকি···হঠাৎ অরুণ প্রসঙ্গ বদলে বলল, ব্রাশট্রাস সঙ্গে এনেছ তো? না থাকলে—ওই যে। দাঁতন

ভেঙে নাও নিমগাছ থেকে। খেয়েদেয়ে দুভায়ে বেরোব। আমার নিজের কিছু কথা আছে।

রাহুল বিকৃত হেসে বলল, অরুণদা, বাচ্চাটার চেহারা আমার বাবার মতো—তাই না?

যাঃ! লোকের কথায় কান করতে আছে?···হাসতে লাগল অরুণ।

আমার চেহারাও নাকি অবিকল বাবার মতো।

ছেড়ে দাও ও কথা। যাও, ডাল ভাঙো।

আচ্ছা অরুণদা, বাবা হোটেল খুলতে গেলেন কেন?

সব পরে ডিটেল বলব খন। আগে—

উঁহু—শুনতে ইচ্ছে করছে।

হোটেল তোমার বাবা খোলেন নি—ভবানীবাবুর মেয়েই খুলেছে।

রাহুল এগিয়ে গিয়ে ফুলবাগিচার ধারে নিচু নিমগাছটা থেকে এক ঝটকায় একটা ডাল ছাড়িয়ে বলল, নেপালদা মারা গেছে জানো তো?

অরুণ বলল, জানি—শুনেছি।

আমিও একবার জোর বেঁচে গেছি। তারপর থেকে বাঁচার সাধটা ভারি শক্ত হয়ে জমাট বেঁধেছে মনে।···রাহুল এগিয়ে এসে বলতে থাকল।···তাই ভেবে ছিলাম আর বে লাইনে পা দেব না। সবার মত ভদ্রটদ্র হয়ে চলব। আর সেজন্যই ময়নাচকের বাবার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু শালা আমার কপালে তা নেই। কী করি, বাৎলে দিতে পারো?

অরুণ বলল, পারি বইকি। সেজন্যই বলছিলাম না—তোমাকে দেখে মনে জোর পেলাম। আমার ভাই একজন লোক দরকার—যেমন তেমন লোক নয়, দঁদে লোক। কারণ, এই চোর ডাকাত গুণ্ডার জায়গায় আমার মতো নিরীহ লোকের দুপয়সা রোজগার করা সত্যি অসম্ভব। পরে বুঝিয়ে বলছি সব। তুমি এখানে থাকবে রাহুল। খুব ভালো হয় ভাই। পুষিয়ে দেব তোমাকে—কিছু ভেবোনা থাকবে?

রাহুল নির্বিকার দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ তো। থাকব।

মুক্তকেশী হোটেলের সামনে রাস্তায় কয়েকটা মালবোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। রাহুল একটা ট্রাকের আড়ালে দাঁড়াল। গ্রীষ্মের সূর্য ততক্ষণে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। রোদের তাপ বেড়েছে। কিন্তু আগের দিনের কালবোশেখির ঝড়বৃষ্টির পর আজ আবহাওয়ায় একটুখানি স্নিগ্ধতার ভাব রয়ে গেছে। আজ এখানে হাটবার। ময়নাচকের পুরানো হাটটা এখনও সপ্তায় দুবার চলেছে—নতুন বাজার

তাকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি। শুধু তার জায়গাবদল ঘটেছে। বড়রাস্তার দুপাশে সে নিজের জায়গা খুঁজে নিয়েছে। আগে হাটটা বসত গ্রামের ভিতর শিবমন্দিরের পাশে।

ভিড় আর গোলমাল ছাড়িয়ে সারাক্ষণ মাইকে বিচ্ছিরি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাইক একটা নয়—অনেকগুলো। রাজ্যের তুকতাকওয়ালারা বজ্রনির্ঘোষে লোককে সামনে তাতাচ্ছে। তার মধ্যে সন্তর্পণে চলেছে বাস ট্রাক রিকশো সাইকেলের আনাগোনা। একটুতে কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে। রাহুল ভাবছিল, অরুণ গেছে যাক্—সে এই সুযোগে কেটে পড়বে। কোথাও চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকবে। এখানে এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়া। ইতিমধ্যে অরুণের সঙ্গে ঘুরে এলাকার প্রায় সবটাই দেখা হয়ে গেছে। কত নতুন বাসিন্দা এখানে এসেছে! ময়নাচক বা এলাকার কোন গ্রামের লোকের সঙ্গে চালচলনের মিল এদের সামান্য। রীতিমত শহরের পরিবেশ—তেমনি পোশাক-আসাক, স্মার্ট ছেলেমেয়ে, অতিচালাক সবজান্তা ভদ্রলোকেরা। রেডিও, খবরের কাগজ আর ওই সিনেমাঘরটা এনে ফেলে হাইওয়ে তার চূড়ান্ত কাজটা শেষ করেছে। এই কয়েক হাজার বাসিন্দার ভিতর থেকে রাহুলকে নিজের শিকার খুঁজে বের করতে হবে। সে হতাশ বোধ করছিল। আনমনা হয়ে পড়েছিল। আর সেই সময়—'এই যে তোমাদের মুক্তকেশী' বলে অরুণ ট্রাকগুলোর সরু ফাঁক গলিয়ে চলে গেছে। ভেবেছে যথারীতি রাহুলও তার পিছনে যাবে।

রাহুলের পা দুটো আড়ষ্ট। পালিয়ে যাবে? কিন্তু হঠাৎ মনে হল, ইতিমধ্যে অরুণ তার বাবার কাছে হাজির হয়েছে। এখন যদি সে পালিয়ে যায়, বাবার প্রতি তার মনোভাবটা খুব সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়বে। একটু দ্বিধায় পড়ে গেল সে। না—বাবার কথা ভেবে নয়, গঙ্গার কথা ভেবে!

ওদিক থেকে অরুণ তাকে ডাকছিল—রাহুল, রাহুল! তারপর আচমকা তার সামনে যে এসে দাঁড়াল, তাকে সে ঠিক সেই মুহূর্তে চিনতে না পারলেও—সে যখন শান্তস্বরে বলল, এস—তখন তাকে চেনা গেল এবং পলকে সব অস্বস্তি আর ঘৃণার অতিসচেতন বিহ্বলতাটা কোথায় হারিয়ে জেগে উঠল একটা স্বাভাবিকতা। তার মধ্যে যেন কোন মালিন্য নেই—কোন প্রচ্ছন্ন এপিসোড লুকানো নেই।

হ্যাঁ, এই গঙ্গা। গঙ্গার এ শক্তি একদা প্রত্যক্ষ করেছিল রাহুল। সবকিছুকে নিমেষে সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলতে তার জুড়ি নেই।

কয়েকটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে ছিল রাহুল। সেই গঙ্গা! চওড়া নকসীপাড় ফিকে লাল রঙের শাড়ি, চাইনিজ কাট ব্লাউজ, কানে সাদাপাথরের কুঁড়ি, গলায় সোনার চেনলকেট, হাতে শাঁখা আর সোনার কাঁকন, এবং সধবার চরম চিহ্ন ডগডগে সিঁদুর সিঁথিতে রক্তরেখা! সেই গঙ্গা। শ্যাম যার গায়ের রঙ—যাকে বলা যায়, বাংলাদেশের কালো মেয়ে।

কিন্তু সেই গঙ্গা তো নয়। মুখের আদলে বালিকার প্রসন্নতা ছিল যার এবং পাপকে যে পাপ বলে বুঝতে পারত না! তার চেহারায় প্রচ্ছন্ন ধ্বংসের ছাপ লক্ষ্য করছিল রাহুল। যৌবনের দুরন্ত উচ্ছ্বাস দেখবার কথা ছিল যে শরীরে, সেখানে কী যেন ক্লান্তির আভাস। তাহলে কি নবীনা গঙ্গা অতিদ্রুত প্রবীণ মাষ্টার মহাশয়ের বয়সের অনুগামিনী হতে চেয়েছিল? হয়তো মেয়েরা এটা পারে। চোখ নামাল রাহুল। তার পায়ের দিকে রাখল। গঙ্গার পায়ে আলতা। পাদুটোও চিনতে পারল না সে। মাঠের কুলঝোপে গিয়ে কাঁটা ফুটেছিল গঙ্গার পায়ে—থুথু দিয়ে সাফ করে সে বলেছিল, এই! কাঁটাটা তুলে দেবে? আজ ওই পায়ে তাকে প্রণাম করতে হবে না তো! পাগল, পাগল! কাঁটা তোলার সময় গালে পা ছুঁইয়ে দিয়েছিল বলে রাহুল রাগে কতক্ষণ কথা বলেনি সেবার।

গঙ্গা যে নিজের টানের শক্তি কতখানি জানে, পরক্ষণে ঘুরে পা বাড়িয়েছে। ...চিঠি দিয়ে এলে উনি খুশি হতেন! শরীর ভালো না তো! ভুগছেন অনেকদিন। এসো। রাহুল নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল। তার সামনে আজ আর সেই গ্রামকন্যাটি অচেনা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, এ মেয়েটি নিপুণা নগরবাসিনী। এর সঙ্গে নেপালদার 'সতীসাবিত্রী' বউর কোন তফাৎ নেই সম্ভবত। রাহুল যখন চওড়া বারান্দা ডিঙিয়ে বাঁপাশের সরু করিডোরে উঠল, সে দেখল যে আর তার কোন অস্বস্তি হচ্ছে না। রাগ ঘৃণা বিক্ষোভও মনে হচ্ছে অকারণ।

ডাইনে হোটেলের ঘর, কিচেন ইত্যাদি। বাঁয়ে সরু করিডোরের শেষে একটা উঠোন। উঠোনে অনেক ফুলগাছের ঝোপ। গঙ্গা ফুল ভালবাসত—তার মনে পড়ল। একপাশে টিউবেল আর উঁচু একটা ল্যাট্রিন। ওদিকের বারান্দাটা ছোট। দুটো ঘর। একটা বড়, অন্যটা ছোট। ছোট ঘরটার ভিতর অরুণকে সে মোড়ায় বসে থাকতে দেখল। বিছানার পাশে। বিছানায় উনিই কি বাবা! রাহুলকে দেখে তিনি শুধু মাথাটা সামান্য তুললেন। রাহুল পুতুলের মতো চাদরঢাকা পাদুটোয় হাত রেখে কপালে ঠেকাল। তারপর দাঁড়িয়ে রইল। হৃষিকেশ বড় বড় দুটি চোখে তাকে দেখছেন—বিবর্ণ নিষ্পলক চোখ। অরুণ বলল, দাঁড়িয়ে কেন! বসো—রাহুল।

গঙ্গা ঘরের মেঝেয় একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল রাহুলের। হৃষিকেশ কিছু না বললেও সে তার বিছানার পাশে সাবধানে বসল।

হৃষিকেশ কাসলেন। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হল। তারপর বললেন, অরুণবাবুর কাছে তোমার আসার কথাটা শুনলুম। কদিন থেকে স্বপ্ন দেখছিলুম। সাউন্ড স্লপ তো আর হয় না। তোমাকে স্বপ্ন দেখছিলুম। এসে ভালই করেছ।...একটু চুপ থেকে যেন একটা কথা খুঁজে তারপর বললেন হৃষিকেশ—টের পাচ্ছি, আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। আর বাঁচবো না।

অরুণ শশব্যস্তে বলল, আরে না না মাষ্টারমশাই! সামান্য অসুখবিসুখ সবারই

হয়। তাছাড়া এমন কি বয়স হয়েছে যে—
হাত তুলে হৃষিকেশ বললেন, বয়সের কথা তুলে ঠাট্টা করোনা অরুণবাবু।
অরুণ অপ্রস্তুত হেসে বলল, না—মানে, আজকাল যত কঠিন অসুখই হোক—তার ওষুধের তো অভাব নেই! প্রশান্তবাবুকে দেখাচ্ছেন, না চৌধুরীকে? ডক্টর চৌধুরী কিন্তু হার্টস্পেশালিস্ট মাণ্টারমশাই, তা জানেন?
হৃষিকেশ সেদিকে কান না করে বললেন, অরুণবাবু একটুখানি উপকার করবে? ও বোধ হয় ওদিকে ব্যস্ত রয়েছে। তুমি একবার ঘোঁতনকে ডেকে দেবে? কিছু মনে করো না—যে ভাগাড়ে পড়ে আছি, কেউ নেই!
না, না। বলে অরুণ উঠে দাঁড়াল। এক্ষুণি ডাকছি। সেই দাঁত উঁচু ছোকরাটা তো?
যে যেতে যেতে একটু দাঁড়িয়ে রাহুলকে লক্ষ্য করে ফের বলল, ভাই রাহুল—আমি কিন্তু এখন আর আসছি না। তুমি বাবার সঙ্গে কথাটথা বলে সোজা আমার ওখানে চলে যেও। কেমন?
হৃষিকেশ বললেন, রাহুল আপাতত এখানেই থাকছে। তুমি শুধু ঘোঁতনকে ডেকে দাও।
তাঁর কণ্ঠস্বরে চাপা ক্ষুব্ধতাটুকু লুকোন গেল না। অরুণ মুচকি হেসে চলে গেল—রাহুলের দিকে চোখের ঝিলিকও দেখিয়ে গেল। রাহুল গম্ভীর মুখে বসে রইল।
হৃষিকেশ এবার কণ্ঠস্বব খুব চাপা করে বললেন, আমি জানি, সহজে তুমি অবাক হবার ছেলে নও রাহুল—অবাক তুমি হবে না কিন্তু আমার এই অবস্থার জন্যে আমাকে যদি দায়ী করো, খুব ভুল হবে! কেন ভুল হবে জানো? মানুষ সব ব্যাপারে নিজের প্রভুত্ব খাটাতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে নিজের কাছেও হার মেনে অসহায় আর উদ্বিগ্ন দর্শকের মতো বসে থাকতে হয়। আমি বরাবর সেইরকম অসহায়, সেইরকম উদ্বিগ্ন দর্শক হয়ে নিজের আচরণগুলো লক্ষ্য করছি, রাহুল। শুধু জেনে রাখো—এর কোনটাই আমার আয়ত্তে ছিল না!
রাহুল আস্তে জিগ্যেস করল, কী?
তার এই ছোট্ট 'কী' প্রশ্নে কী টের পেয়েই হৃষিকেশ বললেন—এই বিয়ে, কাজকারবার, হোটেল—এগুলো। জেনেশুনে আমি বিষ খাচ্ছিলুম। এ্যামবিশান —উচ্চাকাংখা আমাকে সাতবছর আগে দূর থেকে এখানে টেনে এনেছিল। সেটাই আমার নিয়তির ভূমিকা নিল। আর—তোমার মা—ছেলের সামনে মায়ের নিন্দা করা অশোভন, তোমার মাকে সব সময় একটা দারুণ বোঝা বলে মনে করতুম। সেটা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। বোকার মতো রমাকেই ভাবতুম আমার জীবনের যাবতীয় দুঃখকষ্টের কারণ। তাই পথে হঠাৎ সে মারা গেল স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিল হ্যাঁ, এবার তবে নতুন করে জীবনটা সুরু করার সুযোগ খুঁজতে হবে।

এ্যামবিশান—খুব ছেলেবেলা থেকে ওই শয়তান এ্যামবিশান আবার পিছনে ছায়ার মতো ঘুরঘুর করত। শত দুঃখকষ্টে দুর্যোগেও সে পালায় নি। রমা মারা গেল। আমি এখানে এসে ভবানীবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে একটু করে সচ্ছলতার মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম—ততো পিছনের জীবনটা কুৎসিত ঠাট্টার মতো লাগছিল। ভুলতে চাচ্ছিলুম তাকে। এমন কি তোমাকেও—হ্যাঁ রাহুল, তোমাকেও অস্বীকার করার ঝোঁক আমাকে গ্রাস করছিল। যেন আমি এক মুক্ত পুরুষ—কেন বন্ধন নেই অতীত নেই—আছে মুক্তি আর বিশাল ভবিষ্যত। তাকে সার্থক করে তুলতেই হবে। দুরন্ত ভোগের প্রবৃত্তি আমাকে অস্থির করে তুলল সঙ্গে সঙ্গে। সব অতৃপ্ত কামনা বাসনা নেচে উঠল। আমি তখন নিজের বয়সকে ভুলে গেলুম। এখানে যখন আসি, তখন সবে আমাব বয়স বাহান্ন পূর্ণ হয়েছে। আগুন নেই, জ্বালা আছে। আর···

রাহুল বলল, আপনার কাছে তো কৈফিয়ৎ চাইতে আসি নি। ওসব কথা থাক্।

হৃষিকেশ উত্তেজিতভাবে বিছানা থেকে একটু উঠে বললেন, কৈফিয়ৎ নয় রাহুল। কনফেশান। ঈশ্বর মানিনে বলেই মনের পাপ মনে চেপে রাখতে পারিনে। ছটফট করি। বলার জন্যে মানুষ খুঁজি—পাইনে। আজ তুমি এসেছ, তাই তোমাকে বলছি। না এলে কিছু বলা হত না। তাছাড়া, তোমরাও তো অভিমান থাকতে পাবে।

রাহুল বলল, ওসব নেই-টেই। আপনি চুপ করুন।

হৃষিকেশ দরজাব বাইরেটা দেখে নিয়ে বললেন, ঘোঁতনটা এল না দেখছ? এ কি আমার মানুষের পুরীতে বাস করা? সব রাক্ষস-রাক্ষসীর রাজত্ব। দেহ অশক্ত—তা না হলে···

হঠাৎ রাহুলের হাত ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন হৃষিকেশ, রাহুল, আমাকে এখান থেকে নিয়ে পালাতে পারিস বাবা? আমার কেমন যেন সন্দেহ—তোর ছোটমা আমাকে শ্লোপয়জন করছে। ওর হাত থেকে ওষুধ খেতে আমার ভয় করে। ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ও সব পারে, বুঝলি খোকা? ও একটা সর্বনাশী!

বারান্দায় গঙ্গাকে দেখা গেল সেই মুহূর্তে। হৃষিকেশ আগের মতো পড়লেন। গঙ্গার হাতে একটা ট্রে। সন্দেশের প্লেট, চায়ের কাপ। ঘরে ঢুকে ট্রেটা নিঃশব্দে খালি মোড়াটায় রাখল। তারপর আঁচলে ঠোঁট মুছে শান্ত হাসল। ······শুনলে তোমার রাগ হতে পারে রাহুল, তোমার কথা যেন আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম! কী? রাগ হচ্ছে না শুনে?

হৃষিকেশ পলকে বদলে অন্যমানুষ হয়ে গেছেন। অদ্ভুত শব্দে হাসলেন। রাহুল হাসল না। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে বলল, নাঃ রাগ কিসের?

গঙ্গা বলল, হাত লাগাও। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাহুল বলল, খেয়ে বেরিয়েছি—অরুণদার ওখানে।

গঙ্গার কণ্ঠস্বরে একটু তিরস্কারের আভাষ।…হ্যাঁ, তুমি অরুণবাবুর ওখানে উঠেছ, তা জানলুম। কিন্তু আমরা হয়তো অরুণবাবুর চেয়েও আপনার লোক। ও আদিখ্যেতার কী দরকার ছিল—তুমিই জানো।

রাহুল সামান্য ক্ষুব্ধ হল।……আদিখ্যেতা কিসের? চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল—সে টেনে নিয়ে গেল। ব্যস!

গঙ্গা বলল, কিন্তু ময়নাচকে যখন আসছিলে—আমি পর হতে পারি, তোমার বাবার কাছেই নিশ্চয় আসছিলে?

রাহুল একটু ভেবে জবাব দিল, হ্যাঁ।

তারপর শুনলে তোমার বাবা ফের বিয়ে করেছেন, অমনি……খিলখিল করে হেসে উঠল গঙ্গা।…অমনি ভীষণ রাগ হয়ে গেল, তাই না? অথচ তোমার একটা বিশ্বাস রাখা উচিত ছিল তাঁর ওপর। তাঁর দিকটা ভাবা উচিত ছিল।…গঙ্গার হাসিমুখটা ক্রমশ গম্ভীর হল বলতে বলতে।…বয়স হয়েছে, অসুখ-বিসুখ আছে। বিদেশে একা পড়ে রয়েছেন। দেখাশোনার লোক নেই কাছে। একমাত্র যোগ্য ছেলে—সেও বাইরে। খোঁজ নিতেও তার সময় হয় না। তখন যদি কেউ সেটা লক্ষ্য করে ওঁকে দেখাশোনার ভার নেয়, আশা করি সে খুব একটা অন্যায় করে না।

হৃষিকেশের কণ্ঠস্বরে কে অশোভন হেসে বলল, হ্যাঁ—ভাগ্যিস ও ছিল রাহুল। ওর সেবাযত্ন না পেলে আমি কবে মরে যেতুম বাবা।

গঙ্গা বলল, তাছাড়া এ বয়সে মানুষ কেমন একা হয়ে পড়ে, আমি জানি। আমার বাবাকে দেখে-দেখে এটা আমার শেখা হয়েছিল। তারপর বাবা মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে যে পশুগুলো চারপাশে ওঁৎ পেতে ছিল, বেরিয়ে এলো আমার সামনে।

হৃষিকেশ সায় দিয়ে বললেন, ওঃ! মানুষ যে কী শয়তান, ভাবা যায় না। একটা বাচ্চা মেয়ে—তার সামান্য মুখের গ্রাস! ভবানীবাবু তো দেনার দায়ে ফতুর হয়েই মারা গেলেন। কণ্ট্রাক্টরিতে লোকসানের পর লোকসান হচ্ছিল। আমার অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না এ ব্যাপারে। যাই হোক, তখন আমাকেই সামনে দাঁড়াতে হল ওঁর মেয়ের। মামলা-মোকদ্দমা হ্যাঙ্গামা—সে একটা ইতিহাস!

গঙ্গা বলল, সেদিন তোমার বাবা না থাকলে আমি আজ রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতুম জানো?

রাহুল বিরক্ত মুখে বলল, তোমরা দুজনে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করেছ দেখছি! আমি কি কৈফিয়ৎ চেয়েছি নাকি?

গঙ্গা তীব্রদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে কেন তুমি সোজা এখানে আসো নি?

রাহুল জবাব দিল না।

গঙ্গা বলল, আসোনি—তার মানে এটা তুমি মেনে নিতে পারোনি। কেন, তা

বলবে ?

রাহুল সোজা তাকাল ওর দিকে। তার ঠোঁটে নিজের অজানতে সূক্ষ্ম একটা ব্যঙ্গের রেখা ফুটে উঠল।…কেন—তা তোমারই জানা উচিত। যদি তোমার অন্তত স্মৃতি বলে কিছু থাকে মনে।

বলেই সে উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াল।

পলকে গঙ্গার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল। সে রাহুলের দিক থেকে দৃষ্টিটা নামিয়ে আনল পরক্ষণে। চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে তার উত্তেজনা ধরা পড়ছিল। হৃষিকেশ ব্যস্তভাবে বললেন, রাহুল, খোকা! চলে যাচ্ছিস কেন? বোস। তোকে আমার ভীষণ দরকার—অনেক কথা বলতে বাকি আছে যে। ওগো, তুমি ওকে ধরো—চলে যাচ্ছে যে!

গঙ্গা কোন কথা বলল না। সেও উঠে দাঁড়াল। তারপর পাশের দরজা দিযে ওদিককার ঘরে চলে গেল। রাহুল উঠোনের দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনার উপর রাগ করিনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

হৃষিকেশ যেন অস্ফুট আর্তনাদ করলেন।…না না। একটা ভীষণ জরুরী কথা আছে তোর সঙ্গে। তুই কাছে আয়। কানে-কানে বলি।

রাহুল বলল, ঠিক আছে—পরে আসব'খন। আমি তো এখানেই থেকে যাচ্ছি। অরুণদার কাছে। চাকরীটা ভালই। দেখব--আপনার ভাল চিকিৎসা-টিকিৎসা করা যায় কিনা। আপনি ভাববেন না।

হৃষিকেশ ওঠার চেষ্টা করে চাপা গলায় বললেন, না খোকা—না। কথা শোন, তুই এখানে থাকিসনে বাবা। শীগ্গির পালা—নৈলে বিপদে পড়ে যাবি! এ খুব সাংঘাতিক জায়গা। তুই বরং আজই চলে যা রাহুল।

রাহুল চমকে উঠেছিল। কিন্তু সংযতভাবে বলল, বিপদ আমাব অনেক দেখা আছে। আপনার ওকথা বলে কোন লাভ হবে না।

জানি, জানি!…যেন আবার আর্তনাদ করলেন হৃষিকেশ।…তাই তোর মঙ্গলের জন্যে বলছি, খোকা। এখানে তুই—

গঙ্গা পাশের ঘর থেকে এসে বলল, দেওয়া খাবার না খেয়ে গেলে অকল্যাণ হবে গেরস্থর। সেটা কারো জানা উচিত। যেচে এসে অপমান করা হল—তাও না হয় ভাগ্যের দোষে সইবে। কিন্তু আমাবও তো ছেলেপুলে আছে।

রাহুল বাবার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টে তাকিয়েছিল। এবার সে পা বাড়াল। সাঁৎ করে বারান্দা থেকে করিডোরে গিয়ে ঢুকল। আর পিছন ফিরল না।

বাইরে এসে মন খারাপ হল। সে কিন্তু সহজ আর স্বাভাবিক থাকতেই চেয়েছিল। ওঁদের অপমান করবার ইচ্ছা একটুও ছিল না। অথচ একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। নিজেকে সে সামলাতে পারল না আদতে।

কিন্তু বাবার কথাগুলো যেমন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। গঙ্গা ওঁকে প্রোপয়জন করেছে বলে ওঁর ধারণা হয়ে গেছে। বাবা গঙ্গাকে বিশ্বাস করেন না বোঝা গেল। অবশ্য সেটা তো স্বাভাবিকই। একটি দুরন্ত-যৌবনা মেয়ের স্বামী হয়ে পুরোপুরি সবদিক স্বচ্ছন্দ রাখা আর এ বয়সে ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বাবা একধরনের হীনমন্যতায় ভুগছেন। হয়তো একসময় রাহুলের মেয়ের ক্ষেত্রেও এমনি একটা হীনমন্যতাবোধ ওঁর ছিল। আসলে হৃষিকেশের চরিত্রের যেন এই একটা বিশ্রী খুঁত—নিজের শক্তির প্রতি সংশয়। এইসব লোকের মোটেও বিয়ে করা উচিত নয়। অথচ এরা যেন নারীসঙ্গবর্জিত হলে পৃথিবীটা শূন্য মনে করে।

আর গঙ্গা! তার কৈফিয়ৎটা বেশ আশ্চর্য। একজন নিঃসঙ্গ বুড়োমানুষ—যে গঙ্গাকে নাকি আপদবিপদ থেকে রক্ষা করেছে, তার নিঃসঙ্গতা দূর করতে……

ছেনাল খানকি কোথাকার! রাহুলের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। রাগে ভিতরটা গবগব করে উঠল, এবং সেই রাগ বাবার দিকেও ধাবিত হল একসময়। হৃষিকেশবাবু, তুমি যদি মনে নিষ্পাপ থাকতে, তাহলে এসব ক্ষেত্রে যা সঙ্গত আর শোভন হত—সেটাই করতে। তার মানে, তোমার দুর্দান্ত ছেলের পাত্রী হিসেবে ওই জংলী মেয়েটাকে তুমি নির্বাচিত করতে। তা তুমি করনি। সুতরাং তুমিও—হৃষিকেশবাবু, তুমিও একটি ইতর। জঘন্য লম্পট।

সিগ্রেট নেই পকেটে—কেনার জন্যে সে সামনের দোকানটায় গেল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অবাক হল। রুক্ষ মারমূর্তি চেহারাটা! চোখ-দুটো ভীষণ চকচক করছে। সে সিগ্রেট কিনতে কিনতে চুল আঁচড়ে নিল। পাশে একটি লোক পানের জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আয়নার ভিতরে তার প্রতিবিম্বের দিকে প্রশ্ন করল, আপনাকে চেনাচেনা লাগছে যেন। কোথায় থাকেন বলুন তো?

লোকটা তার চেয়ে বেশ উঁচু। গায়ে খয়েরীরঙের স্পোর্টিং গেঞ্জী, নীলচেরঙের টাইট প্যাণ্ট পরনে। খাড়া নাকের দুপাশে চোখদুটো অস্বাভাবিক ছোট। সুচলো গোঁফটা তিরতির করে কাঁপছে। হয়তো অভ্যাস। রোদপোড়া তামাটে রঙ শরীরটা বেশ বলিষ্ঠ। রাহুল খুঁটিয়ে দেখল ওকে। ওর বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশের কম নয়। রাহুল বলল, বহরমপুর।

আমাদের মুক্তকেশীর মাস্টারমশায় কেউ হন নাকি?

প্রশ্নটা কাল রাতের সেই চা-ওলার মতো রাহুল বিরক্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ।

তাই বলুন! লোকটা হাসল।…আপনিই তবে মাস্টারমশায়ের ছেলে। আমার নাম মণিশঙ্কর—মণিশঙ্কর ঘোষ। আপনার বাবার মুখে অনেক কথা শুনেছি। কবে আসা হল?

রাহুল হাসবার চেষ্টা করে বলল, কী কথা শুনেছেন?

মণিশঙ্কর আঙুলের ডগায় চুণ নিয়ে জিভে রাখল।…সে অনেক। আপনার নামটা কী যেন?

রাহুল।

রাহুল! ভারি চমৎকার নাম তো।···মণিশঙ্কর জোরে হেসে উঠল। আরও বলল আপনার বাবা বলতেন বটে, মনে পড়ল। বলতেন, অমন শান্তশিষ্ট ছেলে ছিল—হঠাৎ শহরে পড়তে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে দেখে কিন্তু নষ্ট হওয়া ছেলে লাগে না। আসলে সেকেলে লোকেরা একালের ছেলেদের রকম-সকম বুঝতে পারেন না কি না! তাই ছেলেদের সব কিছুতেই ওঁদের সন্দেহ!

লোকটার কথায় অন্তরঙ্গতার সুর আছে। এ সেই জাতের লোক—যাদের মুখে তেঁতো কথা শুনতেও মিষ্টি লাগে। তবে বাবার জনপ্রিয়তা টের পাওয়া যাচ্ছে ক্রমশ। রাহুলও হেসে ফেলল সশব্দে। বলল, এখানে কোথায় থাকেন আপনি?

বলার পরক্ষণেই রাহুল আবিষ্কার কবল, মণিশঙ্করের একটা মোটর সাইকেল আছে। সেটা তার কাছেই দাঁড় করানো। মণিশঙ্কর সেটার সীট সাফ করার ভঙ্গীতে থাপ্পড় মেরে জবাব দিল—কাছেই থাকি। আসবেন সময়মতো। আপনি আমাদের নিজের লোক মশাই। হৃষিবাবু এ ময়নাচকের সবারই আপন মানুষ। হ্যাঁ—আমি থাকি মাইলটাক পশ্চিমে—ব্রীজ পেরিয়ে একেবারে খাঁখাঁ মাঠে।

রাহুল এগিয়ে এসে বলল, মাঠে কী করেন?

একটু আধটু চাষবাস আর ফলের বাগান-টাগানও আছে। মেকানাইজড্‌ এগ্রিক্যালচার করছি। অবশ্যই আসবেন কিন্তু। ভারি সুন্দর জায়গা—নদীর ধারে। কী আব করব বলুন? ব্যবসা করে পিতৃপুরুষ কিছু কানাকড়ি আর জমিজমা রেখে গিয়েছিলেন। যা যুগ পড়েছে, ব্যবসাও খুব সুবিধেজনক নয়—আমি ওটা পারিও না আসলে। এদিকে জমিজমাতেও আজকাল ঝঞ্ঝাট অনেক। যাই হোক, এ একটা নেশা বলতে পারেন। এবার মার্চে সদরের এগ্রিক্যালচার এগজিবিশানে কয়েকটা প্রাইজ পেয়েছি। এখন কৃষিই আমার লক্ষ্মী! আসবেন কিন্তু। নদীর ধারে গেলেই দেখতে পাবেন—হাইওয়ে থেকে জাস্ট এক ফার্লং মাত্র। শঙ্করবাবুর খামারবাড়ি বললে ভূতে দেখিয়ে দেবে।

মোটর সাইকেলে চেপে মণিশঙ্কর চলে গেল। রাহুল একটু আশ্বস্ত হল। আসলে পরিচয় হওয়া খুবই দরকার তার। হয়ে যাবে সহজেই—যা মনে হচ্ছে। সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে থাকল। তারপর কিছুদূর এগোতেই একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল।

সামান্য দূরে একটা ভিড় দেখা যাচ্ছিল। কাছাকাছি যেতেই জোর চেঁচামেঁচি শোনা গেল। মনে হচ্ছে দুটি বিবদমান পক্ষকে লোকেরা সামলানোর চেষ্টা করছে। রাহুল কৌতূহলী হয়ে উঁকি মারল। মিষ্টির দোকানের সামনে একটা কিছু অনাছিষ্টি কাণ্ড হচ্ছে নির্ঘাৎ। সামনে একটা মারমুখী যুবক ঘুঁষি পাকিয়ে তেড়ে আসছে—ট্যারা চোখ, মস্তান মার্কা চেহারা। তাকে আটকানোর চেষ্টা করছে কয়েকজনে। উঁকি মেরেই অন্য পক্ষকে দেখেই স্তম্ভিত হয়ে গেল রাহুল।

অরুণদা ! সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আরও হতবাক হল। অরুণদার ঠোঁট কেটে গেছে। রক্তের ছিটে লেগে রয়েছে। লাল চোখে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। হাঁফাচ্ছে। সেই ছোকরাটা কদর্য ভাষায় গাল দিতে দিতে বারবার তেড়ে আসছে। রাহুল সামনে গিয়ে, কি হয়েছে অরুণদা, বলার সঙ্গে সঙ্গে অরুণ লাফিয়ে উঠল।...এসেছিস্ ভাই ? দ্যাখ, দ্যাখ—শালা আমাকে মেরেছে ! ওই খানকির বাচ্চার এত স্পর্ধা যে আমার গায়ে হাত তোলে !

অরুণ হাউহাউ করে প্রায় কেঁদে উঠল। রাহুল দু পা বাড়িয়ে মারমুখী যুবকটির সামনে দাঁড়াল।......কী হয়েছে ? ওঁকে মেরেছ কেন ?

যুবকটি দাঁত ছরকুটে জবাব দিল, মেরেছি—আরও মারব শালা ঢ্যামনাটাকে। তুমি কে হে নাক গলাতে আসছ ? কেটে পড়ো দিকি।

পাশ থেকে তার বয়সী একজন বলে উঠল, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। এ যে নতুন মাল দেখছি।

ভিড়টা চুপ। বিনাপয়সায় মজা দেখার সুযোগটা সবাই উপভোগ করতে চায় যেন। রাহুল কঠোরস্বরে বলল, কেন মেরেছ ?

ট্যারা যুবকটি ভেংচি কেটে বলল, কেন মেরেছ ? ময়নাচকের নন্দর এটা অভ্যেস। মানুষ পেলেই মারে।

ভিড়টা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল চারপাশে। রাহুলের কান গরম হয়ে গেল। হযতো বেশি কিছু করে ফেলার উৎসাহ পাচ্ছিল না সে—এই কুৎসিত হাসির কোরাস তাকে পলকে ক্ষেপিয়ে দিল। সে আচমকা যুবকটি অর্থাৎ সেই নন্দর জামার কলার ধরে চিবুকে একটা নমুনাস্বরূপ 'তিননম্বরী' চালাল। নন্দ আটকাতে হাত তুলেছিল—হাতটা নিজের দাঁতে গিয়ে লাগবামাত্র ঠোঁট কেটে রক্ত দেখা দিল। রাহুল এবার তার 'দুনম্বরী' ঝাড়ল নাকের পাশে। পরক্ষণে সে নিজেকে আক্রান্ত দেখল চারপাশ থেকে। নন্দর সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। এলোমেলো চড় কিল ঘুষি লাথি চলেছে।

রাহুলের এ অভিজ্ঞতা নতুন নয় মোটেই। এতে সে অভ্যস্ত। চারপাঁচটি বদমাসকে একা কাবু করা তার ক্ষমতার বাইরে নয়। প্রতিপক্ষ কয়েকটা ঘুষি ও লাথি খাবার পর রাহুল দেখল একজন ইট তুলেছে হাতে। ইটটা তার মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে মিষ্টির দোকানের কাছে গিয়ে লাগল। ঝনঝন শব্দ হল। রাহুল লাফ দিয়ে ছোকরাটার ওপর পড়ল। সে পেটে ঘুষি খেয়ে পড়ে গেল। পরক্ষণে অরুণের চিৎকার শুনল সে। ...ড্যাগার, ড্যাগার ! রাহুল ! ওরে বাবা !

নন্দর হাতে চকচকে ছুরিটা দেখতে পেল সে। আরেক লাফে ওর ছুরিধরা-হাতের কব্জিটা ধরে ফেলল তক্ষুনি। কিন্তু হাতের একপাশটা কেটে গেল অনেকখানি। রক্ত বেরিয়ে এল। দুজনে ধস্তাধস্তি হতে লাগল। রাহুলকে অবিশ্রান্ত এই সুযোগে ঘুষি মারছিল নন্দর সঙ্গীরা। রাহুল ক্রমশ অবশ হয়ে

পড়ছিল। ছুরিধরা হাতটা সে তবু ছাড়ল না। সে টের পেল ছুরিটা ক্রমশ কেটে বসছে তার হাতে। একসময় তার হাত শিথিল হয়ে এল।

অরুণ সমানে চেঁচামেচি করছে। ভিড়টা সামান্য তফাতে সরে গিয়ে মজা দেখছে। রাহুল টলে পড়ে যাবার মুহূর্তে কার ভারি গলায় হুকুম শুনল, নন্দ ছেড়ে দে ওকে। এই শালার ব্যাটা শালা!

নন্দ তার হাত ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল রাহুল। আচ্ছন্ন চোখে তাকাল। একটি লম্বাচওড়া বিশাল লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে চাপা কৌতুকে। অরুণ তাকে হাতমুখ নেড়ে কী বোঝানোর চেষ্টা করছে। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপব রাহুল উঠে দাঁড়াল। অক্ষত বাঁহাতে অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে—আচমকা সেই লোকটিকেই ঘুষি মেরে বসল।

লোকটা ভারি সেয়ানা। খপ করে তার মুঠোটা ধরে সশব্দে হেসে উঠল। তারপর অন্যহাতে রাহুলের জামার কলারও ধরে ফেলল। রাহুল নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল—কিন্তু পারল না। সে ক্লান্ত, আহত—সর্বাঙ্গ ব্যথায় আড়ষ্ট। আর এই লোকটার শরীরে যেন অসুরের শক্তি।

লোকটা শক্ত হাতে রাহুলের জামার কলার ধরে তার মুখটা সোজা রাখল এবং পর পর দুটো ঘুষি চালাল দুদিকের চোয়ালে। রাহুল অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল তার, সে দেখল অরুণের ঘরে শুয়ে আছে। আলো জ্বলছে। সামনে অরুণকে দেখতে পেল। অরুণ বলল, উঁহু—নড়ো না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। রাহুল টের পেল তার ডানহাতটা ভারি—সারা শরীর অবশ। কিন্তু কোন যন্ত্রণা হচ্ছে না। একটু পরে সে বুঝল যে চোয়াল নড়ানো যাচ্ছে না। ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে দুদিকে। তার কথা বলার ইচ্ছে করছিল। ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু কথা বলা সম্ভব হল না।

অরুণ কাঁদোকাঁদো স্বরে বলল, আমিই শালা যত নষ্টের গোড়া! মিছেমিছি তোমার কপালে এত কষ্ট এনে দিলুম! উঃ! কেন যে এ শয়তানের রাজ্যে এসে জুটে-ছিলুম! এখানে কি মানুষ আছে কেউ? সব জানোয়ারের রাজত্ব ভাই রাহুল। আর দেখলে তো সব স্বচক্ষে! ওই নন্দ—নন্দ আমার এখানেই কাজ করত। বুঝলে? বিশ্বাস করে পার্টির কাছে টাকাপয়সা আদায়ের ভার ও ব্যাটার ওপর দিয়েছিলুম। তিন-তিনহাজার টাকা মেরে কেটে পড়ল ব্যাটা। তখন ওর মুরুব্বী সানু চাটুয্যেকে গিয়ে ধরলুম—এই তোমার চ্যালার কাণ্ড। একটা ফরসালা করে দাও। সানু মিটমাট করে দিলে। আসলে ভদ্রবংশের ছেলে তো সানু চাটুয্যে—এখনও বিবেকবুদ্ধি কিছু আছে। তা নন্দ রাজী হল। রাজী না হলে উপায় আছে আয়? এলাকায় সানুর নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। এখন—রাজী তো হল নন্দ। বারোটা কিস্তিতে টাকাটা শোধ করে. দেবে। প্রথম দুটো কিস্তি

বেশ ভদ্রভাবেই দিল। থার্ড কিস্তির বেলা শালা খানকীর বাচ্চা টালবাহানা স্বরু করল। দিনের পর দিন ঘোরাচ্ছে। কাঁহাতক আর পারা যায়? আজ শালাকে ধরে ফেললুম ওখানে—তারপর দুটো কথা কথান্তর হতে হতে শুওরটা আচমকা আমাকে মেরে বসল! …যাক্ গে, ভেবো না। ও টাকা আমার দরকার নেই। এখন তোমার জন্যে আমি মাষ্টারমশাইকে মুখ দেখাব কেমন করে ভাবতে পারছিনে ভাই। নিশ্চয় সব কথা কানে যাবে ওনার।

শীলা এসে বলল, দাদা, গরম দুধ।

রাহুল দেখল শীলা একটা প্লেটের ওপর দুধের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অকারণে হাসল রাহুল। হাসিটা হয়তো স্পষ্ট ফুটল না—ঠোঁটের কোণে সামান্য স্পন্দন তুলল মাত্র। কিন্তু শীলাও কি হাসল? ঠিক হাসল না—একটা হাসি চাপল যেন। কেন? রাহুলের হাসির বিনিময় মাত্র—নাকি তাকে দেখে তার কীর্তি জেনে শীলার হাসি পেয়েছে?

অরুণ বলল দুধ এনেছিস? চামচ না হলে খাবে কেমন করে? যা—নিয়ে আয়।

শীলা দুধ টুলে রেখে ভিতরে গেলে অরুণ বলল, ভাই রাহুল, আমি একবার বেরোচ্ছি। এখন জাস্ট সাতটা বাজে—আমি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব। ডাক্তারবাবুর কাছ হয়ে ফিরে আসব—ভেবো না। শীলা রইল। একবার সানু চাটুয্যের কাছে ঘুরে আসি। ডেকে পাঠিয়েছে। বিশ্বাস নেই—না গেলে ভাববে পাল্টা মতলব আঁটছি।

শীলা আসার পর অরুণ বেরিয়ে গেল। রাহুল চোখের ভাষায় শীলাকে বলতে চেষ্টা করল, বসুন।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করে শীলা নিঃসংকোচে কাছে এল। তারপর বলল, নিজে খেতে পারবেন—নাকি খাইয়ে দিতে হবে?

রাহুল ফের তেমনি হাসল—মাথাটা দোলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শীলা তার পাশের চেয়ারে বসে চামচে দুধ তুলে বলল, এই, হাঁ করুন—আপনারও আর কাজ ছিল না! দাদার পাল্লায় পড়ে গেলেন। লোকটা কেমন গণ্ডগুলে মানুষ—জানা ছিল না—তাই না?

রাহুলের কিছু খাবার ইচ্ছে মোটেও ছিল না। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে শীলার সাদা হাত—সাদা চিরোল আঙুলে ধরা দুধভরা রুপোলি চামচটা তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদরের জিনিস মনে হচ্ছিল। শীলার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। শীলার দুচোখে দুটো চামচ চকচক করছে—অসম্ভব উজ্জ্বল দুটো স্নেহভালবাসা! রাহুল তার জীবনের অন্ধকার হাতড়ে বিপন্নভাবে খুঁজতে চেষ্টা করছিল—কী যেন এমনি উজ্জ্বল বস্তুখণ্ড তারও সঞ্চিত ছিল, বড় পরিচিত ছিল—এমনি মুখ, স্নেহভালবাসায় নরম হয়ে ওঠা চিরোল আঙুল! কতকাল আগে তা হারিয়ে গেছে। তার কথা বলতে ইচ্ছা করল। যে কোন কথা। ক্ষোভ দুঃখ

অভিমানের কথা—অথবা কিছু রাগের কথা। চুপ করে থাকা তার অসম্ভব মনে হচ্ছে। ভীষণভাবে সাড়া দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কিছু করার নেই, এবং পরিণামে এই অক্ষমতার বিপুল চাপেই তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

শীলা চমকে উঠল। ···আরে! আপনি কী ছেলেমানুষ! কাঁদছেন কেন? মারামারিতে হেরে গেলে কেউ কাঁদে নাকি? উঁহু—চুপচাপ দুধটা খেয়ে ফেলুন তো। গায়ে বল না হলে আবার ফাইট করবেন কিসের জোরে? জানেন—মার দিতে যারা পারে, তাদেরও মাঝে মাঝে মার খেতে হয়?

চাপা হাসিতে তার মুখটা উজ্জ্বল। রাহুল চোখ বুজল। হ্যাঁ—তাকে সেরে উঠতে হবে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে অনেকটা শক্তি তার দরকার। আপাতত নন্দ নয়—সানু চাটুয্যের চোয়াল না ভাঙা অব্দি তাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

চোখবুজে নিঃশব্দে দুধ খাচ্ছিল সে। হঠাৎ শীলার কণ্ঠস্বরে চোখ খুলল। শীলা উঠে দাঁড়িয়েছে। ···কে কে ওখানে? বলে সে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাইরের দিকে জানালাটা খোলা ছিল। রাহুল দেখল—চমকে উঠল। গঙ্গা!

শীলা দরজা খুলে বলল, মাসিমা! আরে—আসুন, আসুন।

গঙ্গা ঘরের ভিতর এক পা বাড়িয়ে রাহুলকে একবার দেখে নিয়ে শুধু বলল, আচ্ছা, চলি শীলা।

শীলা বলল, এসেই চলে যাচ্ছেন মাসিমা? বসবেন না? বউদি বকবেন—জানতে পারলে।

পরে আসব'খন। ······বলে দ্রুত ঘুরে চলে গেল গঙ্গা।

শীলা দরজাটা বন্ধ করে বলল, ঢঙ দেখে বাঁচিনে! ছেলের খবর নিতে এসেছিলেন দয়াময়ী জননী! রাহুলবাবু, আপনার ছোটমাকে চিনতে পারলেন তো?

রাহুল প্রচণ্ড চেঁচিয়ে শীলাকে থামিয়ে দিতে পারলে আকস্মিক ভয়ংকর আলোড়নটা প্রশমিত হত; কিন্তু পারল না। তার চোখদুটো নিষ্পলক হয়ে উঠল। শীলা দৌড়ে কাছে এসে বলল, কী হয়েছে আপনার? রাহুলবাবু। শুনছেন? অমন করে তাকাচ্ছেন কেন? সত্যি বড্ড ভয় করছে আমার। রাহুলবাবু!

রাহুল তেমনি রক্তরাঙা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল। একটা ভয়ংকরকে যথাশক্তি ভিতরের অন্ধকারে ঠেলে দিতে তার সবটুকু রক্ত যেন ঘাম হয়ে বেরুচ্ছে।

ময়নাচকের এই অভিজ্ঞতাটা তার নতুন। রাহুল কোনদিন কারো হাতে মার খায়নি। সে জেনেছিল যে অপরকে মার দিতেই তার জন্ম। কিন্তু এতদিনে টের

পাচ্ছিল একটা গোলকের সুমেরু ছাড়া কুমেরু আছে। আসলে সে বহরমপুর এলাকায় একা ছিল না। সারাক্ষণ তার মাথা বাঁচানোর জন্যে নেপাল আর তার দলবল ছিল তৈরী। সে ছিল দলের একটা অংশ মাত্র। এখানে আজ সে একা। কেউ তার মাথা বাঁচানোর জন্যে নেই এখানে। কাজেই আজ তার শক্তির পুরোটা যাচাই হয়ে যাচ্ছে। আজ তার যা কিছু শক্তি—তার উৎস সে নিজে। এই অভিজ্ঞতার অবশ্যই দরকার ছিল। কতখানি জোর তার দরকার এবার জানা গেল। এখন তাকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে বাড়তি অনেক কিছু সংগ্রহ করতে হবে। সুতীব্র সাহস, ক্ষিপ্রতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চাতুর্য—অনেক কিছু জিনিস তার দরকার, পরোক্ষে যা বুদ্ধি থেকে মেলে। তা না হলে সে এখানে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আর সৎ নিরীহ ভালোমানুষ হয়ে-ওঠাও তার পক্ষে সম্ভব নয়—হয়তো সহজও নয় আর। ইচ্ছের বিরুদ্ধে, হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে তার জীবনের সবকিছু। এখন আর চেষ্টা করেও ভালো মানুষটি হয়ে ওঠা যাবে না।

তিনটে দিন তার বিছানায় কেটে গেল। কীভাবে কাটল, সে স্পষ্ট টের পায়নি। একটা গুরুতর আচ্ছন্নতা কুয়াসার মতো তার অস্তিত্বের চারপাশ ঘিরে ছিল সারাক্ষণ। তার মধ্যে শুধু শীলাই ছিল কিছুটা স্পষ্ট—বাকি সব অস্পষ্ট। গঙ্গা আরেকবার নাকি এসেছিল, সে জানে না। তখন তার প্রচণ্ড জ্বর। মাথার কাছে বসে থেকে চলে গেছে। শীলা বলেছে। আর এসেছিল সেই সানু চাটুয্যে। বলে গেছে, পরে আসবে। সানু আরও বলে গেছে, মাস্টারমশায়ের ছেলে জানলে সে ওর গায়ে হাতই দিত না। নিষ্পত্তি করে ফেলত ব্যাপারটার। যাক্‌গে, যা হবার হয়েছে। পরে এসে ভাব করে ফেলবে। তাছাড়া সানু খুব অবাক হয়েছে যে রাহুলের মারপিটে এমন ওস্তাদী হাত আছে। সেইজন্যেই তার ভাব করার ইচ্ছেটা এত তীব্র। ময়নাচকে নন্দরা সবাই আসলে তার মতে নেড়ি কুত্তা—তার মধ্যে এ একটা ডালকুত্তা সন্দেহ নেই। হুঁ, সানু খুব খুশি হয়েছে।

চতুর্থ দিনে সকালে যখন ঘুম ভাঙল, শরীরটা হাল্কা লাগল তার। সে স্বচ্ছন্দে উঠে বসতে পারল। দুর্বলতা সামান্য আছে, কিন্তু সেটুকু আমল দিল না সে। প্রথমে মুখের ব্যান্ডেজটা একটানে খুলে ফেলল। দেখল দুটো চোয়ালেই কালচে ছোপ পড়েছে। তখনও একটু ফোলাভাব বোঝা যাচ্ছে সেখানে। চোয়াল নাড়া দিতে গেলে বিশেষ ব্যথা আর নেই। গতরাত্রে কথা বলতে পারছিল—কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল। এখন সেই কষ্টটা নেই। নেই—তা স্পষ্টভাবে বোঝবার জন্যেই ডাকল, অরুণদা, ও অরুণদা!

নাঃ, সে এবার অনেকটা ফিট হয়ে উঠেছে। শুধু ডানহাতের ব্যান্ডেজ এখনও কিছুদিন খোলা যাবে না। ঘা সারতে সময় লাগবে। বুড়ো আঙুল নড়ানো যাচ্ছে না। তালুও টনটন করছে। সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ফের অরুণকে ডেকে বাঁহাতের সাহায্যে বাইরের দরজাটা খুলে দিল। বাইরে প্রচুর রোদ নিয়ে

অনেক আশা আর সম্ভাবনায় ভরা পৃথিবীটা অপেক্ষা করছে তার জন্যে। পরিচ্ছন্ন আকাশে খেলা করছে প্রসন্ন একটা মুক্তি। অন্তত রাহুলের তাই মনে হল —আকাশ এবং রোদে ঝকমকে পৃথিবী জুড়ে মুক্তির গভীর আস্বাদ রয়েছে ছড়ানো। সেখানে পা বাড়ালেই তার দুর্বিনীত স্বাধীনতার বোধ বাঘের মতো সগর্জনে সাড়া দেবে। আর এই ভয়-না-মানা হার-না-মানা ক্ষুধিত স্বাধীনতার বোধই তো তাকে কোনদিন আর দশটা ছেলের মতো সুবোধ করে তুলতে দ্যায়নি।

অরুণের সাড়া সে পেল না। এল শীলা। ভিতরের দরজা খুলে প্রথমে অবাক হল। তারপর হেসে উঠল।…এই ম্মা! কী হবে!

রাহুল বলল, কিছুই হবে না। মুখ ধোবার জল দিতে পারেন? ঠাণ্ডা জল কিন্তু।

শীলা চোখ কপালে তুলে বলল, সে কী! ব্যাণ্ডেজ খুলে গরম জলে মুখ ধুতে বলেছেন যে ডাক্তার। একটা পাওডারও দিয়ে গেছেন।

উঁহু। আর ডাক্তার-ফাক্তার নয়।……রাহুল একটু হাসল।……আমি নিজেই এখন ধন্বন্তরী।

শীলা বলল, সেই তো! এখন মুখে কথা ফুটেছে—আর কে কার ভরসা করবে!

রাহুল পলকে ক্ষুব্ধ হল। দেখুন ভরসা আমি কারো ওপর করতে চাইনি। পথে ফেলে দিতেই পারতেন আপনারা।

শীলা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ছি, ছি! আমি কী তাই ভেবে কিছু বললুম নাকি! আপনি ভারি মেজাজী লোক রাহুলদা। অত হিসেব করে কথা বলতে আমি শিখিনি।

সে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল—রাহুল ডাকল, শীলা শুনুন।

বলুন।

আপনিও কম মেজাজী নন, দেখছি।

ওর কথার সুরে শীলা ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, জল ঠাণ্ডাই এনে দিচ্ছি—কিন্তু খারাপ কিছু হলে আমার দায়িত্ব নেই।

কিসের দায়িত্ব? আমার জন্যে দায়ী আমি নিজে।……রাহুল বলল।…আচ্ছা, অরুণদা ওঠেনি এখনও?

শীলা জবাব দিল, আজ দাদার ঘুম সকালেই ভেঙেছে। মানে ভাঙানো হয়েছে। সানু এসেছিল—সেই বদমাস লোকটা—তার সঙ্গে বেরিয়েছে দাদা। কী জানি কী ব্যাপার।

রাহুল একটু অস্বস্তি বোধ করল। বলল, লোকটার সঙ্গে আপনার দাদার বুঝি ভীষণ ভাবটাব আছে?

শীলা ভ্রূ কুঁচকে এবং ঠোঁট উল্টে বলল, কে জানে! দাদার ব্যাপারে আমার উৎসাহ নেই। দাঁড়ান জল এনে দিচ্ছি।

রাহুল দেখল সানু চাটুয্যের নামে তার অবচেতনা থেকে এই অস্বস্তিটা যেন অনুভূত

হচ্ছে। সে তাকে মেরেছিল বলে? কিছুক্ষণ এটা নিয়ে ভাবল সে। আচ্ছন্নতার মধ্যে ওই লোকটার কণ্ঠস্বর সে শুনেছে মনে পড়ছে। কেন এসেছিল তাকে দেখতে? এসব ক্ষেত্রে তো তারা দুজনে পরস্পর শত্রু—কারণ আঘাত ও আক্রমণ ঘটেছে দুপক্ষের মধ্যে। হতে পারে এটা সামান্য বিবাদ মাত্র, কিন্তু নিতান্ত দৈবাৎ উত্তেজনার মুখে ঘটে গেছে—তারা দুজনে পরস্পর অপরিচিত বটে; কিন্তু সানু চাটুয্যের এই খোঁজখবর নেওয়া আর উদারতা দেখানো কেমন অস্বস্তিকর লাগছে। শুধু কি মাষ্টারমশায়ের ছেলে বলে তাকে খাতির দেখাতে চায় সে? সেজন্যেই কি বলতে চায় যে সে অনুতপ্ত হয়েছে? অনেক প্রশ্ন মনে ভিড় করল রাহুলের। সানু সম্পর্কে সে মোটামুটি যা জেনেছে—তাতে বোঝা যায়, লোকটি নেপালদার জাতেরই একজন। কিন্তু সে নেপালের চেয়ে অনেক উঁচুদরের মানুষ নাকি। বেশ অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে সানু বা সনৎ চ্যাটারজি। তার দাদা এলাকার রাজনীতির পাণ্ডা। তাছাড়া সানু রাহুলের মত কলেজ ছাড়া। বিদ্যেবুদ্ধি বড় কম নেই। এদিকে অরুণের মত মিথ্যুক অসচ্চরিত্র লোভী লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। ব্যাপারটা বড় রহস্যময়। শীলা কি কিছু জানে?

শীলা জলের বালতি এনে বলল, নিন। মুখটুখ ধুয়ে আজ ভিতরে আসবেন কিন্তু। বউদি আপনাকে ডেকেছে।

রাহুল জল নিয়ে বাইরে গেল। বারান্দায় বালতিটা রাখল। নিমডালের দাঁতন করা সম্ভব হবে কি না ভাবল কিছুক্ষণ। মুখের ভিতরটা পচে গেছে যেন। কদিন ধরে দাঁত মাজা হয় নি একেবারে।

শীলা যেন টের পেয়েছিল। ঘরের ভিতর থেকে বলল, গুঁড়ো মাজন এনে দিচ্ছি। ডাল ভাঙতে যাবেন না যেন। একদিনে বেশি-বেশি স্ফূর্তি দেখাতে গেলে আর ফাইট করবেন কেমন করে?

রাহুল হেসে বলল, সত্যি বলেছেন। কিন্তু দেখে শুনে মনে হচ্ছে, আমাকে চাঙ্গা করতে পারলে আপনি খুব খুশি। অর্থাৎ লাস্ট ফাইটটা দেখবার লোভ বড্ড প্রবল। তাই না?

শীলা জবাব দিল, কেন হবে না বলুন? বিনা পয়সায় জলজ্যান্ত মজা দেখতে কে না চায়। এ্যাদ্দিন পর্দার ছবিতে ওসব দেখেছি—এবার বাস্তবে দেখব। হাততালি দেব।

রাহুল বলল, ঠাট্টা হচ্ছে? মনে হচ্ছে না যে আমি কাকেও মারতে পারি!

শীলা হেসে বলল, বা রে! মনে কত কী হচ্ছে। কিন্তু সানু চাটুয্যের সামনে শুনেছি নাকি খুব জবর পালোয়ানও ভিরমি খায়।

রাহুল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, দেখা যাবে। দেখবেন আপনি। আপনাদের সানু না কানু—

শীলা সকৌতুকে বলল, আপনি এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ রাহুলবাবু। এখনও

বাচ্চাদের স্বভাব আপনার যায় নি। ছাড়ুন তো ওসব—মুখ ধুয়ে ভিতরে আসুন। বউদি ডাকছেন।

রাহুল জেদের স্বরে বলল, সানুর সম্পর্কে অন্যের কী ধারণা জানিনে—আপনার ধারণা দেখছি খুব উঁচু। অনেক ভক্তি-টক্তিও থাকতে পারে লোকটার ওপর। কিন্তু আমি রাহুল। আমাকে আপনি চেনেন না।

শীলা হঠাৎ কণ্ঠস্বর একটু চাপা করল।...ভক্তি-টক্তি হবে না। ধারণা উঁচু হবে না আবার? জানেন, সে আমার কে?

চমকে উঠল রাহুল। ঘুরে বলল, আপনার! কে হয় সে আপনার?

শীলা চোখ নামিয়ে বলল, হয় নয়—হতে চলেছে। সে আমার গলায় নাকি মালা দেবে। দাদা খুসি হয়ে নিজে থেকেই কথাটা তুলেছেন। চাটুয্যে মশায়ের কোন আপত্তি নেই।

রাহুল দু পা এগিয়ে বলল, এ কী বলছেন! অরুণদা জেনেশুনে—

বাধা দিয়ে শীলা বলল, জেনেশুনে নয়, প্রাণের দায়ে। নৌকোর চারিদিকে যে হাজারটা ফুটো—জল ঢুকে কখন ডুবে যায় সেই ভয়ে একটা করে ফুটো বন্ধ করার মতলব। কিছু ফুটো বন্ধ করবেন শ্রীমান চাটুয্যে—কিছু আপনি। দাদা আমার কী রকম লোক—তা জানেন না বুঝি?

শীলা দ্রুত ভিতরে চলে গেল। রাহুল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। শীলা, এই শীলার সঙ্গে হারামজাদা সানুটার বিয়ে হবে? আজ সব আগে একটা পবিত্র কর্তব্য আছে রাহুলের। সেটা হচ্ছে, যে কোন মূল্যে এই বিয়েটা ভাঙা। অমন চমৎকার মেয়েটার সর্বনাশ করতে অরুণদার বাঁধবে না? আশ্চর্য তো। সে মনে মনে বলল, রাজেনবাবু, আপনার কাজ পরে হবে। আপাতত একবার সানু চাটার্জির সঙ্গে চরম বোঝাপড়া করাটাই জরুরী। কিন্তু অরুণের চাদ্দিকে ফুটো কিসের?

একটু পরে ভেতরে যেতে হল রাহুলকে। অরুণের বউর সঙ্গে তার প্রথম মুখোমুখি আলাপ। প্রথম দর্শনেই তার মনে হল, মেয়েটি ভালো। ভালো মানে বোকা আর সাদাসিদে। ওর গায়ের রঙ বেশ ফরসা, চেহারায় লালিত্যেরও অভাব নেই—কিন্তু অনেক দিন ধরে নানান অসুখে ভুগে চেহারাটি হয়েছে যেমন পাটকাঠি, তেমনি ফ্যাকাসে। এসব মেয়েরা সচরাচর তিরিক্ষি মেজাজের হলেও দোষ দেওয়া যায় না। অরুণ বলেছিল ওর আসল অসুখ হচ্ছে মনে—মেজাজই ওর অসুখের কারণ। তাই রাহুল ভেবেছিল, দুটো কড়া কথা বলতেই ডেকেছে অরুণের বউ। কারণ উড়ে এসে জুড়ে বসে হাঙ্গামা বাধিয়েছে রাহুল। হয়তো অরুণের প্রতিপক্ষকে রাহুলই আপোষ ফয়সালার বাইরে ফেলে দিয়েছে এবং তার ফলে অরুণের নন্দঘটিত সমস্যা আরও বেড়ে গেছে।

কিন্তু মিষ্টি হেসে অরুণের বউ করুণা কথা বলতে সুরু করলে রাহুল আশ্বস্ত

হয়েছে। শুধু আশ্বস্ত নয়, মনে হয়েছে—এ যেন কতকালের চেনাজানা আপনজন। রাহুল তার নিজের সম্পর্কে অরুণের মনোভাব পুরোটাই জানে। সে জানে যে অরুণের খাতির করার পিছনে কিছু স্বার্থ আছে—তা না হলে পারতপক্ষে রাহুলের মতো ছেলেকে সে এড়িয়ে থাকত। আর—শুধু অরুণ কেন, যারাই রাহুলের সবিশেষ পরিচয় জানে তারা প্রত্যেকেই তো তাকে মনে মনে গভীরভাবে ঘৃণা করে। করুণাও তাকে সবিশেষ জানে বইকি—অরুণ তার সম্পর্কে সবই বলেছে। অথচ করুণা যেন তাকে ঘৃণা করল না! করুণা বলল, একালের ছেলে সব—চাকরী-বাকরী নেই, কাজকর্ম্ম পায় না। একটু আধটু দুষ্টুমি করবে না তো কী করবে শুনি? বেশ করবে। বিষদাঁত না থাকলে এ যুগে চলে না মোটে। এই দ্যাখো না তোমাদের দাদাটির কাণ্ড। যদি শক্তসমর্থ মানুষ হত, চাদ্দিক থেকে কেউ ওকে লাঞ্ছনা করবার অবকাশ পেত? আমি তোমার প্রশংসা করেছি, রাহুল। শীলাকে জিজ্ঞেস করো। বলেছি, পুরুষ ব্যাটাছেলে—কখনও দুঘা দেবে, কখনও দুঘা খাবে—তাতে লজ্জা কিসের?

পরক্ষণে সে একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, সানু চাটুয্যেকে তুমি মেরেছ শুনে আমার তো ভাই নাচতে ইচ্ছে করছিল। ওই খড়ের অসুরকে সবাই এখানে নাকি ভয় পায়।

রাহুল হেসে বলল, নাঃ, মারতে আমি পারিনি বউদি। সেই আমাকে মেরেছে।

করুণা বলল, আহা, হাত তো তুলেছিলে মারতে—আমি সব শুনেছি ভাই। ওই হাত ওঠানোই হচ্ছে আসল কথা। সানুর গায়ে হাত ওঠানোর মানুষ যে এ তল্লাটে নেই। তাই শীলাকে বলছিলাম, ওকে আমি সামনে বসিয়ে খাওয়াবো, দুটো কথা বলে শান্তি পাব রে শীলা! ওকে একবার ডেকে আনবি? আমার তো চলাফেরা বারণ। তাছাড়া বড্ড মাথা ঘোরে।

শীলা দুষ্টু হেসে বলল, চাটুয্যেমশায়কে রাহুলবাবু চিনতেন না বলেই হয়তো মারতে হাত তুলেছিলেন!

রাহুল হো-হো করে হাসতে গিয়ে, দেখল, চোয়ালে ব্যথা। সে বিকৃতমুখে বলল, যা বলেছেন!

করুণা ধমক দিল।...তুই থাম্ শীলা। রাহুল ঠাকুরপোকে তুই চিনিসনে। বেথুয়াডহরিতে থাকতে তোর দাদার মুখে ওর যা সব গল্প শুনেছি, ভয়ে তো বুক ঢিপঢিপ করছে। আসলে ভুলেই গিয়েছিলুম ওর কথা। গত রাত্তিরে তোর দাদা বলল, সানুর সঙ্গে একটা মিটমাট করে দিতে হবে রাহুলের—সানু নিজেই উদ্যোগী। বারবার আসছে সেজন্যে। বুঝলি শীলা? তখনই আমার মনে পড়ে গেল। আরো তাইতো! রাহুলের কথা তো আমি শুনেছিলুম! এ তবে সেই রাহুল!

করুণা হেসে উঠল। হাসতে সম্ভবতঃ কষ্ট হয় ওর। পরক্ষণে বলল, হাঁফিয়ে উঠি ভাই বেশিক্ষণ কথা বললে। তুমি এখানে থাকো ভাই, কোথাও তোমাকে যেতে

দেব না। নিজের বাড়ির মতো থাকো। নিজের মা নেই বাবা থেকেও নেই, তো কী হয়েছে? আমি তো আছি। যদ্দিন বাঁচব তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আপাতত সেরে-টেরে ওঠ, তারপর…

তাকে থামতে দেখে শীলা বলল, তারপর কী হবে বউদি? লড়িয়ে দেবে কারো সঙ্গে?

করুণা ধমক দিয়ে বলল, লজ্জা করে না তোর হতভাগা মেয়ে? কী হবে? তোর নিজের কথা একবার ভেবে দেখেছিস? একবারটি ভেবেছিস তোর দাদার কথা? তাহলে বুঝতিস, আমরা এখানে কী অসহায় অবস্থায় বেঁচে আছি। তোমাকে সব বলব রাহুল, সব জানতে পারবে। দিনের পর দিন ওই বদমাস সানু তোমার দাদার কাছে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। সময় নেই অসময় নেই—এসে হাত বাড়াচ্ছে। না পেলে শাঁসাচ্ছে, ইটখোলাশুদ্ধ উড়িয়ে দেবে নাকি। অগত্যা, তোমার দাদা ডাকাতটার মুখ বন্ধ করতে…

বাধা দিয়ে রাহুল বলল, বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে—তাই না?

করুণা চমকে উঠে বলল, তুমি জানো? ভাই রাহুল, কথাটা শুনে আমি ওকে যা-না-তাই গালমন্দ করেছিলুম। কিন্তু শেষ অব্দি ভেবে দেখলুম, আর কিই বা উপায় আছে!

শীলা ফোঁস করে উঠল, হ্যাঁ—তা তো নেই। মায়ের পেটের বোন তো নয়—উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক হতচ্ছাড়ী। অতএব তাকে বলি দিয়েই দেবতাকে তুষ্ট করা যাক্।

করুণা হাত তুলে বিষণ্নস্বরে বলল, না—তা নয় রে শীলু, কথাটা তা নয়। বিয়ে তো তোর দিতেই হবে—কারো না কারো ঘর করতেই হবে। রাবণরাজারও তো ঘরকরার মেয়ে ছিল ভাই রাহুল, ছিল না? তাই শেষটা আমিও মত দিয়েছিলুম। কিন্তু সে আমার মুখের সায়—তোমার দিব্যি ভাই, মনের সায় আমার ছিল না। আর এখন—এখন তুমি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছ, এখন বুকে জোর বেড়েছে। তাই কথাটা আবার ভাবছি। সানুর মত রাক্ষসের গ্রাসে এমন সুন্দর কচি মেয়েটাকে ফেলে দিতে কার বা মন চায়, বলো? রাহুল, তুমি আমাদের বাঁচাও ভাই!

শীলা উঠে কোথায় চলে গেল। রাহুল মাথাটা একবার দোলাল মাত্র। তার মনটা এবার তেঁতো। তাহলে এই হচ্ছে আসল ব্যাপার! এই শত্তুরের বাচ্চা দুনিয়ায় এই হচ্ছে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের প্রকৃত ভিত্তি। স্বার্থ না থাকলে কোন শালা বাঁশালী আপন ভাবতে একটুও রাজী নয়। সবাই চায় একজন শক্তসমর্থ মারাত্মক ধরনের দেহরক্ষী—কারণ এখন সব পথই অন্ধকার এবং শত্রুসঙ্কুল। আমি শক্তিমান—তার একটি অর্থই আজ খুঁজে মেলে—সেটি হচ্ছে, আমি খুন করতে পারি। খুনীই এখন শক্তিমান। ওস্তাদ লড়ুয়ের দিকেই সবার একাগ্র সপ্রশংস দৃষ্টি। আমি সানুর গায়ে হাত ওঠানোর ক্ষমতা রাখি, এতেই আমি হিরো হয়ে গেছি। বাঃ!

করুণার কথা শুনতে পেল সে।...ভাই রাহুল, নিরীহ মানুষ আমরা। কারো সাতে পাঁচে নেই। কিন্তু তবু রেহাই আছে? চারদিকে ওঁৎ পেতে বেড়াচ্ছে বদমাসের দল। তুমি আমাদের বাঁচাও।

রাহুল উঠে দাঁড়াল।...বউদি! মহাভারতে একটা শ্লোক আছে, জানেন নিশ্চয়।...দুষ্কৃর্তিকে বিনাশ করতে আর সাধুদের পরিত্রাণে ভগবান নাকি যুগেযুগে অবতার হয়ে গজান। আমি অবশ্যি অবতার মোটেও নই। আমি সামান্য পাপী তাপী গুন্ডা-বদমাস মানুষ। দুষ্কৃতি করাটাই আমার ধর্ম। তবে কথা দিচ্ছি, দেখব কী করতে পারি। না বউদি, হয়তো শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নয়—যদিও উনি আমার যথেষ্ট সেবাশুশ্রূষা করেছেন—আমি সানু চ্যাটারজিকে দেখব শুধু নিজের কারণে। জীবনে কখনও মার খাইনি কারো হাতে। আমার রাগ বলুন—সেটাই আসল কথা।...

বাইরের ঘরে চলে এল সে। দেখল, শীলা চুপচাপ বসে আছে তার বিছানায়। কিন্তু ও কী করছে সে? কোত্থেকে খুঁজে বের করল ওই জিনিসটা?

রাহুল অস্ফুট চেঁচিয়ে ঝুঁকে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।...আরে, আরে! করছেন কী? এটা কেন বের করলেন? রেখে দিন, রেখে দিন—অটোমেটিক। গুলি পোরা আছে।

শীলা তার বিছানার তলা থেকে রিভলবারটা বের করে নাড়াচাড়া করছিল। সাবধানে সেটা তুলে দেয়াল তাক করে বলল, কোথায় পান আপনারা? আমাকে একটা দিতে পারেন?

রাহুল বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে—দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সে জোর করল না। পাশে বসে শান্ত গলায় বলল, দরকার হলে ওটাই পাবেন। এখন লক্ষ্মীমেয়ের মতো রেখে দিন তো। উঁহু হু—ট্রিগারে আঙুল দেবেন না। অটোমেটিক। শীলা, প্লীজ, লক্ষ্মীটি!

শীলা নিঃশব্দে হাসছিল। বলল, সে-রাতে আপনার ঘরে উঁকি মেরেছিলুম, জানেন? আমার ঘুম আসছিল না। আসবে কেমন করে! পাশের ঘরে একা একজন জ্বরের ঘোরে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে—হয়তো জল তেষ্টা পেয়েছে। কেউ দেবার নেই। চুপিচুপি উঠে এলুম। ওই দরজাটা তো বন্ধ থাকে না। একটু ফাঁক করে দেখি আপনার মাথাটা, বালিশ থেকে পড়ে গেছে। বালিশও পড়ে গেছে নিচে। তখন বিছানাটা ঠিক করতে গিয়ে কেমন শক্ত কিছু হাতে ঠেকল। এই জিনিসটা আবিষ্কার করলুম। খুব ভয় পেয়েছিলুম—কিন্তু হঠাৎ মনটা খুসি হয়ে উঠল। বুকে যেন জোর পেলুম। ইচ্ছে করছিল, এটা লুকিয়ে ফেলি। বিপদের দিন ঘনিয়ে আসছে—তখন এর চেয়ে আর বড় বন্ধু কোথায় পাব! কিন্তু পারলুম না। আপনার দিকে তাকিয়ে সেটা পারা গেল না।

শীলা, আপনি কাঁদছেন!

ফেট্। কান্নাটান্না আমার আসে না।···তারপর কী হয়েছে শুনুন।

শুনব, ওটা আপনি—তুমি রাখো আগে। আঃ শীলা, এই!

রাহুল অসতর্ক বিহ্বলতায় একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিল শীলার। অন্তত বাঁ-হাতটা শীলার পিঠ ঘুরে ওর হাতে ধরা রিভলবারটার কাছে পৌঁছতে গিয়েই এই বিপত্তিকর ঘনিষ্ঠতা! দুটো মুখ অনিবার্যভাবে খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। শীলার শ্বাসপ্রশ্বাসের গন্ধ ঝাপটা মারছিল রাহুলের মুখে। শীলা সরল না। বলল, কতবার এটা চুরি করতে চেয়েছি। সুযোগ পাইনি। মনে হয়েছে আপনি ধরে ফেলবেন! আপনাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না হয়তো। তারপব আমি মনে মনে—ও রাহুলবাবু রাগ করবেন না তো? যদি বলি—মনে মনে আপনার মরণ চাইছিলুম। শীলা চাপা হেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাহুল দেখল তার নিজের শরীরজুড়ে জেগে উঠেছে একটা অনন্যসাধারণ তৃপ্তি। নারীশরীরের স্বাদ তাকে প্রথম একদা গঙ্গাই দিয়েছিল—তারপর বহু সুযোগ জীবনে এসেছে, সুযোগগুলোর যথাযোগ্য ব্যবহার সে করে নি, ভাল লাগত না। একটা হিংস্র শক্তির হাতে পুতুল হয়ে উঠেছিল সে—মানুষের টাটকা রক্ত তাকে জীবনের আস্বাদ দিত। পৃথিবী আর মানুষকে ঘৃণা করাটাই তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। সেই ঘৃণা দিয়ে ত্যাগ করাই যায়—ভোগ কবা অসম্ভব। এখন সে দেখল, ব্যাপক ঘৃণার প্রচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে আলোর শিখার মতো একটা কিছু উঠে আসছে—তাকে অবশ করে ফেলছে। দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সেই আলোয় সব ঘৃণা সরে যাচ্ছে পলকে পলকে। আর সে জড়িয়ে ধরল শীলাকে। চুমু খেয়ে বসল হঠকারিতায়। শীলা কিন্তু চমকাল না। নড়ে উঠল না। স্থির অবিকৃত ঠোঁটে নিল চুমুগুলো। তাবপর রিভলবারটা রাহুলের হাতে দিয়ে বলল, যার হাতে যা মানায়। ফেট! আমি কি মানুষ মারতে পাবি!

রাহুল বলল, তোমাকে মানুষমারা আমি শেখাব।

বিকেলে মণিশঙ্কর এল মোটর সাইকেলে। রাহুল চুপচাপ শুয়ে ছিল। মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হয়েছিল সে। অরুণ ইটখোলার দেখাশোনায় ব্যস্ত। দরজায় ধাক্কা আর অরুণের নাম ধরে ডাকাডাকি শুনেও মণিশঙ্করের কথা ভাবেনি রাহুল। আসলে, তাকে ভুলে গিয়েছিল সে। শীলা এসে দরজা খুলতে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিল অকারণে। তারপর মণিশঙ্করের আবির্ভাব।

এসেই বিছানার পাশে বসে হন্তদন্ত বলল, কী মুসকিল! এত সব কাণ্ড হয়েছে, একটুও জানতুম না ভাই। আজ সকালে অরুণের কাছে শুনলুম। অরুণ বলেনি যে আমি এবেলা আসব?

রাহুল মাথা দোলাল।

ভুলে গেছে তাহলে।···মণিশঙ্কর কৌটো থেকে পান বের করে মুখে দিল।···ওর বড্ড

ভুলো মন। অবশ্য, কাজের চাপও তো কম নয় বেচারার। কুমড়োদহর রাস্তায় ইটের নতুন অর্ডার পেয়েছে বলছিল। বেশ আছে ও। ওই টিঙটিঙে শরীরে যা খাটে, ভাবা যায় না! যাক্ গে রাহুলবাবু। কাণ্ডটার জন্যে সত্যি বড় দুঃখিত ভাই। ময়নাচকের আসল লোকেরা কিন্তু মোটেও বদমাস নয়। এই টাউনশিপ হবার পর কোত্থেকে সব নানা ধরনের লোক হাজির হয়ে জায়গাটা নরক করে তুলেছে। আমি—মণিশঙ্কর হেসে বলল,—অন বিহাফ অফ দি গুড পিপল অফ ময়নাচক, অ্যাপলজি চাচ্ছি রাহুলবাবু। শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশায়ের ছেলে আপনি, আপনাকে আঘাত করা তো দূরের কথা—কটুকথা কেউ বলবে, ভাবতে আমার অবাক লাগছে!

রাহুল চুপ করে বসে থাকল।

এখন কেমন আছেন? চলাফেরা করতে অসুবিধে হয় না তো? একটা ব্যাপার আমি বুঝিনে মশাই—অরুণ কেন এটা পুলিশে জানাল না। এমনি করেই তো জানোয়ারগুলো আস্কারা পাচ্ছে। এই দেখুন না, হাইওয়েতে প্রায়ই রাহাজানি হচ্ছিল রাতের বেলা। এমন কি একদিন দিন-দুপুরেই ব্রীজের কাছে তিনটে লরী আটকে কারা মাল নামিয়ে নিল। ড্রাইভারদের দুজনকে স্ট্যাব করে নদীতে ফেলে দিল—অন্যজন এখনও হাসপাতালে। পুলিশ এল যথারীতি—কিন্তু কোন ফয়সালা হল না।

রাহুল বলল, কারা এসব করছে জানেন নিশ্চয়?

মণিশঙ্কর তেঁতোমুখে বলল, কারা করছে সেটা তো সবাই দেখছে চোখের সামনে। তাদের পুলিশ ধরছেও। কিন্তু মজার কথা—কী ফুসমন্তরে তাদের ছেড়ে দিতে পুলিশ পথ পায় না! আসলে, সবারই ধারণা—তলায় খুব বড় আদমি আছে মশায়। বুঝলেন? জব্বর আদমি আছে পিছনে। আমি অবশ্য কোন সাতে পাঁচে নেই। কিন্তু ভয় হয়। হবে না কেন? ওই মাঠের মধ্যে থাকি? ফসলটসল ওঠে। বাইরে কোথাও ট্রাকে পাঠাতে ভরসা পাইনে। পাঠালে দরটর ভাল পেতুম। অথচ সব ফসল লোকাল ফড়েদের কাছে লোকসানে ঝেড়ে দিচ্ছি। কে রিস্ক্ নিতে যাবে মশাই!

রাহুল শীলাকে ডেকে চায়ের কথা বলবে ভাবছিল, সেই সময় শীলা চায়ের ট্রে হাতে হাজির। নমস্কার করে বলল, কেমন আছেন শঙ্করদা?

মণিশঙ্কর বলল, আরে শীলা যে! কেমন আছেন? কই, আর গেলেন না যে আমাদের ওখানে? আমার স্ত্রী সবসময় আপনার কথা বলে। তেপান্তর মাঠে একা থাকি সবাই···বাইরের কেউ গেলে কত খুসি হই জানেন? বাই দা বাই, শীলা, আপনার পরীক্ষা কী হল? এবারই তো? ডেট পিছিয়ে গেছে শুনলুম—খবর নিতে হবে।

শীলা সলজ্জ হেসে বলল, পরীক্ষা দিয়ে কী হবে? প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার

কোন মানে হয় না। আমি সব ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া প্রাইমারী মাষ্টারিটাই যখন ছেড়ে দিলুম—তখন উপায় ছিল না।

মণিশঙ্কর বলল, সর্বনাশ! তবে যে ও বলছিল—আপনি ছুটিতে আছেন! কাজটা ভাল করেন নি শীলা। আপনার বউদিও মাঝে-মাঝে খুনসুটি করে। বলে—দুঁদে জোতদারের বউ হয়ে পাঠশালায় রোজ ছেলেঠ্যাঙাতে যাই—মর্যাদা থাকে না। কিন্তু আমি বরাবর স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। গ্রামের মেয়ে—বাপের বাড়িতে না হয় ভালো সুযোগ পাওনি, আরে বাবা, আমার ঘরে এসে তো অসুবিধে নেই? জানেন রাহুলবাবু,……হাসতে হাসতে মণিশঙ্কর বলল, রোজ দুবেলা আমার কাজ হচ্ছে ওই বাহনে স্ত্রীকে বহন করা। অর্থাৎ চার মাইল দূরে স্কুলে পৌঁছে দিই এবং ফেরৎ নিয়ে আসি! হাঃ হাঃ হাঃ!

রাহুল শীলার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি প্রাইমারী স্কুলের দিদিমণি ছিলে? বলনি তো? আশ্চর্য, অরুণদাও বলেনি!

শীলা বলল, বলবার মতো নয় বলেই কেউ বলেনি।

মণিশঙ্কর বলল, আরে—শীলা আর আমার গিন্নি এক খোঁয়াড়েই দু'বচ্ছর কাটাল যে! সে থেকেই তো পরস্পর চেনাজানা। তা নাহলে ইটখোলার অরুণ সাঁতবার সঙ্গে আমার কী!

সে ফের হাসতে লাগল। রাহুল বলল, রেজিগনেশন দিয়েছ কদ্দিন শীলা?

শীলা জবাব দিল, তিনমাস আগে একটা ছুটির দরখাস্ত করেছিলুম—তারপর চুপচাপ আছি। দাদাবউদিও বলছিল—আর গিয়ে কাজ নেই। চাকরী করা তো পরীক্ষাপাসের জন্যে। পাস করে তো ডানা গজাবে না! কী বলেন শঙ্করদা?

মণিশঙ্কর বলল, উঁহু—গজাবে। দেখুন—যেযুগে বাস করছি, হঠাৎ দুম করে পুরুষ ব্যাটাছেলে পটল তুলল—মেয়েদের কথা একবার ভেবে দেখুন। বলবেন—আমার জোতজমা আছে-টাছে। কিন্তু ও তো অনিশ্চিত সম্পত্তি। কাল সরকার কেড়ে নিলেই হল—নয়তো কোন পলিটিক্যাল পার্টি এসে ঝাণ্ডা পুঁতে দখল নিল। এ আমার জেনেশুনে বিষপান মশাই—বুঝলেন রাহুলবাবু? ফসল-ফলানোর একটা নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল। তাছাড়া মানুষের ভিড় থেকে এইভাবে দূরে থাকা যায়—গাছপালা উদ্ভিদজগতে একটা শান্তিও আছে। যাক্ গে রাহুলবাবু, চলুন না একবার আমার ওখানে। ভাল লাগবে। রাত্তিরটা থেকে যেতেও পারেন—কোন অসুবিধে নেই। যাবেন? ব্যাকসীটে বসিয়ে নিয়ে যাব—কোন কষ্ট হবে না। চলুন না!

রাহুল শীলার দিকে তাকাল। শীলার চোখে সম্মতি ছিল। রাহুল বলল, শরীর এখনও একটু দুর্বল—তা হোক। যেতে ইচ্ছে করছে। চলুন—বেরোচ্ছি।

মণিশঙ্কর উঠল। শীলাকে বলল, তাহলে কথাটা শোভনাকে জানাতে হয়। কী মুশকিল, ও আপনার জয়েন করার দিন গুনছে ওদিকে।

শীলা হাসল মাত্র।

একটু পরে বেরুল রাহুল। শীলার সামনে রিভলবারটা প্যান্টের পকেটে ভরল—কিন্তু কী ভেবে কার্তুজগুলো বের করে অন্য পকেটে রাখল। শীলার চোখে উদ্বেগের ছাপ লক্ষ্য করে সে চাপা গলায় বলল, নাঃ—আপাতত মানুষ মারবার দরকার হবে না। এমনি রাখলুম কাছে। আর একটা কথা—যদি দ্যাখো রাত্তিরটা ওখানে রয়ে গেছি, তোমরা হইচই করোনা।

বাজার পেরিয়ে একমাইল ফাঁকা মাঠের পর ব্রীজ। ব্রীজ পেরিয়ে বাঁদিকে নামল ওরা। একফালি ইটের পথ নদীর পাড় বেয়ে চলেছে উঁচু বাঁধের ওপর। বনজঙ্গল আসে কিছুকিছু। বিকেলে লালচে আলোয় পরিবেশ বেশ মনোরম দেখাচ্ছিল। এখানে কোথাও কোন রুক্ষতা নেই। নদীর বুকে বাঁধ রয়েছে। তার ফলে একদিকটা অতল নীলাভ জলে ভরা। সেখান থেকে পাম্পিং মেসিনের আওয়াজ আছে। অন্যদিকে ঘন গাছপালার ভিতর একতালা বাংলোধরনের ছোট্ট একটা বাড়ি। সুদৃশ্য ফুলবাগিচা—কলাঝোপ, ইউকালিপটাস আর দেবদারু গাছের সারি। বেশ রুচি আছে লোকটার। শুধু ভাবতে অবাক লাগে যে এও জীবনকে অনিশ্চিত আর নিরাপত্তাবিহীন ভেবে উদ্বিগ্ন নিরন্তর। তাই বউকে সামান্য প্রাইমারী টিচারের চাকরী করতে আপত্তি করে না। বরং খুশি থাকে। নাকি টাকা নামে সর্বনাশা শক্তির একটা মারাত্মক টানের কারচুপি সবই? সবাই টাকা চায়—যে কোনভাবে, যে কোন জায়গা থেকে, যে কোন মূল্যে! রাগে রাহুলের মেজাজ ফের খারাপহয়ে গেল। টাকার লোভ সবাইকে যেন হিজড়ে করে ফেলেছে ক্রমশ।

মণিশঙ্করের বলার অপেক্ষা ছিল মাত্র—রাহুল থাকতে চেয়েছিল রাত্রে। কারণ, একটা উদ্দেশ্য ছিল তার। ব্রীজের কাছেই রাহাজানি হয়। এদিকে সন্ধ্যার দিকে জনা চার সশস্ত্র পুলিশ নাকি সেখানে হাজির থাকে—তারা ভোরঅব্দি পাহারা দ্যায়। তা সত্বেও রাহাজানি আটকানো যায় না। কেন যায় না? তাহলে কি ড্রাইভারদেরও কোন কারচুপি থাকে? মুক্তকেশী হোটেলে ট্রাক ড্রাইভারদের সে দেখেছিল। গাড়ি থামিয়ে ওখানেই কেউ কেউ স্নান আহার বা বিশ্রাম সেরে নেয়। কাজেই স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাদের আলাপ-পরিচয় থাকা সম্ভব। ওদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে হলে বাবার কাছে থাকাটাই তার সবচেয়ে ভাল সুযোগ ছিল। কিন্তু কোনভাবেই সেটা সম্ভব নয়। কাজেই মণিশঙ্কর আর তার বাড়িটা তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে—রাহুল একথা ভেবেছিল। ব্রীজের কাছেই বাড়ি—মণিশঙ্কর খেয়ালী মানুষ, রাত জেগে সে নিজের ফসল পাহারা দ্যায়। শুধু তাই

নয়, তার একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরীও আছে—সেখানে সে তার অশিক্ষিত পটুত্বের জোরে উদ্ভিদবিদ্যার চর্চাও করে। তার পক্ষে ওইসব রাহাজানির অনেক কিছু জানা থাকা সম্ভব মনে হয়েছিল রাহুলের। প্রাণের দায়ে খামখেয়ালী সরল লোকেরাও অনেক সময় মারাত্মক কথা মুখ টিপে হজম করতে বাধ্য হয়।

মণিশঙ্করের স্ত্রী শোভনা গাব্দাগোব্দা মুটকি মেয়ে। খুব জোরে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করে। হাসি পাচ্ছিল রাহুলের। শোভনা তার পড়ার জগৎ ছাড়া আপাতত কিছু আমল দেয় না যেন। সে রাহুল সম্পর্কে কোন কৌতূহলই প্রকাশ করল না। রাতের খাওয়া চুকে গেলে নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর তার মুখে রোমের ইতিহাস তারস্বরে বেরোতে থাকল।

মণিশঙ্করকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল স্ত্রীর আচরণে। রাহুল যেটুকু দূর করার জন্যে সরলভাবে বলল, সত্যি একেই বলে সাধনা। বউদির কিছু হবে। জানেন শঙ্করদা? আমি মুখ খুলে পড়তুম না বলে বাবা কী মার না লাগাতেন! মুখ খুলে পড়তে পারিনি বলেই হয়তো আমার কিছু হল না জীবনে। মারামারি করেই কাটালুম খালি।

মণিশঙ্কর অন্যমনস্কভাবে বলল, বড্ড গরম লাগছে না? বরং চলুন, নদীর ধারে-ধারে কিছুক্ষণ ঘুরে আসি। খুব ভাল লাগবে। হাঁটতে কষ্ট হবে না তো?

রাহুল সোৎসাহে উঠে দাঁড়াল।···মোটেও না। আমি পুরো ফিট এখন।

দুজনে বেরিয়ে এল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। অন্ধকার আছে। খোলামেলায় বাতাস বইছে উত্তাল। সামনের দিকে নদীর পাড় অব্দি ছড়ানো জঙ্গলে গাছপালার শোঁ শোঁ শনশন শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরে বেশ উঁচুতে ময়নাচকের আলোগুলো জ্বলছে। আকাশটা সেখানে সামান্য হলুদ। বাঁধে দাঁড়িয়ে ব্রীজের দিকে তাকাল রাহুল। ব্রীজের বিশাল ফ্রেম অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মণিশঙ্করের হাতে টর্চ। মাঝেমাঝে সে টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখে নিচ্ছিল। সে বলল, এখানে সবই ভালো—কিন্তু পোকামাকড়ের উপদ্রব আছে কিছুটা।

রাহুল বলল, সাপ?

মণিশঙ্কর জবাব দিল, হুঁ। নদীটা বিহারের পাহাড় এলাকা হয়ে এসেছে। তার ফলে রাজ্যের পাহাড়ী সাপ বর্ষায় ভেসে এসে আশ্রয় নেয়। গতবার এখানে একটা প্রকাণ্ড অজগর মেরেছিলুম।

বলেন কী?

আর বলবেন না। প্রথম প্রথম অনেকবার জোর বেঁচে গেছি সাপের হাতে। তারপর জঙ্গলগুলো সাপ হয়ে গেলে উপদ্রব একেবারে কমে গেছে। আসলে কী জানেন? মানুষকে সবাই বড্ড ভয় করে।······মণিশঙ্করের বক্তৃতা শুরু হল যথারীতি।······রাহুলবাবু, সত্যি বলছি—মানুষকে ভয় করা উচিতও। মাঝে

মাঝে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়—এ কী জাত মশাই এই প্রাণিজগতে গজিয়ে উঠেছিল। অদ্ভুত, ব্রিলিয়াণ্ট, সাংঘাতিক! কেন জানেন? এরা আইন বানাতে জানে। রাষ্ট্র গড়তে জানে, রাষ্ট্রের নামে মানুষ আইন চালায়। আর এই রাষ্ট্রই হল প্রবঞ্চনার মোক্ষম উপায়। পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে অনেক বলেছেন। আমার সামান্য বুদ্ধিতে আমি বুঝেছি—রাষ্ট্র হল বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ক্ষমতাবান বদমাসের একটা মজার খাঁচাকল। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই নির্বোধ নিরীহ ছাপোষা টাইপের। তার ফলে তারা খাঁচাকলেই আটক থেকে কোন রকমে একটা সামঞ্জস্য করে বেঁচে থাকে। কষ্ট কি টের পায় না? পায়। মাঝেমাঝে তাদের সেই কষ্ট পাওয়ার সুযোগ নেয় বুদ্ধিমান ক্ষমতাবানেরা—বিদ্রোহ ঘটায় চলতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। সেটা ভেঙে ফেলে। কিন্তু তার জায়গায় ফের গড়ে ওঠে নতুন রাষ্ট্র, নতুন একটা খাঁচাকল। নতুন তার আইনকানুন। সুতরাং ফের কষ্ট আর সামঞ্জস্য করে বেঁচে থাকা।...রাহুলবাবু, রাষ্ট্রই মানুষের—আই মিন ব্যক্তি—মানুষের কাঁধে এক জগদ্দল বোঝা। এ বোঝার দাসত্ব সারাজীবন তাকে সইতে হয়। একটু সচেতন হলেই তো আমি বুঝতে পারি, আমার যন্ত্রণাটা কোথায়? আমার প্রকৃত শত্রু কে? ইয়েস—রাষ্ট্র। অতএব মনে মনে আমার যত ঘৃণা তার ওপর। আর তাকে ঘৃণা করি বলেই মানুষও আমার ঘৃণার পাত্র—সরি, ঘৃণা বলব না—করুণার পাত্র। আমি ভেবেই পাইনে কী করে মানুষ এই বিশ শতকের দুদশক পেরোতে চলেছে—তবু রাষ্ট্রের কারচুপি ধরতে পারল না! ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের মৌলিক বিরোধটা আজও কোন সার্থক রূপ পেল না মানুষের ইতিহাসে। কেউ রাষ্ট্রের দিকে থুথু ছুঁড়ল না!

মণিশঙ্কর সশব্দে থুথু ফেলল। হয়তো তার মুখে বিকৃতি ফুটেছে। অন্ধকারে—হয়তো তার শরীরের শিরা ও পেশীগুলো ফুলে শক্ত হয়ে উঠেছে—রাহুল অনুমান করল। সে কোন মন্তব্য করল না। শুধু অবাক হল।

মণিশঙ্কর ফের মুখ খুলল। রাষ্ট্র চালানোর যে যন্ত্র, তার নাম সরকার। তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব টের পাইয়ে দ্যায় যা কিছু—তা সবই আমার ঘৃণার বস্তু। পুলিশ আর মিলিটারি দিয়ে সে আমাকে গায়ের জোরে তার প্রতি অনুগত রাখে। ইচ্ছে করে, দিই একের পর এক...

রাহুলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কী?

মণিশঙ্কর কেমন হাসল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। পিশাচেরা কি এমনি হেসে ওঠে? রাহুল পিশাচের গল্প শুনেছে—পিশাচের অস্তিত্বে তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু তার মাথায় পিশাচ শব্দটাই এসে গেল। সে মণিশঙ্করের হাসি শুনে চমকে উঠল। অস্বস্তি টের পেল। বাঁধের নিচে ডানদিকে নদী। নদীর বুকে এখানেই উঁচু বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয়েছে। ওপাশটা শুকনো—বালির চড়া, অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোয় ঝকমক করছে নিচে। মণিশঙ্কর বলল, ওখানে গিয়ে বসবেন?

কেন কে জানে, গা ছমছম করল রাহুলের। সেই মুহূর্তে মণিশঙ্কর তার কাঁধে হাত রাখল। আড়ষ্টভাবে সে অনুসরণ করল তাকে। টর্চের আলোয় সাবধানে পাড় বেয়ে নিচে নামল ওরা। বাঁধের ওপর দাঁড়াল। বাঁধের কিনারা ছুঁয়ে জল চকচক করছে। বাতাসের কাঁপনে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্রগুলোও অতলে ঝিকমিক করছে। মণিশঙ্কর বলল, বসুন।

বসল দুজনে। মণিশঙ্কর বলল, কথাগুলো নিঃসঙ্কোচে আপনাকে বলে ফেললুম। বলতে পারলুম। কারণ, বয়স আমার চেয়ে যত কম হোক আপনার—আমি আপনাকে পছন্দ করি রাহুলবাবু!

রাহুল বলল, কেন? আমার মধ্যে পছন্দ করার মতো কী পেলেন?

অনেক। প্রথমত আপনিও আমার মতে বিশ্বাসী।

কেমন করে বুঝলেন তা?

আমি আপনাকে সবিশেষ জানি। আইন আপনার চক্ষুশূল—রাষ্ট্র আপনার শত্রু।

রাহুল হেসে উঠল। বলল, ধেৎ! কী যে বলেন!

মণিশঙ্কর গম্ভীরভাবে বলল, আপনি জন্মবিদ্রোহী রাহুলবাবু। হলফ করে বলুন তো এ যাবৎ যা কিছু করেছেন—তা কি টাকা রোজগারের জন্যে করেছেন, নাকি গায়ের ঝাল ঝাড়তে?

রাহুল একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, কে জানে!

আপনার বাবা গতকাল সব বলেছেন আপনার ইতিহাস। উনি দুঃখ করছিলেন—ওর ওই শক্তি, ওই বিদ্রোহের জ্বালাটা যদি রাজনীতির পথে আত্মপ্রকাশ করত, উনি খুব খুসি হতেন। যাই হোক—আমি অবশ্য রাজনীতি পছন্দ করিনে। কারণ রাজনীতি মানেই রাষ্ট্রের খাঁচাকল ব্যবস্থা আর ক্ষমতাবানদের শাসন শোষণ—ভোগ-দখল প্রবৃত্তি চরিতার্থতার উপায় কায়েম রাখা। কাজেই সে পথে না গিয়ে ভাল করেছেন। কিন্তু রাহুলবাবু……হঠাৎ মণিশঙ্কর কণ্ঠস্বর চাপা করল। ফিসফিস করে বলল, ময়নাচক এসেছেন—সে কি সত্যিসত্যি বাবার কাছে থাকতে? লুকোবেন না। আমার বিশ্বাস হয় না যে আপনি ছাপোষা মানুষের মতো নিরীহভাবে বেঁচেবর্তে থাকার জন্যে বাবার কাছে চলে এসেছিলেন! ওটা আপনার চরিত্রের সঙ্গে মানায় না। এখানে আসবার উদ্দেশ্য কী আপনার?

রাহুলের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কে এই মণিশঙ্কর! সে বাঁহাতটা প্যাণ্টের পকেটে ঢোকাতে গিয়ে দেখল, ঢুকছে না। উঠে না দাঁড়ালে সেটা সম্ভব নয়। অতল জলের একেবারে কিনারায় সে বসে আছে। তার মাথা ঘুরছিল। দুর্বলতাটা ফের জেগে উঠছিল। সে সামলানোর চেষ্টা করে বলল, আপনার প্রশ্নটা খুব অদ্ভুত। এর কী জবাব দেব, খুঁজে পাচ্ছিনে।

মণিশঙ্কর খুকখুক করে হাসল।……অরুণ আপনাকে এখানে এনেছে—তাই না?

রাহুল একটু রাগের ঝাঁঝে জবাব দিল, না।

মণিশঙ্কর তার রাগটা আমল দিল না। বলল, অরুণের একজন শক্ত-সমর্থ বডিগার্ড দরকার হয়ে পড়েছে। সানু চ্যাটারজি তাকে ব্ল্যাকমেইল করে যাচ্ছে সমানে। তাই অরুণ—আমার দৃঢ় বিশ্বাস—অরুণ আপনাকে এখানে এনেছে।

রাহুল বলল, ব্ল্যাকমেইল? সে কী! কেন?

মণিশঙ্করের মুখের পানের গন্ধ ঝাপটা মারল রাহুলের নাকে। সব জেনেও লুকোচ্ছেন রাহুলবাবু।

রাহুল বিরক্তভাবে বলল,—কিচ্ছু জানিনে আমি। অরুণদা একটা ব্যাপার বলবে বলেছিল—এখনও বলেনি। আপনি ভুল করেছেন শংকরবাবু, তাছাড়া এতে আপনার উৎসাহেরও কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে কিন্তু।

মণিশঙ্কর বলল, সত্যি বলছেন, অরুণ আপনাকে আনেনি?

বিশ্বাস করা না করা আপনার খুসি। চলুন, উঠব।

রাগ করবেন না প্লীজ। মণিশঙ্কর তার কাঁধে হাত রাখল।......বসুন। ঘরে গরমের চেয়ে খোলামেলায় কিছুক্ষণ গল্পগুজবে আপত্তি কী?

এ ঠিক গল্পগুজব নয়, শঙ্করবাবু! আপনি কেন এসবে ইনটারেস্‌টেড, শুনি?

মণিশঙ্কর অন্ধকার জলে সশব্দে থুথু ফেলল। তারপর বলল, আমার ইনটারেষ্ট খোলাখুলি বলছি। সানু চ্যাটারজি আমার শত্রু—ঘোর শত্রু বলতে পারেন। সে আমাকেও ব্ল্যাকমেইল করে। অরুণ আমার বন্ধু মানুষ—তারও শত্রু সানু। এদিকে আপনি হচ্ছেন অরুণের লোক—সানু আপনাকে মেরেছে, অতএব সানু ইজ আওয়ার কমন এনিমি। তাকে কখনো বিশ্বাস করবেন না। তার ফাঁদে ভুলেও পা দেবেন না। শুনলুম, সে আপনার সঙ্গে ভাব করতে চায়। সাবধান, সানু সাংঘাতিক লোক!

রাহুল মুখ তুলে বলল, তারপর?

কথাটা জানিয়ে রাখলুম—এইমাত্র। আপনি সতর্ক থাকবেন সবসময়। নন্দর সাধ্য হবে না আপনার ক্ষতি করতে—কিন্তু সানু আপনাকে ছাড়বে না। ওর গায়ে হাত তুলেছিলেন—ও কখনো সইবে না। তাই......বলতে বলতে হঠাৎ মণিশঙ্কর ঘুরে নদীর শুকনো দিকটায় টর্চের আলো ফেলল। তারপর উঠে দাঁড়াল। চাপা স্বরে বলল, জাস্ট ইনটুইশান! মনে হল, কাদের পায়ের শব্দ পেলুম যেন।

রাহুল উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। টর্চের আলো ঘুরছিল বালির চড়ায়—নদীর ভিতর অন্ধকার চিরে যাচ্ছিল বারবার। কাকেও দেখা গেল না। রাহুল বলল, কেউ না। চলুন ফেরা যাক্।

দুজনে উঠে পাড়ের বাঁধে এল। তারপর রাহুল বলল, শংকরবাবু প্লীজ—কিছু মনে করবেন না। আমি বরং ফিরে যাই অরুণদার ওখানে।

মণিশঙ্কর শশব্যস্তে বলল, না—না, সে কী! এই শরীরে এতদূর যাবেন কী করে?

তাছাড়া অন্ধকার রাস্তা। নাঃ, ভারি ছেলে মানুষ আপনি মশাই! রাগ হয়েছে আমার কথায়—তাই না? দেখ কাণ্ড। আমি খামখেয়ালী লোক—কী বলতে কী বলি। দূর, দূর! ফরগেট ইট। চলুন আসল কথাটা তো বলাই হয়নি!

রাহুল গোঁ ধরে বলল, না। আমার ভালো লাগছে না এখানে। আমি যাই। পরে আসব'খন।

সে হনহন করে হাঁটতে থাকল। মণিশঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। যা ভাবে ভাবুক, রাহুল বিরক্ত। প্রথমে ওই লোকটার কথাবার্তায় কেমন রহস্যের আভাষ পাচ্ছিল, এখন তার মনে হচ্ছে—আসলে সব তাতে নাকগলানো অভ্যাস আছে ওর। সম্পূর্ণ হার্মলেস মানুষ মণিশঙ্কর। সব তাতে কৌতূহলী। গায়েপড়া ভাব আছে। অদ্ভুত সব কথা ভাবে—অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা মগজে নিয়ে ঘোরে। তা না হলে কেন এই বনে প্রান্তরে নির্জনে পড়ে রয়েছে সে? রীতিমতো বাতিগ্রস্ত লোকটা। ওর বউ বেচারা ভাগ্যিস বোকাসোকা মেয়ে—উদ্দেশ্যহীন পড়াশোনা ডিগ্রি পরীক্ষাপাসের নেশায় পড়ে রয়েছে বলেই রক্ষে। তা নাহলে কবে বিদ্রোহ করে বসত স্বামীর ওপর।

ব্রীজ লক্ষ্য করে সে হাঁটছিল। আশ্চর্য, মণিশঙ্কর তাকে টর্চটা দিলেও তো পারত! দিল না। হয়তো এত হাঁ হয়ে গেছে যে কথাটা মাথায় এল না! কিন্তু ওর কথা যদি সত্যি হয়, সানু কেন ব্ল্যাকমেইল করছে অরুণকে? শীলা বলছিল, অরুণের অনেকগুলো ফুটো আছে। কিসের? আর সানু কেন মণিশঙ্করকেও ব্ল্যাকমেইল করে? মণিশঙ্কর বা অরুণ যদি খুলে না বলে সব, সানুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেলে কৌশলে জানা যেতেও পারে। একটা কথা মাথায় আসছে এ মুহূর্তে—মণিশঙ্করও যেন রাহুলকে পেতে চায়—দেহরক্ষীর মতো। সেও সম্ভবত রাহুলের সাহায্য চায়।

বডিগার্ড! সবাই নিজের নিজের বদমাইসির কারণে একটা করে রক্ষাকবচ চাইছে। রাহুলকে বেছে নিয়েছে সেজন্যে। কী শালা কপাল! নেপালদাও বলত—রাহুল থাকতে আমার গায়ে গুলি-চাকু বিঁধবে না। এই জন্যেই কি হৃষিকেশ মাষ্টারমশাই তার জন্ম দিয়েছিলেন পৃথিবীতে?

ব্রীজটা তখনও সামান্য দূরে—বাঁধের দুপাশে টানা জঙ্গল এখানটার, আচমকা একঝলক টর্চের আলো পড়ল সামনে থেকে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রাহুলের। অভ্যাসবশে সে পকেটে বাঁহাত ভরে জিগ্যেস করল—কে? কে?

প্রথমে ভেবেছিল—ব্রীজের সেই পুলিশেরা, পরে চমক খেল। বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অথচ আলো এগিয়ে আসছে। সে পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করার আগেই এবং আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজন লোক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুপাশের অন্ধকার থেকে।

তার মুখে কাপড় গুঁজে দিলে রাহুল চিৎকার করার সুযোগ পেল না। তাকে জোর

করে শুইয়ে দিল তারা। একজন ফিসফিস করে বলল, এখানে না—নদীতে নিয়ে চল।

আরেকজন বলল, ধুস্! এখানেই চালিয়ে দে।

চোখ দুটো খোলা ছিল রাহুলের। সে অনুমান করল, একজনের হাতে ছোরা রয়েছে। তার গলা পেঁচিয়ে কাটা হবে—তাতে কোন ভুল নেই। এ মুহূর্তে শুধু শীলার মুখটাই ভেসে উঠছিল মনে। আর কিছু নয়—কেউ নয়। সে চোখ বুজল। অনেক মৃত্যু সে অনেককে দিয়েছে—এবার নিজের পালা পড়েছে। নিস্পন্দ থেকে সইতে হবে। সে জানত—এটাই নিয়ম। অমোঘ আইন। তবে খুব শীগগির বিনা প্রস্তুতিতে এসে গেল—তাই একটু কষ্ট। এরা কে—তা জানবার ইচ্ছে মনে নেই, হয়তো আর প্রয়োজনও নেই। কেন তার মৃত্যু হচ্ছে—তার কৈফিয়ৎও অপ্রাসঙ্গিক। শুধু মনে হচ্ছে, এত তাড়াতাড়ি! এত হঠকারিতায়! চোখ বুজে সে মুহূর্তকাল আগে দেখা নক্ষত্রের প্রতিবিম্বে চেতনাকে রাখল। সেখানে শীলাকে দেখল সে। শেষ সময় এইটুকুই যেন সান্ত্বনা। শীলা নামে পৃথিবীতে একজন ছিল—তার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল একদিন। তা না হলে কত আগে সে কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল—শেষ অব্দি জীবন এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ছিনিয়ে নিয়ে গেছে শীলার ঠোঁটে তখনও চুমু দেওয়া বাকি বলে।

হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এল। কার অমানুষিক কণ্ঠস্বর শুনল সে। এক ঝলক তীব্র আলো ফুটল ভয়ংকর অন্ধকারে। একটা ঝড় সুরু হল যেন। গাছপালার শব্দ গেল বেড়ে। চোখ খুলতে ইচ্ছে ছিল না—সাধ্যও ছিল না, দুচোখের পাতা অবশ হয়ে গেছে। তারপর মনে হল সে তলিয়ে যাচ্ছে অনন্ত শূন্যে।·········

চোখ খুলে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল রাহুল। তারপর বলল, তুমি গঙ্গা না?

গঙ্গা তার পাশে বসে আছে। সে ভ্রু কুঁচকে বলল, গঙ্গা কে? ছোটমা বলতে পারছ না?

রাহুল ধুড়মুড় করে উঠে বসল। সকাল হয়েছে। ঘুম ঠিক সময়ে ভেঙেছে। কিন্তু এখানে কেন সে? ঘরটা চিনতে পারল না সে। অরুণের ঘরেই সে ঘুমাচ্ছে ভেবেছিল—সেখানে গঙ্গা এসেছে মনে হয়েছিল। কিন্তু এবার অচেনা ঘরটা তাকে চমকে দিল। পরক্ষণে রাত্রে মণিশঙ্করের ওখানে বাঁধের ওপর জঙ্গলের ব্যাপারটা তার মনে পড়ে গেল। তাহলে সে ফের বেঁচে গেছে! কে বাঁচাল তাকে? এখানে আনলই বা কে? সে গঙ্গার দিকে সপ্রশ্ন তাকাল। তখন দেখল, গঙ্গার দুপায়ের ফাঁকে একটি বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে মুখটা গঙ্গার বুকের নিচে গুঁজে একটু কাত হয়ে ফ্যালফ্যাল করে দেখছে তাকে। অবিকল তার বাবার মতো চেহারা। রোগা গড়ন—বড় বড় চোখ, একটু পিঙ্গল—গঙ্গার চোখ দুটো শুধু

পেয়েছে।

গঙ্গা শান্তভাবে তাকিয়ে বলল, অবাক হচ্ছ তাই না? মণিশঙ্করবাবু কাল রাত্রে তোমাকে এখানে রেখে গেছেন। সব শুনলুম। নন্দদের ঘাঁটিয়েছ—ওরা যা বজ্জাত সবাই জানে। ভাগ্যিস, মণিশঙ্করবাবু গিয়ে পড়েছিলেন! তা এসেছ—বেশ করেছ। কিন্তু অরুণের পাল্লায় পড়তে গেলে কেন? আর যেও না ওখানে—এখানে থাকো। তোমার বাবার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ছিল এখানে—আমাকে বিয়ে করে একটু কমলেও যা আছে, তাই যথেষ্ট তোমার পক্ষে।

রাহুল কিছু বলল না। ভ্রূ কুঁচকে ব্যাণ্ডেজবাঁধা ডানহাতটা দেখতে থাকল। দেখতে দেখতে তার রিভলবারটার কথা মনে পড়ে গেল। সে প্যাণ্টের পকেটের দিকে হাত বাড়াল।

গঙ্গা বলল, তোমার যন্ত্রটা? আছে—রেখেছি। তোমার বালিসের নিচেই আছে। ইস! তুমি যে এত সাংঘাতিক ছেলে হয়েছ, ভাবতেও পারিনি! ওটা ভেঙে ফেল। ওটা যতক্ষণ থাকবে, তোমার রেহাই নেই।

রাহুল বালিশ তুলে দেখে নিয়ে বলল, এটা তোমার ঘর?

হুঁ—আবার কার? তোমার বাবা পাশের ঘরে আছেন। চা-টা খেয়ে নাও, তারপর দেখা করবে।

রাহুল বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, শঙ্করদা আমাকে এখানে আনলেন কেন?

গঙ্গা জবাব দিল, আমি তার কি জানি। সে নিজের ওখানে রাখলেও পারত—রাখেনি। অরুণবাবুর ওখানেও নিয়ে যায়নি। এখানেই আনল। কী ভেবে আনল—সেই বলতে পারে।তখন রাত তো বেশি হয় নি। হোটেল খোলা ছিল। আমি কী করব—অগত্যা ডাক্তারের কাছে খবর দিলুম। তিনি এসে কী ওষুধ খাইয়ে দিলেন। তারপর……

বাবা জানেন?

না—বলা হয়নি। বলছি।………গঙ্গা বাচ্চাটাকে ঠেলে দিল। …যাও, এখন খেলো গিয়ে। পরে দাদার সঙ্গে ভাব করবে, কেমন? দাদা এখন এখানেই রইল—তোমাকে নিয়ে বেড়াবে। লক্ষ্মীসোনা!

ছেলেটি শান্তভাবে চলে গেল। গঙ্গা ফের বলল, চোখজ্বালা করছে। এমনিতে তো রাতে ঘুমোতে পাইনে। হোটেল—তারপর তোমার বাবার পাশে বসে থাকা। …সে ম্লান হাসল।…কাল রাতটা বেশ গেল। ওঘরে বাবা বিড়বিড় করছে—এঘরে ছেলে। খুব দুঃস্বপ্ন দেখছিলে তুমি।

রাহুল জবাব দিল না। কিছু মনে নেই। মাথার ভিতরটা খালি লাগছে। অথচ গঙ্গা, তার কণ্ঠস্বর, তার বসে থাকা, তার চাহনি সবকিছু দিয়ে তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করছে যেন। ডাইনি গঙ্গা! এত ভালো সে! এত মমতাময়ী! সহজ আর স্বচ্ছন্দ সে!

গঙ্গা উঠল।…মুখটুখ ধুয়ে নাও। চা খেতে হবে না—গরম দুধ দিচ্ছি।

রাহুল বিছানা থেকে পা বাড়িয়ে বলল, আমি অরুণদার ওখানে যাচ্ছি।

গঙ্গার মুখটা পলকে কালো হয়ে গেল। সে স্থির তাকাল রাহুলের দিকে। তার নাসারন্ধ্র কাঁপছিল। তারপর সে বলল, কী আছে অরুণদার ওখানে যে নিজের লোকদেরও পর মনে হয়?

রাহুল অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, এখানেই বা কী আছে যে সবাইকে নিজের লোক মনে হবে?

গঙ্গা কোন জবাব দিল না দেখে সে ফের বলল, নিজের লোকের কথা যদি বলো—আমার কোথাও কেউ নেই। আমি সবসময় নিজেকে একা ভাবতে অভ্যস্ত। এতেই আমি স্বস্তি পাই—ভালো লাগে। কারো বা কাদের সঙ্গে জড়িয়েপড়া আমার স্বভাবের বাইরে।

গঙ্গা বলল, স্বার্থপর—দায়দায়িত্বের জ্ঞান যাদের নেই—ওটা তাদের মুখের কথা রাহুল।

রাহুল একটু হাসল।…আমি সত্যি স্বার্থপর। আমার দায়িত্বজ্ঞানের বড্ড অভাব আছে। কিন্তু কী করব বলো? যাকে বলে ফ্যামিলিলাইফ—তা আমার কপালে সইবেও না, আর পছন্দও নয়। নিজেকে একা ভাবতে আমার স্বর্গসুখ হয়। আচ্ছা চলি!

গঙ্গা সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখমুখে উত্তেজনার ছাপ পড়েছে। সে চাপাস্বরে ঈষৎ বিদ্রূপের ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল, একা ভাবতে নয়—তোমার স্বর্গসুখ যে কিসে তা আমি জানি রাহুল। অরুণের বাড়ি তোমার প্রাণশুদ্ধ কিনে নিয়েছে—সে খবরও জানি! কিন্তু রাহুল, তুমি বোধ হয় ভুল করছ।

রাহুল ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী বলতে চাও তুমি?

গঙ্গা হেসে উঠল। হাসিটা স্বচ্ছন্দ নয়। ঠোঁটের কিছু ভাঁজ আর উজ্জ্বল চাহনি তাকে একটা সর্বনাশা চেহারা দিল, সে বলল, বলতে চাই যে অরুণের বোনের সঙ্গে সানুর বিয়ের কথা কবে ঠিক হয়ে গেছে। আর সানুকেও তুমি ইতিমধ্যে ভালো চিনেছ। তার মতো বুদ্ধিমান এ এলাকায় আর একটিও নেই। সে একটা কিছু আঁচ করে ফেলেছে।…গঙ্গার হাসিটা নিভে গেল ক্রমশ। মুখে একটা কঠোর গাম্ভীর্য ছমছম করে উঠল। সে কয়েক মুহূর্ত থেমে ফের বলল, তুমি খুব বিপদের মধ্যে পড়ে গেছ রাহুল—বুঝতে পারছ না! কেন তুমি অরুণের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গেলে? কী দরকার ছিল? বাবার কাছে থাকতে না চাইলে তো কেন বহরমপুর ফিরে গেলে না তক্ষুনি?

রাহুল প্রথমে রাগে অস্থির হয়েছিল—শেষের দিকে রাগটা পড়ে গিয়ে একটা বিস্ময়-কৌতূহল ক্ষোভ মেশানো আলোড়ন এসে গেল তার মধ্যে। সে বলল, কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে। আসার পর থেকে যেন কোন অন্ধকার রাজত্বে ঢুকে পড়েছি!

আবছায়ার মতো কারা কী সব করছে, স্পষ্ট বোঝা যায় না। কী জায়গা রে বাবা!
গঙ্গা এগিয়ে এল কাছে।···রাহুল, লক্ষ্মীটি, যা বলছি শোন। তোমার বাবার যা অবস্থা, কদিন আছেন বলা যায় না। এদিকে আমি মেয়ে—কেউ পাশে রইল না, ওই দুধের বাচ্চা নিয়ে কীভাবে এখানে বেঁচে থাকব—কিছু বিশ্বাস নেই। হোটেলের কথা বলছ! আমি আর পারছিনে রাহুল, বিশ্বাস করো—তখন তো খুব সাহস করে হোটেলের ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলুম, এখন এটা আমার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একা মেয়েদের পক্ষে এ কি চালানো সম্ভব! তোমার বাবা অসুস্থ হয়ে আর কিছু দেখাশোনা করতে পারছেন না। শেষ অব্দি উঠিয়েই দিতে হবে হয়তো। এ আমার সাজে না রাহুল—আমি খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিলুম। সব মান-সম্মান খুইয়ে এ পথে নামলুম। কিন্তু আর পারছিনে!
রাহুল শান্তভাবে বলল, জানিনে—তুমি যা বলছ, তা সত্যি কি না। কারণ আমি অন্য কথা শুনেছি।
গঙ্গা কথা কেড়ে বলল, জানি, জানি—তুমি কী শুনেছ। আমি নষ্টা মেয়ে। আমি বেশ্যা হয়ে গেছি,·· এইসব তো!
রাহুল বলল, তুমি কী হয়েছ না হয়েছ, তাতে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।
গঙ্গার চোখ ছলছল করে উঠল হঠাৎ। সে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার কোন দোষ নেই—সব আমার ভাগ্য। তোমার দুঃখটা কোথায়—
রাহুল বলল, আমার কোন দুঃখটুঃখ নেই। আমি চলি।
গঙ্গা ওর কাঁধে হাত রেখে একটু ঠেলে দিল।···তুমি একটুখানি বসো রাহুল। তোমার সব কথা জানা দরকার। সব শুনে তুমি আমাকে যে শাস্তি দিতে হয়, দিও।
রাহুল একটু ইতস্তত করে বসল। চুপ করে থাকল। গঙ্গাও বসল—সামান্য একটু তফাতে। বিনা ভূমিকায় খুব চাপা কণ্ঠস্বরে সে বলতে থাকল।
···বাবা রাস্তার কাজে দারুণ লোকসান করেছিলেন। লোকসান হয়তো হত না—লাভই হত প্রচুর। কিন্তু লোকেরা চক্রান্ত করে দরখাস্ত করে বসল ওপরে যে ঠিকঠিক মালমশলা দেওয়া হয়নি, অথচ রোডস এঞ্জিনিয়ার আর সব অফিসার মিলে টাকা খেয়ে বিলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এ রাস্তা আর কালভার্টগুলো নাকি এক বর্ষাও টিকে থাকবে না। ওপরে মন্ত্রীঅব্দি বাবার বিরুদ্ধে আনাগোনা সুরু হল। এনকোয়ারি যা হবার হল। তারপর বাবার বিল তো চুলোয় গেল, কণ্ট্রাকটের লাইসেন্সও বাতিল করল ওরা। জনমতের চাপ। ফের সব তুলে-টুলে নতুন করে বানাতে হবে। বাবার পক্ষে তা আর সম্ভব ছিল না। বাবা জোর আঘাত পেলেন। শয্যাশায়ী হলেন। আর উঠলেন না। এদিকে শত্রু যা চাল চেলেছিল, তা কাজে লাগতেই সে সামনে এসে দাঁড়াল। নিজে কনট্রাকট নিল। আশ্চর্য রাহুল, এ যুগে কী যে হচ্ছে, ভাবতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে করল কী জানো?

বাবার তৈরী সেই রাস্তায় জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু পীচ ঢেলে আর কালভার্টের সামান্য মেরামত করে সেই পুরো কাজের টাকা পেয়ে গেল। তখন কেউ আর চেয়েও দেখল না যে ভবানীবাবুর খোওয়ার-পীচগুলো কোথায় গেল। দিনদুপুরে এইরকম বিরাট জোচ্চুরি হয়ে গেল লোকের চোখের সামনে। কেউ আর তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করল না পর্যন্ত। কেন করবে? করাই কার বা সাহস হবে! সানু চাটুয্যের দাদাকে লোকে ভক্তি করে বলেই তো ভোট দ্যায় ইলেকশনে। নিরু চাটুয্যের বেনামী কণ্ট্রাকটারি—তাও সবাই জানে। সইটইগুলো সানু দ্যায়—আসল কাজ করে নিরুবাবু। সানু বাউণ্ডুলে লোক। সংসারের ধার ধারে না। গুণ্ডামি মারামারি করা তার নেশা। তাকে তার দাদা কাজে লাগায় নানা দরকারে। তার ভয়েই সবাই দরখাস্তে সই দিয়েছিল—বুঝতে পারছ নিশ্চয়।

রাহুল গুম হয়ে বলল, তারপর?

গঙ্গা আঁচলে ঠোঁট মুছে বলল, তারপর তো বাবা মারা গেলেন। মাষ্টার মশাই—তোমার বাবার প্রতি লোকের অবশ্য ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল খুব। সেটা ওঁর অমায়িক ব্যবহারের দরুণ। সবার সাথে হেসে কথা বলতেন, সৎ উপদেশ দিতেন। লোকে সৎ উপদেশ বা ভাল কথা মানুক বা না মানুক, শুনতে খুব ভালবাসে কি না। তা—বাবার মৃত্যুর পর উনি হলেন আমার গারজেন। এদিকে সুযোগ পেয়ে আত্মীয় শরীকেরাও সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা বাধাল। তোমার বাবা খুব তদ্বির তদারক করলেন। কিন্তু কাজে লাগল না। সে বৈষয়িক বুদ্ধি তো ওঁর নেই। শেষে সব খুইয়ে মাত্র ভিটেবাড়িটা রইল। সেইসময় উনি একটু অসুখে পড়লেন। খাটনি হয়েছিল তো খুব। তাই জ্বর—বুকে ব্যথা। পাশের ঘরে প্রতিরাত্রে শুয়ে থাকি। উনি ডাকলে ঘুম ভেঙে যায়। কাছে যাই। একদিন……

গঙ্গা হঠাৎ থেমে নিজের পা দুটো দেখতে থাকল। রাহুল বলল, থাক্‌।

গঙ্গা মাথা দোলাল।…না লজ্জা আমার সাজে না। অন্তত তোমার কাছে লজ্জা করলে সারাজীবন যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। আসলে সবই তো আমাদের সংস্কার রাহুল, তাই না? বেশি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাইনি তোমার মতো—কিন্তু জীবনের চারপাশে যা ঘটেছে যা দেখেছি তা থেকেই আমার অনেক শেখা হয়ে গেছে। আর তুমি তো জানো—খুব কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী কী বোঝবার আগেই বিধবা হয়েছিলুম। তাই ভিতরে ভিতরে খুব পেকে উঠেছিলুম। যখন বুঝতে পেরেছিলুম যে আর আমার বিয়ে হবে না—তখনই একটা বিদ্রোহ করার ঝোঁক মথোয় এসে গিয়েছিল। দিনে দিনে তত লোভী হয়ে পড়েছিলুম। সেই লোভ আমাকে সাহস যোগাচ্ছিল অনেক। সে সবই তুমি জানতে পেরেছিলে। পারনি রাহুল?

রাহুল বলল, সেকথা থাক্‌।

গঙ্গা জেদের সাথে বলল, ওকথা এড়িয়ে যাবার নয়। কেন যাবো? কেন আমি

অপরাধী হয়ে থাকব তোমার কাছে? আমি তো কোন দোষ করিনি।

শেষ কথাটা বলতে তার গলার স্বর কান্নার চাপে ভেঙে পড়ল। সে আঁচলে চোখ ঢাকল। একটু নত হল! রাহুল তেঁতো মুখে বলল, কান্নাটান্না আমার ভালো লাগে না।

গঙ্গা সামলে নিয়ে ভাঙ্গা কন্ঠস্বরে বলল, কাঁদতে দাও আমাকে। বিশ্বাস করো, কতদিন আমি কাঁদিনি। সেই বাবার মরার সময় একবার কেঁদেছিলুম। আর একবার—বলছি সেকথা। কিন্তু আমি যে প্রাণভয়ে কাঁদতে চাই রাহুল। ভিতরে কত কান্না চেপে আছি—কেউ তো জানে না। অথচ কাঁদতে ভয় হয়—লোকে হাসবে। টিটকারী করবে।

রাহুল বলল, তোমার আবার কান্না কিসের? বেশ তো আছ।

গঙ্গা শান্ত হবার চেষ্টা করে বলল, অসুখের সময় তোমার বাবা বুকে হাত বুলিয়ে দিতে বলতেন। এত শ্রদ্ধাভক্তি করতুম, আপনজন ভাবতুম ওঁকে। বাবার অভাব আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু একরাত্রে বুকে হাত বুলোতে গিয়ে হঠাৎ উনি আমাকে···

গঙ্গা ফুঁপিয়ে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকল। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর রাহুল বলল, বুঝেছি। কিন্তু ওঁর কাছে শুনলে হয়তো অন্য রকম শুনব।

গঙ্গা সবেগে মাথা নেড়ে বলল, না, না। আমি যা বলছি, সব সত্যি। আমাকে উনি যেন বশ করে ফেলেছিলেন। খারাপ লাগত। কষ্ট হত। কিন্তু ওঁকে চটাতে সাহসও পেতুম না। আর আস্তে আস্তে আমি ওঁর কাছে অবশ হয়ে পড়ছিলুম। মনে হচ্ছিল, রাগ করে উনি চলে গেলে আমি খুব অসহায় হয়ে পড়ব। শুধু ভাবতুম, উনি না থাকলে আমার কী হবে! শিউরে উঠতুম। রাহুল, আমাকে পাপের পথে টানবার লোক তখন চারপাশে অনেক ছিল—এখনও আছে। কিন্তু পুণ্যের পথে টানবার মতো উনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। যদি বলো, কী সেই পুণ্য— আমি বলব, ঘর-সংসার। আমি বিধবা—আমার ঘরসংসার আর হবে না, এটা যে মনে মনে কোনদিন মেনে নিতে পারিনি। আগেই বলেছি না? লোভ আমাকে পাগল করে তুলেছিল।

রাহুল বলল, এর কোনটাতেই আমি দোষ দিইনে তোমাকে। আমার প্রশ্ন অন্যখানে। বাবাকে তুমি ঠকিয়েছ—সাংঘাতিকভাবে ঠকিয়েছ।

কেন শুনি?

সাতবছর আগের সেই দিনগুলো তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।

ছিল মনে? কিন্তু সেই দুর্দিনে তুমিও তো কোন খবর রাখ নি, রাহুল। তোমার বাবা না হয় রাগ করে খোঁজ নিতেন না। তুমি কেন নাওনি?

নিলে কী করতে? বাবার আক্রমণ থেকে বাঁচতে ছেলের কাছে আশ্রয় নিতে?······ রাহুল অস্ফুট হাসল।

অসভ্য! গঙ্গা ক্ষুব্ধভাবে বলল।···তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ে গেছ রাহুল?

নিষ্ঠুরতা কোথায়? যা সত্যি, তা খোলাখুলি বলা ভালো। অনেক সত্যি কথা গোপন রাখি বলেই তো আমরা কষ্ট পাই। ঠকতে হয়। তাছাড়া আমার প্রশ্ন হচ্ছে—বুঝলাম, বাবা তোমাকে দেখে বা হাতের কাছে পেয়ে হ্যাংলা কুকুরের মতো লোভী হয়েছিলেন—কিন্তু তুমি? তুমি তো খুলে বললেই পারতে যে অনেকদিন আগে তাঁর ছেলের সঙ্গে তোমার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল! তাহলে বাবা নিশ্চয় লজ্জা পেতেন।

গঙ্গা নির্বিকার মুখে বলল, পেতেন এবং আমাকে ফেলে পালিয়ে যেতেন।

বেশ তো, যেতেন।

আর চান্দিক থেকে কুকুর আর শকুন এসে ভাগাড়ে পড়ত। কেমন?

রাহুল জবাব দিল না। চুপ করে থাকল। সে কথা খুঁজছিল। গঙ্গা বলল, এর কোন জবাব তোমার নেই। তাই সহজভাবে সবকিছু মেনে নাও রাহুল।

রাহুল সব্যঙ্গ হেসে বলল, তার মানে—তবু তোমাকে ছোটমা বলতে হবে? মায়ের আসনে বসাতে হবে? শ্রদ্ধাভক্তি করতে হবে?

গঙ্গা ধরা গলায় বলল, তা বলছিনে। নাই বা করলে শ্রদ্ধা-ভক্তি!

রাহুল চঞ্চলতার সুরে হাল্কাভাবে বলল, দ্যাখো গঙ্গা—মা একজনই থাকে। লোক দ্যাখানো ভব্যতায় কাকেও হয়তো মা-টা আমরা বলে থাকি, মায়ের পুজোটুজো দিই—কিন্তু মা একজনই আসলে—যার পেটে আমি জন্মেছিলুম। নারী মাতৃসমা বলে একটা কথা চালু আছে। ওটা অর্থহীন। বিশেষ করে বয়স নামে যখন একটা ব্যাপার আছে। কোন যুবকের মা কোন যুবতী হতে পারে না। সেটা ইললজিক্যাল, ইররৗাশানাল—সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের কাছে একটুও সত্যি ব্যাপার নয়। আমি তা ভাবতে পারিনে। ওটা নিতান্ত আত্মপ্রবঞ্চনা। দুর্বল লোকদের পক্ষে যা সত্য, তা সকলের কাছে নাও সত্য হতে পারে।

গঙ্গা একটু চুপ করে থেকে বলল, বেশ। মা ভেবো না—যা খুশি ভেবো। আমিও তোমাকে অন্যকিছু ভাবব। ধরে নাও—এ বাড়ির তুমি একজন মানুষ মাত্র। কিন্তু তুমি এখানে থাকো রাহুল।

রাহুল হেসে উঠল।···তোমাকেও কেউ ব্ল্যাকমেইল করছে না তো? বুঝেছি অরুণদা বা মণিশঙ্করের মতো তোমারও একজন বডিগার্ড দরকার। তাই না?

গঙ্গা উঠে দাঁড়াল।···না। আমার বডিগার্ড দরকার নেই—আমি অনেক ঠেকে আত্মরক্ষার কৌশল শিখেছি। তুমি এমনি থাকো। তোমারও তো পায়ের নিচে মাটি দরকার। কেন তুমি ভবঘুরে হয়ে বেড়াবে! এখানে তোমার অধিকার আছে। সেটা তুমি দাবী করে নাও। তারপর আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মতো ঘরসংসার করো। ব্যস, তাহলেই আমি খুসি।

রাহুল পা নাচাতে-নাচাতে বলল, এমন হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ থাকতে আমি শালা

টোটো করে ঘুরে মরছিলুম ! বাকগে—চা-টা তো দাও। দেখা যাক্।......
গঙ্গা বেরিয়ে গেল। বাইরে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে ঘোঁতনকে ডাকছে।

আবার বাবার মুখোমুখি রাহুল। ঘরে আর কেউ নেই। গঙ্গা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে হোটেলের দিকে চলে গেছে। বলে গেছে, অরুণের বাড়ি থেকে তোমার ব্যাগপত্তর আনতে ঘোঁতনকে পাঠাচ্ছি। তুমি কখনো ওদিকে পা বাড়াবে না আর। রাহুল মুখ টিপে হেসে সায় দিয়েছে।

এবার বাবার মধ্যে কিছুটা নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করে অবাক হল রাহুল। হৃষিকেশ নিষ্পলক কয়েক মুহূর্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, বসো।

রাহুল মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল। বলল, এখন কেমন আছেন ?

হৃষিকেশ সেকথার জবাব না দিয়ে বললেন, এসে অব্দি অনেক কীর্তি করে বেড়াচ্ছ শুনছি। সব কানে আসছে।

রাহুল বলে উঠল, কিসের কীর্তি ! এখানের লোকগুলো আমাকে যেন সইতে পারছে না। তাই সামান্য ধস্তাধস্তি হচ্ছে। আবার কী !

হৃষিকেশ পাশ ফিরে বললেন, এরপর জানশুদ্ধ মেরে দেবে—তখন আর পস্তানোর সুযোগ পাবে না। আমার আর কতক্ষণ ! ওবেলা দেখবে, নেই। শুধু দুঃখ হয় —তোমার অমন তাজা জীবনটা তুমি নষ্ট করে দেবে ! শীগগির তোমার চলে যাওয়া উচিত। এ কাজ তোমার নয়।

রাহুল দারুণ চমকে উঠে বলল, কী কাজ !

হৃষিকেশ কোন জবাব দিলেন না।

রাহুল উত্তেজিতভাবে একটু ঝুঁকে পড়ল বাবার দিকে···কী কাজ আমার নয় বলছেন ? বাবা !

উঁ !

আপনি কী ভেবেছেন, শুনি ?

ভাবনার ব্যাপার নয়, রাহুল। আমি সব জানি—তুমি কেন হঠাৎ এখানে হাজির হয়েছ। তোমার মুরুব্বীরা একটু ভুল করেছেন। তোমার মতো চপলমতি ছেলের পক্ষে এসব কাজ একেবারে অসম্ভব। তাছাড়া ওঁরা কেন ভাবলেন যে হৃষিকেশ জেনেশুনে নিজের ছেলেকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ? কোন বাপ তা পারে না।

রাহুল গুম হয়ে বলল, তাহলে রাজেনবাবুদের ইনফরমার আপনিই ?

হৃষিকেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি কারও ইনফরমার নই। নিতান্ত দায়ে পড়ে ওঁদের সাহায্য চেয়েছিলুম। ভাবিনি যে ওঁরা তোমাকেই পাঠিয়ে বসবেন।

রাহুল চাপা গলায় বলল, আমার এক বছরের কোন কিছু আপনি জানেন না। আমি আর সে-রাহুল নই বাবা। আমাকে আপনি খুলে বলুন সব। কিছু পারি না-পারি—অন্তত সান্ত্বনা থাকবে যে আপনার কিছুটা কাজে লেগেছিলুম। আর সেজন্যে মরতেও আমি পিছ-পা নই!

হৃষিকেশ ঘুরে সোজা হলেন। স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, ওরা যে তোমাকেই পাঠিয়েছেন—সে খবর আমি গতকাল পেলুম। তারপর থেকে খুব অস্থির হয়েছিলুম। যাক্ গে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমাকে বলছি রাহুল, তুমি এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে। আমি আর বাঁচব না। বাঁচতে ইচ্ছে নেই। শুধু ওই বাচ্চাটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। রাগও হচ্ছে। ভীষণ একটা হঠকারিতায় সব ঘটে গিয়েছিল। তার জন্যে অবশ্য ওর কোন দায়িত্ব নেই—যত দায়িত্ব আমার। ও হয়তো রাস্তার ছেলে হয়ে যাবে। কী কবব!

রাহুল বলল, খুলে বলুন বাবা। আমার সব জানা দরকার। হাইওয়েতে কারা রাহাজানি করছে—তার সঙ্গে আপনার কিসের সম্পর্ক! আপনিই বা কিসের দায়ে পড়ে রাজেনবাবুদের খবর পাঠিয়েছিলেন। ওদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগই বা কার মারফত? কে সে?

হৃষিকেশের মুখটা থমথম করছিল। অনেক কষ্টে উত্তেজনা দমন করছেন যেন। বললেন, ওসব জেনে কী হবে? তুমি চলে যাও রাহুল। তাছাড়া—ধরো, বদমাইসির এই র‍্যাকেটটা তুমি যে কোন ভাবে ভাঙলে—কিন্তু তাতে আমার তো শান্তি হবে না। এ একটা দারুণ সমস্যা—তুমি বুঝবে না। এ বুড়ো বয়সে একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরসংসারের আশা করেই ভবানীবাবুর মেয়েকে বিয়ে করলুম—

রাহুল বাধা দিয়ে বলল, বিয়ে আপনি নাকি বাধ্য হয়ে করেছিলেন?

হৃষিকেশ একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললেন, ওটা বাইরে-বাইরে আমার লোক দেখানো ছল। বিয়ে আমি করতুম। ও সন্তানসম্ভবা ছিল। তাই কিছুটা দ্বন্দ্বেও পড়ে গিয়েছিলুম। তবে শেষে বিয়ে করতুমই। রণ্টুর মা একটু হইচই করে ফেলল খামোকা। যাক্ গে—যা হবার হল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখি, আমি ঠকেছি! আমার সংসারের নিচে কোন মাটি নেই। কারণ—যা নিয়ে আমার নতুন সংসারের আশা, সেখানেই সর্বনাশ ওৎ পেতে আছে।

রাহুল উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বলল, রাজেনবাবুর কাছে শুনেছি—তিনজন লোক রয়েছে র‍্যাকেটের পিছনে। তাদের একজনের নাকি মাথায় বড় বড় চুল—মেয়ে বলে ভুল হয়েছিল আপনার। এখন বুঝতে পারছি, আপনি ঠিকই চিনেছিলেন বা বরাবর চিনতেন—শুধু খুলে বলতে পারেননি। কারণ সে আপনার—

হৃষিকেশ কঠিন মুখে প্রশ্ন করলেন হঠাৎ, সে আমার কী?

রাহুল জবাব দিল, স্ত্রী।

হৃষিকেশ অস্থিরভাবে বলে উঠলেন, ধরো যদি তাই হয়—তুমি কী করবে? ওকে

ধরিয়ে দেবে, তাইতো ? তখন রণ্টুর কী হবে ? আর আমার এই অবস্থা—আমি কী করব ? কখনো ভেব না যে ওদের র‍্যাকেটটা পুরো ভেঙে দিতে পারবে। যদি বা পারো, তারপর তোমার এখানে অক্ষত থাকা সম্ভব ভাবছ ? অসম্ভব। তখন কী করবে ? রণ্টু কী করবে ? আমি যদি বেঁচে থাকি—আমিই কী করব ? না খেয়ে পথে পথে ঘুরে মরব দুটিতে ! হোটেলের অবস্থা যা—তাতে কোন ভরসা নেই। ওটা এখন রণ্টুর মায়ের মুখোস মাত্র। তাছাড়া এই বাড়ি বা হোটেল—কোনটাই তো আমার নয়। সব হচ্ছে ওর। বেচবার মালিক আমি তো নই। অনেক সমস্যা আছে, রাহুল। ছেলেমানুষী করো না। কেন তুমি আমার আরও সর্বনাশ করতে এসেছ ? যেটুকু বাকি ছিল—তা না সারলে বুঝি স্বস্তি পাচ্ছ না। তাই না ?

রাহুল একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা বাবা, আর দুজন লোকের নাম আপনি জানেন—তারা কে ?

হৃষিকেশ জবাব দিলেন, নাম জেনে কী লাভ ? তুমি চলে যাও।

রাহুল বিরক্ত হয়ে বলল, যদি না যাই ?

বেশ, যেও না—যা খুসি করো।…হৃষিকেশ পাশ ফিরে শুলেন।…তোমার জীবন তোমার। যদ্দিন কিছু বলার অধিকার ছিল, বলেছি। আর বলি নে। বলবও না। শুধু একটা কথা—আমি চাইনে যে তুমি নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে রণ্টুর সর্বনাশ করো।

রাহুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, রণ্টুর দায়িত্ব আমি নিলুম।

হৃষিকেশ চকিতে ঘুরলেন।…তাহলে তুমি রাজেনবাবুর কথামতো কাজ করবে ?

হ্যাঁ।

কেন ? কী পাবে তুমি ? দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ বদমাস আছে—থাকবে। তুমি কি তাদের ত্রাণকর্তা ? আর—তুমি নিজে কী, শুনি ?

আমি অনেক টাকা পাবো। তাই দিয়ে—

মিথ্যা কথা ?…ফুঁসে উঠলেন হৃষিকেশ।…টাকার নেশা তোমার নেই—আমি জানি। এ স্রেফ তোমার একটা জিঘাংসা।

জিঘাংসা ?

হ্যাঁ—তাই। তুমি ভেবো না যে আমাকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ। আমি কিছুতে বিশ্বাস করিনে যে রাজেনবাবুর কথায় তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো ময়নাচকে চলে এসেছ।

রাহুল এক পা বাড়িয়ে বলল, তাহলে কেন এসেছি ?

তুমি আমার ছেলে না হলে বলে ফেলতুম। যাও, আমাকে ঘাঁটিও না।

রাহুল কঠিন কণ্ঠে বলল, না—আপনি বলুন।

হৃষিকেশ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। শান্তভাবে বললেন, সব জেনেও আমি স্বেচ্ছায় বিষ

খেয়েছি। এ আমার চরিত্রের বরাবর দুর্বলতা। নিজেকে ধিক্কার দিয়েও লাভ নেই। আত্মহত্যা করতেও ভয় পাই। আমি সত্যি বড় অসহায় রাহুল, তুমি ক্ষমা করো আমাকে!

একটু দাঁড়িয়ে থেকে রাহুল চলে এল। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। রোমকূপে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে গঙ্গার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বেরোল। হাইওয়ে ধরে সোজা অরুণের ইটখোলার দিকে চলতে থাকল। সাতবছর আগে গঙ্গার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বাবা তাহলে আঁচ করেছিলেন। তবু তাঁর দ্বিধা হয়নি এতটুকু?

অরুণ সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছে। রাহুলকে দেখে বলল, আরে, ব্যাপার কী তোমার? রাত্রে শংকরদার ওখানে ছিলে না? ঘোঁতনা এসেছিল এই মাত্র। তোমার ব্যাগট্যাগ নিতে এসেছিল। দিইনি। বিশ্বাস করিনি, ওর কথা।

রাহুল বলল, ঠিক করেছ অরুণদা।

সে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ল। শরীর একটু দুর্বল মনে হচ্ছিল এতক্ষণে। মাথাটা ঘুরছে। বাবার কথাগুলো সে ভুলে যেতে চেষ্টা করল—কিন্তু অলক্ষ্যে বেঁধা কাঁটার মতো সেটা অনবরত খচখচ করছে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে ওই গঙ্গা। নিজের বয়স ডিঙিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে ভাবা যায় না। তার মুখে সাত বছর আগে দেখা সেই গ্রাম্য সারল্যটা অবিকৃত থাকলে একটু সমস্যার সৃষ্টি হত নিশ্চয়। রিভলবারের গুলিটা ঠিক কোথায় লাগা উচিত, সে মনে মনে টিপ করতে থাকল। মৃত্যু! একটি মৃত্যু দিয়ে সেই পাপস্পৃষ্ট ভালবাসার মূল্য শোধ তাকে করতে হবে। না রাজেনবাবু, না—তোমাদের সরকারের সুনাম, প্রশাসনের দক্ষতা বা সামাজিক শৃঙ্খলা, কিংবা আইন ব্যবস্থা সচল রাখবার মাথাব্যথা আমার একটুও নেই। ছিলও না। এ আমার একটা অদ্ভুত প্যাসন—রক্তের দিকে, ধ্বংসের দিকে ছুটে যাওয়ার প্রচণ্ড আবেগ। এটাই আমার জীবন। জীবনের স্বাদ। কিন্তু এমন অদ্ভুত অবস্থায় আমি কখনও পড়িনি।…

অরুণ বলল, সানুটা আমাকে উত্ত্যক্ত করে মারছে তোমার জন্যে। ওর আসবার কথা আছে এখন। একটা কথা বলে রাখি রাহুল। ও ভাব করতে চায়—করো, আপত্তি নেই। কিন্তু খবর্দার, খুব বেশি মিশবে না ওর সঙ্গে। কখন কিসের সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবে—টেরও পাবে না। অমনি করেই তো আমাকে জড়িয়েছে ব্যাটা।

রাহুল বলল, কিসে জড়িয়েছে অরুণদা?

অরুণ কাছে এসে বসল। সতর্কভাবে চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলছি, শোন। গতবছর বর্ষার সময় একরাত্রে হঠাৎ একজন লোক কিছু চোরা মালপত্র এনে আমার কাছে রাখতে বলল—পরে সময় মতো নিয়ে যাবে। তার

নাম বলতে পারছিনে—যাই হোক, সে এমন লোক যে তার কথা এড়ানোর সাধ্য আমার ছিল না। মালগুলো রাখলুম। কিন্তু তারপর আর তার নিয়ে যাবার কোন লক্ষণ নেই। এদিকে পুলিশ নাকি খোঁজাখুঁজি সুরু করেছে। আমি পড়লুম মহাসমস্যায়। সেই ফাঁকে ব্যাটা সানু একদিন এসে হাজির। ঝানু লোক—হয়তো টের পেয়েছিল কীভাবে। আমি বোকার মতো ওর প্যাঁচে পড়ে গেলুম। বলে ফেললুম সব। ব্যস, সেই হল আমার কাল। ব্যাটা গুম হয়ে গেল! তখন হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলুম সেই লোকটার কাছে। বললুম, শীগ্‌গির মাল সরিয়ে ফেলে প্রাণ বাঁচাও দাদা। সানু ঘোরাঘুরি করছে। সানুকে যে সব বলেছি, সেটা গোপন রাখতে হল। বেলাবেলি মাল সে সরিয়ে নিল! কিন্তু তারপর সুরু হল সানুর জুলুম। টাকা দাও—নয়তো পুলিশে ফাঁস করে দেব। ভাই রাহুল, পুলিশ কিছু প্রমাণ আর হয়তো পেত না—কিন্তু কথায় বলে—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আমি নিরীহ মানুষ—কোন সাতে পাঁচে নেই। পুলিশের খাতায় নাম উঠলে ইটের কণ্ট্রাকটগুলো নির্ঘাৎ বাতিল হয়ে যাবে। তাই—

রাহুল বলল, সানু আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করে, তা জানি। কিন্তু মণিশঙ্করকে করে কেন জানেন?

অরুণ বিকৃত মুখে বলল, তাহলে আর ঢাক গুড়গুড় করে লাভ নেই। মণিশঙ্কর একটা হাড়ে-হাড়ে নচ্ছার। ডাকাতের বাড়া শালা। ওই মাঠের মধ্যে থাকার আসল কারণ কি জান?

রাহুল বলল, হাইওয়েতে রাহাজানি?

হ্যাঁ। ওই শালাই তো আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা এনে বিপদে ফেলল! ইটের কণ্ট্রাকটারী গেলে আমি কী করব বলতে পারো? এমন চমৎকার সহজ ব্যবসা নষ্ট হলে কী বিপদে পড়ব বুঝতেই পারছ।...অরুণ চাপা স্বরে বলতে থাকল।... মণিশঙ্কর ডাকাতের ওস্তাদ। ভদ্রলোক ভালমানুষ সেজে থাকে। সে গোল্লায় যাক, আমার মাথাব্যথা নেই। কথাটা হচ্ছে, সানুকে কীভাবে সামলাবো!

রাহুল হেসে বলল, কেন? তার সঙ্গে তো শীলার বিয়ে দিচ্ছেন?

অরুণ তেঁতো মুখে বলল, হ্যাঁ। সেটা মিথ্যে নয়। কিন্তু জেনেশুনে শীলার মতে মেয়েকে ওর হাতে দিতে কি ইচ্ছে করে ভাই? তাই যখনি তোমাকে এখানে দেখেছি সঙ্গে সঙ্গে আমার মত বদলেছে।

আমি কি করতে পারি?...রাহুল গম্ভীর হয়ে বলল।

অরুণের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সে বলল, সানু শালাকে সাবড়ে দিতে পারো একেবারে খতম! যত টাকা চাই তোমার—দেব। সিরিয়াসলি বলছি রাহুল অনেক তো করেছ-টরেছ। এটুকু কি আর পারবে না? তুমি না পারলে পারবে বা কে? দাও না শুয়োরটাকে শেষ করে। রাহুল! তোমার হাত ধরে বলছি—আমাকে তুমি বাঁচাও। শীলাকেও বাঁচাও।

আগের দিনে হলে রাহুল লাফিয়ে উঠে বলত—আলবাৎ। কিন্তু সে দেখল, তার ভিতরে যেন কী গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেছে। নিঃসাড় হয়ে পড়েছে ভিতরটা। সে শান্তভাবে শুয়ে রইল। কোন জবাব দিল না। সে অন্য একটা কথা ভাবতে থাকল। তাহলে রাজেনবাবুর মুখে শোনা সেই কালো ত্রিভুজের একটি বাহু মণিশঙ্কর, অন্যটি গঙ্গা। কিন্তু তৃতীয়টি কে? অরুণ কি তাকে সত্যি কথা বলল? যদি না বলে থাকে, তাহলে অরুণই কি তৃতীয় বাহু? গঙ্গাকে খতম করতে তার হাত কাঁপবে না। গঙ্গার মৃত্যু যত শীগ্‌গির ঘটে, তত ভালো—সে একটা পরম নিষ্কৃতি যেন। আর মণিশঙ্করের বেলায় একটু দ্বিধায় পড়তে হয়। সে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে গত রাত্রে। নন্দরা তাকে শেষ করে দিত—ভাগ্যিস মণিশঙ্কর কোনক্রমে দৈবাৎ সেখানে এসে পড়েছিল! খুব জটিল সমস্যা। তৃতীয় ব্যক্তিটি অরুণ হলেও একটু ইতস্তত করার আছে। ওর রোগা বউ করুণার জন্যে মায়া হয়। আর শীলা—শীলা যদি কোনদিন টের পায়!…

একটু পরে রাহুল স্পষ্ট জানল, আসল সমস্যা শীলা তার জীবনের ঘূরন্ত চাকার কেন্দ্রে জড়িয়ে গেছে হঠাৎ। কিছু ঘটলে বা ঘটাতে গেলে শীলার দিকে তাকে তাকাতে হচ্ছে বার বার। শীলা যেন তাকে খুব গভীর থেকে টান দিচ্ছে। ক্লান্তি ঘাম রক্ত ঘৃণা অবিশ্বাস থেকে বাইরে দূরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে তাকে—একটা স্বচ্ছন্দ বিশ্বাসে, একটি সরলতায়।

অরুণ ঝোঁকের বশে তার আহত ডানহাতটা ধরে আছে। রাহুল সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, সানুটানুকে মেরে কী হবে? বরং এক কাজ করলেই পারেন অরুণদা। শীলাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন।

অরুণ হতাশ চোখে চেয়ে বলল, আর আমি? আমার কী হবে?

কেন? আপনারা সবাই বেথুয়াডহরিতে চলে যান।

এত সব ইট পত্তর কী হবে?

কাকেও বিক্রী করে দিন। আপনি বাঁচলে বাপের নাম!…হেসে উঠল রাহুল।

অরুণ গুম হয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে রইল। তারপর বলল, সেও ভেবেছি। অনেকবার ভেবেছি। কিন্তু ফের কোথাও গিয়ে নতুন কনট্রাক্ট পাওয়াও তো চাট্টিখানি কথা নয়।

রাহুল কঠিন মুখে বলল, দেখুন অরুণদা—ওটা কোন ব্যাপারই নয়। আপনি আসলে ময়নাচক ছেড়ে যেতে রাজী নন। কারণ এখানে যেকোনভাবে হোক, সম্ভবত যখের ধনের খোঁজ আপনি পেয়ে গেছেন। খুব সহজে অনেক বেশি টাকা পাবার সুযোগ থাকলে মানুষ পাগল হয়ে ওঠে নেশায়। আপনিও হয়েছেন। আপনার ইট খোলাটা সত্যি বড় রহস্যময় লাগছে এখন।

অরুণ তার দিকে নিষ্পলক তাকাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মনে হচ্ছে তুমিও

সানুর দলের লোক। রাহুল, তাহলে শীলাকে সানুর হাতেই তুলে দিচ্ছি। ভেবেছিলুম—

ওকে চুপ করতে দেখে রাহুল সকৌতুকে বলল, কী ভেবেছিলেন ?

অরুণ মুখ নামিয়ে বলল, শীলাকে তুমি পছন্দ করেছ। তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দেব। আমার তো ছেলেপুলে নেই—হবারও আশা নেই। তোমরাই হবে আমার সবকিছুর মালিক।

রাহুল হাসতে গিয়ে পারল না। শুধু বলল, বাঃ! চমৎকার!

কেন ? শীলা কি খুব একটা অযোগ্য মেয়ে, রাহুল ? খোঁজ নিলে জানতে পারতে ও সামান্য ঘরের মেয়ে নয়। ঘর-বংশ-গোত্র সবদিক থেকে ওদের মর্যাদা বড় কম না। বামুনহাটির আশু রায়চৌধুরীর মেয়ে শীলা। আশুবাবুকে তুমি দ্যাখোনি ? উনিই আমাকে ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন। ব্যবসা শিখিয়েছিলেন। বেথুয়াডহরিতে ওঁর ইট আর টালিভাটা ছিল। উনি মারা গেলেন। শীলা আর তার মা তারপর থেকে আমার আশ্রয়ে রইল। শীলার মা হঠাৎ···

রাহুল বলল, কী হল ?

অরুণ বলল, তোমাকে বলতে লজ্জা নেই। শীলার মা মেয়েকে ফেলে হঠাৎ একদিন চলে গেল। বেথুয়াডহরির এক স্কুল টিচারের সঙ্গে পালাল সে। তারপর আর খবর নেই কতদিন। শীলা তখন বাচ্চা মেয়ে। যাই হোক, খবর একদিন এল। শীলার মা আত্মহত্যা করেছে।

রাহুল চমকে উঠল।·· কেন ?

স্কুল টিচারটি লোক কেমন ছিল, সবাই তো জানতুম। আসলে সে একটা ফোরটুয়েন্টি—মস্তো চিটার। ফলস্ সার্টিফিকেট যোগাড় করে নানা জায়গার স্কুলে গিয়ে চাকরী নিত—জমিয়ে তুলত। তারপর একটা বিয়ে করে বউ নিয়ে উধাও হত। কিছুদিন পরে দেখা যেত—মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছে। শীলার মায়ের বেলা ঘটল অন্যরকম। শীলার মা আত্মহত্যা করে বসল। তার একটা চিঠিই হল লোকটার পক্ষে সাংঘাতিক। ডি. এম. কে চিঠিতে ওর সব কাণ্ড কারখানা লিখে তারপর হয়তো ঝোঁকের বশে আত্মহত্যা করেছিল শীলার মা। অনেকে সন্দেহ করে, জোর করে লোকটাই বিষ খাইয়ে মেরেছিল। যাই হোক—লোকটা ধরা পড়ল। কাগজে খবর উঠল। ঢি ঢি কাণ্ড একেবারে। জেল হল ওর। তারপর আর খবর জানিনে। হয়তো জেল থেকে বেরিয়ে আবার কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে। শালা বদমাসে চিটারে দেশটা একেবারে নরক হয়ে উঠেছে দিনে দিনে।

রাহুল একটু হাসল। বলল, হ্যাঁ—আমরা সবাই মিলে নরক গুলজার করছি। তাই না অরুণদা ? কেউ—কেউ বাদ নেই।

অরুণ একটু অপ্রস্তুত হল। বলল, তা যদি বলো—তো বলব, দিনোদিনে অবস্থা যা

হচ্ছে—আর কেউ ভালো মানুষ থাকবার উপায় আছে? সবাইকে জড়িয়ে পড়তেই হচ্ছে পাঁকে। তোমার বাবা—মাষ্টারমশাই একটা চমৎকার কথা বলেন। একটা মস্তো চাকা আছে—তার আধখানা স্বর্গ, আধখানা নরক। এখন মাটিতে নরকের দিকটা রয়েছে। মাষ্টারমশাই বলেন, এই দ্যাখো না অরুণ, আমি—আমার মতো মানুষও হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ হয়ে নরকে ঘষা খাচ্ছি। হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ, হ্যাঁঃ!

অরুণ হাসতে পেরে অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিল। রাহুল বুঝল, অরুণ তার বাবাকেও জড়িয়ে নিজের বদমাইসির সমর্থন দাঁড় করাচ্ছে আসলে। তবে সে তো মিথ্যা নয়। রাহুল চুপ করে থাকল। শীলার কথা ভাবতে তার অবাক লাগছে। এই শীলার মতো মেয়ের পিছনেও অন্ধকারের উপদ্রব আছে!

অরুণ একটু কেসে বলল, তা—রাহুল, আমার কথার কোনো জবাব পাইনি ভাই।

কী কথার?

শীলার কী হবে?

আমি কেমন করে বলবো?

লুকিও না রাহুল—আমি জানি, শীলাকে তুমি পছন্দ করো। শীলাও তোমাকে—

বাধা দিয়ে রাহুল হেসে বলল, পছন্দ করে—অর্থাৎ ভালবাসে? ফেট্!

অরুণ তার দিকে ঝুঁকে চপলভাবে বলল, আমি খুব বেঁচে যাই রাহুল, তোমার বউদিই প্রথম আমাকে একটু হিন্ট্ দিয়েছিল। মেয়েরা মেয়েদের সবকিছু টের পায় কিনা। তুমি আর না করো না। যদি বলো—আজকালের মধ্যেই একটা শুভক্ষণ দেখে সব ঠিক করে ফেলছি। শালা সানু পাঁঠাটা ধড়ফড় করে মরুক না। ঢাক বাজাব আর নাচব হে।

রাহুল কোন জবাব দিল না। অন্ধকার রাজত্বের আইনকানুন বেশ মজার। অন্ধকারের এক শক্তিমান অনুচর সে। তাই সে রাজত্বের সবখানে তার সম্মান—তার গুরুত্ব—তার মর্যাদা—তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কেউ দিতে চায় আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক, কেউ বন্ধুত্ব, কেউ টাকা। রাজেনবাবু, গঙ্গা, মণিশঙ্কর, অরুণ আর তার বউ, সানু চ্যাটার্জি—সবাই তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ির প্রতিযোগিতা চলেছে। সে মানুষ মারতে পারে ঠাণ্ডা হাতে নির্বিকার মুখে। এই খবরটা জানাজানি হতেই এত সব হইচই। কলেজ জীবনে তার এক বন্ধু একটা কবিতা আওড়াত। কবিতাটা শুনে-শুনে নিজের অজানতে মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজী কবিতা।

> **And at last the killer came···**
>
> অবশেষে এল সেই ঘাতক!
>
> কথা ছিল তার হাতে থাকবে
>
> এক টুকরো ইস্পাত

ঋজু মসৃণ নীল ঠাণ্ডা আর কঠিন
মৃত্যুর অতৃপ্ত জাতক
তৃষ্ণা যার রক্তে হয় নিবৃত্ত—
অথচ এ কী তার রূপ!
শান্ত রুগ্ন ভীতু ছন্নছাড়া প্রেমিক
কম্পিত পদক্ষেপ তার ধূলিধূসর ক্লান্ত দুটি পায়ে
শূন্য নগ্ন হাত ভিখারীর প্রার্থনায় জড়োসড়ো
রুক্ষ চুলে কামনার দুঃখগুলি হাওয়ার মতন মৃদু কাঁপে
কামনার সুখগুলি শুধু দুটি চোখে জ্বলজ্বল করে
হায়, অবশেষে এল সেই ঘাতক
শুধু বলল, নমস্কার ॥······

শীলা ঘরে ঢুকে বলল, চা-টা খাবে—না সারা সকাল গল্প করা হবে? মুখ ধুয়েছ তোমরা?

অরুণ উঠল। তাই তো! বাসিমুখে ভ্যানর ভ্যানর করছি যে। শালা, যাচ্ছি ভাই। বেগনী ভাজিস নি আজ? রাহুল, ওঠ। সানু এখনও এলো না দেখছি। ভেবেছিলুম, শালার সঙ্গে বসে আজ ব্রেকফাস্ট করব।

সে হেসে উঠল। শীলা ঠোঁট কুঁচকে চলে গেল। রাহুল উঠে বসল। বলল, আপনার বোন আমাকে দেখে চমকালো না কিন্তু।

অরুণ চাপা গলায় সকৌতুকে বলল, তুমি চমকে দিতে পারলে কই?

সানু সে বেলা এল না। অরুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইটখোলার কাজের চাপ বেড়ে গেছে। সে তাই নিয়ে ব্যস্ত হল অবশেষে। রাহুল সারা দুপুর চুপচাপ শুয়ে কাটাল। খাবার সময় অরুণ একবার উঁকি মেরে বলে গেছে, আমার সামান্য দেরী হবে খেতে। তুমি একা খেয়ে নাও। করুণাবউদির সেই একই নাকিকান্না শুনতে শুনতে রাহুল কোনমতে খাওয়া শেষ করে চলে এসেছে। তারপর শীলা জলের গ্লাস দিতে এসেছে বাইরের ঘরে। তখন শীলার হাতটা চেপে ধরতে ইচ্ছে করেছিল রাহুলের। ধরে নি। সে আর শীলা পরস্পর শুধু হেসেছে। কোন কথা বলে নি।

রাহুল গত রাতের কথা ভাবছিল। যারা তাকে খুন করতে যাচ্ছিল, তারা কি সত্যি সত্যি নন্দ আর তার লোকজন? বিশ্বাস হচ্ছে না। সামান্য মারামারির জন্যে তাকে ওরা খুন করবে কেন? কথাটা যত সে ভাবল, তত তার বিশ্বাস দৃঢ় হল যে এ ঘটনার পিছনে অন্য গুরুতর কারণ আছে। তাহলে কি কোনভাবে গঙ্গা-মণিশঙ্কর বা তৃতীয় ব্যক্তিটি জানতে পেরেছে, রাহুল কেন এখানে এসেছে? আশ্চর্য ধুরন্ধর মেয়ে গঙ্গা—তার কথায় বা আচরণে এতটুকু ধরার উপায় নেই কিছু। সাত

বছর আগের সেই সরলমনা কিশোরী মেয়েটিকে পাপ ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গে কী অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে তার মধ্যে !……

ঘুমিয়ে পড়েছিল রাহুল। কী সব আজগুবি স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখল, শীলা তার পাশে বসে আছে। সে মুহূর্তে একটা আবেগ এসে গেল হঠাৎ। শরীব বা মনে সেই আবেগটা জোর নাড়া দিল বলেই রাহুল সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরল। টেনে বুকের ওপর শুইয়ে দিল। শীলা আস্তে আস্তে বলল, আঃ দরজাটা খোলা আছে।

থাক্। বলে রাহুল তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল দুটিতে। তারপর রাহুল ওর মুখটা তুলে ধরতেই দেখল, শীলা নীরবে কাঁদছে। সে শীলাব কাপড়েই শীলার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, আমি আছি। কেঁদোনা। কাঁদবে কেন ?

শীলা আস্তে আস্তে উঠে বসল। বলল, ছাড়ো। তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

ভিতরের দিকে দরজায় অবশ্য পর্দা আছে। শীলা পর্দাটার দিকে এতক্ষণে তাকাল। পরমুহূর্তে সে চকিত উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলল, কে ? বউদি ?

রাহুলও উঠে বসেছিল। সে দেখল পর্দার নিচে দুটো পা—খসখসে ফ্যাকাশে পায়ের পাতায় আবছা আলতার ছোপ, সবে সরে যাচ্ছে।

শীলা পর্দা তুলেই পিছিয়ে এল। জিভ কেটে সলজ্জ হাসি মুখে নিয়ে কটাক্ষ করল বাহুলের দিকে।

রাহুল বলল, কে ? বউদি তো ?

শীলা মাথা দোলাল। চাপা গলায় বলল, না—তোমাব ছোটমা ! ফেট্, আমার লজ্জা করছে। কী ভাবলেন বলো তো ! আর কখনো এঘরে আসব না।

সন্ধ্যার আগে রাহুল বেরুল। খুব সতর্কভাবে বেরুল সে। গত রাতের ঘটনার পর আর তার পক্ষে অসতর্ক থাকা ঠিক নয়। অরুণের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। নয় তো তাকে সঙ্গে যেতে বলত। আসলে সানু চ্যাটারজি তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছিল।

হাইওয়েতে পৌঁছে একটা রিকশো করল সে। রিকশোওলার কাছে জানা গেল, সানু থাকে টাউনসিপের শেষ প্রান্তে। তার দাদা নীরেন চ্যাটারজি নামকরা লোক। রাজনীতির পাণ্ডা এ এলাকায়। মস্তো বড়লোক। সানু তার সৎমার ছেলে। কলেজে পাস দিয়েছে রীতিমতো। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে মারামারি খুনোখুনি রপ্ত করেছে হাড়ে।…রিকশোওলা জানাল।…তবে লোকটার মন বড় ভালো। গরীবের উপকারে সবসময় তৈরী। ছোটলোক-গরীব গুরবো মানুষের কাছে সানু দেবতাদের মতো।

রিকশোওলা বলল, আপনি নতুন মানুষ বাবু—তাই বলছি। যাচ্ছেন এখন চলুন।

আমার আর কী ? ভাড়া পাব। তবে এখন হয়তো ওনাকে বাড়িতে নাও পেতে পারেন। মুক্তকেশী হোটেলটা একবার দেখে এলে পারতেন।

রাহুল বলল, সে পরে দেখব'খন। চলো—দেখেই আসি বাড়িটা।

একটা সুদৃশ্য বাগানবাড়ি বলা চলে। বিরাট বাউণ্ডারী। গাছপালা। ফুল ফলের বাগান। পিছনে পুকুর। সামনের দিকে লন আছে। খেলার জায়গা। আছে। রীতিমতো একেলে পরিবেশ। দুপাশে দুটো গেট। গেটের মাথায় বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি—লাল সাদা ফুলে ঝকমক করছে। একটা জিপ বেরিয়ে গেল —তার মধ্যে সানুকে দেখল না রাহুল। গেটে দারোয়ান আছে। সে বলল, চলিয়ে যান—খবর লিন। সানুবাবুর খবর হামি জানে না।

গাড়িবারান্দার সামনে বিশাল ড্রয়িংরুম। পর্দাটা ফাঁক হয়ে আছে। উঁকি মারতেই একটা লোক এগিয়ে এসে বলল, বড়বাবু তো এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন। পরে আসবেন।

রাহুল বলল, আমি ছোটবাবুকে চাই।

লোকটা ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, কোত্থেকে আসছেন ?

একটু ইতস্তত করে রাহুল বলল, আমি—হৃষিকেশবাবুর ছেলে।

মানে—মুক্তকেশীর মাষ্টারমশাইয়ের ছেলে ?

আজ্ঞে।

তাই বলুন। বসুন, বসুন।...বলে সে কয়েক পা এগিয়ে ঘুরল।...অবশ্যি সানুবাবু আছেন কি না জানিনে। আপনার ভাগ্য। উনি কখন বাড়ি আসেন, কখন থাকেন বলা ভারি কঠিন। দেখছি।

লোকটা হাসতে হাসতে চলে গেল। রাহুল একটা সেকেলে প্রকাণ্ড চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ বনেদীয়ানার ছাপ রয়েছে ঘরে। বড় বড় ছবি, মস্তো ভারি পর্দা, মেহগিনিরও আসবাবপত্র—সব মিলিয়ে একটা আভিজাত্যের ভাব। এই বাড়ির ছেলে সানু। শীলা তার বউ হবে !

ফিরে এল লোকটা।...আপনার বরাত ভালো। ছোটবাবু রয়েছেন। আসছেন এক্ষুনি। আপনি বসুন।

ফের সে চলে গেল। একটু পরেই সানু এল। মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল। বিশাল হাত বাড়িয়ে বলল, হ্যাল্লো।

রাহুল বলল, আপনার নাকি যাবার কথা ছিল সকালে। অরুণদা বলছিল।

সানু ওর দু-কাঁধে হাত রেখে বলল, আপনি নিজে চলে এসেছেন—এতে যে কী আনন্দ হচ্ছে বলার নয় ! জানেন, আমি কতবার আপনাকে দেখে এসেছি !

রাহুল হেসে বলল, জানি।

আলগোছে রাহুলের ডানহাতটা তুলে ধরে সানু বলল, এখনও সারে নি ? নন্দটার দিন ঘনিয়ে এসেছে, বুঝলেন ? শালা সব তাতেই ছুরি বের করতে শিখেছে। অথচ

একটা বেড়ালের জোরও শালার নেই। বসুন—উঁহু,…
সে ভ্রূ কুঁচকে কী ভেবে নিল যেন। তারপর বলল, চলুন—আমার ঘরে গিয়ে বসি। নিরিবিলি না হলে জমবে না। রিয়েলি রাহুলবাবু, সেদিন নিজের ব্যবহারে এত অনুতপ্ত আমি, কী বলব।
রাহুল ওকে অনুসরণ করল। সানুকে মুহূর্তে তার এত আপন মনে হয়েছে।

ঘরটা বাড়ির উত্তর প্রান্তে একতালায়। দরজার বাইরে লম্বাচওড়া ছাদবিহীন বারান্দার মতো লাল সিমেন্টের মসৃণ চত্বর। তার শেষে ধাপ নেমে গেছে পুকুরে। পুকুরটা মোটামুটি বড়ো। মাঝখানে একটা বিরাট স্তম্ভ উঠেছে জল ছাড়িয়ে। তার ওপর ফোয়ারা। ধূসর আর কালচে রঙের ছোপধরা প্রকাণ্ড পদ্মফুলের গড়ন সেটা। কেন্দ্রশীর্ষে সাদা পাথরের উলঙ্গ পরী। বোঝা যায় ফোয়ারাটা কবে মরে গেছে। চারপাশে গাছপালা আর জলের মধ্যে সেটা নির্জন সমাধির মতো স্তব্ধ। রোদ সরে গিয়ে বিস্তৃত ছায়া ঢেকে আছে সেখানে। শিরশির করে জল কাঁপছে। একপাল দেশি-বিদেশি নানান চেহারার হাঁস কী জন্যে ঝিমুচ্ছে সিঁড়ির ওপর। সানু অনর্গল কথা বলছিল। ময়নাচকের কথা। তাদের পূর্বপুরুষদের কথা। ভবানীবাবুর সঙ্গে পুরুষ-পরম্পরা তাদের শত্রুতার কথা। একসময় সে উঠে বলল, চলুন—বরং বাইরে বসা যাক্। প্লীজ রাহুলবাবু, বসার জায়গা আমরা নিজেরাই নিয়ে যাই। এবাড়ির চাকরবাকর সব শালা মন্ত্রীমহারাজ। ডাকলে সাড়া দ্যায় না।
দুজনে দুটো হাল্কা চেয়ার নিয়ে বেরোল। ঘরে অবশ্য আসবাবপত্র বলতে ওই ধরনের গোটাকয় চেয়ার, গদীছেঁড়া একটা সোফাসেট—আর একটা সেকেলে খাট। কিছু বাকসের গাদা ছেঁড়া চাদরে ঢাকা আছে কোণের দিকে। পা ছড়িয়ে বসে সানু বলল, আমি বাউণ্ডুলে পাপীতাপী লোক—থাকি একলষেঁড়ে হয়ে এদিকটায়। ভিতরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি বড্ড কম। তবে হ্যাঙ্গামা বাধলে তখন সানুর ডাক পড়ে। তখন বাড়িতে আমার খাতির যদি দ্যাখেন মশাই, চক্ষু ছানাবড়া হবে।
রাহুল বলল, আপনার বাবা-মা কদ্দিন আগে মারা গেছেন?
বাবা? দাঁড়ান বলছি।…সে চোখ বুজে কী হিসেব করে বলল, বছর বাইশ হবে। বুড়ো তো এখানে থাকত না—এখানে রেসের মাঠ কোথায়? বিলিতি বার আর মেমসায়েব কোথায়?…সে হেসে উঠল। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলল, মা বছর

পাঁচেক আগে গেল। যাই বলুন—সতীলক্ষ্মীরা একটানা পতিশোক কদ্দিন বা সইতে পারে!

রাহুল বলল, বাবা-মার ওপর খুব অভিমান আছে আপনার—তাই না সানুবাবু?

কে জানে কী আছে!···সানু বিকৃত মুখে বলল।···আসলে আমার চয়েসটাই হয়তো আলাদা। বাবা-মা সম্পর্কে আলাদা চয়েস নিয়ে যে ছেলেরা জন্মায়—তারা হয়তো কষ্ট পায়। যাক্ গে দুনিয়ায় মনের মতো কোনটাই বা আছে? এই যে আমি—আমি শালাই কি নিজের চয়েস অনুযায়ী হতে পেরেছি বা পারছি? তবে অন্য সব হয়তো গড়েপিটে মনের মতো করা যায়—বাবা-মাকে তো যায় না। কী বলেন?

ফের সে হো হো করে হেসে উঠল। রাহুল বলল, বিয়ে করেন নি কি সেইজন্যেই?

সানু তার দিকে তাকাল।

রাহুল একটু ইতস্তত করে বলল, একটা গুজব শুনছিলুম। বলব?

সানু শিস দিয়ে দুলতে দুলতে বলল, আলবৎ বলবেন।

অরুণদার বোনকে আপনি বিয়ে করছেন?

সানু কিছুক্ষণ চোখবুজে দুলে চলল। তারপর তাকাল। চোখে কৌতুক জ্বলজ্বল করছে তার। বলল, মেয়েটিকে তো আপনি দেখেছেন। কী মনে হয়েছে?

কী মনে হবে?

অরুণ শালাকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। ওর ইট খোলার মজুরনীগুলোর সঙ্গে খুব দিল-লেনা-দেনা আছে। লম্পটের হদ্দ ব্যাটা। এখন কথা হচ্ছে—তার নিজের বোন নয়। এমনকি স্বজাতও নয়। ও শূদ্রটুদ্র বটে—মেয়েটা বামুন। আমার খালি মনে হয়, বেচারা শালাকে শালা গোপনে নষ্ট-টষ্ট করে বসেনি তো?

রাহুল নিষ্পলক তাকালো ওর দিকে। তারপর বলল, অরুণদা লম্পট তা সত্যি। কিন্তু শীলা শিক্ষিতা মেয়ে। পারসোনালিটি আছে। সেটা ভুলে যাওয়া কি ঠিক হবে?

রাইট, রাইট!···সানু তার লোমশ হাতটা চেয়ারের হাতলে আঘাত করল।···শীলা খুব সহজ মেয়ে নয়। র‍্যাদার সফিসটিকেটেড মনে হয়। আপনি কী বলেন?

রাহুল পুকুরের দিকে ঘুরে বলল, খুব বেশি মিশিনি। তাই জানিনে।

সানু ঝুঁকে এল তার দিকে।···বিয়ের কথা আমি কিন্তু তুলিনি—তা জানেন? অরুণই তুলেছে। সেজন্যেই তো আমার সন্দেহ। আপনাকে বলতে বাধা নেই। অরুণকে আমি বলেছি—ঠিক আছে। বিয়ে আমি করছি। কিন্তু তার আগে যেকোন কায়দায় শীলার একটা হেলথ্ সার্টিফিকেট চাই। ডাক্তার আমি ঠিক করে দেব। অরুণ রাজী হয়েছে। মশাই, আমি আজকালকার মেয়েদের এতটুকু বিশ্বাস করিনে। তার ওপর আজকাল কত সব কনট্রাসেপটিভ বেরিয়েছে।

সানুর একটা উজ্জ্বল সুন্দর চেহারা মনে তৈরী হয়ে গিয়েছিল—এতক্ষণে হঠাৎ সেটা মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। বিকৃত কিম্ভূত একটা চেহারা পেল সানু

চ্যাটারজি। মনটা তেঁতো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। রাহুলের ইচ্ছে হল—এক্ষুনি ওর মুখে একদলা থুথু ফেলে চলে আসে। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল।

সানু চাপা গলায় সকৌতুকে ফের বলল, ডাক্তার যদি সার্টিফিকেট দ্যায় যে শী ইজ ষ্টিল আনটাচ্‌ড্‌ বাই অপজিট সেক্স—এখনও তার কুমারীত্ব অটুট আছে, আমি তক্ষুনি টোপর পরব। এটা মশাই, সরকারের আইন করে বিয়ের সর্ত করা উচিত। বলবেন, মেয়েদের বেলা তো ওটা না হয় হল—পুরুষের বেলা?

রাহুল ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, আমি কিছু বলছিনে।

সানু জোর হেসে বলল, দেখছেন কাণ্ড? এখনও চা এল না। বসুন—একমিনিট আসছি।

সে চলে গেলে রাহুল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। অরুণ ওই ডাক্তারী পরীক্ষার কথাটা বলেনি। চেপে গেছে। শীলা কি জানে? অবশ্যই জানেনা। তার অজানতে কোন ছলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কী জঘন্য ব্যাপার! তবে একটা কথা বোঝা যাচ্ছে যে অরুণই এ বিয়েতে উৎসাহী হয়েছিল। আর সানুরও শীলাকে খুব মনে ধরে গেছে।...

একটু পরে ফিরে এল সে। তার সঙ্গে ট্রে হাতে একটা লোকও এল। কিছু বিস্কুট আর চা মাত্র। সানু কোলের ওপর ট্রে রেখে নিজেই চা বানাল।

চা খেতে খেতে সানু বলল, বাই দা বাই—কাল রাতের ব্যাপার। যে জন্যে আজ সকালে আপনার কাছে যাবো ভাবছিলুম। নদীর ধারে কারা নাকি আপনাকে গলা কাটতে চাচ্ছিল। সত্যি?

রাহুল মাথাটা দোলাল মাত্র। একটু শুকনো হাসিও দেখা দিল ঠোঁটে।

সানু বলল, মণিশঙ্কর বলছিল। সকালে এসেছিল সে। তার সন্দেহ—এ কাজ নাকি নন্দর। নন্দ নাকি সেদিনের রাগ ভুলতে পারছে না।...যাই হোক, আমি উল্টোকথা বললুম ওকে। বললুম—শংকরদা, এ তোমারই কাজ নয় তো? বেচারা বিদেশি ছেলে—নতুন এসেছে এখানে।...

বাধা দিয়ে রাহুল প্রশ্ন করল, শংকরবাবুর কী স্বার্থ আছে আমাকে খুন করে?

সানু ভ্রূ কুঁচকে মৃদু হেসে এবং অভ্যাসমত দুলতে দুলতে বলল, আছে নিশ্চয়। তার আগে একটা কথা জিগ্যেস করি। স্পষ্ট জবাব দেবেন কিন্তু।

দেব। বলুন।

কাল রাত্রে মণিশঙ্করের ওখানে এমন কিছু কি নজরে পড়েছিল আপনার—হুইচ ইজ কোয়াইট ষ্ট্রেঞ্জ?

না তো।

কিচ্ছু দ্যাখেন নি—যাতে ওকে সন্দেহ করা যায়?

কিসের সন্দেহ?

সানু চাপা গলায় বলল, হি ইজ এ গ্যাংষ্টার। এলাকার যত রাহাজানি, ডাকাতি

আর খুনোখুনি হয়—তার লিডার সে। আমার মুসকিল হচ্ছে যে মণিশঙ্কর আবার দাদার বিশেষ বন্ধু নয়—আরও বেশি কিছু।

রাহুল বলল, শুনেছি—আপনি ওকে ব্ল্যাকমেইল করেন।

সানু বলল, হুঃ! করি। আরে মশাই, সে কি লুকিয়ে করি নাকি?

অরুণদাকেও করেন শুনেছি।

ও তো একটা বকধার্মিক। শুওরের ধাড়ী। শালার ইটখোলাটায় যদি পুলিশ হামলা করে, ঢিঢি পড়ে যাবে। ওদিকে একটা বাঁশবন আছে দেখেছেন? সেখানে রিজেকটেড ইটের পাহাড় জমে রয়েছে। সে-ইট অরুণ বেচে না। অথচ রোডস ডিপার্ট রিজেক্ট করলেও ইটগুলো মশাই প্রথম শ্রেণীর ইট। ক'বছর ধরে পড়ে আছে সেগুলো। ডবল দর বললেও কাকেও বেচতে চায় না। ক্যাশব্যানা ঝোপঝাড় গজিয়েছে ওখানে। সাপ-খোপের আড্ডাও হয়েছে। একদিন আমার খুব সন্দেহ হল। ডিটেলস বলব না—কোন একটা ব্যাপার দেখেছিলুম রাত্রিবেলা—তাতেই সন্দেহ হল। গিয়ে ওকে বললুম, আমার হাজার বিশেক ইট চাই। বাড়ি করব নিজের। দাদার সঙ্গে পোষাচ্ছে না। শুনে অরুণ হন্তদন্ত চিমনিভাটার দিকে এগোল। আলবাৎ দেব। এ ক্লাস ইট টাটকা পুড়িয়ে দেব—স্পেশাল তৈরী। আমি বললুম—উঁহু, ওই বাঁশবনের ঝড়জল খাওয়া ইটের কাছে আর কোনটা লাগে নাকি? চলো—ওখানে গিয়ে দেখি। অরুণের মুখ গেল শুকিয়ে। সে নানা বাহানা ছলছুতো সুরু করল। আমিও নাছোড়বান্দা। শালা ঘুঘু দেখেছ—ফাঁদ দ্যাখোনি। ও সাপখোপের ভয় আমায় দেখিও না। আমি বেদের রাজা। ব্যস্। একজায়গায় নতুন ষ্ট্যাক আর দোমড়ানো ঝোপঝাড় দেখে হাত লাগালুম। অরুণ পরিত্রাহি চ্যাঁচায়। যেন শালার গলায় ছুরি চালাচ্ছি। উরে ব্বাস! বেরিয়ে পড়ল গুঁড়োদুধের টব! বেবিফুড।…উরে হালুয়া! অরুণ পায়ে ধরল। কান্নাকাটি—সাধাসাধি!…

দম নিয়ে সানু বলল, আমি যদি অন্যলোক হতুম রাহুলবাবু, তাহলে সেদিনই আমার মুণ্ডুটা সাবড়ে ফেলা হত। সেটা খুব সহজ কাজ নয়। আমার ষ্টেনগান আছে—দুদশজন চেলা আছে। অবশ্যি তারা কেউ নন্দর মতো গুণ্ডা-বদমাস নয়। ভদ্রলোকের বাড়ির শিক্ষিত ছেলে সব। হাতে আর্মস পেলে মানুষ বদলে যায় মশাই। না—ডিটেলস বলব না। শুধু জানবেন যে আমি পলিটিকস করি না—বিশ্বাসও নেই ওতে। আমার দলের ছেলেদের অবশ্য সেটা আছে। ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু এটুকু যে ওরা ডাকলে আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াই আর আমি ডাকলে ওরা আমার পিছনে এসে জোটে। এইমাত্র।

রাহুল একটু অবাক হয়ে বলল, আপনার চেলা যাদের বললেন—তারা নিশ্চয় আপনার দাদার পার্টির লোক?

সানু রহস্যময় হাসল। বলল, হ্যাঁ। তবে—ওই যে বললুম, দাদা আমাকে ডাকলে

আমি যাব না। নেভার। তখন দাদা চালাকি করে। হ্যাঙ্গামার দরকার হলে ওদের ডাকে—ওরা ডাকে আমাকে। ব্যস, দাদার উদ্দেশ্য সিদ্ধ। কিন্তু আমি তো জানি—কার খাতিরে যাচ্ছি।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ততক্ষণে। আকাশে নক্ষত্র ফুটেছে। বাড়ির এদিকে কোন আলো নেই। হয়তো আছে—জ্বলেনি তখনও। হাঁসগুলো কখন উঠে গেছে সিঁড়ি থেকে। কোথাও কোন শব্দ নেই। রাহুল বলল, উঠি তাহলে।

সানু বলল, একটু বসুন। সেদিন আপনার সাহস আর শক্তির পরিচয় পেয়ে খুসি হয়েছিলুম খুব। কারণ আমি নিরীহ টাইপের ভীতু বোকাসোকা ছেলেদের একটুও পছন্দ করিনা। তাছাড়া আপনার হাতের মার দেখে তক্ষুনি চিনেছিলুম, আপনি ওস্তাদ ছেলে। আপনার প্রেমে পড়ে গেছি মশাই।…সানু হো হো করে হাসল।… যাক্‌গে—এখন কথা হচ্ছে, শংকরই সম্ভবত আপনাকে সাবড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন ?

রাহুল বলল, তাহলে তিনিই বা কেন শেষমুহূর্তে বাঁচালেন ? পৌঁছে দিলেন বাবার ওখানে ?

সানু বলল, শালা ঘাগী মাল। জানে মারতে চায়নি আসলে—বেশ বোঝা যাচ্ছে, আপনাকে জোর ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিল। সবটা সাজানো ব্যাপার। ওর উদ্দেশ্য ছিল—শীগগির আপনি ময়নাচক থেকে পালিয়ে যাবেন !

কিন্তু কেন ?

প্রশ্নতো আমারও। কেন ? সেজন্যেই বলছিলুম, কাল কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখেছিলেন নাকি ওখানে ?

কিছু দেখিনি তো।

সানু ফিসফিস করে বলল, কিছু মনে করবেন না প্লীজ। আপনার ছোটমার সঙ্গে লোকটার একটা ইলিসিট কানেকসান আছে। অনেকেই জানে ব্যাপারটা। হয়তো মাষ্টারমশাইও জানেন। কিন্তু বেচারা তো শয্যাশায়ী রোগা মানুষ। রাহুলবাবু, আপনার ছোটমার সঙ্গে কি মণিশঙ্করকে তেমন কোন অবস্থায় দেখেছিলেন ?

রাহুল বলল, না। আমি তো মোটে দুবার গেছি ওখানে। সেও সকালবেলা।

সানু একটু ভেবে বলল, আমি আপনার হিতৈষী। যাকে আমি পছন্দ করি, তার জন্যে জান দিতে পারি। একটা কথা বলব—রাখবেন ?

বলুন।

আপনার ছোটমার ওখানে কখনো যাবেন না। আর যদি পারেন, বাবাকে নিয়ে শীগ্‌গির চলে যান এখান থেকে। বহরমপুরে বাড়ি আছে তো আপনাদের ?

নাঃ। আমি বহরমপুরে থাকতুম। বাড়ি তো গ্রামের দিকে। ঘরটর পড়ে গেছে। না বানালে নিজে যাই কী করে ? আর সেখানে গিয়ে করবই বা কী ?…রাহুল শুকনো হাসল।

সানু বলল, তাহলে এক কাজ করুন। এখানেই জায়গা দিচ্ছি—দাম লাগবে না। বাড়ির মালমশলা যা লাগবে—সব অরুণশালা দেবে। ওর বাপ দেবে।

দেখি।…বলে রাহুল উঠল।

সানুও উঠে দাঁড়াল।…টর্চ আনেন নি? উঁহু—আনলেও আপনাকে একা যেতে দেওয়া ঠিক নয়! চলুন, আপনাকে রেখে আসি। সাইকেল আছে—রডে বসে যেতে পারবেন তো?

রাহুল বলল, থাক্। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি একা যেতে পারব।

পাগল!…সানু বলল।…আপনি মণিশঙ্করকে চেনেন না। ওর ভিতরের চেহারা দেখলে ভয় পাবেন রাহুলবাবু। আমি ভিতরে-বাইরে এক—ও শালা উল্টো। বাপ্স্ আমাকেই ছমছমানি লাগে! চলুন। রাত্তিরে এখানেই থাকতে-খেতে বলতুম—ফ্রাঙ্ক্লি স্পিকিং ব্রাদার—এ বাড়িতে মানুষ নেই। ভূতের রাজত্ব। বউদিটা আছে—তার তো দেমাকে পা পড়ে না। রোস, দেখাচ্ছি মজা। বিয়েটা হয়ে যাক্। তারপর পাইপয়সার বখরা ছাড়ব না। আলাদা বাড়ি তো বানাবই। অরুণশালা আমার বাড়ি করে দেবে। বোন দেবে—যৌতুক দিতে হবে না? সে হাসতে হাসতে পা বাড়াল।

রাহুল বলল, চলুন। কিন্তু আমি নিরস্ত্র নই সানুবাবু।

সানু পিছন ফিরে চাপা গলায় বলল, রিয়েলি? কী মাল? 'রেঞ্জ্', না 'টিপস্'? অটোমেটিক।

কই দেখি? বলে সে দ্রুত ঘরে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল।

রাহুল রিভলবারটা বের করে ওর হাতে দিল। কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখার পর সানু বলল, চীনেটীনে মনে হল! কোথায় পেলেন? আপনি মশাই রাজা তাহলে! দাঁড়ান আমার যন্ত্রপাতি দ্যাখাচ্ছি।

রাহুল অবাক হয়ে গেল। দুটো অটোমেটিক রিভলবার আর একটা ষ্টেনগানের মালিক সানু চ্যাটারজি। নিঃশব্দ হাসিতে তার মুখটা ফেটে পড়ছে। একটু অস্বস্তি এল রাহুলের। কেন কে জানে—তার গা ছমছম করে উঠল। সে বলল, বেরিয়ে পড়া যাক্।

সাইকেলে এগোচ্ছিল দুজনে। যেতে যেতে হঠাৎ রাহুল বলল, নন্দর সঙ্গে অরুণের বিবাদ কিসের? আমি অবশ্য অরুণদার কাছে একরকম শুনেছি।

সানু বলল, অরুণ আর লোক পায়নি—রেখেছিল নন্দকে। কী না ক্যাসিয়ার বাবু! নন্দ মোটা টাকা মেরে সরে পড়েছিল। চাইতে গেলেই উল্টে পিট্টি লাগায়।…হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে সানু বলল, এক কাজ করবেন? চলুন না মুক্তকেশীতে যাই।

রাহুল বলল, না না। কেন?

সানু বলল, উঁহু—চলুন। আপনার ছোটমাকে দেখিয়ে আসি যে আমি এখন আপনার জানের দোস্ত। এটা আপনার সেফটির জন্যে দরকার। ওরা টের পাক্। তা না হলে এখানে স্বচ্ছন্দে বেড়াবেন কেমন করে? তাছাড়া হয়তো মণিশংকরকেও পেয়ে যেতে পারি ওখানে। তাহলে তো খাসা হবে। দুজনেই দেখুক, সানু চ্যাটারজির সাইকেল থেকে রাহুলবাবু নামছেন! হ্যাঁ?

প্রস্তাবটা সঙ্গত মনে হল রাহুলের। সে কোন কথা বলল না আর। হাইওয়ের দুপাশে সারবন্ধ দোকানপাট। আলো হল্লা জেল্লা আছে। মাঝে মাঝে বাস লরী রিকশা টেম্পো ভ্যান সাইকেল আনাগোনা করছে। তবে দিনের চেয়ে গতিবিধিটা কম। অল্পস্বল্প ভিড় আছে। বেশ গরম পড়েছে আজ। একটুও হাওয়া দিচ্ছে না। তাই কারো হয়তো ঘরের দিকে পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। মুক্তকেশীর সামনে রাস্তার দুধারে অনেক ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে যথারীতি। ড্রাইভাররা খেয়ে বিশ্রাম করছে—কেউ খাটিয়ায়, কেউ ঘাসের ওপর গড়াচ্ছে। রাহুল লক্ষ্য করল একদল পাঞ্জাবী ড্রাইভার গোল হয়ে বসে মদ খাচ্ছে আর হইহুল্লা করছে।

একেবারে হোটেলের বারান্দায় পা রেখে সাইকেল থামাল সানু। রাহুল নামবার আগেই সে ডাকল, হ্যাল্লো ম্যাডাম! হেয়ার ইজ সানু চ্যাটারজি।

থামের ওদিক থেকে গঙ্গা বেরিয়ে এল। থমকে দাঁড়াল। মুখটা থমথমে। পরমুহূর্তে হাসিতে ভরে উঠল।...সানুদা! এস। ওকে কোথায় পেলে?

সাইকেলটা সশব্দে উঁচু বারান্দায় ঠেস দিয়ে রেখে সানু বলল, হুঁ—তোমাদের হারানিধি খুঁজে আনলুম। কই, কী খেতে দেবে দাও।

আহা, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার খাওয়া যায় নাকি? ভিতরে এসে বসবে তো?...গঙ্গা মিষ্টি হেসে হাতের রুমালে ঠোঁটটা একবার মুছে নিল।

সানু উঁকি মেরে বলল, আসামী যে অসংখ্য আজ। মেনু কী?

গঙ্গা বলল, মেনুর খবর তো সবসময় জিজ্ঞেস করো—খেতে বললে তখন পেট ভার। এস, বসোদিকি আগে।

একটা তক্তাপোষে এক বুড়ো ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। সামনে বাকসো। কিছু খাতাপত্র। বোঝা যায়, গঙ্গার লোক। ঘোঁতন নামে ছোকরাটি রাহুলকে দেখে কী কারণে একবার দাঁত বের করে হেসে গেল। খাওয়ার ব্যবস্থা মেঝেয় পিঁড়ি আর আসন পেতে। গা ঘিন ঘিন করছিল রাহুলের। সানু বলল, নাঃ, এখানে বসব না। ভিতরে মাষ্টারমশাইকে দেখে আসি। এস রাহুল।

সানু তাকে তুমি বলছে, সেজন্যে নয়—রাহুল অবাক হল গঙ্গার কথায়। গঙ্গা গম্ভীর মুখে বলল, সানুদা? ওঁর অবস্থা আজ খারাপের দিকে। এখুনি ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। বলে গেলেন—আজ রাতটা সাবধানে থাকতে। বলা যায় না! কিন্তু আমি ওদিক দেখব—না এখানটা সামলাবো। মাসকাবারের খাইয়ে আছে সব।...

খোঁজে অরুণের ওখানে গেলুম। দেখা হল না।

রাহুল সানুর হাত ধরে টানল। চলুন, ভেতরে যাই আমরা।

গঙ্গা বলল, তাই যাও তোমরা। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

একা পড়ে আছেন বাবা! রাহুল ক্ষুব্ধভাবে বারান্দা থেকে সরু করিডোরে ঢুকল। সানু তাকে অনুসরণ করল। হৃষিকেশের ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। দরজা ভেজানো আছে। ভিতরের বারান্দার বাঁদিকে গঙ্গার ঘরের দরজা সেটাও ভেজানো আছে।

দরজা খুলে রাহুল ছেলেবেলার গলায় ডাকল, বাবা!

হৃষিকেশের কোন সাড়া নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। বুকের ওপর দুটো হাত। একটু ঝুঁকে পড়ল রাহুল। দেখল হৃষিকেশের একটা চোখের কোণায় জলের ফোঁটা। নাকে জমাট কয়েকফোঁটা রক্ত। ঠোঁটের দুদিকে চাপ চাপ ফেনা। সে দ্বিতীয়বার একটু জোর চিৎকার করল, বাবা!

হৃষিকেশের শ্বাসপ্রশ্বাস স্তব্ধ। গা বরফের মতো ঠাণ্ডা। রাহুল আস্তে আস্তে হাঁটু দুমড়ে বসল। তারপর বাবার বুকে মাথা রেখে সশব্দে কেঁদে উঠল। সানু বিকৃত মুখে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। হতবাক। নিস্পন্দ। এবার সে এগোল। হৃষিকেশের হাতের মুঠোয় ও পুরিয়াটা কিসের?

কতক্ষণ পরে গঙ্গা এসে কী বলতে গিয়ে সেও থেমে গেল। স্থির দাঁড়াল।

হৃষিকেশ তাঁর ষাটবছরের ভালমন্দভরা জীবনটা নিয়ে কখন চুপিচুপি পালিয়ে গেছেন চিরকালের মতো। মনে হচ্ছিল আর তাঁর কাছে কেউ কৈফিয়ৎ নিতে পারবে না এবং খুব সহজে তাঁকে ক্ষমা করা যাবে।

কিন্তু আরও কিছু ছিল।

আবিষ্কার করতে সামান্য সময় লাগল সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যটাকে। গঙ্গার ঘরে ধবধবে পরিপাটি বিছানায় আরেকটি নিষ্ঠুর মৃত্যুর স্বাক্ষর। রণ্টু!

হৃষিকেশ তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন? এবং তখন মনে হল, হৃষিকেশ পালিয়ে গিয়েও নিস্তার পাবেন না। একটা কৈফিয়ৎ তাঁর পক্ষে জরুরী থেকে যাবে। কোনমতে আর তাঁকে ক্ষমা করা যাবে না।

গঙ্গার ভয়ঙ্কর চিৎকারে ময়নাচকের রাতের আকাশ আলোড়িত হচ্ছিল। সে চিৎকারকে শোকের কান্না বললে হয়তো ভুল করা হবে। সে একটা শব্দময়ী মারাত্মক জিঘাংসা।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল তারপর।

রাহুল অরুণের বাড়িতে থেকেছে যথারীতি। কিন্তু কোনরকম শাস্ত্রীয় বিধির ধার ধাবে নি। অরুণ, তার বউ, কিংবা সানুর অনুযোগেও না। শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপার ছিল। সেটাও এড়িয়ে থাকল সে। একটা ঘোরতর নির্লিপ্ততা তাকে গ্রাস করেছিল। বারবার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল একটা বিশাল শূন্যতা। সে শুধু ভাবছিল, কী হবে! ময়নাচকের দুষ্টচক্র খতম করে তার লাভ কতটুকু? তারপরও আরেক দুষ্টচক্র গজাবে না তার কোন গ্যারান্টি আছে? আর এ পৃথিবীতে যুগেযুগে এইসব বিষফোঁড়া গজায়। গজাবে চিরকাল। সে কি ত্রাণকর্তা অবতার? না বাজেনবাবু, পাঁচ হাজাব টাকা পাওয়াটাও খুব সুখের কিছু নয়। টাকা নানাভাবে পাওয়া যায়। আজ আমার কাছে টাকাও তার দাম হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ মারার সুখ আর সুখ নয়। আমাকে ক্ষমা করুন রাজেনবাবু। এখানে পা দেওয়ার পর সব সংকল্প অভিসন্ধি বাসনাকামনাগুলো যেন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে এখন এমন জায়গায় পেঁৗছে গেছি, সেখানে শুধু চারদিকে থরে থরে সাজানো উদ্দেশ্যহীনতা। খুব শীগ্‌গির এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে। টের পাচ্ছি, আমি আর কারো কাজে লাগব না। এমন কি নিজের কাজেও না। এ অবস্থা অসহ্য। হাঁফিয়ে উঠেছি। আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই।···

অথচ চলে যাবার কথা ভাবলেই মনে হচ্ছে, কী যেন বাকি থেকে গেল। রন্ধ্রহীন শূন্যতার দেয়াল জোরে সরাতে পারলে সেটা পরিষ্কার দেখা যেত। যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, বাবার আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল ময়নাচকে, অথচ ফুরিয়ে গেল না হয়তো। অদ্ভুত এ এক অবস্থা! একটা গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল রাহুলের মনে।

অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এল সে। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠিক করে ফেলল, আজই চলে যাবে। বহরমপুর যাবে না। অন্য কোথাও। বরং কলকাতা—অথবা আরো দূরে। বোম্বে। হ্যাঁ, বোম্বেতে তার এক পরিচিত ভদ্রলোক থাকেন। একবার কথায়-কথায় তিনি তাকে বোম্বে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কী যেন কারবার আছে জিতেনবাবুর—জিতেন বোস নাম ওঁর। একজন কর্মঠ লোক দরকার ছিল। উত্তেজিতভাবে সে ব্যাগ থেকে নিষ্ফল নোটবুকটা বের করল। কিছু ঠিকানা লেখা আছে তাতে। জিতেনবাবুর ঠিকানাটা কি লিখে রাখেনি? কোথাও খুঁজে পেল না নামটা। বেরঙা পাতাগুলো পুরনো কিছু হরফসমেত ব্যঙ্গ করল তাকে। তবু সে শেষ পাতা অব্দি উল্টে দেখতে গিয়ে একটা ভাঁজকরা ছোট্ট চিঠি খুঁজে পেল।

বাবার শেষ চিঠিটা! অন্যগুলোর মতো এটাকেও ছিঁড়ে ফেলেনি দেখে তার অবাক লাগল। কেন রেখে দিয়েছিল? মনে পড়ল না তার। চিঠিটা খুলে পড়ল।···
রাহুল, সম্প্রতি জনৈক পরিচিত ব্যক্তির মারফত তোমার সবিশেষ কীর্তিকলাপ জানিতে পারিলাম। আর তোমার সহিত কোন সম্পর্ক রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইতেছে। জানিলাম, আমার রাহুল নামে কোন সন্তান নাই।···
তবে শেষ সুযোগ হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিতে চাহি না। এই চিঠি পাইবার পক্ষকালের মধ্যে তুমি যদি ময়নাচকে আমার নিকট চলিয়া এস—তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।···
আসেনি রাহুল। এলে কী ঘটত? সে একটু ভেবে দেখল। হয়তো এসে পড়লে বড়জোর গঙ্গার সঙ্গে বাবার বিয়েটা হত না। তার নিজের কি পরিবর্তন ঘটত? মনে হয় না। কারণ, অন্ধকারের আস্বাদ যে পেয়েছে, সে সারাজীবন অন্ধকার চাইবে এবং ময়নাচকে প্রচুর অন্ধকার।···
একটু হাসল সে। এখন বাবার প্রসঙ্গ অর্থহীন। অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কি দুর্বুদ্ধি! হিতেন বোসের ঠিকানাটা কেন লিখে নেয়নি? খুব আফশোস হচ্ছে। যাক্ গে, কলকাতা যাওয়া যায়। চেনা জানা লোকের অভাব নেই। কার কাছে যাবে, ঠিক করার জন্যে নোটবইতে চোখ রাখল সে।
সেই সময় শীলা এল। নোট বুকটার দিকে ঝুঁকে বলল, হিসেবের খাতা নাকি?
রাহুল অস্ফুট হেসে বলল, কতকটা। শীলা, আজ আমি চলে যাচ্ছি।
শীলা তার পাশে বসে পড়ল। আমল দিল না কথাটা। বলল, তোমার হাতটা এখনও সারল না? ব্যান্ডেজ খুলে দেখছ না কেন?
রাহুল নোটবইটা রেখে ডানহাতটা তুলে বলল, ঠিক মনে পড়িয়ে দিয়েছ তো। ভুলেই গিয়েছিলুম হাতের কথা। তাছাড়া, আর হাতের ব্যবহার হচ্ছে না কি না—তাই মনে থাকে না।
শীলা বলল, থামো। আমি খুলে দিচ্ছি। ইস্, কী বাঁধন বেঁধেছ!
সে সযত্নে খুলে ফেলল। ঘা প্রায় শুকিয়ে গেছে। রাহুল ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করল। বলল, দেখছ কাণ্ড? 'নেবাসালফের' শিশিটা রয়েছে আস্ত। এ্যাদ্দিন রোজ লাগালে মিরাকল্ ঘটে যেত। শীলা, পাওডার ছড়াও এক্ষুনি! সব ভুলভাল হয়ে গেছে।
শীলা শিশি খুলে পাওডার ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, চলে যাবে না কী বলছিলে?
হুঁ। এক্ষুনি বেরোব।
কোথায়?
সে শুনে কী হবে! আমি আর থাকব না এখানে।
তার মানে?
আর কদ্দিন তোমাদের কষ্ট দেব, বলো!

শীলা একটু চুপ করে থেকে শান্তভাবে বলল, আমি কী বলব ! তোমার ইচ্ছে ।
শীলা !
উঁ ?
তোমার বিয়েটা অব্দি থেকে যাওয়াব ইচ্ছে ছিল । কিন্তু ভালো লাগছে না ।
শীলা তাকাল নিষ্পলক । কোন কথা বলল না ।
রাহুল ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, কিছু ব্যাপার আছে—তোমাকে না জানিয়ে পারছিনে শীলা । বেশ মজার ব্যাপার—হাস্যকর । সেজন্যেই জানাতে চাই ।
শীলা নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে ।
রাহুল চাপা স্বরে—কিছু চপলতাও ছিল, বলল, সানুবাবুর একটা অদ্ভুত বাতিক আছে । সে একালেব মেয়েদের বিশ্বাস করে না । সোজা কথায়—তার ধারণা, কনট্রাসেপটিভের যখন এত ছড়াছড়ি, কুমারীত্ব ব্যাপারটাও নাকি দুর্লভ হয়ে উঠেছে । অতএব তার ইচ্ছে—অরুণবাবুর বোনের একটা ডাক্তারী সার্টিফিকেট চাই আগে । তারপর বিয়ের কথা । এদিকে অরুণদা…
শীলা ভ্রূ কুচকে বিকৃত মুখে বলে উঠল, ডাক্তারি সার্টিফিকেট ? তার মানে ?
রাহুল সকৌতুকে বলল, বুঝতে পারছ না ? সে তোমার নিষ্পাপ কুমারীত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে চায় ।
শীলার মুখটা লাল হয়ে গেছে । সে সব্যঙ্গ বলল, নিষ্পাপ কুমারীত্ব ! কিন্তু ডাক্তারবাবুরা কি মনেরও সার্টিফিকেট দিতে পারেন নাকি ? মনে মনে যদি আমি নিষ্পাপ না থাকি ?
রাহুল সামান্য আকর্ষণ করে ওর গালের কাছে মুখ রেখে বলল, জানি বাবা জানি—তুমি আমার সঙ্গে মনে মনে পাপ করেছ । কিন্তু মনটনের ধার সানুবাবু ধারে না । সে বউ বলতে যদি বউর বডিটাই বোঝে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না । সবাই তো মেয়েদের বডিটডি পাবে বলেই বিয়ে করে । আর সবাই চায়, বউর বডিটা প্রথম উপভোগ করবে সে নিজে । এর নাম কিনা পুরুষত্ব ।
শীলা সরল না । বলল, ও ! তাই বুঝি কিছুদিন থেকে দাদা প্রায়ই বলে—তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস রে । চল্, একদিন বড় ডাক্তার-টাক্তারের কাছে নিয়ে যাই । হ্যাঁ—কাল রাতেও তো বলছিল দাদা ! বউদিও খুব বলল ।
তুমি রাজী তো ?
উঁ ?
ডাক্তারী পরীক্ষায় ?
শীলা ঘুরে বসল । ওর চোখদুটো জ্বলতে থাকল । নাসারন্ধ্র কাঁপছিল । সে রাহুলের চোখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, তুমি এর পরও বলছ আমি কচি খুকির মতো সোজা ডাক্তারের টেবিলে শুয়ে পড়ব ?
না বললে নিশ্চয় পড়তে !…রাহুল হেসে উঠল ।

পড়তুম। না জেনে বিষ খাওয়ার ওপর কারো হাত থাকে না।·· শীলাকে অস্থির দেখাল। তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। · ছোটলোক! ইতর! চামার!
কিন্তু সানুবাবু লোকহিসেবে বেশ ভালো। পয়সাকড়ি আছে।···রাহুল আরও কি বলতে যাচ্ছিল, শীলা তার বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ফুলেফুলে কাঁপতে থাকল সে। রাহুল বলল, আঃ শীলা, ছাড়ো। কাঁদে না! কে এসে পড়বে এক্ষুনি—সেদিনের মতো। এই শীলা! কথা শোন। বিয়ে তো তোমাকে করতেই হবে—যেখানে হোক। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। তাছাড়া অরুণদার জন্যে তোমার স্যাক্রিফাইস করাটাও তো উচিত। সে তোমাদের কত করেছে-টরেছে। এ একটা মামুলী ব্যাপার মাত্র। শীলা!
শীলা কান্নাজড়ানো গলায় বলল, তোমার লজ্জা করছে না বলতে? গলা কাঁপছে না? বেশ—তবে আমাকে তোমার পিস্তলটা দিয়ে যাও। বলে সে সোজা হল। মানুষ মারা শেখাব বলেছিলে, দরকার নেই। আমি নিজে পারব।
রাহুল টের পেল তার মধ্যে কী একটা শক্তি জেগে উঠেছে আস্তে আস্তে। তার রক্ত চঞ্চল হচ্ছে ক্রমশ। সে শীলার চোখেচোখে তাকিয়ে বলল, সানুর হাতে মার খেয়েছিলুম। কিন্তু পাল্টা মার দিতে আজও পারিনি। উৎসাহ পাচ্ছিলুম না। ·· অথচ একটা কিছু করা দরকার। সত্যি শীলা, হার স্বীকার করে বেঁচে থাকাটা আমার স্বভাবের বাইরে। কিন্তু কী করব? আমার আমার কিছু ভাল লাগছে না আর। শীলা, ইচ্ছে করছে যাবার আগে সানুকে হারিয়ে দিয়ে যাই—অন্তত একটা জায়গায়। সে হয়তো মোক্ষম মার হবে ওর পক্ষে। কিন্তু
শীলা দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল উদ্‌ভ্রান্তের মতো। দুচোখে কিসের আগুন ধকধক করে উঠল। চুলগুলো বিস্রস্ত হল। সে থরথর করে কাঁপছিল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কেন পারবে না? আমি যদি ডাকি তোমাকে? আমি নিজে তোমাকে ডাকছি। · সে ফিসফিস করে উঠল। · বউদি নেই। ডাক্তারের ওখানে গেছে। নেতা রান্নাঘরে। দাদা বেরিয়েছে। কেউ আসবে না।
ভিতরের দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে এল রাহুল। তারপর জানালাগুলো। ঘরটা আবছা আঁধারে ভরে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু চাপা কিছু শ্বাস প্রশ্বাসের ধ্বনিপুঞ্জ।···
চলে যেত ঠিকই—কিন্তু আর সম্ভব হল না। কারণ সকালের সেই বিস্ফোরণের পর রাহুল আবিষ্কার করল, শূন্যতা আর উদ্দেশ্যহীনতার চাপচাপ অবরোধ কোথাও সরে গিয়ে কিছু অর্থময়তা কিছু উদ্দেশ্য উঁকি দিচ্ছে। গঙ্গা বলেছিল, ·· তোমারও তো পায়ের নিচে মাটি দরকার। কেন তুমি ভবঘুরে হয়ে বেড়াবে? ·· আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মতো ঘরসংসার করো।
গঙ্গার কথাগুলো বারবার তার মনে ভেসে আসছিল। পায়ের নিচে যে মাটি দরকার —তা কি শীলার ভালবাসা? কৈশোরে একদা গঙ্গার দেহে দেহ মিশিয়ে সে যে-

সুখের স্বাদ প্রথম পেয়েছিল, তার মধ্যে আর যাই হোক, ভালবাসা ছিল না। তা ছিল নিষিদ্ধ প্রান্তরে খেলার গোপন আনন্দ—তার মধ্যে অস্থিরতা বেশি, উত্তেজনাই পরম, তার নিচে কোন বুনিয়াদ ছিল না। শুধু জেনেছিল, কামনা নামে একটা ব্যাপার মানুষের রক্তে থাকে। কামনার সুখটা সে একটু একটু চিনেছিল। দুঃখের দিকটা জানা হয় নি। জানা হল অনেক বছর পরে। অথচ সে তো শুধু কামনাই! ভালবাসা নয়। ভালবাসা আলাদা জিনিস। তার অচেনা কিছু। এতদিনে একটা সকাল কামনার সঙ্গে ভালবাসাকে নিয়ে এল। আর ভালবাসার এত অশেষ দুঃখ! দুঃখ দিতে জানে ভালবাসা।

চলে যাওয়াটা আবার ভেবে দেখবার বিষয় হয়ে উঠল রাহুলের কাছে। একটা দুঃখ সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে—যেখানে যাক, যতদূরে যাক্ সে। বার বার মনে হবে, মাত্র একবার সত্যিকার ভালবাসার খপ্পরে সে পড়েছিল। তার মধ্যে পবিত্রতা আর সৌন্দর্যের ছিল আভাষ। দেহের মধ্যে দিয়ে দেহাতীত একটা সত্তাকে ছুঁয়েছিল সে। হায়, তাকে নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়নি—সে যেখানেই যাক, ভাববে। অস্থির হবে।

বিকেলে সাইকেলে চেপে সানু হাজির হল সেদিন।...কী, আর যে পাত্তা নেই! শোক দুঃখ কি চিরকাল বয়ে বেড়ায় মানুষ? বাবারা কেউ বাঁচে না। চলো ঘুরে-টুরে আসা যাক্। এই গরমে চুপচাপ শুয়ে থাক কী করে? এ্যাঁ?

অরুণ ছিল ইটখোলার দিকে। হয়তো দূর থেকে আসতে দেখেছিল সানুকে। এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।...এস, এস। আজই ভাবছিলুম, তোমার কাছে যাই একবার।

সানু ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী ব্যাপার?

অরুণ বলল, না—তেমন কিছু না। এমনি। মানে তোমার বউদি বলছিল—ও আসেটাসে না আর। অসুখ-বিসুখ হল নাকি।

সানু বলল, নাঃ। আমার অসুখ-বিসুখ হয় না। ভালো কথা—অরুণদা, এক্ষুনি শ'দুই টাকা দাও তো! শীগ্‌গির! বড্ড দরকার। আর ইয়ে—শীলা কোথায়?

অরুণ হন্তদন্ত হয়ে ডাকল, শীলা, শীলু! এদিকে একবারটি আসবে?

শীলার কোন সাড়া না পেয়ে সে ভিতরে গেল। সানু চোখ নাচিয়ে রাহুলকে বলল, দেখলে শালা আমাকে কী ভয় পায়! এক্ষুনি টাকা এসে যাবে। শীলাও এসে পড়বে। দুনিয়াটা এমনি জায়গা রাহুল—বুঝলে ভাই? সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

রাহুল শুকনো হাসল মাত্র।

সানু ফিসফিস করে বলল, গত রাত্রে ফের তিনতিনটে ট্রাক উজোড় হয়ে গেছে জানো?

রাহুল কৌতূহলী হয়ে বলল, কী হয়েছে?

সানু ফ্যাচ করে হাসল।...মুক্তকেশী হোটেলটা যে দি সেণ্টার অফ দা রিং, পুলিশ কল্পনা করতেও পারে না। যদ্দিন ওটা থাকবে—তদ্দিন এই সব চলবে। লক্ষ্য

করেছ, যত ট্রাকড্রাইভারের আড্ডা হল ওখানে! তোমার ছোটমা-টি যা জিনিয়াস, ভাবা যায় না!

রাহুল বলল, কাল রাতে রাহাজানি হয়েছে আবার?

সানু দুহাত ভর করে বুক চিতিয়ে দিল। বলল, হ্যাঁঃ! আমি হাওয়ায় গন্ধ পাই। দেখেশুনে আমারও ইচ্ছে করছে, ওদের দলে ভিড়ে যাই। পারিনে—কী হবে! এত ঢাকগুড়গুড় লুকোচুরি রক্ত জল করা আমার পোষায় না। আসলে ব্যাপারটা তো চুরি—নাকি? আমি চুরি চামারি ঘেন্না করি হে। চাইলেই যখন টাকা পাই, তখন ছেনালী করে কী হবে? ভিতরে বাইরে একরকম থাকাই আমার পছন্দ। শংকরটার মতো ছেনালি···হঠাৎ সে রাহুলের কানের কাছে মুখ আনল। ···শংকরের দিনকাল যা পড়েছে। তুমি বাপের ছেলে না কী হে? মাগীটাকে শায়েস্তা করতে পারছ না? হাজাব হোক, বাবা বিয়ে করেছিলেন শাস্ত্রমতে। রক্ষিতা তো নয়। তোমার একটা কর্তব্য আছে—না নেই!

রাহুল ক্ষুব্ধভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, শীলা এসে ঢুকল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল রাহুল। শীলা হাসল। ··কেন ডেকেছেন?

সানু বরের মতো লাজুক হাসল।···আরে আসুন, আসুন। একটু গল্পগুজব করা যাক্। অনেকদিন আসা হয় নি। বউদি কেমন আছে?

ভাল।···শীলা নির্বিকার বলল।···আমিও ভাল আছি। আর কী জানতে চান, বলুন?

সানু একটু অপ্রস্তুত হল।···অতিথির প্রতি আপ্যায়নটা কি ঠিকমতো হচ্ছে? মনে হচ্ছে, হঠাৎ আপনার কাছে কী অপরাধ করে বসে আছি। বুঝলে রাহুল, এই ভদ্রমহিলা সানু চ্যাটারজিকেও থতমত খাইয়ে দ্যায় দাপটে। বাপ্স্, বুক ঢিপঢিপ করছে।

সে কৌতুক দিয়ে শীলাকে পরাহত করার চেষ্টা করছে, রাহুল তা টের পেল। রাহুল শীলার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বসো। ভদ্রলোক এসেছেন। একটু গল্পগুজব করা যাক্। কাল রাতে কী যেন হয়েছে বললেন সানুদা?

শীলা লক্ষ্মীমেয়ের মত বসল কোণের দিকে একটা চেয়ারে। সানু তার দিকে তাকালে দেখত, ঠোঁটের কোণে প্রচ্ছন্ন কী বিদ্রূপ উঁকি দিচ্ছে।

সানু বলল, ব্রীজের ওখানে ফের তিনটে ট্রাক ফর্দাফাঁই। এত চুপি চুপি হয়েছে যে একশোগজ দূরের সেন্ট্রিরা টু শব্দটি পায় নি। বোঝ ব্যাপারখানা। এদিকে···

সেই সময় অরুণ এসে ওকে ডাকল।···একটু বাইরে চলো সানু, কথা আছে।

দুজনে বাইরে গেল। কিছুক্ষণ ফিসফিস করে কিছু কথা হল। তারপর সানু একা ফিরল। রাহুল টের পেল যে অরুণ ওকে টাকা দিয়ে গেল। সে শীলার দিকে চোখ টিপে হাসল। শীলা ভ্রূ কুঁচকে মুখ ফেরাল অন্যদিকে।

রাহুল বলল, আমরা চা পাবো তো এখন? শীলা, শুকনো মুখে আড্ডা জমে না।

শীলা উঠতে যাচ্ছিল—সানু বলল, চা-ফা হবে। রাত্রির কাণ্ডটা শোন।
শীলা বলল, আহা, চা খেতে খেতেই শোনা যাবে। আসছি।
সে চলে গেলে সানু অভ্যাসমত পা দোলাতে দোলাতে বলল, এই শীলা মেয়েটি এজন্যেই আমার বেস্ট চয়েস রাহুল। দারুণ গিন্নিপনা আছে। তার ওপর চেহারায় এমন দীপ্তি যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আমি শালা বড় ভাগ্যবান। অবশ্য ··
সে ফিসফিস করে বলল—অবশ্য এমন ভাল জিনিষকে অরুণচন্দ্র তলে-তলে ফাঁসিয়ে রেখেছে কি না কে জানে!
রাহুল ঠাণ্ডা স্বরে বলল, সে তো হেল্‌থ সার্টিফিকেটেই ধরা পড়বে। ভাবনা কিসের?
সানু কিন্তু রীতিমত গম্ভীর। সে বলল, সেই সমস্যা। কিন্তু রাহুল, ইট ইজ সিওর এ্যাণ্ড সার্টেন—শেষ অব্দি ভেবে ঠিক করেছি—ইফ শী ইজ রিয়েলি টাচ্‌ড্‌ বাই সামবডি, তবু আমি ওকে বিয়ে করব। এ আমার জেদ। আরে ভাই, বললে কী হবে—পৃথিবীতে কোথাও কি খাঁটি জিনিস আছে—নাকি থাকে? ভালমন্দব ভেজাল দিয়ে সবকিছু তৈরী। যদি শীলার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে থাকে, হোক—কিছু যায় আসে না।
রাহুল বলল, তাহলে ডাক্তারী পরীক্ষা নিশ্চয় করাচ্ছেন না।
নাঃ। ওটা একটা কথার কথা বলেছিলুম মাত্র। সানু খিকখিক করে হাসল।···অরুণটা একটা ছোটলোক। তাছাড়া ব্যাটার প্রাণের দায়ও বটে। তাই স্বীকার করে নিয়েছি। এমন ইনসালটিং সর্ত কোন ভদ্রলোক মাথা পেতে নিতে পারে? নেভার। অতএব অরুণশালা কী মাল, বুঝে দ্যাখ।
রাহুল বলল, হুঁ। তাহলে শীলাকে বিয়ে করতে আর তো বাধা নেই।
তা নেই। ভাবছি কালপরশুর মধ্যে দিনটিন ফাইনাল করে ফেলব। আসলে হয়েছেটা কী জানো? আমার বউদিটার ব্যবহারেই অবশেষে ঝুলে পড়তে হল। যা থাকে কপালে। ওকে মুখের ওপর বলে এসেছি, তোমার চেয়ে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী সদ্বংশের মেয়ে আমি এ সপ্তার মধ্যে বউ না করে ফেলি তো আমি বেজন্মা। শশাঙ্ক চ্যাটারজির ঔরসে আমার জন্মোই হয় নি। মাগীকে দেখিয়ে দেখিয়ে বউ নিয়ে বাড়ি ঢোকা চাই। এক ডজন ব্যাণ্ড পার্টির অর্ডার দেব। কান্দী থেকে বাজী পোড়াতে মালাকার আনব। দাদার গাড়ি আছে—আমার নেই। তো কী হয়েছে? কাটোয়ার গুরুদাস আঢ্যির ছেলে আমার বুজম্‌ ফ্রেণ্ড্‌। কলকাতায় থাকে। মস্তো ক্যাডিলাক আছে তার। শালা হাইওয়ে দিয়ে প্রিঁ প্রিঁ করে চলে আসবে। হইচই ফেলে দেবে সানু চ্যাটারজি!
সানুকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। তার মুখটা লাল—ফেটে পড়ছে যেন। রাহুল বুঝল, পারিবারিক চাপা ক্রোধটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু আর কৌতুক অনুভব করছিল না রাহুল। প্রচ্ছন্ন অস্বস্তি ভাবে আড়ষ্ট করছিল ক্রমশ। সে

মুখ ফসকে বলে ফেলল, সব বুঝলুম। কিন্তু শীলা—শীলা যদি রাজী না থাকে!

সানু চমকে তাকাল।…কেন? সে রাজী নয়—এমন কথা তো শুনিনি। আর তার অরাজীর কারণ কী আছে? আমি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ তো বটে। খেঁদাপেঁচাও নই—কী বলো তুমি? আমার ক্যাশ টাকা প্রচুর না থাকলেও সম্পত্তি আছে। সংসারী হলে তখন সব ছেড়েটেড়ে টাকা-পয়সার দিকে মন দেব। আশা করি, সৎপথে থেকেও ভাল কামাতে পারব। পারব না?

ওর কথায় একটা অসহায় কাকুতি ছিল। রাহুল গুম হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর শুকনো হেসে বলল, না। এমনি বললুম। শীলার ভাগ্য তো বটেই।

সানু চাপাস্বরে বলল, তুমি একটু সাহায্য করবে রাহুল?

বলুন না। নিশ্চয় করব।

শীলা—ধরো যদি রাজী নাও থাকে, মেয়েদের ব্যাপার তো—বুক ফাটে মুখ ফোটে না—তুমি ওকে বুঝিয়ে বলবে? তোমাকে তো ও মনে হয়—খুব খাতির করে।

আমার বলায় কি কাজ হবে? আমি তো বাইরের লোক। আজ আছি—কাল নেই। তাই হয়তো খাতির করে। খাতির দিয়ে তো বেশি দূর এগোন যায় না।

সানু সবেগে মাথা নাড়ল।…উঁহু হুঁ। তোমার ভীষণ সেবাশুশ্রূষা করেছে শুনেছি।

তাতে কি হয়েছে? বাইরের লোক এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়ির মেয়েরা একটু আধটু লক্ষ্য রাখে। এটা নিয়ম।

সানু চুপচাপ বসে রইল। ভ্রূ কুঁচকে কী ভাবতে থাকল। ইতিমধ্যে শীলা এসে গেল চা নিয়ে। চা রেখে সে চলে গেলেও সানুর ধ্যানভঙ্গ হল না যেন। রাহুল বলল, চা নিন সানুদা।

সানু হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল। কিন্তু তার অন্যমনস্কতাটা ঘুচল না।

রাহুল বলল, কী ভাবছেন?

উঁ?

অত ভাববার কী আছে। বিয়ে তো হচ্ছেই। অরুণ যখন শীলার গারজেন—অরুণ কথা দিয়েছে, ব্যস—আর কোন কথা নেই।

তা তো নেই।…বলে সানু ঘুরল।…রাহুল, তোমাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। পারবে? তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।

বেশ তো। বলুন।

তুমি শীলাকে আমার অসাক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে, ওর কী মত। তারপর…

আমাকে যদি না বলে?

আরে বাবা, যাহোক একটা কিছু জবাব দেবে তো সে! সেটাই আমার জানা দরকার। অ আ ক খ—যা হোক কিছু তো বলবে।

রাহুল হেসে বলল, যদি মুখ না খোলে একেবারে ?
সানু হেসে উঠে উরুতে থাপ্পড় মারল।···ব্যস। মৌন সম্মতি লক্ষণং। সেটাও একটা খবর।
আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না। আমি বাইরে যাচ্ছি।
সানু স্যাঁচ করে জীভ কেটে বলল, ধ্যাৎ ! সে হয় নাকি ?
বাকি চা-টুকু গিলে সে উঠে দাঁড়াল। ··চলো, সন্ধ্যেবেলাটা একটু ঘুরে আসা যাক। হ্যাঁ, ভাল কথা। ভুলে গিয়েছিলুম। তোমার ছোটমা আজ সকালে বলছিল—তোমার বাবার কিছু বাকসোপত্তর আছে। পুরনো আমলের জিনিস সব। তোমাদের ফ্যামিলির নিজস্ব। ওগুলো সে রাখতে চায় না। ইচ্ছে করলে তুমি ফেরৎ নিতে পারো।
রাহুল মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠল। তাই তো! তার মায়ের কত সব স্মৃতি—দাদুর কত কিছু এবং বাবারও অনেক জিনিস রয়ে গেছে। গ্রাম ছেড়ে আসবার সময় সবই তো ওঁরা নিয়ে এসেছিলেন। ওইসবের মধ্যে তার নিজের ছেলেবেলারও অনেক কিছু থাকা সম্ভব। হয়তো কোন পোষাক-আসাক—কোন ছবি।
ছবি। মা-বাবার ছবি। স্কুলে বাবাকে বিদায়সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল—তারও ছবি আছে।
রাহুল কোন কথা না বলে উঠল। সানু বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রাহুল ডাকল শীলাকে। দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে, এবং অস্ত্রটা তো নেবেই।···
দুজনে হাঁটতে হাঁটতে হাইওয়েতে এল। তারপর কিছুদূর হেঁটে মুক্তকেশী পৌঁছল। সানু বলল, এক কাজ করো। তুমি ততক্ষণ কাজ গুছিয়ে নাও। আমি একপাক ঘুরে আসি। টাকার দরকার। শঙ্করকে পাকড়াব। জাস্ট একঘণ্টার মধ্যে ফিরব। তারপর রিকশো ডেকে মালপত্র যা নেবার নিয়ে ওখানে পৌঁছে দেব। কেমন ?
সানু চলে গেল। রাহুল একটু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করার পর হোটেলের বারান্দায় উঠল। ঘোঁতন বলল, মা ভেতরে আছেন। যান না।

সাত বছর আগে গঙ্গাকে দেখেছিল। চঞ্চল হাসিখুসি বেপরোয়া। উদ্দাম বন্যতাই ছিল তার জীবনের ছন্দ। শুচিতা-অশুচিতা পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের বাইরে ছিল তার অবস্থিতি। নিঃসঙ্কোচে সে নিজের সবকিছু—দেহ বা মন, বাজী রেখে খেলতে পারত। বুক খুলে খুব সহজে সে তার নতুন স্তনের তিলটা দেখাতে পারত। বলত, চুষে দ্যাখো না—দুধ পাবে না একফোঁটা। পাবেই না। আমি যে কক্ষনো মা হবো না !
সাত বছর পরে এসে আরেক গঙ্গাকে দেখেছিল। ধীর শান্ত গম্ভীর। পুরো জোয়ার এসে গেলে নদীর যে থমথম স্থিরতা—তা ছিল তার মধ্যে প্রকাশিত। তার

যৌবন নিজের কাছে গোপন প্রাচুর্যের প্রতীক—কৃপণের ধনের মতো লোহার সুকঠিন আলমারিতে গঙ্গা যেন নিজের দেহকে রাখতে শিখেছে। সে পাপপুণ্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা চিনেই মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে একহাতে পাপ অন্য হাতে পুণ্যকে ছুঁয়ে থেকেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সে মা হয়ে গেছে। তার স্তনে অভাবিত দুধের উৎস খুলে গেছে সংসারী প্রৌঢ় পুরুষের কামনার দাঁতে—আর সে পুরুষকে সে হয়তো একদা পিতৃসম দেখেছিল। তাই সব মিলিয়ে সে ছিল বিদ্রোহিনী গঙ্গা। কিন্তু পূর্ণতা দিয়ে সব বিদ্রোহ সব প্রক্ষোভ সে ঢেকে রাখতে জানত।

আজ এক গঙ্গাকে দেখল রাহুল। চমকে উঠল বিস্ময়ে এবং ঘৃণায়।

ভেবেছিল, দেখবে শান্ত সৌম্য শোকনম্র বিধবাকে—হয়তো স্বামীর নয়, ছেলের শোকে বিধ্বস্ত—ভাঁটার নদীর মতো শূন্য আর গভীর। ক্ষীণ স্মিত জলধারায় রোদ চিকচিক করছে বিষণ্ণতার মতো। তাব দুপাশে জমে থাকবে পুঞ্জীভূত অনুশোচনার ক্লেদ।

কিন্তু এ কী গঙ্গা! তার কোথাও কোন অনুশোচনা—কোন রিক্ততা—কোন হারানোর দুঃখ নেই। ফিকে রঙের ভয়েল সাড়ি জামা, দুহাতে মোটা রুলি, গলায় চেন লকেট, কানে বেলকুঁড়ি, কপালে একচিলতে বেগুনি রঙের টীপ—নাগরী গঙ্গার দুচোখে কামনা বাসনার প্রবল উচ্ছলতা। তার দেহটা প্রগলভ হয়ে উঠেছে। তেইশ বছরের যৌবনকে দারুন ঝাড়পোঁছ করে, ঝড় ঝাপটার ধুলো বালি মুছে, দেহের আলমারিতে সাজিয়ে নিয়েছে এবং এখন সহজেই সে কপাট খুলে থাকে থাকে সাজানো হরেক জিনিস দেখাতে সংকোচ বোধ করে না যেন।

চোখ জ্বলে উঠেছিল রাহুলের। খোলামেলা মুক্তির বিশাল মাঠে একা হেঁটে চলেছে মুক্তকেশী গঙ্গা। ভবানীবাবু তাঁর মেয়ের নাম মুক্তকেশী রেখেছিলেন। তখন কী জানতেন এ মেয়ে একদা সত্যি সত্যি মুক্তকেশী হবে—ভয়ংকরী এবং বিবসনা—অযুত পুরুষের মুণ্ডমালা যার গলায় শোভা পায়?

গঙ্গা আয়নার ভিতর রাহুলকে দেখেছিল। বলল, এস। তোমাকে ডেকেছিলুম।

রাহুল দাঁড়িয়ে রইল।

গঙ্গা বলল, বসো—দাঁড়িয়ে কেন? একটু দেরী করে এলে দেখা পেতে না। একবার বেরোচ্ছিলুম। যাক গে—আর যাচ্ছিনে কোথাও। তুমি এসে গেছ। আরে, বসো। বিছানাটা একটু ঠিকঠাক করে দিল সে। রাহুল তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে গঙ্গা বলল, এটা নতুন বিছানা। বসতে পারো।

অর্থাৎ ভেবেছে যে রুণ্টু যে-বিছানায় মরে পড়েছিল, সেটা বলে রাহুল বসতে চাইছে না। রাহুল অবশ্য বসল। তারপর বলল, বাবার কীসব জিনিসপত্র আছে?

গঙ্গা সামান্য দূরে বসে বলল, হ্যাঁ—ওই তিনটে বাকসো। বিছানাপত্তর তো সব ফেলে দেওয়া হয়েছে। অনর্থক এ বাকসোগুলো রেখে কী করব। যার জিনিস, সে এসে নিয়ে যাক।

রাহুল বলল, কী আছে-টাছে ওতে ?
গঙ্গা ভ্রূ এবং নাকের ডগা কুঁচকে বলল, আমি দেখিনি। ওগুলো খুলতেও অবশ্য দেখিনি কোনদিন। অন্যের জিনিসে আমার কোন আগ্রহ নেই। সে অস্ফুট হাসল।
রাহুল উঠে গিয়ে পুরনো ময়লা ঢাকনা দেওয়া ওপরের বাকসোটা খুলে ফেলল। তালা দেওয়া নেই। তালা নিচের দুটোয় অবশ্য আছে! ডালা খুলতেই কেমন একটা গন্ধের ঝাঁঝ তার নাকে এসে লাগল। কী যেন মনে পড়ে গেল গন্ধটার অনুষঙ্গে—আবছা কী স্মৃতি! কোন সকাল দুপুর অথবা বিকেলের—রোদ-ছায়া-নীলিমায় ঘেরা পৃথিবীর একটা পাড়াগেঁয়ে জীবনের কিছু মুহূর্ত—জানালার বাইরে দেখা ধুধু গঙ্গার বালুচর, ঝাউবন, কাজল জল, তার মা এক গুচ্ছের খাতা-পত্র বই, ছেঁড়াখোঁড়া জামা, কৌটো, টুকিটাকি জিনিস কতরকম। হরিণের শিঙ একটা। একটুকরো চন্দনকাঠ। একটা পুঁতির মালা। ছোট্ট হাতুড়ি।..
বইগুলি তার ছেলেবেলার স্কুল পাঠ্য। খাতাগুলোও। এটা বুঝি বাবার সেই সিল্কের পাঞ্জাবি! ওটা কি তার চেককাটা লাল শার্টটা! একটা অসমাপ্ত সোয়েটার—নেভীব্লু রঙের, কিছু উলের গুটি। মা বলেছিলেন, ওখানে গিয়ে ধীরে-সুস্থে তুলব। এখন তো মোটে খরা। শীত আসতে ঢের দেরী!…
কতক্ষণ তন্ময় হয়ে পড়েছিল সে। গঙ্গার কথা ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠল। তার নগ্ন ঘাড়ের কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটায় সে একটু ঘুরল—গঙ্গা ঘনিষ্ঠভাবে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এবং কাঁধের ওপর দিয়ে জিনিসগুলো দেখবার চেষ্টা করছে। রাহুলের পিঠে—হয়তো মনের ভুল—গঙ্গার সামান্য চাপ—সে অস্বস্তিতে অস্থির হল চকিতে। গঙ্গা বলল, ওগুলো কোথায় নিয়ে যাবে ভাবছ ?
রাহুল দেখল, সরতে হলে ডাইনে বা বাঁয়ে ছাড়া আর জায়গা নেই—সে বাকসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরে আবছা অন্ধকার। বাইরে সূর্য ডুবে গেছে একটু আগে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আলো জ্বালবে ?
জ্বালছি। গঙ্গা যেন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল কথাটা।…কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে শুনি ? অরুণের ওখানে ?
রাহুল বলল, হ্যাঁ আপাতত তাই। তারপর…
তারপর ?
কিচ্ছু ঠিক নেই!—বলে রাহুল বাকসোটা বন্ধ করল। সরে এল একটু।
সে তো নেই, জানি। ঠিক করে নিতেই বা দোষ কী?—গঙ্গা হাসল—ভ্রূ কুঁচকে ডান ভ্রূটা একটু তুলে ফের বলল, এক কাজ করলেই পারো। শীলা বেচারাকে আর মিছেমিছি না তাতিয়ে বিয়ে করে ফেলো না কেন ? শুনেছি, বেথুয়াডহরিতে ওর বাবার বাড়িটা এখনও আছে।
রাহুল কোন জবাব দিল না। গঙ্গা বলল, অবশ্যি সানু গোলমাল করে ফেলতে

পারে। কিন্তু তোমরা দুজনে যদি চুপচাপ কেটে পড়ো, ও কী করবে? বলো তো—আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

রাহুল বলল, কী ব্যবস্থা করবে?

গাড়ির। চাই কি সানুর দাদার জীপটাও মিলে যেতে পারে। সানু নাকের ওপর ঘা খাক্ না।

সানুর দাদা তো বিখ্যাত লোক—তার সঙ্গেও তোমার ভাব আছে?···রাহুল তার বিদ্রূপটা আর লুকোতে পারল না।

আছে।···গঙ্গা কিন্তু গম্ভীর।···থাকা খারাপ ভাবছ কেন? ভবানীবাবু খুব সামান্য লোক ছিলেন না। তাঁর ফ্যামিলির সঙ্গে চাটুয্যেদের যোগাযোগ থাকবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। হোটেলওয়ালি হয়েছি বলেই তো বংশমর্যাদা চলে যায় না। যা ছিল—তা আছে। তুমি ভুলে যেও না—আমার দাদু ছিলেন চাটুয্যেদের মতোই একসময়ের জমিদার।···বলে গঙ্গা উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

রাহুল বলল, দেখি—সানুদা কখন আসে।

কোথায় যাচ্ছ?

রিকশো ডাকতে হবে। সানুদার অপেক্ষা শুধু।

হাত ধরে টেনে গঙ্গা বলল, বসো—কথা আছে। আসছি।

রাহুল বসল না। বলল, কী কথা?

গঙ্গা কেমন হাসল।···তোমার বয়স কোনদিন হয়ত বাড়বে না। সেই যা দেখেছিলুম, আজও তাই। বসো না, এখুনি আসছি। চা খেতে ইচ্ছে করছে না?

না। এক্ষুনি খেয়ে এলুম।

আমারও তো ইচ্ছে করতে পারে। মনে পড়ে? সেই যে ওবাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা দুজনে চা খেতুম—আমার কোঁচড়ে গরম মুড়ি থাকত। আঃ, কী সব দিন ছিল!

গঙ্গা চলে গেল। রাহুল কেমন অবশ বোধ করল। অবশ্য সানু না আসা অব্দি তার থাকা উচিত। একা বেরোতে গা ছমছম করে আজকাল। মনে হয়, রিভলবারটা মরে গেছে কখন। সে আজ পুরোপুরি নিরস্ত্র। নিরস্ত্র কিংবা কুরুক্ষেত্রে কর্ণের মতো।

বারান্দায় টিমটিমে আলো। বাবার ঘরে তালাবন্ধ রয়েছে। হঠাৎ রাহুলের মনে হল—গঙ্গা কি একা এ ঘরে থাকে? সম্ভবত ঘোঁতন ছোকরাটাও থাকে। তা না হলে তো তার ভয় পাওয়া উচিত এঘরে শুতে। দুদুটো ভয়ংকর মৃত্যু ঘটেছে এখানে। এই ঘরে রুন্টু মরে পড়ে ছিল। এই খাটটাতে। গা শিউরে উঠল রাহুলের। ভূতপ্রেতের ভয় তার নেই। কিন্তু এখন এ মুহূর্তে এই শূন্য বাড়িটা হাঁ করে তাকে গিলতে আসছে যেন। সে প্যান্টের পকেটে হাত ভরে রিভলবারটা

বের করল। চারদিকে তাকাল। মনে হল—সামনে পিছনে ইতস্তত কিছু অদৃশ্য আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে লক্ষ্য করছে। কিছুতেই এই ভয়টা তাড়াতে পারল না সে।

পায়ের শব্দ শুনে দ্রুত অস্ত্রটা পকেটে ভরে ফেলল সে। গঙ্গা এক কেটলি চা আর একটা ঠোঙা হাতে ঘরে ঢুকল হাসিমুখে।…দিনগুলো কী-ভাবে কাটাচ্ছি, আমিই জানি। এত একা লাগে মানুষের, কখনো ভাবিনি। সারা রাত জেগে থাকি। ভয়ে চমকে উঠি। এত কান্না পায় তখন…সে আলমারি খুলে কাপপ্লেট বের করতে থাকল।

রাহুল বলল, চা-ফা আমি খাবো না কিন্তু।

গঙ্গা আমল দিল না তার কথায়। বলল, কী করব—এর নামই তো ভাগ্য। একসময় তোমাকে বলতুম—আমার কী মজা, কী মজা! মা হবো না। কারো ঘর করব না। মনে পড়ছে রাহুল?

রাহুল মাথা দোলাল শুধু।

আমার প্রত্যেকটি কথা মনে আছে। ভুলিনি। ওই নিয়েই তো আছি—তাছাড়া আর কী আছে আমার?

রাহুল বলল, অল্প করে দাও—ব্যস!

চায়ের কেটলিটা নিজের কাপে উপুড় করে গঙ্গা বলল, একটুও বদলাওনি তুমি। সেদিনও ঠিক এমনি বলতে।

রাহুল বিরক্ত হয়ে বলল, সেদিনকে টেনে আনছ কেন? ছেড়ে দাও।

গঙ্গা চটুল গলায় বলল, আমি আনছি কি? চলে আসছে। এ্যাদ্দিন মাঝে জগদ্দল পাথর ছিল—তাই লজ্জা দুঃখ ঘেন্না ছিল। এখন তো আর আটকানো যাচ্ছে না রাহুল।

রাহুল বিকৃত মুখে বলল, সত্যি বড় অবাক লাগে তোমাকে। তুমি কী!

গঙ্গা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, তেলেভাজাগুলো গরম আছে। নাও—কই হাঁ করো—খাইয়ে দিই। মনে আছে? সেবার তোমার মুখে—রাহুলের চোখের দিকে তাকিয়ে সে অস্ফুট হেসে থামল। বলল, ঘাট হয়েছে। পিছনটা চাপা থাক্‌। কই হাঁ করো।

রাহুল সব্যঙ্গ বলল, ছোটমা তার কর্তব্য করছে না তো?

গঙ্গা পলকে বদলে গেল।…কে ছোটমা?

তুমি।

না। তোমার ছোটমা মরে গেছে।…গঙ্গা হিসহিস করে উঠল। আর রাহুল, সেই পিছনটা যদি তুমি চাপা দিতে বলো—তাহলে এই পিছনটাই বা আমি চাপা দিতে বলব না কেন? নিশ্চয় বলব। আমি তোমার ছোটমা ছিলুম না—কোনদিনও ছিলুম না! তুমি আমাকে ঘেন্না করতে হয় করো—কিন্তু ক্ষেপিও না।

গঙ্গার চোখে জল দেখে অবাক হল রাহুল। সে সংযত স্বরে বলল, আদিম যুগে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল। তখন মেয়েরাই ছিল নাকি সমাজের লিডার। তাদের হুকুমেই পুরুষকে ওঠবস করতে হত। লিডার মেয়েটি ইচ্ছেমত পুরুষ বেছে নিয়ে তার সঙ্গে বাস করত। সন্তান জন্মাত। মা—তার মানে সেই লিডার তখন করত কি জানো? সন্তানদের ভিতর শক্তিমানদের বেছে নিত—যৌন সংসর্গ করত। ফ্রি সেক্স কাকে বলে—হয়তো তোমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না গঙ্গা। কিন্তু আমরা যে অনেক দূরে চলে এসেছি।

গঙ্গা কী বুঝল কে জানে—সে শ্বাসাক্লিষ্ট স্বরে বলে উঠল, ছোটলোক তুমি। ইতর! অসভ্য!

তার নাসারন্ধ্র কাঁপতে থাকল। সে মুখ ঘুরিয়ে বসল। রাহুল বলল, মিছেমিছি গাল দিচ্ছ গঙ্গা। তুমি—আমার মনে হচ্ছে, সেই আদিম যুগ থেকে কী ভাবে চলে এসেছ এখানটায়। তোমাকে এখানে মানায় না।

গঙ্গা কিছুক্ষণ কোন জবাব দিল না। চায়ের কাপটা হাতে ধরা রইল। তারপর কঠিন আর ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে বলল, আমি তোমার মা নই। ভুলে যেও না কথাটা।

রাহুল বলল, তা ঠিক। কিন্তু গঙ্গা! তোমার সত্যিকার চেহারা কী আজও আমি জানতে পারলুম না। তুমি কী? কী তোমার ইচ্ছে? খুলে বলবে?

গঙ্গা ঘুরে তাকাল।…যদি বলি, তোমাকেই চাই! যদি বলি, তোমার ওপর রাগ করেই একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলুম—তোমাকে কত ঘেন্না করি, তা বলতে চেয়েছিলুম!

মিথ্যা কথা!…রাহুল গর্জে উঠল।…সব তোমার ছেনালি।

গঙ্গা চায়ের কাপটা মাটিতে ছুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। কাপটা সশব্দে ভেঙে গেল। সে অস্ফুট গর্জে বলল, আমার ছেনালি! ছেনাল বুঝি দ্যাখোনি তুমি। অরুণের বোনটা বুঝি খুব সতীসাধ্বী মেয়ে! বুকে বুক মিশিয়ে ছেনালপনা করতে তো কারো বাধে না!

রাহুল ক্ষিপ্রহাতে রিভলবারটা বের করল। তাক করল গঙ্গার দিকে। গঙ্গা চুপ করে গেছে। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে সে থরথর করে কাঁপছে। আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ মণিশঙ্কর এসে ঢুকেছে। সে চমকে উঠে চেঁচাল, সর্বনাশ! রাহুলবাবু, রাহুলবাবু! না—না—না।

রাহুল চাপা গর্জে উঠল, হ্যাণ্ডস আপ রাস্কেল! আজ দুটোকেই খতম করব।

থতমত খেয়ে মণিশঙ্কর দুহাত তুলে দাঁড়াল।

একটা কিছু ঘটে যেতে পারত। মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিতে কয়েকটা দণ্ডপল দরকার মাত্র—কিন্তু সানুও এসে পড়ল।

এসেই সে হো হো করে হেসে উঠল।…আরে, এ যে যাত্রার আসর একেবারে! এই রাহুল! রাখতো তোমার ইয়েটা। ওই টয়পিস্তল দিয়ে আসর জমে না।

রাহুল বেরিয়ে গেল।
সানু পিছনে গিয়ে বলল, কী হয়েছিল বলতো খুলে?
রাহুল করিডোরে দাঁড়িয়ে বলল, রিকশো ডাকছি। আপনি বাকসো তিনটে এনে দেবেন সানুদা?
সানু বলল, লে হালুয়া! এসেই ঝগড়াঝাঁটি। ঠিক আছে। রিকশো ডাকো।

সারারাত ঘুম আসছিল না রাহুলের। ঢিবির ওপর খোলামেলা জায়গায় অরুণের বাড়িটা। এ ঘরে জানালাও আছে অনেকগুলো। বাইরে গাছপালার শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছিল বাতাস বইছে উত্তাল। তালগাছের বিশাল শুকনো পাতাগুলো খড়খড় শব্দে নড়ছিল। অস্থিরতার আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল নিসর্গে। অথচ ঘরের ভিতর যেন এতটুকু বাতাস নেই। কোণের টুলে টেবিলফ্যান আছে। সেটা হঠাৎ অকেজো হয়ে পড়েছে। সেটাও রাহুলের মেজাজ খারাপের কারণ হতে পারে।
তাহলে দেখা যাচ্ছে সেই কালো ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুটি অরুণ নয়—সম্ভবত সানুর দাদা নীরেন চ্যাটার্জি। অরুণ নিতান্ত জিম্মাদার—স্টকিস্ট। যাই হোক, এবার অনায়াসে রাহুল একে একে তিনটি বাহুকে খতম করে রাজেনবাবুর কাছে গিয়ে পুরস্কার নিতে পারে। কিন্তু আবার তার মাথায় এল, সে ত্রাণকর্তা নয়। ময়নাচক হাইওয়ে নিরাপদ করার জন্য তার জন্ম হয়নি। রাহুল অন্যদিক থেকে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করল। মণিশঙ্কর আর গঙ্গার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক আছে। গঙ্গা তার পরলোকগত বাবার স্ত্রী। কাজেই মণিশঙ্করকে খুন করলে বাবার পক্ষে থেকে একটা নৈতিক কর্তব্য পালন করা হয়। তাছাড়া মণিশঙ্কর তাকে সন্দেহ করে। সে চায় না যে রাহুল এখানে থাকে। রাহুল আরও থাকবার চেষ্টা করলে এরপর হয়তো সে রাহুলকে সত্যি খতম করতে চাইবে। এদিকে গঙ্গা—গঙ্গারও বেঁচে থাকার অধিকার নাই। বাবার ওই ভয়ঙ্কর আত্মহননের জন্যে দায়ী গঙ্গা। রণ্টু—নিষ্পাপ দুধের বাচ্চা—তাকে বাবা একরকম খুনই করেছেন এবং তার কারণও গঙ্গা। অতএব গঙ্গার চরম শাস্তি পাওনা হয়েছে। বাকি রইল নীরেন চ্যাটার্জী। তার সঙ্গে রাহুলের কোন যোগাযোগ নেই। তাকে খুন করার উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ গঙ্গা বা মণিশঙ্কর না থাকলেও কিছু যায়-আসে না, নীরেন চ্যাটার্জিই যখন মূল খুঁটি—বদমাইসির র‍্যাকেট সমানে টিঁকে যাবে।·· গা ঘামতে থাকল রাহুলের। ছেড়ে দিল প্রসঙ্গটা। শীলার কথা ভাবল সে। সানুর কথা। সানু বিয়ে করবেই। হয়তো জোর করে বিয়ে করবে শীলাকে। রাহুল কি সত্যিসত্যি শীলাকে ভালোবাসে? তুমি কি শীলাকে ভালবাসো রাহুল? নিজের দিকে

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে।

তারপর কিছুক্ষণ বাইরের নিসর্গে মন রাখল। বাতাসের শব্দ শুনল একমনে। তারপর দেখল শেষ প্রশ্নটা তার মাথার ভিতর সাপের মত ফণা তুলে বসে রয়েছে। ভালোবাসা কি তাই—যা বেঁচে থাকে কিছুক্ষণের সংসর্গে, চিন্তাভাবনার অভ্যাসে, দেহের অভ্যাসে? দূরে গেলে যা মরে যায়! তখন বয়স কম—তবু গঙ্গাকেও ঠিক এমনি লেগেছিল। কত আপন কত কাছের এবং মোহসঞ্চারিণী! তারপর ঠিকই ভুলে গেল। প্রকৃত ভালোবাসা কী—তা হয়তো জানা হয়নি তার। যা সময় ও দূরত্ব—অর্থাৎ দেশ-কালের ধার ধারে না।…পরক্ষণে হাসল।—ফেট! তা অবাস্তব অসম্ভব। ক্ষণিকতার মধ্যেই ভালবাসার বেঁচে থাকা। তার আয়ু খুব ক্ষীণ। শীলা আর সে হয়তো যথানিয়মে ফের দূরে সরে যাবে পরস্পর। তারপর আর কোন কষ্টই হবে না কারো।

…হবে না? তাহলে কেন গঙ্গা তাকে এত উত্তেজিত করল—এখনও করে চলেছে সমানে? আর, গঙ্গাও কেন বারবার তার মতোই আজও স্মৃতির কথা তোলে—ভোলে না কিছু, ভোলেনি? সংস্কারের শক্ত পাঁচিল চুঁইয়ে এপার-ওপার শিশিরের ফোঁটার মতো ভিজে দুঃখ, টলটলে ঘৃণা, স্যাঁতসেঁতে সবুজ শ্যাওলার মতো হাল্কা কামনার রঙ চোখে পড়ছে পরস্পর? একদিন শীলার জন্যেও তাই হবে। যে পুরুষ বা মেয়ের দেহকোষগুলো প্রাণবন্ত শুধু নয়—সজাগ, প্রতি রোমকূপে একটা করে চোখ—চেতনার তীব্রতায় যারা আজীবন জর জর থাকে—প্রকৃতির অদ্ভুত ফসল সেইসব পুরুষ ও মেয়ের জীবনে কামনা যত সুখ আনে, তত আনে দুঃখ। রাহুলও তাদের একজন। হয়তো গঙ্গাও। রাহুল, তুমি ঠিক সেই রকম। গঙ্গা, তুমিও তাই।…রাহুল সিগ্রেট জ্বালল আবার। মাথার ভিতরটা শুকনো লাগছে। একটা অসহায় আকুতি তার ভিতর ছটফট করে উঠেছে। ভয়ঙ্কর শূন্যতার সামনে এসে তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে বারবার। কী করবে সে? রাহুল তুমি কী করবে?………

অবশেষে সে উঠে বসল। তক্তাপোষটা মচমচ করে কাঁপল। বালিশের নীচে থেকে রিভলবারটা বের করল। ময়নাচকে আসার রাত্রে একটা কার্তুজ খরচ হয়েছিল—বাকিগুলো পোরা আছে সেই থেকে। রিভলভিং কেসের সেই শূন্য খাপটা আর পূর্ণ করল না। দুটো কি তিনটে কার্তুজই যথেষ্ট। রাজেনবাবুর জন্যে নয়—নিজের জন্যে আর গঙ্গার জন্যেই এটা জরুরী।

……দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চুপি চুপি খালি পায়ে সে বেরুল। খালি গায়ে, পরনে প্যাণ্টটা মাত্র। অসম্ভব হাল্কা লাগছে শরীর। শুক্লপক্ষ সুরু হয়েছে সবে। চাঁদ অনেক আগে ডুবে গেছে। অন্ধকার আছে। সে হাইওয়েতে উঠল না—মাঠের দিকে নামল। অনেকটা ঘুরে একটা বাগান পেরিয়ে মুক্তকেশীর পিছনের দিকে পৌঁছল। খিড়কির দিকে ছোট্ট ডোবা। ডোবার পাড়ে পাঁচিল। পাঁচিলে লতা-পাতার ঘন বিনুনি। সামান্য শব্দ হল। সে উঠোনে নামল। বারান্দায় উঠল।

বারান্দার দিকে জানালাটা খোলা। ঘরে মৃদু নীলচে আলো টেবিলল্যাম্পের। গঙ্গা—মণিশঙ্কর! পাশাপাশি শুয়ে আছে। রক্ত ছলাৎ করে উঠল। রিভলবার তুলে প্রথমে লক্ষ্য করল গঙ্গাকে। ট্রিগারে চাপ দিল! কোন শব্দ নেই। ফের জোরে চাপ দিল! নিস্ফল। রিভলভিং কেসটা ঘুরিয়ে দিল আঙুলের চাপে। ফের ট্রিগার টিপল। আওয়াজ হল না। জ্যাম হয়ে গেছে! রাহুল থরথর করে কাঁপতে থাকল। গঙ্গা চোখ খুলেছে। তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ংকর হিংস্র চাহনি। অব্যক্ত আর্তনাদ বেরুল রাহুলের গলায়।···

চোখ খুলল সে। শীলা তার গায়ে চিমটি কাটছে। ধুড়মুড় করে উঠে বসল রাহুল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

শীলা হেসে বলল, গোঁ গোঁ করছিলে শুনে ছুটে এলুম। স্বপ্ন দেখছিলে? কী স্বপ্ন?

স্বপ্ন দেখছিল। বাইরে ভোর হয়েছে। ধূসর আলোয় পাখ-পাখালি ডাকছে। রাতের উদ্দাম হাওয়াটা আর নেই। ঘামে সারা শরীর চবচব করছে। ঠোঁট মুছে সে তাকাল শীলার দিকে। তারপর বালিশ তুলে রিভলবারটা বের করল। দেখে নিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর······

শীলা হাঁ হাঁ করে উঠেছিল। রাহুল জানালা দিয়ে অদূরে ইটের পাঁজাটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসল। বিস্ফোরণের আওয়াজে বুক কেঁপে উঠল শীলার। বারুদের কটু গন্ধ ভেসে এল। রাহুল একটু হেসে রিভলবারটা ফের যথাস্থানে লুকিয়ে ফেলল। বলল, পরীক্ষা করে দেখলুম। অনেকদিন চুপচাপ আছে তো! আর শীলা, মাঝে-মাঝে হঠাৎ ভয় হয়, ওটা অকেজো হয়ে পড়ল বুঝি। ওকে ছাড়া আমি কি বাঁচতে পারি?

অরুণ পর্দা তুলে লাল ঘুমঘুম চোখে বলল, শব্দ হল কিসের?

শীলা বলল, কে পটকা ফাটাল কোথায়। ঘুমোও গে না।

অরুণ চলে গেল। এইটেই ওর ঘুমের সময়। কাজেই এত ভোরে এই নির্জন জায়গায় কে পটকা ফাটাবে—এত হিসেবের অপব্যয় করা তার ইচ্ছে নয়। একটা কৈফিয়তই যথেষ্ট।

শীলা বলল, স্বপ্নটা কী বললে না তো? আর আচমকা গুলি ছুঁড়লেই বা কেন, শুনি?

রাহুল বলল, আচ্ছা শীলা—তুমি তো বেশ জানো আমার স্বভাব-চরিত্র। আমি খুনজখম করে বেড়াই। আমি—

শীলা বাধা দিয়ে বলল, যতক্ষণ চোখে দেখিনি—ততক্ষণ তোমাকে খুনী বলব কেন?

চোখে দেখাটাই তো সব নয়।

নয়। কিন্তু তোমার মধ্যে খুনীর আদল নেই। তোমার স্বভাবে নেই।
কিন্তু এই রিভলবারটা কেন তাহলে ?
বারে! আমার একটা সখের ছুরি আছে। তাতে কী প্রমাণ হয় ?
শীলা, অত সরলতা ঠিক নয়। চেহারায়-স্বভাবে সবকিছু ধরা পড়ে না মানুষের।
তর্ক থাক! স্বপ্নটা কী বলো শুনি।
তার আগে অন্য একটা কথা শোন, শীলা। যদি বলি, আমি এখানে এসেছিলুম একজন ভাড়াটে খুনী হিসেবে! এসেছিলুম তিনজন মানুষকে খুন করতে। কিছু পুরস্কারের লোভে!
শীলা ঠোঁট উল্টে বলল, আমি বিশ্বাস করিনে।
আমার কথায় একটুও মিথ্যে নেই, শীলা। সত্যি বলছি—বিশ্বাস করো।
ধরো, করলুম। কাদের খুন করতে এসেছো? কে তারা ?
মণিশংকর ঘোষ, মুক্তকেশী রায় ওরফে গঙ্গা আর নীরেন চ্যাটার্জি।
যাঃ! কেন ?
ওরা হাইওয়ে রাহাজানির তিনটি মূল খুঁটি।
তুমি পুলিশের লোক নাকি? আই বি এজেন্ট ?… শীলা খিলখিল করে হাসল।
না। বলেছি তো আমি একজন ভাড়াটে খুনী।
তা খুন করছ না কেন? হাত কাঁপছে ?
রাহুল একটু ঝুঁকে পড়ল।… সেটাই সমস্যা। ধরো যদি সত্যি কাজটা করেই ফেলি—তুমি, শীলা—তুমি কি আমাকে তারপরও ভালোবাসতে পারবে? ঘেন্না করবে না ?
শীলা নিষ্পলক তাকিয়ে রইল তার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আস্তে আস্তে বলল, ওকথার কী জবাব দেব? বরং আমার একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি ছাড়া কাকেও বলা যাবে না। আজ সারারাত জেগে ঠিক করলুম, আমি এখান থেকে চলে যাব। সবাইকে লুকিয়ে চলে যাব। আমি জানি, তুমি কথাটা কাকেও বলবে না। তাছাড়া—তোমাকে বললুম, পাছে কিছু ভুল বোঝো আমাকে।
রাহুল চমকে উঠে বলল, কোথায় যাবে ?
আপাতত বেথুয়াডহরি। বাবার বাড়িটা আছে। একটা লোক দেখাশোনা করছে। সেখানেই উঠব। বউদির অসুখ বলে এ্যাদ্দিন ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আমাকে পালাতেই হবে।
রাহুল একটু চুপ করে থেকে বলল, অরুণদা একটু বিপদে পড়ে যাবে হয়তো।
শীলা ধরাগলায় বলল, দাদা আমাকে এবরকম ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে। লোকটা হয়তো অসৎ, অনেক দোষত্রুটি আছে—কিন্তু ও যা করেছে, কেউ করে না। সেইজন্যেই কষ্ট হয়। কিন্তু আর সম্ভব নয়। আমার জীবনটা কেন এমনি করে তার জন্যে নষ্ট করে ফেলব ?

রাহুল চুপ করে রইল।

শীলা ম্লান হেসে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি এসে আমাকে ভীষণ লোভী করে ফেলছ হয়তো। কত অসম্ভব স্বপ্ন দেখছি। কত অদ্ভুত সব আশা!

রাহুল তার একটা হাত ধরল। বলল, আমারও তাই, শীলা। তোমার মতো। স্বচ্ছন্দে সহজভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে। অথচ···

শীলা মুখ তুলল।···অথচ কী?

কোন উৎসাহ পাইনে। সব মনে হয় উদ্দেশ্যহীন। কেন এমন হচ্ছে, কে জানে!

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ থাকার পর শীলা বলল, ইচ্ছে হলে তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পাবো। তোমাব যদি ভালো লাগে!

রাহুল হাতটা ছেড়ে দিল। বলল, দেখি। তুমি কখন যাবে, ভাবছ?

যেকোন দিন—যেকোন সময়। কাটোয়ায় একটা ট্রেন পাব সেই সন্ধ্যার দিকে। বহরমপুর হয়ে যেতে হবে। দুপুরেব ট্রেন ধরা অনিশ্চিত। বাসেই ঘণ্টা চার লেগে যায়।

বরং নবদ্বীপ হয়ে গেলে তো সোজা!

তাও দেখব।

রাহুল শুকনো হাসল।···অরুণদা আমাকে দুষবে না তো? ভাববে না তো যে আমিই তোমাকে ফুসমন্তর দিয়েছি?

শীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সে তুমি সামলে নেবে। বসো চা আনি। মুখটুখ ধুয়ে ফেলি ততক্ষণ। ভেবে নাও কথাটা। আজ পুরো দিন আর রাত্রিটা অব্দি তোমাকে ভাববার সময় দিলুম। আলটিমেটাম।···নীরব হেসে চলে গেল সে।

রাহুল বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এমনি করে পালিয়ে যেতে তার বাধছে। না—স্ক্যাণ্ডালের জন্যে নয়। বাধাটা অন্য কোথাও। কালো ত্রিভুজটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তার। চেষ্টা করেও ওটা ভুলে থাকা যায় না। প্রশ্নটা কী অদ্ভুত! এত সাজানো গোছানো ঝকঝকে স্বপ্ন সে এর আগে একবারও দ্যাখেনি। একটুও টের পায়নি যে আগাগোড়া সবটুকুর পিছনে একটা নিপুণ কারিগরি রয়ে গেছে।

কিন্তু স্বপ্নটা যদি বাস্তব হত, হাল্কা হতে পারত কি? স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারত সে? আবার একটা কালো ত্রিভুজ তার সামনে ভেসে এল। শীলার চলে যাওয়াটা ঢেকে ফেলল।···

অস্থির রাহুল দু তিনবার চিঠিটা লিখবার চেষ্টা করল আর ছিঁড়ে ফেলল। রাজেনবাবুকে লিখতে চাচ্ছিল সে।···আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাদের সেই মারাত্মক কালো ত্রিভুজের খোঁজ আমার হাতে। কিন্তু আমি পারছিনে। বড্ড ক্লান্ত। একফোঁটা শক্তি নেই আর। আজ স্বপ্ন দেখলুম, রিভলবারটা জ্যাম

হয়ে গেছে। এ কাজ আমার নয়। তিনটি নাম দিচ্ছি। এবার নতুন কাকেও পাঠান—যে খুব শক্ত-সমর্থ, বিবেচনাহীন, বেপরোয়া মানুষ। নয়তো আপনাদের আইনের সাহায্য নিন। নামগুলো হচ্ছে···

শেষবার ছিঁড়ে ফেলে সে উঠল। হার স্বীকারের সংকোচে আড়ষ্ট হল সে। ভেবে দেখল, অন্য কোথাও হলে কাজটা করতে একটুও পিছপা হত না—হাত কাঁপত না। কিন্তু ময়নাচকে এসে সে আজ ভারি অসহায় হয়ে পড়েছে যেন। শুধু মনে হচ্ছে, কী লাভ তার? বারবার বাবার কথাটা মনে ভাসছে—তুমি তো ত্রাণকর্তা নও! অথচ এখান থেকে প্রতিশ্রুত রক্ত না ছুঁয়ে চলে যাওয়া মানে ভীতুর মতো, কাপুরুষের মতো লেজ গুটিয়ে পালানো। কাকে তার এত ভয়? গঙ্গাকে? গঙ্গা···গঙ্গা··· গঙ্গা! কালো ত্রিভুজ! মুক্তকেশী গঙ্গা! শব্দগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ভীমরুলের মতো তার মগজকে ঘিরে ধরল।

তখন সে বেরুল। প্রস্তুত হয়েই বেরুল। দেখে নিল, স্বপ্ন না বাস্তব এই বেরিয়ে পড়া—এই ছোট্ট রাস্তাটা, গাছপালা, ঘরবাড়ি, হাইওয়ে, খরদুপুরের নিঃঝুম হয়ে ওঠা ঝিম ধরা ময়নাচক আর মাথার ওপর গনগনে সূর্য, রোদের ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, ঝাঁঝাল হাওয়া, হিংস্র দহনজ্বালা।

হাইওয়েতে উঠে চমকে দাঁড়াল হঠাৎ। সানুকে মনে পড়ে গেল। একবার যাবে তার কাছে? সব খুলে বলবে? পরক্ষণে মনে হল, সেটা ঠিক হবে না। সানুর ব্ল্যাকমেলিং বন্ধ হয়ে যাবে—তাই সানু এতে একটুও সাহায্য করবে না তাকে। উপরন্তু খাম-খেয়ালী গোঁয়ার সানুর হাতেই তার বিপদ ঘটতে পারে। তাছাড়া সবচেয়ে মারাত্মক কথা—সানুর দাদাও তো তার অন্যতম শিকার! না—এটা ভীষণ ভুল করা হবে।

রোদের তাপে গা জ্বালা করছিল যেন। সামনের ডিসপেন্সারিটার পাশ দিয়ে একটা গলিপথ বেরিয়ে গেছে পুরনো ময়নাচক গ্রামের দিকে। দুধারে ঘন বাঁশবন। সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। সাত বছর পরে রাস্তাঘাট অনেক ভুলভাল হতে পারে। তবে যদ্দুর মনে পড়ছে, বাঁশবনটার শেষে একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে। উঁচু পাড়গুলো ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ভরতি। পাড় ধরে কিছু পশ্চিমে এগোলে কয়েকটা পোড়ো বাড়ি পড়তে পারে সামনে। ভবানীবাবুদের জ্ঞাতিদের বাড়ি। তারা সব কে কোথায় রয়েছে। ধ্বসে গেছে বাড়িগুলো। ডাইনে মন্দির, বাঁয়ে একটু এগোলে গঙ্গার বাড়ির পিছনের ডোবা পুকুরটা। খুব পরিষ্কার দেখা হয়নি—তাহলেও পিছনটা নির্জন। স্বপ্নের মধ্যে ওদিক দিয়েই গিয়েছিল সে। বাস্তবে কী ঘটবে জানা নেই। তবু চেষ্টা করা যেতে পারে। রাতের দিকে হলে অবশ্য এত ভাববার কিছু ছিল না। কিন্তু আর অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই।

হঠাৎ মনে হল, অমন করে লুকিয়ে যাবার দরকার কী? হাইওয়ে দিয়েই তো বুক ফুলিয়ে গঙ্গার কাছে যাওয়া যায়। সেদিন হঠকারিতার বশে যাই ঘটুক, গঙ্গা তাকে

অস্বীকার করবে না—খুসি হবে। কারণ, গঙ্গা তাকে এখনও ভোলেনি। নির্লজ্জা গঙ্গা যেন সাত বছর আগের দিনগুলোকে টেনে এনে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চায়—অব্যাহত রাখতে চায়। সুতরাং একটুখানি অভিনয় করতেই হবে। গা ঘিনঘিন করবে। সংস্কারে বাধবে। হৃষিকেশের শরীরের ছায়া পড়েছিল যার উপর, তাকে মা না ভাবুক, ভাবতে না পারুক—তবু সংস্কার বলে একটা কঠিন সত্য আছে। তাকে হটিয়ে দিতে পারবে তো?…

'মুক্তকেশী'র সামনে এসে অবাক হল সে। হোটেল বন্ধ। ব্যাপার কী? অত পুলিশ কেন ওখানে? উল্টোদিকের দোকানগুলোতে জায়গায় জায়গায় ভিড় জমে রয়েছে। সবাই তাকিয়ে আছে 'মুক্তকেশী'র দিকে। চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে। সে পিছিয়ে এল উল্টোদিকের চায়ের দোকানটায়। সেই সময় সানুর কণ্ঠস্বর কানে এল।…এই যে রাহুল এখানে!

সানু চায়ের দোকানের ভিতর বসে আছে। পাদুটো টেবিলে তুলে বুকে দুটো হাত বেঁধে দুলছে সে। রাহুল কাছে গিয়ে বলল, কী হয়েছে সানুদা?

সানু তার দিকে তাকাল না। চোখ বুজে জবাব দিল, তোমার ছোটমা গঙ্গারাণী খুন হয়েছে।

রাহুলের মনে হল, তার শরীরটা কতক্ষণ—হয়তো অনিশ্চিত অজ্ঞাত দীর্ঘ সময় ধরে একটা অতলস্পর্শী শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে অবশেষে কোথায় এসে ঠেকল। অনুভূতিহীন নিঃসাড় বোধশূন্য হয়ে সে তাকিয়ে আছে সানুর দিকে। সানু তখনও চোখ খোলেনি। দুলছে আর দুলছে।

সানু নির্লিপ্ত স্বরে ফের বলল, কখন খুন হয়েছে, কেউ টের পায়নি। বিছানায় স্বাভাবিক ভাবে মানুষ যেমন শুয়ে থাকে, শুয়েছিল। ঘোতনা মেঝেয় শোয়, ও থাকে খাটে। ঘোঁতনা উঠে গেছে। চা এনে ডেকেছে। সাড়া পায়নি। মাথার কাছে চা রেখে চলে গেছে—রোজ যেমন করে। তখনও কিছু সন্দেহ করে নি ব্যাটা। ইদানীং গঙ্গা নটার আগে ঘুম থেকে উঠত না। হোটেলের দিকে আসত দশটায়—আপিস যাওয়ার মতো। তারকবাবুর ওপর হোটেলের ভার পড়েছিল—তোমার বাবার অসুখের পর থেকে। বুড়োটা বিশ্বাসী লোক। খুব একটা দরকার না পড়লে গঙ্গারাণীকে ঘাঁটাত না। ভাবত, শোকটোক পেয়েছে বড্ড—সামলে উঠুক।

…ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটু হেসে সানু বলতে থাকল।…দশটা বেজে গেল, উঠল না—তখন ঘোঁতন পায়ে হাত দিয়ে ঠেলেছে। পা ভীষণ ঠাণ্ডা আর হলদে—ছোঁড়াটা পুলিশকে বলছিল, শুনলুম। হঠাৎ তার চোখ চলে যায় বালিশে—মুখটা একপাশে গোঁজা। মাথায় হাত দিয়ে মুখ সোজা করতে গিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে। গলায় আঙুলের দাগ নীল হয়ে বসেছে। গলা টিপে মেরেছে ওকে।

রাহুল অবশ জিভে কোনমতে উচ্চারণ করল, কে মেরেছে?

আমি নই।···বলে সানু তার দিকে একবার তাকাল—ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। হাসিটা ম্লান—অপরিচ্ছন্ন।···গঙ্গারাণী ছিল আমার সোনার হাঁস। যাক্ গে—যে মরেছে, সে তোমাকেই সম্ভবত ট্র্যাপ করতে চেয়েছিল। কারণ কাল সন্ধ্যায় তুমি একটা কীর্তি করে বসেছিলে। এটা পুলিশ জানে না। আর জেনেও তাদের লাভ নেই। খুনীকে তারা ধরে ফেলেছে। ঘোঁতনার বুদ্ধি আছে। মণিশংকর কাল রাতে—অনেকটা রাত তখন, গঙ্গাকে ঘুম থেকে তুলেছিল। ঘোঁতনের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। দুজনকে বিছানায় বসে কথা বলতে দ্যাখে। ঘোঁতন ফের ঘুমিয়ে পড়ে। এখানেই একটা মজার ব্যাপার আছে। যখন সকালে সে বাইরে বেরোয়, দ্যাখে দরজাটা খোলা আছে।···

সানু একটু চুপ করে থেকে বলল, তাহলেও হয়তো মণিশংকরের কিছু হত না। ও যা বদমাস, শেষঅব্দি তোমাকেই জড়াত। কিন্তু সে সুযোগ পেল না। কারণ—রিয়েলি, ইট ইজ কমপ্লিটলি আনবিলিভেবল। আমার দাদাকে এ ব্যাপারে উৎসাহী দেখলুম ভীষণ। মাইরি, দাদারই স্ত্রীকে যেন মণিশংকর মার্ডার করেছে। উ রে হালুয়া! দাদাও গঙ্গারাণীর ভরাগাঙে ডুব দিচ্ছিল! দুচোখের দিব্যি, একটুও টের পাইনি। ভাবতুম—নিতান্ত কড়ির কারবার নিয়ে যোগাযোগ। আজ দাদার চেহারা দেখে তাক লেগে গেছে। ঝড়ো কাক যেন। বউদিকে একটু ইসারা দিলে যা লেগে যাবে, ভাবা যায় না! ··সানু খিকখিক করে হাসল।

রাহুলের ভিতর হঠাৎ কোত্থেকে একদমক চাপা দীর্ঘ অবরুদ্ধ কান্নার চাপ এসে গেছে—কিসের এ কান্না—কেন—তা সে জানে না; একে সামলাতে সে দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। তার ভিতর দাপাদাপি সমানে চলতে লাগল তবু। তাব মনে হল—এক্ষুনি কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে বমি করার মতো উদ্দাম না কাঁদলে সে বুক ফেটে মরে যাবে। এ কি তার পরাজয়ের দুঃখ, নাকি গঙ্গার জন্যে শোক? সে বুঝতে পারল না।

সে উঠে দাঁড়াল। একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল হতভাগিনী গঙ্গাকে। সে বলেছিল, পায়ের নিচে তোমার মাটি দরকার। মাটি দেব তোমাকে। আরও পাঁচটা মানুষের মতো ঘরকন্নার সুখ নাও, রাহুল। কেন অমন করে জীবনটা নষ্ট করবে তুমি?··· হয়তো তার কথায় সত্যের আবেগ ছিল, কামনাটাও ছিল শুদ্ধ আর যথার্থ, আন্তরিকভাবেই কথা বলেছিল গঙ্গা। যদি রাহুল থেকে যেত তার কাছে—গঙ্গার ভাষায় 'শুধু একজন এবাড়ির মানুষ' হয়ে থাকত—তাহলে গঙ্গাকে সে বাঁচাতে পারত। হয়তো কালো ত্রিভুজ থেকে সরিয়ে আনতে পারত। অন্তত এই নিষ্ঠুর অসহায় মৃত্যুবরণ করতে হোত না তাকে।

কিন্তু কেন তাকে খুন করল মণিশংকর? নীরেন চ্যাটারজির সঙ্গে কি গঙ্গার দেহটা নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়েছিল গোপনে? অন্তত সানুর কথায় তার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

রাহুল উঠে দাঁড়িয়েছে দেখে সানু বলল, রাহুল! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হল। একটা জরুরী কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

রাহুল বলল, বলুন।

উঁহু। এখানে বলার মতো নয়।···সানু পা নামিয়ে সোজা হল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, আজ সন্ধ্যার পর দুজনে একবার বেরোব। তুমি তৈরি থেকো। ডেকে নেবো অরুণের ওখান থেকে। কোথাও যাবে না কিন্তু। ভীষণ জরুরী ব্যাপার। অলরাইট?

রাহুল অন্যমনস্কভাবে বলল, আচ্ছা।

সে বেরিয়ে পড়ল। পথে আসতে আসতে তার মনে হল, সানুকে অমন অপ্রসন্ন আর নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন? সোনার হাঁসের একটা মারা পড়ল, অন্যটা পুলিশের হাজতে—তাই কি?

অরুণ সাইকেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে আসছিল। রাহুলকে দেখে নামল সে।··সর্বনাশ! তোমার কোন ঝামেলা হয়নি তো? এইমাত্র শুনলুম সব। ভয় পেয়ে গেলুম—তোমার আবার··

রাহুল শুকনো হেসে বলল, না। আমার কী হবে? মণিশংকরকে ধরেছে।

অরুণ পাশেপাশে হেঁটে আসছিল। বলল, হ্যাঁ—এ আমি জানতুম। নীরেনবাবু ইদানীং গঙ্গার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেছিল। কানাঘুঁষো শুনছিলুম অনেক। এই তো গতকাল ওঁকে ঠাট্টা করে বলছিলুম—দাদা, আপনার পলিটিকাল কেরিয়ার আছে, সম্মানী মানুষ—দেখবেন যেন···নীরেনবাবু বলল, ধ্যাৎ! মণিশংকর রটাচ্ছে নাকি। ওর কি মাথা খারাপ হল অরুণ? যে ডালে বাসা, সেই ডাল কাটতে বসেছে কেন?···যাক্ গে বাবা। আমি কাল সব ফয়সালা করে ফেলেছি, রাহুল।

রাহুল বলল, কিসের?

অরুণ জবাব দিল, তুমি কতক জানো, কতক জানো না। সেই চোরা মালপত্তর হে। সব দায় খালাস করেছি। আর বাবা কারো সাতে পাঁচে নেই আমি। এবার সানু আসুক না টাকা চাইতে—সোজা বলে দেব যা পারো করো—আর একপয়সাও দেব না। আমি চোর, না চোরের দাদা! তাছাড়া ওর দাদা নীরেনবাবুও বলেছে, আর এক পয়সা যেন না দিই ওকে। নীরেনবাবু জানত না সানু আমার কাছে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে। আর একটা মজার কথা সানু ওঁকেও দাদা বলে রেহাই দিত না, জানো? ব্ল্যাকমেইল করে আসছিল। নীরেনবাবু আর আমি কাল দুজনে মিলে একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংএ এসেছি। সানুকে ঠাণ্ডা করতে হবে।

রাহুল চমকে বলল, অ্যাঁ?

হাসল অরুণ।···চমকে উঠছ কেন? খুনটুন নয়—ভেবে দেখলুম, শীলার বিয়ে তো দিতেই হবে। এখন সানুর দাদা নিজে যখন সানুর সঙ্গে বিয়ের কথা তুলল—তখন কথাটা ভাববার মতো। অতবড় বংশ, অমন ফ্যামিলি, অত রবরবা। সানু

বদমাস মাতাল বটে, নীরেনবাবু যা বললে, ঠিকই বললে—বউ ঝুলিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে সব। এমন চান্সটা ছাড়া ঠিক হবে না ভাই। তুমি কী বলো?

রাহুল বলল, হ্যাঁ—সে তো ভালই।

অরুণ সোৎসাহে বলল, এ খুব ভালো হল। ওর দাদা নিজে গ্যারাণ্টার রইল। তাছাড়া—আরেকটা ব্যাপার তুমি জানো না। সানুটা কী পাজি ভাবা যায় না। এ্যাদ্দিন বলছিল, বিয়ে করবে—তবে আজকালকার মেয়ে,—খিকখিক করে হেসে অরুণ বলল, শালা একটা বদ্ধ পাগল। বলে হেলথসার্টিফিকেট চাই! শীলা শুনলে ক্ষেপে যেত। তা—

রাহুল বলল, সেটা আর চায় না সানু?

না। ওর সুমতি হয়েছে। শীলার মতো সচ্চরিত্রা সরল মেয়েকে ভগবান রক্ষা করবেন না—এ হয় নাকি?

অনর্গল কথা বলতে বলতে অরুণ পথ হাঁটছিল। ইটখোলার কাছে এসে বলল, কী কাণ্ড! আমি তোমার সঙ্গে ফিরে আসছি যে! দেখছ? মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে। যাই—একবার তোমার ছোটমার ওখানে। কর্তব্য তো আছে একটা। তুমি গিয়ে ঘুমোওগে—যা গরম পড়েছে! ফ্যানটা সেরে এনেছি দ্যাগ গে। আরাম পাবে।

অরুণ চলে গেল।

বাহুল বন্ধ দরজায় কড়া নাড়লে শীলা লাল চোখে দরজা খুলে দিয়েই রাহুলের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বোঝা গেল, ওখানেই সে ঘুমোচ্ছিল এতক্ষণ। ফ্যানটা জোরে ঘুরছে টুলের ওপর। কাত হয়ে শুল সে। চুলগুলো উড়ে মুখ ঢেকে ওপাশে নেমে যাচ্ছে ঝাঁকেঝাঁকে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথাটা ঘুরছে এতক্ষণে। দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। শরীর টলছে। সে ভিতরের দরজাটা বন্ধ দেখল এদিক থেকে। তখন শীলার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। ডাকল, শীলা!

শীলা সাড়া দিল না দেখে সে তার বুকের উপর ঝুঁকে ফের ডাকল, শীলা কি সত্যি ঘুমুচ্ছ?

উঁ?

খবরটা শুনেছ?

হুঁ।

তোমার কি খুব ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

কী মুসকিল! দিনদুপুরে এত ঘুম কেন?…রাহুল ওর কাঁধে হাত রাখল।…শীলা, আমিও ঘুমুবো। রোদে ঘুরে ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।

শীলার সাড়া না পেয়ে সে ঘরের ভিতরটা দেখে নিয়ে ফের বলল, একটা মাদুরটাদুর নেই এ ঘরে ?

শীলা জড়ানো স্বরে বলল, শোও না এখানে।…তারপর একটু সরল সে।

রাহুল বলল, শীলা, আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। ওঘরে বউদি আছেন। নেত্য আছে।

শীলা তবু চুপ।

রাহুল একটু হেসে বলল, শীলা, আরও খবর আছে। অরুণদা এইমাত্র বলল, সানুর দাদাও তোমার সঙ্গে সানুর বিয়েতে খুব উৎসাহী হয়েছে। অরুণদা ভারি খুসি। এ বেচারাকে যে কথাটা দিয়ে বসেছিল, তা ভুলেই গেছে। কাজেই, এভাবে তোমার পাশে শোওয়া যায় না। আগুন ধরে যাবে শীলা।

শীলা বিরক্তভাবে আগের মতো জড়ানো ভারি গলায় বলল, জানি বাবা জানি। বড্ড বকতে পারো। শোও চুপচাপ।

রাহুল একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে। জিভ থেকে বুক অব্দি শুকনো লাগছে। একটু জল খাওয়াতে পারো ?

শীলা সামান্য ঘুরল। চোখ খুলল না। ঠোঁটে নিশ্চুপ হাসির আভায় ধরা পড়ছিল। সে দুহাত বাড়িয়ে রাহুলের গলাটা জড়াল। তারপর ওর মুখটা নিজের মুখের কাছে টেনে নিল। ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ফিস ফিস করে বলল, জলতেষ্টা —না, অন্য কিছু ?

রাহুলের কিছু ভাল লাগছিল না। শীলার নিশ্বাসের গন্ধ, তার বুকের চাপ— অনিবার্য যৌনতার আক্রমণ—অথচ রক্ত যেন জমাট হয়ে গেছে শরীরে। তার মনে হল, এখন এসব অশোভন—ভারি অসঙ্গত। প্রস্তুতিহীন আকস্মিক উপদ্রব। কিন্তু একটা গভীরতর ভিন্ন প্রকৃতির আবেগ তার বুকের মধ্যে আস্তে আস্তে দুলে উঠেছে। শান্তির আশ্রয়ের জন্যে আত্মা মাথা কুটতে সুরু করেছে। শূন্যতার জ্বালা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোন কঠিন মাটি—যে মাটিতে ছায়া আছে, তার পক্ষে কাম্য হয়ে উঠেছে। আর সেই প্রবলতম কামনা তার মুখটা শীলার ঠোঁট থেকে শীলার বুকের দিকে নিয়ে গেল। ব্লাউজের বোতামটা হিংস্রহাতে খুলে ফেলে সে তার দুটি কুমারী স্তনের মধ্যে শিশুর মতো মাথা ঘষতে থাকল।

কতক্ষণ পরে শীলা চমকে উঠেছে। দুহাতে রাহুলের মুখটা তুলে ধরে সে দেখল, এই দুর্দান্ত তরুণ খুনী যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর নিষ্ঠুর আঘাতে রক্তাক্ত—কারণ তার চোখ এবং গালে ওই ভিজে ছোপগুলো অশ্রু বলে মনে হল না শীলার— সেগুলো হয়তো রক্তই।

শীলা শুধু বলতে চাইল—আমি আছি। তার চোখের ভাষায় ধরা পড়ছিল ওই কথাদুটো। টেবিলফ্যানটা উদ্দাম ঘরঘর ঘূর্ণীর একটানা শব্দে নিঃঝুম দুপুর-বেলাটাকে কী একটা অর্থপূর্ণ সুরে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

দুজনে পরস্পরকে অশেষ প্রত্যাশায় আঁকড়ে ধরে রইল।

সেই দুপুরেই ওরা ঠিক করে ছিল—দুজনেই চলে যাবে ময়নাচক থেকে। সানুর সঙ্গে জরুরি কথাটা সেরে ফিরে আসবে রাহুল। শুয়ে পড়বে সকাল সকাল। রাত গভীর হবে। অরুণ দেরীতে ঘুমোয় বলে শীলা অপেক্ষা করবে। তারপর এ ঘরে চলে আসবে। দুজনে বেরিয়ে পড়বে। পথে যেতে যেতে কোথাও না কোথাও ট্রাকে একটা লিফ্‌ট পেয়ে যাবে। রাহুলের কাছে টাকা নেই—শীলার কিছু আছে। আপাতত ওতেই বেথুয়াডহরি পৌঁছন যায়। পৌঁছতে পারলে একটা ব্যবস্থা হবেই।

সানু এল ঠিক সন্ধ্যায়। মুখটা গম্ভীর। একটু অবাক হয়েছিল রাহুল। কিন্তু পরে ভাবল, হয়তো দু দুটো সোনার ডিমদেওয়া হাঁস হাতছাড়া হয়ে বেচারা মনমরা হয়ে গেছে। সে পায়ে হেঁটে এসেছিল। বলল, এস।

রাহুল তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিল। কী কথা বলবে তাকে সানু? হয়তো হাইওয়ের রাহাজানি—কিংবা অরুণের বামাল সামলানো নিয়ে কোন নতুন তথ্য। হয়তো সে তাকে দলে টানবে। রাহুলের মন চঞ্চল। সে হাতড়াচ্ছিল।

অবশ্য সে যখন চলেই যাচ্ছে এখান থেকে, তখন ওইসব কথা শোনার জন্যে সানুর সঙ্গে যাওয়াটা অনর্থক। রাহুল টের পেল—কৌতূহল আর চাঞ্চল্যটার উৎস হয়ত অন্যখানে। শীলার সম্পর্কে কি কিছু বলবে সানু?—হ্যাঁ—সেটাই জেনে রাখা খুব জরুরী মনে হচ্ছে। নিরাপদ ভবিষ্যত নিয়ে ময়নাচক থেকে শীলার সঙ্গে চলে যাওয়া দরকার। তা না হলে আবার হয়তো জড়িয়ে পড়বে বিশৃংখলায়—রক্তে হিংসায় জিঘাংসায়।

রাহুল বেরুল। আকাশে নবমীর চাঁদ। ধুলো মাখানো স্তিমিত জ্যোৎস্না—আলো আছে অথচ সব ছায়াময় মনে হয়। পথে কথা বলছিল না সানু। রাহুল জিগ্যেস করল, কোথায় যাচ্ছি সানুদা?

সানু জবাব দিল, বেশিদূরে নয়। মাঠের দিকে।

ব্যাপারটা কী বলবেন তো?

ইনটারেসটিং। তোমার 'টিপস্‌টা এনেছ তো?'

রাহুল দাঁড়াল।···কিন্তু ওটা কী হবে?

সানু তার হাত ধরে টানল।···নিরস্ত্র বেরোতে নেই।

ফের কিছুদূর চুপচাপ হাঁটল দুজনে। হাইওয়েতে উঠে ব্রীজ যেদিকে—তার উল্টো দিকে চলতে থাকল সানু। তারপর বলল, রাহুল, তোমার মালফাল খাওয়া অভ্যেস নেই?

রাহুল বলল, তেমন না। সামান্য।
আজ আমরা মাল খাব।
আমার বমি হয়ে যায়, সানুদা। থাক্ গে।
পাগল! জমবেই না তাহলে।…সানু আবগারী দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। …দিশি না—বিলিতিই। মদনটা বিলিতিও রাখে লুকিয়ে। সব শালা চোরের রাজত্ব হে। ওয়েট—আমি আসছি।
রাহুল একটু চিন্তিত হল। ঝোঁকের বসে বেশি খেয়ে ফেললে রাতের প্রোগ্রামটা ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া শীলার পক্ষে সহনীয় না হতেও পারে। মেয়েরা নাকি খুনীর সঙ্গে শুতে ভয় পায় না—মাতালকে ভয় পায়। খুনীর চেয়ে মাতালকেই ঘেন্না করে বেশি।
প্রকাশ্যে বোতলটা দোলাতে দোলাতে নিয়ে এল সানু। অন্য হাতে দুটো মাটির ভাঁড়, একটা ঠোঙায় কিছু চাট। বলল, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট—শালা এ্যাদ্দিন বিয়ে করলে তোমার মতো দু-দশটা ছেলের বাবা হতুম। তবু তুমি আমার পেয়ারের ইয়ার। অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল, তোমাকে নিয়ে একটু ফুর্তি করি। হচ্ছিল না। চলো।…
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রাহুল। খামখেয়ালি সানুর আসলে মনটা কেমন দমে গেছে—তাই মৌজ করতে চায়। এটা স্বাভাবিকও। গঙ্গার বীভৎস লাসটা দেখার পর বেচারা মুষড়ে পড়েছে। রাহুল দেখলে, সেও মুষড়ে পড়ত।
কিছুদূরে হেঁটে বাঁদিকে আগাছার জঙ্গলে ভরা পোড়া জমিতে নামল সানু। রাহুল তাকে অনুসরণ করল। জায়গায়-জায়গায় বেশ ফাঁকা আছে। একটা কাছিমের খোলের মতো ডাঙা জমি। অজস্র ফণিমনসা আব কেয়াঝোপ। ফাঁকা জায়গাগুলোতে কোথাও শুকনো কিছু ঘাস, কোথাও খোলা শক্ত মাটি জ্যোৎস্নায় চকচক করছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এদিক-ওদিক ঘুরে জায়গা পছন্দ করল সানু। তারপর একখানে বসে বলল, এখানটাই ভালো। অল্পস্বল্প ঘাস আছে—পাছা আরাম পাবে।
আরাম করে বসে সে দাঁত দিয়ে ছিপি খুলল। ভাঁড় দুটো ভরতি করল। তারপর বিনাভূমিকায় একটা ভাঁড় তুলে, ইসারায় রাহুলকেও নিতে বলে, সে অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করল—'চিয়ারস!' গিলে ফেলল মদটুকু। বিকৃত মুখে বলল, র খাওয়াই ভালো। জল মেশালে ব্যথা বাজে।…আরে, কী হল?
রাহুল ভাঁড়টা হাতে নিয়ে ভাবছিল। এবার চোখ বুজে গলায় ঢেলে দিতেই হু হু করে জ্বলে উঠল বুক অব্দি। দম আটকে যাবার উপক্রম হল। কাসতে কাসতে চোখে জল এসে গেল তার। তারপর হাসতে লাগল।
ভালো না?…সানু বলল সিগ্রেট জেবলে। তার পায়ের কাছে দুটো চারমিনারের প্যাকেট পড়ে আছে।…নাও, সিগ্রেট খাও। মৌজ আসবে।

রাহুল নীরবে সিগ্রেট নিল। ঠোঙা থেকে ভিজে ছোলা তুলে মুখে দিয়ে সিগ্রেট জ্বালল সে। বাতাস বইছিল—কখনও দমকে-দমকে কখনও মৃদু। সামান্য দূরে গাছপালা আর আশেপাশে ঝোপঝাড়গুলো দুলছিল। সাদা কেয়াপাতার বড় ঝাড় রহস্যময় ভঙ্গীতে কাঁপছিল—চকচক করছিল।

সানু বলল, আমি খুব বেশি খাইনে আজকাল। একসময় ভীষণ খেতুম। পরে ভেবে দেখলুম, রাজ্যেব লোক স্ফূর্তি করতে পায় না। গরীবগুরবো ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে চাদ্দিকে—শালা এ কোন দেশে বাস করছি! ওদের জন্য একটা কিছু করা দরকাব।

রাহুল সকৌতুকে বলল, কী করলেন শেষ অব্দি?

সানু বোতল থেকে ফের ভাঁড় ভরে নিয়ে বলল, হল কই? নানান ঝামেলা আমার। জানো? বরাবর ইচ্ছে ছিল, গরীবের ভালো করব। ওদের হয়ে লড়ব। দরকাব হলে দাদার সঙ্গে যুঝব। ধুস! কী সব গোলমাল হয়ে গেল।

রাহুল বলল, সে কি একা আপনার বলে সম্ভব সানুদা? পার্টি করতে হয় তাহলে। মদটা গিলে সানু খোত খোত করে উঠল—মুতে দাও। ছ্যার ছ্যার করে পেচ্ছাপ করে দাও। সব চেনা আছে। সব নীরেন চ্যাটা'ব দলে। চ্যাটা! কী পদবীখানা দিলুম দেখছ?

রাহুল আর খেতে পারবে না। ওইটুকুতেই তাব মাথাটা চনমন করছে। উত্তেজনা অনুভব করছে সে। ভাবছিল, কীভাবে এড়ানো যায়। কিন্তু সানু সেদিকে তৎপব। তার শূন্য ভাঁড়টা ভবে দিয়ে বলল, হাত চালাও। মৌজ না এলে কিস্যু হবে না। ব্রেন খোলতাই কবো আগে। নাও, হাত ওঠাও।

অনিচ্ছাসত্বেও তাকে ফের গিলতে হল। ক্ষিপ্রহাতে ছোলা তুলে চিবুতে থাকল সে। এত তেঁতো বিস্বাদ জিনিস খেয়ে মানুষ কী স্ফূর্তি পায়! কিন্তু ততক্ষণে মদের কাজ অল্প অল্প শুরু হয়ে গেছে। সে ভাবল, আজ কী পরিপূর্ণ আনন্দের দিন তাব। শীলার সঙ্গে সে চলে যাবে। শীলা আছে তার। আব এই তুখোড় আশাবাদী লোভী সানু চ্যাটারজি বুককপাল চাপড়ে হয়তো কাঁদবে। রাহুল খিকখিক করে হেসে উঠল। বলল, সানুদা, মাগীটাকে দেখেছিলে নাকি?

সানু বলল, কোন মাগী?

মুক্তকেশীর খানকিটাকে?

হ্যাঁঃ। তবে কষ্ট হল বড্ড। আমি শালা কত খুনখারাপি করেছি—তবে মেয়েমানুষ মারিনি কখনো। তোমার দিব্যি। দরকারই হয়নি। কোন শালী তো সানু চ্যাটারজির সঙ্গে একহাত লড়তে আসেনি—তাই।

ফের ঢকঢক করে মদ গিলল সে। রাহুল বলল, যদি আসত কেউ?

সানু হাসল।…এলে? এলে বুক পেতে দিতুম। নে—নে, এ বাপ্তোৎ হৃদয়খানা তুলে নে এক খাবলায়। মাইরি রাহুল, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মেয়েমানুষ।

ঔঃ! এ বেণ্ট্ প্রোডাকসান অফ্ নেচার। এই রাহুলচন্দ্র, কখনও মেয়েমানুষ চেখে দেখেছিস রে?

রাহুল বলল, হ্যাঁঃ।

কেমন লাগে?·· সানুর কুতকুতে চোখদুটো জ্যোৎস্নায় চকচক করল।

ভালো?

শুধু ভালো?···সে ফের মদ ঢালল। গিলে নিয়ে বলল, আঃ! কে যেন বলেছিল বে—ফ্রায়েলটি! দাই নেম ইজ মেয়েমানুষ।

রাহুল ঝোঁকের বশে তার খালি ভাঁড়টা এগিয়ে বলল, দিন।

খা। আজ তুই শালা আমার জানের দোস্ত।

রাহুল বলল, তো দোস্ত ভি কভি কভি দুষমন বন্ যাতা হ্যায়।

সানু ওর দিকে তাকাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, জরুর।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে সিগ্রেট ধরাল। সশব্দে থ থু ফেলল। রাহুল বলল, শীলার সঙ্গে আপনার বিয়ে কবে হচ্ছে?

সানু জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে মদ খেল। দুলতে থাকল।

রাহুল বলল, সানুদা।

হুঁঃ।

আপনার দাদাও তো এতে রাজী। অরুণদা বলছিল।

সানু কোন জবাব দিল না। ফের মদ গিলল। থুথু ফেলল বিকৃত মুখে।

রাহুল একটু অস্বস্তি বোধ করল। বলল, হঠাৎ কী হল? সানুদা।

হুঁঃ।

বিয়েটা কবে হচ্ছে?

কার বিয়ে?

বারে! আপনার।

সানুর জবাব নেই। সে ঘাড় ঘুরিয়ে যেন চাঁদ দেখল একবার। তারপর ধাবমান ঘোড়ার মতো মুখ উঁচু করে রইল কিছুক্ষণ। যেন দম নিচ্ছিল ঝাকড়-মাকড় চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে সে ফের মদ ঢালল। খেল। থুথু ফেলল যথারীতি। তারপর প্যাণ্টের বেল্টটা সামান্য ঢিলে করে জড়ানো স্বরে বলল, টিপসটা এঁটে বসেছে। খুলে রাখি।

কালো রিভলবারটা বের করে পাশে রাখল সে। পা ছড়িয়ে বসল। দেখাদেখি রাহুলও নিজের অস্ত্রটা বের করে পাশে রাখল। এতক্ষণে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল তার। অস্বস্তিটা দূর করতে অনিচ্ছাসত্বে সে নিজের হাতে ভাঁড়টা ভরে নিল। দেখল বোতলটা প্রায় তলায় ঠেকে গেছে। মদটুকু গিলে সে সিগ্রেট জেলে বলল, অভ্যেস নেই। বেশ নেশা হয়ে গেছে।

সানু বলল, দাঁড়াতে পারবি তো?

রাহুল অবাক হয়ে বলল, কেন ? এক্ষুনি তো ফিরছি না। নেশা ছুটলে তখন।
উঁহু। দ্যাখ্ দিকি, দাঁড়াতে পারছিস্ নাকি ?
ধেৎ ! কেন ?
আবে শালা। যা বলছি, কর।
এই সানুদা, গাল দেবেন না মাইরি। আমার রাগ চড়ে যাবে।
চড়ুক না বে মাগীমুখো বেহদ্দ। ওঠ্ দ্যাখ্, পায়ে জোর আছে নাকি।
রাহুল হো হো করে হেসে উঠল।···খুব জোর আছে। কেন, শুনি ?
আবে শালা, লড়াই দিতে পারবি নাকি দ্যাখ। উঠে দাঁড়া।
নির্ঘাৎ মাতালের কাণ্ড। রাহুল উঠে দাঁড়াল। সে টলছিল। বেশ নেশা হয়ে গেছে। সবকিছু টলমল করছে। জ্যোৎস্না যেন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। সবকিছু থেকে যেন সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে সে। সানুকে মনে হল অনেক দূরের মানুষ। সে বলল, এই তো দাঁড়ালুম।
অস্তর নে।
হেঁট হয়ে সকৌতুকে খিকখিক করে হেসে রিভলবারটা নিল সে। তারপর বলল, নিলুম। লড়াইটা হবে কার সঙ্গে ?
সানু বলল, সবুর। লেট মি সি মাই পজিসান।···বলে সে তার অস্ত্রটা হাতে নিয়ে সামনে দাঁড়াল। দুলতে থাকল গরিলার মতো। চোখ দুটো চকচক করে উঠল তার। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়তে থাকল সশব্দে। সে বলল, ইয়েস। ওক্কে। আই অ্যাম ফিট।···বুকে থাপ্পড় মেরে সে চাপা গর্জাল ফের। ···ইয়েস, মাই নেম ইজ সানু চ্যাটারজি—দা সান অফ দা ডেভিল অফ ময়নাচক। আমি···আমি কে ? যম—যমদূত। আমি সানু চ্যাটারজি। আমার উরুতে পাইপগানের গুলি লেগেছিল। আমার কাঁধে ছুরি মেরেছিল। হজম করেছি। আমি দা সন অফ দা ডেভিল—সানু চ্যাটারজি এই ময়নাচকে যাকে বলেছি, ওঠ, সে উঠেছে। যাকে বলেছি বস্—সে···যাঃ শালা ! কী বলছিলুম ! হ্যাঁ—সানু চ্যাটারজি বলছিল। কাকে বলছিলুম ? বহরমপুরের এক শালা পুঁচকে—খানকিবাচ্চাকে !
রাহুল ক্ষেপে গিয়ে বলল, এই শালা সানুদা ! চুপ। যা তা বললে ভাল হবে না।
আবে চোওপ শালা !···বাঁ হাত তুলে সে বলল।······প্রিন্স অফ ময়নাচক ইজ স্ট্যাণ্ডিং বিফোর ইউ। হুঁ-সি-য়ার ! তুমি বিল্লিকা বাচ্চা—হুঁ—হুঁসিয়ার থাকবে।
রাহুল বলল, মাতলামি করলে আমি চলে যাব কিন্তু।
সানু বলল, না—তুই যাবি না। আই সে—সানু চ্যাটারজি বলছে তোর যাওয়া হবে না। নেভার—কভি নেহী। তোর বাবা এসেছিল এখেনে—যেতে পারেনি। তুইও পারবিনে।
সানুদা, এই মাতলামি করার জন্যে ডেকে নিয়ে এলে ?
মাতলামি ? নো—নেভার। ডুয়েল লড়বার জন্যে। ইয়েস—কাম অন। কী

হচ্ছে! আমি চলে যাচ্ছি।…বলে রাহুল পা বাড়াল। একটু ঘুরল সে।

সানু লাফ দিয়ে সামনে এসে বলল, খবর্দার। তুই লড়বি। তোর হাতের টিপস আছে। আর আমার হাতেও…উঁ? কী আছে বললুম। এই খানকিবাচ্চা, কী আছে রে? হুঁ—আমার হাতেও এই টিপস আছে। দোনো হ্যায় অটোমেটিক। আও—কাম অন।

রাহুল ঘেমে উঠল। কেন এমন করছে সানু? রাহুলেরও নেশা হয়েছে খুব—কিন্তু সে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সচেতন রাখছিল। তার দম আটকে আসছিল। তবু সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সানুকে সামলানোর চেষ্টা করল। বলল, আঃ দাদা! প্লীজ—কেলেঙ্কারী করবেন না। রাস্তার এত কাছে, কে কী ভাববে।

নো-ওপ্! তুমি খানকির বাচ্চা—তুমি আমার প্রাণের শীলাকে নষ্ট করেছ। তুমি তাকে বুকের ওপর ফেলে চুমো খেয়েছ। ইয়েস—ইউ……

রাহুল চমকে উঠে বলল, ছিঃ, কি বলছেন? চলুন—বাড়ি চলুন সানুদা। আপনার শরীর ঠিক নেই।

শাট আপ্। গর্জে উঠল সানু।…গঙ্গা আমাকে কাল রাত্তিরে বলেছে সব। তোর মরা বাপের মরা ছেনাল মাগ বলেছে। তুই শীলাকে ইয়ে করেছিস।

না—না!…রাহুল অস্ফুট চিৎকার করল।

আলবৎ করেছিস। শীলা আমার বউ—তুই তাকে রেপ করেছিল। গঙ্গা বলেছে।

রাগে উত্তেজনায় রাহুল বলল, আমি যাচ্ছি। মাঠে একলা নাচানাচি করুন।

সে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সানু তার পায়ে লাথি মেরে বলল, যাবি কোথায় হারামীর বাচ্ছা! আয়—ডুয়েল লড। সানু চ্যাটারজি কাপুরুষের মতো তোর জান নিতে চায় না। কাম অন। তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে—

রাহুল পড়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সে মুখোমুখি হল সানুর। সানু পিছিয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। রিভলবারটা তুলে তাক করে রয়েছে। সেই সময় অদূরে হাইওয়েতে গাড়ির শব্দ হল। শব্দটা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। মুহূর্তে রাহুলের চোখ খুলে গেল। ময়নাচকে তার আসল শত্রু—ভীষণতম প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি এতদিনে গর্ত থেকে বেরিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, এতদিন এটা বুঝতে এত ভুল হয়েছিল তার। এত দেরী লাগল! কিন্তু আর কিছু করার নেই। সে থরথর কেঁপে উঠল। কান্নাভরা ভাঙা গলায় বলল, সানুদা—সানুদা! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি ময়নাচক ছেড়ে। প্লীজ—

সানু বলল, নো। ভয় হচ্ছে? রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে? ওরে শালা মাগীর হদ্দ কাপুরুষ! এই তোর বড়াই বুজরুকি? গিদ্ধড়! লজ্জা করে না? থুঃ—ওয়াক থুঃ!

রাহুল বুঝতে পারল, সনু তাকে তাতাচ্ছে। বুঝতে পেরেও তার রক্তকে সে থামাতে পারল না।

থ্ থ্ থ্ ! ···সান্ থ্থ্ ছুঁড়ে মারল তার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে রাহুল রিভলবার তুলে বলল, কাম অন বাস্টার্ড ! কাউণ্ট—ওয়ান ···টু···

হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। পর মুহূর্তে রাহুল আচ্ছন্ন চোখে দেখল সামনের দিকে টলে পড়ে গেল সানু। যেন দুবার ঝাঁকুনি খেয়েই তার দেহটা স্থির হয়ে গেল।

মানুষের মনের অতলে যে আত্মরক্ষার সহজাত বোধ আছে—তা পলকে তাকে বলে দিয়েছে যে সে ট্রিগার টেপেনি—অথচ সানুর গুলি লাগল, এবং সে ঘাড় ঘোরাতেই ডাইনে কেয়াঝোপের সামনে অস্পষ্ট একটা মূর্তি দেখতে পেল। অমনি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

এটুকু ঘটতে অবশ্য কয়েকটা সেকেণ্ড লেগেছে। রাহুল বুকে হেঁটে চকিতে বাঁপাশের ঝোপে গিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর দেখল মূর্তিটা হন হন করে চলতে সুরু করেছে। দৌড়েছে সে লাফ দিয়ে দুতিনটে ঝোপ ডিঙিয়ে একটা ঝোপের আড়াল থেকে লক্ষ্য করল। লোকটা মাত্র বিশহাত দূরে দ্রুত হাঁটছে। মণিশঙ্কর ? সে তো অসম্ভব। মণিশঙ্কর পুলিশের হাজতে। তবে কে এই আততায়ী ? নন্দ ? হতেই পারে না। তাছাড়া নন্দর শরীর ছোটখাটো। তাহলে ময়নাচকে সানুর কি কোন শত্রু ছিল—যাকে রাহুল চেনে না ?

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। পিছনে ঘুরে দেখল সে জ্যোৎস্নার মাঠে কাটা গাছের মতো সানু পড়ে আছে নিস্পন্দ। হঠাৎ দুঃখে রাগে জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ল সে। মনে হল, সানু নয়—নিজেই পড়ে আছে রাহুল। আব সামনের কেয়া-ঝোপের কাছে গিয়ে লোকটার দিকে রিভলবার তাক করল সে। ট্রিগার টিপল।

এ কি ! আজ ভোরে গুলি ছুঁড়েছিল অরুণের ঘরের জানালা দিয়ে। অথচ এখন কোন শব্দ হল না। ট্রিগারটা নড়ল না একটুও। আঙুলের চাপে গুলির কেসটা সরিয়ে ফের ট্রিগারে চাপ দিল। কোন শব্দই হল না।

ক্রমান্বয়ে ছটি কেসই ঘোরাল। ট্রিগার নড়ল না। দর দর করে ঘামতে থাকল সে। কাল রাতের মতো এও কি তবে স্বপ্ন দেখছে ? কাঁপতে কাঁপতে রাহুল দেশলাই জ্বালল। দূরে লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার গভীরে।

দেখল ট্রিগার ভাঙা—নিচের দিক থ্যাঁতলানো। কে তার অজানতে অস্ত্রটা বরবাদ করে রেখেছে। কে সে ?

না—সানুও না, এই কাজ যার—সেই তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী—জঘন্য শত্রু। ময়নাচকে সারাক্ষণ সে অদৃশ্য থেকে অনুসরণ করেছে। আর শক্তিকে গোপনে থেকে অবশ করে দিয়েছে। তার সব হননেচ্ছাকে তিলে তিলে বিনষ্ট করে ফেলেছে শেষে নিরস্ত্র করে ফেলেছে পুরোপুরি। হ্যাঁ—তার নাম শীলা। আঃ শীলা, তুমি জানো না, কী করেছ !

রাগে দুঃখে মাথার চুল খামচে ধরল সে। অকেজো রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। সানুর রিভলবারটা এখনও পড়ে রয়েছে তার লাসের কাছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে আড়ষ্ট পায়ে এগিয়ে গেল।

উবুড় হয়ে পড়ে আছে সানু চ্যাটারজির নিস্পন্দ দেহটা। জ্যোৎস্নার রাত্রে নির্জন মাঠে একটা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। রাহুল চঞ্চল হয়ে উঠল। তাকে এক্ষুনি এখান থেকে পালাতে হবে। যে লোকটা একে খুন করে পালিয়ে গেল, তার ফাঁদের মুখে সে এখন রীতিমত বিপন্ন। সানুর শক্তিমান রিভলবারটা দ্রুত কুড়িয়ে নিল রাহুল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। নিরুচ্চার একটি প্রতিজ্ঞার কঠিনতা তাকে গ্রাস করল সঙ্গে সঙ্গে।

রাহুল চলতে চলতে দেখল, নেশা কেটে গেছে। পা টলছে না আর। হাইওয়ে ডিঙিয়ে ওদিকে মাঠে সে চলার গতি বাড়িয়ে দিল ক্রমশঃ।

অরুণের ইটখোলায় পেঁৗছে মাথা ঠাণ্ডা করে নিল সে। অরুণের আদরের কুকুরটা একবার ডেকেই চুপ করে গেল। বাইরের ঘরের দরজা খোলা। অরুণ একা বসে কী লিখছে নিবিষ্টমনে। রাহুলের পায়ের শব্দে ঘুরে বলল, কোথায় গিয়েছিলে? কখন থেকে তোমার অপেক্ষা করছি। শীলার কাছে শুনে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলুম—সানুটা একটা জানোয়ার। তার পাল্লায় পড়লে তো···

রাহুল বসে পড়েছিল। বাধা দিয়ে শান্তভাবে বলল, আচ্ছা অরুণদা, সানুর সঙ্গে তার দাদা নীরেন চ্যাটারজির সম্পর্ক কেমন?

অরুণ বলল, কেন? সানু কিছু বলেছিল বুঝি?

রাহুল বলল, আমার কথার জবাব দাও আগে।

অরুণ একটু ভেবে নিয়ে বলল, বাইরে-বাইরে সম্পর্ক ভালই। নীরেনবাবু তার জোরেই তো এখানে রাজত্ব করেন। কিন্তু আমার ধারণা, ভিতরে ওদের পারিবারিক কী সব ভজকট আছে। সানু প্রায়ই আমাকে বলে যে নীরেনবাবু তাকে বঞ্চিত করতে চায়। বিশেষ করে নীরেনবাবুর বউ নাকি এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী।

রাহুল বলল, অরুণদা, সানুকে তোমাদের নীরেনবাবু খুন করেছে।

অরুণ চমকে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, যাঃ!

হ্যাঁ। এইমাত্র সানুকে সে খুন করে পালিয়েছে।···রাহুল বিকৃত মুখে বলতে থাকল।···সানু আমাকে নিয়ে মাঠে গিয়েছিল। আমার চোখের সামনে তাকে তার দাদা গুলি করে পালাল। আমি কিছু করতে পারলুম না। আমার রিভলবারটা কে অকেজো করে রেখেছে, জানতাম না। অরুণদা, আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব।

অরুণ হন্তদন্ত হয়ে বলল, বল কী! সর্বনাশ! রাহুল নীরেনবাবুর পক্ষে অসম্ভব কাজ কিছু নেই জানি। কিন্তু······আশ্চর্য, এ যে অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

রাহুল বলল, সানুর লাসটা এখনও পড়ে আছে মাঠে। একটা কিছু করা দরকার অরুণদা। হয়তো নীরেন চ্যাটারজি আমাকেই এতক্ষণ খুনী সাজিয়ে ফেলেছে।

কারণ, আমার সঙ্গে সানুকে সন্ধ্যায় অনেকেই যেতে দেখেছে।

অরুণ গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ঠিকই বলেছ। একটা কিছু করা দরকার।

তারপর অরুণ উঠে দাঁড়ালো।...আমার মনে হয়, এক্ষুনি থানায় খবর দেওয়া দরকার। ওদের সব খুলে বলাই ভালো। তুমি তো মূল সাক্ষী। একটু দেরী হলেই সব উল্টে যাবে। চলো, এক্ষুনি দুজনে বেরিয়ে পড়ি।

রাহুল বলল, হয়তো আমাদের আগেই নীরেন চ্যাটারজি থানায় চলে গেছে। আমাকে খুনি বানিয়ে ফেলেছে।

অরুণ বলল, তবু দেখা যাক না। ওঠ।

শীলা পর্দা তুলে ঢুকল। বলল, না—ওকে নিয়ে যেও না দাদা। তুমি একা যাও।

অরুণ অবাক হয়ে বলল, তুই কেমন করে জানলি শীলা?

শীলা বলল, আমি ওঘর থেকে সব শুনছিলুম। তুমি ববং একা গিয়ে খবর নাও।

অরুণ উদ্বিগ্নমুখে বেরিয়ে গেল।

শীলা রাহুলের সামনে এসে বলল, সানু তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল রাহুলদা?

রাহুল মুখ নামিয়ে বসেছিল। বলল, তার আগে বল তো শীলা, কেন তুমি আমার রিভলবারটা ভেঙেছ?

শীলা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, তার জন্যে তুমি কি রাগ করেছ আমার ওপব?

রাহুল মুখ তুলে বলল, তুমি জানো না শীলা, কী করেছ!

শীলা একটু হাসল।·· নিজের শক্তিটাই বড শক্তি রাহুলদা। এতদিন মনে হত, অস্ত্রশস্ত্র হাতে না থাকলে এযুগে বাঁচা যায় না। এখন বুঝতে পারি, আসল শক্তি অন্য জায়গায় থাকে। মানুষের মনে। যাকগে—ও নিয়ে ভেবোনা।

রাহুল হাসল।· না, ভাবিনি। কারণ আরেকটা রিভলবার আমি পেয়ে গেছি। সানুরটা। এ লাইনের নিয়মই এই, শীলা।

শীলা চমকে উঠল!...কেন ওর রিভলবার তুমি নিলে? এক্ষুনি ফেলে দিয়ে এসো। তোমার ঘেন্না করল না একটুও? ছিঃ!

রাহুল রিভলবারটা বের করে চুমু খেয়ে বলল, কে জানে! সানুকে আমি ঘেন্না করতুম, না ভালবাসতুম। হয়তো ভালই বাসতুম। তা না হলে মাঠে আজ ডেকে নিয়ে যখন ও আমাকে ডুয়েল লড়তে ডাকল, কেন ওর ডাকে সাড়া দিতে পারছিলুম না? টের পাচ্ছিলুম, ময়নাচকে আমার সেই একমাত্র ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী—তবু আমার হাত উঠছিল না। ওকে এত অসহায় মনে হচ্ছিল। হতভাগ্য সানু চ্যাটারজী!

শীলা অস্ফুটকণ্ঠে বলল, সানু তোমাকে ডুয়েল লড়তে ডেকেছিল? কেন?

রাহুল বলল, কারণ আমি নাকি তার বাগদত্তা বউকে নষ্ট করেছি!

শীলা মুখ ঘুরিয়ে বলল, ইতর! ছোটলোক!

কিন্তু তুমি তো আজ বেঁচে গেছ, শীলা ! আর তো তোমাকে এখান থেকে কোথাও পালাতে হবে না। দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

কে জানে !···শীলা অস্ফুটকণ্ঠে বলল।

শীলার কণ্ঠস্বর শুনে রাহুল চমকাল। বলল, কেন শীলা ?

হঠাৎ শীলা উঠে দাঁড়াল। রাহুলের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, দ্যাখ, আমার মনে হচ্ছে—এক্ষুনি তোমার কী বিপদ ঘটে যেতে পারে। তোমার এখানে বসে থাকা ঠিক নয় রাহুলদা। হয়তো এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে তোমাকে ধরতে। চলো, বাইরে কোথাও গিয়ে বসবে। তারপর শিগগির একটা কিছু ঠিক করে ফেলব আমরা। রাহুলদা, আর সময় নেই। ওঠ।

রাহুল বলল, অরুণদা ফিরে আসুক না।

শীলা তার হাত ধরে টানল।···না। আর একটুও দেরী নয়। চলো।

দুজনে বেরিয়ে গেল। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল শীলা। ইটখোলার ভিতর দিকে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। রাহুল একটু অবাক হয়েছিল শীলার আচরণে। কিন্তু কোন কথা বলল না। জঙ্গলের ভিতরে স্তূপীকৃত ইটের মধ্যে সাবধানে ওরা এগোচ্ছিল। হাওয়া বইছিল উদ্দাম। জ্যোৎস্নায় দূরের মাঠ আর এই জঙ্গলটা রহস্যময় আর ষড়যন্ত্রসংকুল দেখাচ্ছিল। একটা খোলা জায়গায় ঘাসের ওপর দুজনে গিয়ে বসল। কতক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। দূরের রাস্তা থেকে ভারি ট্রাক চলে যাওয়ার আবছা শব্দ ভেসে আসছে। শনশন করে ঝোপঝাড় আর গাছপালা দুলছে। শীলা আরও কাছে সরে এল। রাহুল অবাক হয়ে দেখল সে নিঃশব্দে কাঁদছে। রাহুল ওকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলল, শীলা, কী হল তোমার ?

শীলা ভাঙ্গা স্বরে ওর বুকে মুখ গুঁজে বলল, আমার বড্ড ভয় করছে রাহুলদা। মনে হচ্ছে সব স্বপ্ন আমার মিথ্যে হয়ে যাবে।

রাহুল বলল, কেন মিথ্যে হবে ? আমি তো সানুকে খুন করিনি। তুমি দেখে নিও, সে-পাপ আমাকে লাগবে না।

শীলা চোখ মুছে বলল, একটা কথা রাখবে আমার ?

বলো।

সানুর পিস্তলটা তুমি এক্ষুনি ফেলে দাও। তারপর···

তারপর ?

চলো, এক্ষুনি আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

পালিয়ে যাবো ? কার ভয়ে ?

নীরেনবাবু তোমাকে ছাড়বে না রাহুলদা ! নিজের মাথা বাঁচাতে সে তোমার ওপরই সব চাপিয়ে দেবে। এ আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

রাহুল একটু ভেবে বলল, হয়তো তাই। কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে পালিয়ে গিয়েই

বা কেমন করে বাঁচব? পুলিশ আমাকে খুঁজে বের করবেই। তার চেয়ে এটার মুখোমুখি দাঁড়ানো ভালো।

শীলা ব্যাকুলভাবে বলে উঠল, না না। চলো কোথাও পালিয়ে যাই আমরা—অনেক দূরে। যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না।

রাহুল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, যেতে পারতুম। কিন্তু আমার রক্তে কী আছে যেন শীলা। মনে হচ্ছে সানু মরে গিয়ে ফের আরেকদফা হারের মুখে ঠেলে দিয়েছে আমাকে। তাছাড়া, যেজন্যে এসেছিলুম, তা তো চুকিয়ে ফেলতে পারিনি এখনও। নীরেন চ্যাটারজি এখনও বেঁচে আছে। না শীলা, আমার কাজ শেষ হয়নি।...

সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।...শীলা, তুমি অপেক্ষা করো। এখান থেকে চলে আমরা যাবই। কিন্তু তার আগে শেষ কাজটা চুকিয়ে নিতে দাও।

শীলা তার হাত ধরে টানল। চেঁচিয়ে উঠল, না না। রাহুলদা, তুমি যেও না। আমার কথা শোনো—রাহুলদা!

রাহুল হনহন করে চলে গেল। তাকে একটা ভয়ঙ্কর রক্তলিপ্সু বাঘের মতো দেখাল সেই নির্জন জ্যোৎস্না রাতে। গাছপালার আড়ালে সে লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছে চরম শিকারের দিকে। শীলা ঘাসের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। এ এক দুঃস্বপ্নের রাত যেন।

রাহুল যে তার কথা রাখল না, সেই দুঃখ শীলাকে ক্রমশ নিঃসাড় করে ফেলছিল। কতক্ষণ পরে সে উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ফিরে এল ঘরে। করুণা তার পায়ের শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল। শীলাকে দেখে সে চাপা গলায় বলল, কী হয়েছে রে শীলু? কোথায় গিয়েছিলি তোরা? তখন থেকে কী সব হচ্ছে, একটুও বুঝতে পারছিনে!

শীলা আর নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারল না। তার কাছে গিয়ে হুহু করে কেঁদে ফেলল।

করুণা অবাক।

সানুদের বাড়ির উত্তরে বাগানটার ভিতর ঢুকে পড়েছিল রাহুল। বাগানের পর সেই পুকুর। পুকুরের পাড় ধরে বারান্দা ও চত্বরওলা ঘাটের কাছে পৌঁছল সে। নির্জনতা থমথম করছে চারদিকে। এই চত্বরে বসে একদিন সানুর সঙ্গে গল্প করেছিল সে। চত্বরের শেষে দেয়ালে দরজায় মাথায় টিমটিমে বাল্‌ব জ্বলছে। কেমন করে বাড়িতে ঢুকবে ভেবে পেল না সে। নীরেন চ্যাটারজিই বা কোথায়

আছে এখন—তাও তার জানা নেই। কিন্তু সে আজ মরীয়া। রক্ত চঞ্চল হয়েছে খুনের নেশায়। তার সামনে এতটুকু বাধা সে আর সইতে রাজী নয়। যদি এখন শীলাও তাকে আটকাতে আসে, সে তাকে গুলি করতে দ্বিধা করবে না। একটা খর ক্রোধের ঝড় তার মাথার ভিতর বইতে সুরু করেছে।

না—এদিক থেকে বাড়ি ঢোকা যাবে না। প্রথমে দরকার কোথায় নীরেন আছে, সেই খবরটা জানা। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তা না হলে অনর্থ বিপদে পড়ে যাবে, উদ্দেশ্য মোটেও সিদ্ধ হবে না।

ডাইনে ঘুরে বাড়ির একপ্রান্ত ধরে চলতে থাকল সে। এদিকটা ফুলবাগিচা। অজস্র দেশিবিদেশি ফুলের গাছ আর ঝোপঝাড় রয়েছে। শিকারী প্রাণীর মতো সাবধানে এগোচ্ছিল সে। সামনের দিকে লনের কাছে যেখানে গাড়িবারান্দা, তার পিছনে একটা প্রকাণ্ড বুগানভিলিয়ার ঝাড় রয়েছে। পা টিপেটিপে তার ভিতর গিয়ে ঢুকল সে। ওখান থেকে সদর ঘরটা পুরো দেখা যায়।

ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দায় মৃদু আলো। হাওয়ায় পর্দা সরে যেতেই রাহুল দেখল ঘরের ভিতর কোন লোক নেই। গাড়িবারান্দায় নীরেন চ্যাটারজির জীপটাও দেখা যাচ্ছে না। সব নিস্পন্দ আর নির্জন। রাহুল ভাবল, বোকামি হচ্ছে। নীরেন কখন দেখা দিবে, সেই আশায় বসে থাকার কোন মানে হয় না। সে একটা চান্স মাত্র। তার চেয়ে সোজা এগিয়ে খোঁজ নেওয়া ভালো। সৎভাইকে শেষ করে এসে নিশ্চিন্ত নীরেন নিশ্চয় বিশ্রাম নিচ্ছে।

রাহুল আস্তে আস্তে বেরোল। বারান্দায় উঠল। একটু ইতস্তত করল। প্রকাণ্ড সেকেলে দরজার কপাট। কড়া নাড়লে শুনতে পাবে কি না কে জানে!

সে জোরে কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা। সেদিনের সেই লোকটাই বেরিয়ে এসে বলল, কাকে চাই?

নীরেনবাবুকে।

লোকটা রাহুলের পা থেকে মাথা অব্দি দেখে নিয়ে বলল, আপনাকে চেনাচেনা মনে হচ্ছে। কোথায় থাকেন বলুন তো? বাইরে-টাইরে? কোন গাঁয়ে বাড়ি?

রাহুল সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, নীরেনবাবু আছেন?

লোকটা কেমন গম্ভীর। মাথা নেড়ে বলল, না। একটু আগে বেরিয়েছেন। তাছাড়া রাত দশটায় কারো সঙ্গে উনি দেখা করেন না। সকালে আসবেন। অবশ্যি, কাল সকালেও ওঁর সঙ্গে দেখা হবে কি না জানিনে। একটা বিপদ হয়ে গেছে। সেই নিয়ে উনি ভীষণ ব্যস্ত।

রাহুল নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, বিপদ? কী বিপদ?

লোকটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, কেন শোনেন নি? খানিক আগে সানুবাবু খুন হয়েছেন! আপনি বরং পরশু-টরশু একবার চেষ্টা করবেন। চাকরী-বাকরীর ব্যাপার তো? পরে আসবেন—ওঁর মাথার ঠিক নেই এখন।

দরজা বন্ধ করে দিল সে। রাহুল বুঝতে পারল, জননেতার বাড়ির এই লোকটা তাকে চাকরীপ্রত্যাশী ভেবেছে। এলাকার বেকার যুবকেরা এভাবে নীরেনের কাছে যখন তখন এসে ধরনা দেয়, সে জানে।

গেটে দারোয়ান যথারীতি বসে রয়েছে। গেটটা সামান্য খোলা আছে। রাহুল বেরিয়ে গেলেও সে গা করল না। এটাই রেওয়াজ আছে এ বাড়িতে—দারোয়ানও সেটা জানে। তাই কে ঢুকল বা বেরোল এবং কে না ঢুকেও বেরোল তার মতো, দারোয়ানের তাতে কোন মাথাব্যথা নেই।

এত রাতে হাইওয়েতেও নির্জনতা ছমছম করছে। বাজারের দিকেও লোকজন কদাচিৎ চোখে পড়েছে। ব্যর্থতার ক্ষোভে রাহুল কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে হাঁটল। এ কাজে সময়ের দরকার হবে কিছুটা—সে বুঝতে পারছিল। এখন নীরেন চ্যাটারজিকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। হয়তো এতক্ষণ পুলিশের সঙ্গে সেই মাঠে সানুর লাসের কাছে হাজির হয়েছে সে।

হঠাৎ চমকে উঠল রাহুল। কিন্তু সানুকে যে খুন করল, সে সত্যি কি নীরেন চ্যাটারজি? স্পষ্ট তো রাহুল দ্যাখেনি! এ তার নিতান্ত অনুমান। একটা ধারণা আরোপ করা মাত্র। সেই আততায়ী নীরেন না হতেও তো পাবে!

না হতেও পারে? তবে কে সে? সানুকে খুন করার উদ্দেশ্য কী তার?

এমন তো হতে পারে যে সানুর আরও কোন ভীষণ শত্রু ছিল, অনেক ব্যাপার ছিল সানুর জীবনে—যা রাহুল আজও জানে না বা জানা সম্ভব নয়! রাহুল কতদিনই বা এখানে এসেছে! কতটুকু জানে সানুর? হয়তো কেউ তক্কে তক্কে ছিল—আজ সুযোগ পেয়ে সানুকে খুন করে বসল।

রাহুল একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাটা ভাবল। যত ভাবল, নীরেন চ্যাটারজির ওপর থেকে তার সন্দেহটা সরে গেল ক্রমশ। একথা তো ঠিকই যে আততায়ীকে সে মোটেই চিনতে পারে নি।

রাগ পড়ে গেল নীরেনের ওপর থেকে। অন্তত সানুর হত্যাকারী হিসেবে নীরেনকে সে আর গণ্য করতে পারছে না। অথচ রাজেনবাবু তাকে ময়নাচকে পাঠিয়েছিলেন যে উদ্দেশ্যে, সেদিক থেকে দেখতে গেলে নীরেনকে তার খতম করতে হয়। আবার গঙ্গার কথা মনে পড়ে গেল রাহুলের। তার বাবার কথা মনে পড়ল।

সময় দরকার। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে তাকে। রাহুল আবার অরুণের বাড়ির দিকে চলল। শীলা তার কাণ্ড দেখে এবার হয়তো হাসবে।···

অরুণ ততক্ষণে ফিরেছে। বাইরের ঘরে শীলা আর সে বসে আছে। রাহুল অবাক হয়ে দেখল ওরা সত্যি হাসাহাসি করছে। ব্যাপার কী? এই পরিস্থিতিতে ওরা অমনভাবে হাসতে পারছে! রাহুল ঘরে ঢোকামাত্র অরুণের হাসিটা বেড়ে গেল। শীলাও হেসে উঠল। তারপর বলল, আজ সানুর সঙ্গে বুঝি খুব নেশাটেশা করা হয়েছিল রাহুলদা?

রাহুল বলল, তার মানে ?

অরুণ হাসতে হাসতে বলল, যাঃ ! কোন মানে হয় না।

শীলা বলল, রাহুলদা এরপর খুনখারাপি আর লাস ছাড়া কিছু দেখবে না। তারপর জ্যোৎস্নার রাত—ফাঁকা মাঠ—কল্পনার রাশ ছাড়তে অসুবিধে কিসের ?

রাহুল প্রায় গর্জে উঠল—কী ? হয়েছে কী অরুণদা ?

অরুণ হাত তুলে বলল, রোস রোস হে শ্রীমান ! আগে ব্যাপারটা শোন।

রাহুল বলল, তাড়াতাড়ি বলুন—কী হল ! থানায় গিয়েছিলেন ?

অরুণ বলল, ফেট্ ! থানায় যাব কী ? সানু মলে তো থানায় যাব ? ভাগ্যিস—

বাধা দিয়ে রাহুল বলল, সানু মরেনি ?

অরুণ হেসে বলল, ও শালা মরে ? ওর মরণ নেই হে ! বুলেটপ্রুফ শরীর শালার।

তার মানে ?

গোড়া থেকে বলি শোন।…অরুণ সিগ্রেট ধরিয়ে আরামে টান দিয়ে বলল।… হন্তদন্ত ছুটে যাচ্ছি—এমন সময় দেখি রাস্তায় শালা সানু টলতে টলতে আসছে। পরিষ্কার চাঁদের আলো। দেখেই চিনে ফেললুম। দৌড়ে গিয়ে বললুম, সানু, তুমি বেঁচে আছ ? সানু বলল, বেঁচে থাকব না মানে ?…জোর মাতলামি সুরু করল ও। সেই ফাঁকে প্রশ্ন করে করে যা জানলুম, তা হচ্ছে এই : সানু তোমার দিকে পিস্তল তুলেছিল। ঘোড়াও টিপেছিল। কিন্তু—আমার যা ধরণা, চরম উত্তেজনায় সানু সেই মুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আমি ভাবছি, ভাগ্যিস গুলিটা তোমাকে লাগেনি। তারপর জ্ঞান হলে সে উঠে দ্যাখে, একা পড়ে আছে। সানু বলল, নির্ঘাৎ আমার রিভলবারটা নিয়ে পালিয়েছে রাহুল।

শীলা রাহুলের দিকে চোখ টিপল।

রাহুল বলল, কিন্তু আমি যে আরেকজনকে দেখেছিলুম ! সে ওর দিকে তাক করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেল !

অরুণ বলল ভুল দেখেছ হে। না—লোক একজন দেখেছ, সেটা ভুল নয়। কিন্তু সে বেচারা নিরীহ ভীতু টাইপের লোক। তার সঙ্গে একটু পরেই দেখা হল। তিনি হচ্ছেন আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই চারু চক্কোত্তি। বেচারা পায়খানা করতে গিয়েছিলেন ওখানটায়। ওটা ওঁর প্রতিরাতের অভ্যাস। হঠাৎ গিয়ে পড়ে তোমাদের রণংদেহি মূর্তি দেখে উনি থ। যেই সানুর পিস্তল থেকে গুলির আওয়াজ হওয়া, অমনি উনি কাছাখোলা অবস্থায় ভোঁ দৌড়। সবই আকস্মিক যোগাযোগ।

রাহুল বলল, কিন্তু আমি যে…

ফেট্ ফেট্। সব তুমি নেশার ঘোরে দেখে ইচ্ছেমতো ভেবে নিয়েছ। আমি শুধু ভাবছি—একবার সানুকে আর পরীক্ষা করেও দেখলে না ! সঙ্গে সঙ্গে তুমিও দৌড় লাগালে। এত বোকা আর ভীতু তুমি তো ছিলে না ভাই রাহুল !

অরুণ হাসতে লাগল। শীলা বলল, খবরদার রাহুলদা কক্ষনো আর ওসব ছাইপাঁশ গিলবে না কিন্তু। তোমার সঙ্গে আড়ি হয়ে যাবে।

রাহুল গুম হয়ে বসে রইল। অরুণ বলল, মাতালটাকে তো ঠেলেঠুলে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম। না—পাঠিয়ে নয়, একেবারে নিজে গিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে এলুম গেটের মধ্যে। সেখানে ভজহরি বাবুর সঙ্গে দেখা। সে তো সানুকে দেখে হাঁ। কারণ ইতিমধ্যে চারু পণ্ডিতমশাই দৌড়ে এসে ওদের খবর দিয়ে গেছেন যে সানুকে মাঠে কে এইমাত্র খুন করে ফেলেছে। চারুবাবুও তোমার মতো ভুল দেখেছিলেন তো! তিনি ভেবেছিলেন, তুমিই বুঝি সানুকে খুন করলে। অবশ্যি তোমাকে উনি চিনতে পারেন নি। দিন হলেও চিনতে পারতেন না অবশ্য। যাই হোক খবর শুনে নীরেনবাবুরা দৌড়ে মাঠে গিয়ে হাজির। কিন্তু সানুর লাস তাঁরা পেলেন না। হন্তদন্ত সব ফিরেছেন—নীরেনবাবু, পণ্ডিতমশাই, আর সব পাড়ার লোকজন। আমি সানুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা। সব বললুম। তখন হাসির ধুম পড়ে গেল। পণ্ডিতমশায়ের কাঁপুনি থামল। বাপ্‌স!—একটু থেমে অরুণ বলল, অবশ্যি সানুর সঙ্গে তুমিই মাঠে ছিলে—তা আমি বলিনি। যাক্ গে, শোন। সানুর সঙ্গে আর মিশোনা। ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। আর এক কাজ করো—ক'দিন বেরিওনা কোথাও। খাও-দাও ঘুমোও—নয়তো আমার সঙ্গে ইটখোলায় আড্ডা দাও। শীলু, খেতে দে রে। ক্ষিদে পেয়েছে।

অরুণ উঠে চলে গেল ভিতরে। শীলা একটু পরে উঠল। রাহুল লক্ষ্য করল, তার মুখটা এবার কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছে। সানু বেঁচে আছে বলে?

শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল রাহুলের।

জানালাগুলো খোলা থাকায় বাইরের জ্যোৎস্না থেকে সামান্য আলোর আভাস ঘরের ভিতরে। রাহুল দেখল, শীলা তার পাশে বসে তাকে ঠেলছে। রাহুল চাপাগলায় বলল, কী ব্যাপার?

শীলা মুখ নামিয়ে বলল, চলো—বেরোই। রাত শেষ হয়ে এল যে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রাহুল বলল, কোথায়?

বা রে! কী কথা ছিল আমাদের? আমি তৈরী। দেরী করো না—ওঠ।

সব মনে পড়ে গেল রাহুলের। হ্যাঁ, শীলার সঙ্গে তার ময়নাচক ছেড়ে আজ চলে যাবার কথা আছে। সানু মরেনি—ওর মৃত্যু নেই। ও বেঁচে থাকতে শীলাকে নিয়ে সে সুখে থাকতে পারবে না এখানে। রাহুল সাবধানে উঠে বসল। তারপর বলল, আচ্ছা শীলা, যদি আমরা অরুণদাকে বলেই যাই, তাঁর নিশ্চয় আপত্তি হবে না।

পাগল!...শীলা ফিসফিস করে উঠল।...দাদা যে বিপদে পড়ে যাবে সানুর হাতে। দাদা কখনো যেতে দেবে না আমাকে।

কিন্তু অরুণদা যে সত্যি বিপদে পড়ে যাবেন!

তাতে আমার কী ?

এ মুহূর্তে শীলাকে কেমন স্বার্থপর মনে হল রাহুলের। সে চলে গেলে অরুণ নির্ঘাৎ সানুর খপ্পরে পড়ে যাবে। সানু হয়তো ভাববে অরুণই এদের সরিয়ে দিয়েছে। রাহুল খুব দ্বিধায় পড়ে গেল।

তাকে চুপ দেখে শীলা বলল, তাহলে তুমি থাকো—আমিই যাই।

রাহুল কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে শীলাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল। চুমু খেল শান্তভাবে। শীলা বাধা দিল না। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল দুজনে। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শীলা বলল, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমাকে যেতে দাও।

রাহুল শুধু বলল, কেন যাবে ?

দাদাকে তুমি এখনও চেনো না। ওকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। গতিক বুঝলে দাদা সানুর ঘাড়ে আমাকে ঝুলিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না।

রাহুল ভাবছিল, সেটা মিথ্যে নয়। অরুণ খুব দুর্বলচেতা ভীতু লোক। তার পক্ষে সেটা সম্ভব। কিন্তু এমনি করে চোরের মত পালিয়ে যাবে তাই বলে ?

শীলা উঠে দাঁড়াল। রাহুল দেখল, সে একেবারে তৈরী। মেঝে থেকে একটা সুটকেস তুলে নিচ্ছে শীলা।

রাহুল এবার উঠল। দেয়ালের হুক থেকে ব্যাগটা তুলে নিল। বালিশের নিচে থেকে সানুর রিভলবারটাও নিল, পকেটে রাখল। বাবার বাকসোগুলো নেওয়া যাবে না। থাক। কী হবে !

সাবধানে শীলা বাইরের দরজাটা খুলল। প্রথমে সেই বেরোল। বাইরের জ্যোৎস্না ভোরের আলোয় ফিকে হয়ে গেছে—ধূসর অন্যরকম আলোয় পৃথিবী এখন স্পষ্টতর। কাককোকিল ডাকতে সুরু করছে চারপাশে। রাতের উদ্দাম হাওয়াটা থেমে গেছে।

হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে পিছিয়ে এল শীলা। ঢিবির নিচে থেকে একটা বিশাল শরীর টলতে টলতে উঠে আসছে সামনে। লাল চোখ—বিশৃংখল শার্টের নীচেটা প্যান্টের উপর বেরিয়ে পড়েছে খানিক—বোতাম খোলা, খালি পা, উস্কোখুস্কো ঝাঁকড়া চুল, অসম্ভব একটা মানুষ ! কয়েকমুহূর্ত তাকে যেন চিনতেই পারছিল না শীলা।

রাহুল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

সানু চ্যাটারজি পাগলের মতো হেসে উঠল—হা হা হা হা।

রাহুল আর এক মুহূর্ত ইতস্তত করল না। পকেট থেকে রিভলবারটা ক্ষিপ্রহাতে বের করল। তারপর ট্রিগারে চাপ দিল। একবার···দুবার···তিনবার।

সানু চ্যাটারজি গড়াতে গড়াতে ঢিবির নীচে ইটের পাঁজার ওপর গিয়ে স্থির হল। এতক্ষণে সেই ডুয়েলটা একতরফা সমাপ্ত হল। এবার সত্যি সত্যি মারা পড়ল হতভাগ্য,

সানু চ্যাটারজি। তার হাতের টিপে রাতের প্রথমদিকে অব্যর্থ হলে রাহুলই মরে যেত। হয়তো এর নামই ভাগ্য।

রাহুল শীলার হাত ধরে টানল। শীলা পুতুলের মতো পা বাড়াল। প্রচণ্ড নির্ঘোষে অরুণের ঘুম ভাঙলো কিনা টের পাবার আগেই ওরা হাঁটতে শুরু করছে। দ্রুত হেঁটে চলল দুজনে। হাইওয়েতে পেঁাছে দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর হাঁটতে থাকল। পিছনে একটা ট্রাক আসছে। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলতেই সেটা থামল। ট্রাকগুলো এমনি করে বাড়তি পয়সা কামাতে অভ্যস্ত। ড্রাইভারটা শুধু প্রশ্ন করল, কোথায় যাবেন ?

রাহুল একটু হেসে জবাব দিল, আপাতত রেলস্টেশন অব্দি।

ট্রাকটা ভোরের হাইওয়েতে প্রচণ্ড গর্জন করে ছুটে চলল। দিগন্তে তখন লাল সূর্যটা ডিমের কুসুমের মতো আকাশ ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।…

স্টেশনে পেঁাছতে সেই সূর্যের রঙ বদলাল। হালকা রোদ্দুর ছড়াল চারদিকে। একটা বেঞ্চে বসে ওরা চা খেতে থাকল। রাহুল একবার চাপা গলায় বলল, শীলা, ভয় করছে না তো আর ?

শীলা মাথা দোলাল। একটু হাসলও।

এবার তাহলে সামনে পড়ে আছে একটা অন্যরকম জীবন। তার কথাই শীলা ভাবছিল। আপাতত বেথুয়াডহরিতেই যাবার মতলব—তারপর…

হঠাৎ রাহুল বলল, শীলা, তোমার সিঁথিটা শূন্য থাকা আর ঠিক নয়। কে কী ভেবে বসবে। বসো, আসছি।

শীলা পরিচ্ছন্ন হেসে বলল, বেশ তো। নিয়ে এসো না সিঁদুর। কিন্তু এখন পাবে কোথায় শুনি ?

ওপাশে তো সব দোকান রয়েছে। দেখি, বলে রাহুল উঠে গেল।

ট্রেনের এখনও সামান্য কিছু দেরী আছে। একটু উৎকণ্ঠা অবশ্যই রয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি ট্রেনটা আসে তত মঙ্গল। শীলার মনে শুধু সেই আসন্ন ট্রেনের চাকার শব্দ—দূরে থেকে কাছে প্রতিধ্বনিময়। একটা আপ কিংবা ডাউন যেকোন ট্রেনের জন্যে শীলা এখন জীবন বিকিয়ে দিতেও রাজী। সেই ক্রমাগত ট্রেনের সঙ্গীতময় ধ্বনিপুঞ্জ তার কানে স্পষ্টতর হচ্ছে।…

শীলা চায়ের ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে পাশে ছোট্ট বাজারটার দিকে তাকাল। সবে দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে। রিকশোর জটলা বাড়ছে। সকালের ট্রেনের যাত্রীরা ভিড় জমাচ্ছে একটি দুটি করে। খুব বড় স্টেশন নয়। কিন্তু এখনও রাহুল ফিরছে না কেন ? শীলা একটু এগোল।

রাস্তায় গিয়ে সে খুঁজল রাহুলকে। তারপর চমকে উঠল। ও কী! রাহুল ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ? ছোট্ট বাজারের পরে বিশাল একটা মাঠের সুরু। সেই মাঠের দিকে চষা জমির ওপর দ্রুত হেঁটে চলেছে রাহুল !

কয়েকমুহূর্তের জন্যে সারা শরীর অবশ হয়ে পড়েছিল শীলার। জিভ ব্লটিং পেপারের মতো খসখসে হয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিল সে। ঠোঁটে দাঁত কামড়ে নিষ্পলক তাকিয়ে দেখতে লাগল রাহুল চলে যাচ্ছে। ভণ্ড, মিথ্যুক, প্রতারক কোথাকার! সিঁদুর কেনার ছল করে তুমি পালিয়ে গেলে! শুকনো চোখ ফেটে জল এল এবার।

একবার ইচ্ছে হল দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরে ফেলে—সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কিছু বলে। কিন্তু পরক্ষণেই জানল, ওকে আর ধরা যাবে না। নির্জন প্রসারিত শূন্য মাঠের বুকে এতক্ষণে ওই মানুষটার সত্যিকার চেহারা ফুটে উঠেছে। ওর নাগাল পেতে শীলার মতো মেয়েকে আরও কতবার জন্মাতে আর মরতে হবে।

সিগনাল পড়ে গেছে ওদিকে। স্টেশনে হল্লা বেড়েছে। শীলা চঞ্চল হল। ময়নাচকে আর ফিরবেনা সে। অনেকদিন পরে যেন রাহুল এসে তাকে একটা মুক্তির স্বাদ দিয়ে গেছে। বেথুয়াডহরির সেই অনেক স্মৃতিতে ভরা সংসারটা আজ শূন্য আর নির্জন হলেও মনের ভিতর হাতছানি দিচ্ছিল। একটা দুঃস্বপ্নের মতো ময়নাচকের ভয়ঙ্কর জীবন থেকে সে সদ্য জেগে উঠেছে।

টিকিটের কাউণ্টারের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল শীলা। আঃ, কতদিন ছেলেবেলার স্বপ্নেভরা বেথুয়াডহরি তার যাওয়া হয় নি!···

রাহুল অনেকখানি হেঁটে একবার দাঁড়াল। পিছন ফিরে স্টেশনটা দেখে নিল। শীলা দুঃখ পাবে। সে জানে। কিন্তু উপায় ছিল না। ময়নাচক থেকে এতখানি পথ সে মনে মনে তোলপাড় হয়েছে। শীলাকে কি সত্যি ভালবাসে? শীলাকে নিয়ে জীবন কাটালে কি সুখী হবে? কিসে তার সুখ—কাকে সে ভালবাসে, তা খুঁজে পাচ্ছিল না।

স্টেশনে পেঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছিল, কোথাও একটা গুরুতর ভুল করা হচ্ছে। তার মন বলছিল, না—না, ওদিকে নয়, ওখানে নয়। তার জীবনের শেষ কথা এই পালিয়ে গিয়ে ঘরবাঁধা নয়। অন্য কিছু।

তাছাড়া, এখন তার সরকারী পরিচয়—শুধু মাত্র খুনী। আজই ভোরে সে ময়নাচকে সানু চ্যাটারজি নামে একটা লোককে তারই রিভলবারে গুলি করে মেরেছে। সানুর দাদা নীরেন চ্যাটারজি প্রখ্যাত লোক—প্রভাবশালী। পুলিশ রাহুলকে রেহাই দেবে না। একসময় তাকে খুঁজে বের করবেই—তারপর কাঠগড়ায় হাজির করে দেবে বিচারকের সামনে। যাবজ্জীবন জেল কিংবা ফাঁসি হবে। তখন বেচারা শীলা আরও বেশি কষ্ট পাবে। জেলখাটা বা ফাঁসিযাওয়াদের বউ হওয়া শীলার মতো শিক্ষিতা ভদ্র মেয়ের পক্ষে ভারি অশোভন। সে তাকে হয়তো সত্যিসত্যি গভীর-ভাবে ভালবেসেছিল, তার কাঁধে ওই কুশ্রী জীবনটা চাপিয়ে দেবার অধিকার রাহুলের নেই।

রাহুল একটু হাসল। মনে মনে বলল, শীলা, সুখে থাকো। স্বচ্ছন্দে থাকো। আমার জীবনটা আমার থাক, তোমারটা তোমার। দুটোকে নিজের নিজের ছন্দে বয়ে যেতে দাও।

সে তীক্ষ্নদৃষ্টে শীলাকে খুঁজছিল অতদূর থেকে। দেখতে পেল না। ভেবেছিল, শীলা দৌড়ে আসবে। এলে রাহুল কী করত?…কী করতে তুমি, রাহুল? নিজেকে প্রশ্ন করে জোরে হেসে উঠল সে। তারপর রিভলবারটা বের করে শূন্যে নাচাতে নাচাতে পা বাড়াল। দিগন্ত-বিস্তৃত অসমতল মাঠের বুকে সোজা হাঁটতে থাকল। সামনের গ্রামে গিয়ে নিজের গ্রামটার পথ জিগ্যেস করে নিতে হবে তাকে। এখন তার সাবা শরীরে শুধু গভীর তৃষ্ণা—প্রান্তপ্রবাহিনী গঙ্গার কালো জলে সে-তৃষ্ণা মেটাবে রাহুল। সে গঙ্গা ও মুক্তকেশী—একদিন সেও ছিল পরম কামনার সুখদুঃখে ভরা।

তাবপর? সেই কালো জলে রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

তাবপর যাবে সে বহরমপুরে রাজেনবাবুর কাছে। সোজাসুজি বলবে, একটা কবিতা শুনুন স্যার।

অবশেষে এল সেই ঘাতক……
শান্ত রুগ্ন ভীতু ছন্নছাড়া প্রেমিক
শূন্য নগ্ন হাত ভিখারির প্রার্থনায় জড়োসড়ো
রুক্ষ চুলে কামনার দুঃখগুলি হাওয়ার মতন মৃদু কাঁপে
কামনার সুখগুলি শুধু দুটি চোখে জ্বলজ্বল করে… ‥

আততায়ী

আনন্দময় বিকেলে ঘাটের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বললেন, নিরু ঘাটে ইন্দ্রকে দেখলাম জানিস ?

নিরু বাবার জন্য চা করছিল। মা এখনও গঙ্গাস্নান করে ফেরেন নি। দেরি হবে আজ—সে তো জানাই। আজ গুরুপূর্ণিমা। সাধুবাবার আশ্রমে ভিড় হবে। বিকেলে সামিয়ানা টাঙাতে দেখেছিল নিরু।

আনন্দময় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ফের বললেন, সামনাসামনি হলে হয়তো কথা বলত। এড়িয়ে গিয়ে ঘাটোয়ারিজীর গদিতে বসলাম। ঘাটোয়ারিজী বললেন, হাইকোর্টে খালাস পেয়েছে। কী যে হচ্ছে আজকাল !

উঠোনে অনেকটা জ্যোৎস্না পড়েছে। টিউবেলের পাশে বুগানভিলিয়ার ঝাড় পাঁচিল ঘেঁষে উঠে বাইরে ছড়িয়ে গেছে। খুব হাওয়া দিচ্ছে বলে শব্দ করে দুলছে। নিরু সেদিকে তাকিয়ে নাক খুঁটছিল। চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠল। রুটি বেলতে বেলতে চা করেছিল সে।

নিরু কথা বলছে না টের পেয়ে আনন্দময় একটু হাসলেন খুক খুক করে। হাসিটা অসহায় মানুষের। বললেন, এভাবেই ক্রিমিনালে দেশ ভরে যাচ্ছে। আবার যেন মধ্যযুগ ফিরে এল। যাক গে, আমাদের কী? কারুর সাতেও না পাঁচেও না। নিরু রাত্তিরে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না রে। এই যে চা খেলাম এতেই মনে হচ্ছে পেটটা ফুলে গেল।

নিরু একবার মুখ তুলে আবার রুটি বেলতে থাকল। আনন্দময় অভ্যাসমতো উঠোনে চেয়ার পেতে বসে আছেন। চায়ের কাপ প্লেট নামিয়ে মুখ তুলে চাঁদ দেখছেন। ভরা গঙ্গার শিয়রে পূর্ণিমার চাঁদটা দেখার ইচ্ছে ছিল আনন্দময়ের। ইন্দ্রকে দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে।

নিরু আস্তে বলল, আমি একবার আশ্রমে যাব বাবা। মা বলে গেছে।

আনন্দময় চমক খাওয়া গলায় বললেন, তুই যাবি ? কী দরকার ?

নিরু একটু হাসল।—একা থাকলে বুঝি ভূতে ধরবে তোমাকে ? যাব বলছি, যাব।

আনন্দময় চুপ করে থাকলেন। এই পুরনো বাড়িতে ভূত যদি সত্যি থাকে তবে সে মা ও মেয়ে দুজনকেই অনেক আগে ধরে ফেলেছে। বাধা দিলেও নিরুকে নিরস্ত করা যাবে না। কারণ সব তাতেই তার মা তাকে সমর্থন করবেন। এখন যদি ইন্দ্রের অছিলায় নিরুকে জোর করে আটকান, সুচরিতা এসেই আকাশপাতাল করে ছাড়বেন—সে রাতদুপুর হোক না কেন।

মরুক গে। যার যা খুশি করুক। আনন্দময় হাল ছেড়ে দিলেন। সময় কী রকম খেলছে মানুষকে নিয়ে সেইসব কথা ভাবতে থাকলেন।

এই রানীরঘাটে একসময় বাঘের উপদ্রব ছিল। এখন বাঘের আত্মা মানুষের ভেতর ঢুকেছে। চাঁদুবাবুর ইটখোলার দিকটায় ছেলেবেলায় আনন্দময় একটা প্রকাণ্ড সাপ মেরেছিলেন। ওপারের শহর তখন গোপাল সিঙ্গির শিকারী বলে খুব

নামডাক। সে ডোমপাড়ার পেছনে খালের ধারে একটা বাঘ মেরেছিল। সেটাই রানীরঘাটের শেষ বাঘ। কারণ তারপর আর বাঘের কথা শোনা যায় নি।

তবে মানুষের দিনকাল তখন ভালই ছিল বলা যায়। দু'একজন চোর ছিল। তারা প্রায়ই ধরা পড়ত আর ফাঁড়ির জমাদারবাবু বদ্রীনাথের হাতে বেদম পেঁদানি খেত। জগন কামারের ছোটভাই রতন ছিল দারুন চোর। রোগা শুঁটকো চেহারা। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটত। একবার নিশুতি রাতে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ির পেছনে শেয়াল ডাকল। আনন্দময়ের মা গলা চড়িয়ে বললেন, অ আনু! ঘুমোস নে! রতনা এসেছে।—মা ঠিক টের পেতেন।

আজকাল চোররা শেয়াল ডাকে না। সোজা ঘরে ঢুকে পিস্তল ছোরা বাগিয়ে যা নেবার নিয়ে যায়। মান্ধাতা আমলের ফাঁড়ির চেহারা তেমনি ক্ষয়াটে হয়ে থাকলেও পুলিশের রকমসকম বদলে গেছে। জমাদারবাবুকে এ এস আই না বললে খাপ্পা হন। চুরির খবর গেলে সবিনয়ে বলেন, ফুটাপাত্রে আর মিছিমিছি জল ঢালেন ক্যান? ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। দেখিয়াও বোঝেন না কিছু? কী দেখে কী বোঝা যাবে কে জানে! কেউ পারতপক্ষে ফাঁড়ির সামনেকার ঘাস মাড়ায় না। সেপাইরা গাবগাছের তলায় বসে খৈনি খায় আর তাস পেটে। বন্দুকগুলো দেখে বিশ্বাস হয় না নল থেকে গুলি নামে একটা সাংঘাতিক কিছু বেরোয়।

আনন্দময় এসব কথা ভাবতে বসলেই রেগে যান। মনের রাগ মনের ভেতর কিছুক্ষণ ছটফট করে একটু পরে উবে যায়। তখন টের পান, শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই। তিনি সত্যি বুড়ো হয়ে গেছেন।

নিরু রান্নাঘর সামলে বলল, ফিরতে দেরি হলে খেয়ে নিও। কেমন?

আনন্দময় গলার ভেতর বললেন, বললাম তো পেট ভার। খাব না। দুধটা খেও তাহলে। গেলাস ঢাকা রইল।

নিরু টানা বারান্দা ঘুরে ঘরে চলে গেল। বারান্দায় মিটমিটে একটা আলো জ্বলছে। বাল্‌বটা সাফ করা দরকার। বললেও করে না। সংসারটা দিনে দিনে কেমন যেন দূরে সরে যাচ্ছে আনন্দময়ের কাছ থেকে। সরে যাওয়া দেখে যে তিনি তার পেছন পেছন দৌড়ে সঙ্গ ধরবেন, তাও না। কিছু ভাল লাগে না আনন্দময়ের। বয়স বলেও না, ভেতর থেকে একরাশ আলিস্যি উঠে এসে তাঁকে সারাক্ষণ চেপে ধরে থাকে।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে একটু সেজে নিরু বেরিয়ে এল।—তাহলে গেলাম। তুমি দুধটা খেয়ে নিও যেন। দরজার কাছে গিয়ে একবার ঘুরে ফের দুষ্টুমি করে বলল, নইলে মা এসে দেখবে গরম গরম দুধ গেলাবে।

নিরু বেরিয়ে গেলে আনন্দময় আবার কিছুক্ষণ মুখ তুলে প্রকাণ্ড চাঁদটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওই চাঁদে মানুষ গিয়েছিল বিশ্বাস করা যায় না! কোথায় এই

গঙ্গার ধারে এঁদো গঞ্জ রানীরঘাট, কোথায় চাঁদ! ঘাটোয়ারিজী দীননাথ চৌবে বলেছিল, নেহি বাবুজী। ঔর কৈ চান্ধ হোগা।

ঠিক বলেছিল। ওদিকে তুমি চাঁদে মানুষ পাঠাচ্ছ, এদিকে হারামজাদা ইন্দ্রের মতো ছেলেরা সাংঘাতিক কাজ করেও খালাস পাচ্ছে! আনন্দময় কার উদ্দেশে এ অনুযোগ করলেন, নিজেও বুঝলেন না। ঈশ্বর-টিশ্বরে তাঁর বিশ্বাস নেই। বারান্দার বোগাটে আলো চটাওঠা থামের পাশ দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে। তার কয়েক ইঞ্চি দূরে ধপধপে জ্যোৎস্না। বুগানভিলিয়ার ঝাড়টা খুব আছাড় খাচ্ছে পাঁচিলের মাথায়। কদিন গুমোটের পর এই পুবের হাওয়াটা আসছে গঙ্গা পেরিয়ে। বিকেল থেকে বেশ আরাম আসে আবহাওয়ায়। সারা আকাশ দিনের মতোই নির্মেঘ। এখনও মনে হচ্ছে ঘন নীল হয়ে আছে। এখানে ওখানে কয়েকটা কবে তারা।

উঠে গিয়ে দরজাটা আটকে দিয়ে এলেন আনন্দময়। বাইরের রাস্তায় লোকজন চলাচলের চাপা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আশ্রমে সংকীর্তন শুরু হবে কখন কে জানে! মাইক তো বাজবেই। ওই এক জ্বালা। তবে এমুহূর্তে মনে হচ্ছে, জোর আওয়াজ দরকার রানীরঘাটে। একটা হইচই গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাক। বদমাস ইন্দ্রটা দিব্যি ফিরে এসে হেসে হেসে মনোহরের দোকানে চা খাচ্ছিল। গায়ে নীল গঞ্জি, পরনে আরও নীল প্যাণ্ট। চোখ জ্বলে গেছে আনন্দময়ের।

বেচারা রাজেন এতদিন রানীরঘাটে থাকলে তার খুব কষ্ট হত। ছেলের খুনী বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত চোখের সামনে! রাজেন কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। রাজেন বাসের কণ্ডাক্টার হতে পারে, কিন্তু সে তো একজন বাবা। বাবার সামনে ছেলেকে ছুরি মেরেছিল! আনন্দময়ের বুকের ভেতর আবার কষ্টটা ঠেলে উঠল! স্নেহাকর আর ইন্দ্র দুজনেই তাঁর ছাত্র ছিল। স্নেহাকরকে দেখে বুঝতেন, সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই জন্মেছে। ইন্দ্রকে দেখে কিছু বুঝতে পারেন নি। একটু গোঁয়ারগোবিন্দ ছিল বটে—খেলার মাঠে মারামারি করত একটু-আধটু, কিন্তু সে খুনী হবে এটা অকল্পনীয় ছিল। আসলে অনেক ছেলেকে দেখে বোঝা যায় না কিছু।

সবচেয়ে খারাপ লাগে, রাজেন বড় আশা করেছিল, ছেলেটা ওপারের কলেজে বি-এ পাশ করল—এবার বুড়োবয়সে তার আরাম মিলবে। রাধা ট্রান্সপোর্টের মালিক ব্রজভূষণ প্রভাবশালী মানুষ। স্নেহাকরের একটা চাকরিবাকরি হয়ে যেত। কিন্তু ওর যে সবসময় প্রতিবাদের স্বভাব। জ্যৈষ্ঠসংক্রান্তির দিন ঘাটে গঙ্গাপুজো দেখতে আসে গ্রাম-গ্রামান্তরের মেয়েরা। বাসস্ট্যাণ্ডের ওখানে সন্ধ্যাবেলা ইন্দ্র কার পেছনে লেগেছিল। সেই নিয়ে বচসা। তারপর স্নেহাকর ছুরি খেল তলপেটে।

আনন্দময় টের পেলেন শরীরটা ফেলে রেখে তিনি যেন পালিয়ে যাচ্ছেন দুঃখে, রাগে অনেকটা ভয় নিয়েই।

শুভব্রত ডাকছিল, নীলি ! নীলি ! একবার আসবি ?

নীলিমা বাড়ির সামনে বাগান করা নিয়ে ব্যস্ত। রথের মেলায় কয়েকটা ফুলগাছ কিনেছিল। টানা দু সপ্তাহ বৃষ্টি নেই তারপর। চারাগুলোর দশা দেখে সে হতাশ হচ্ছে। দাদার ডাকে ঘুরে বলল, যাচ্ছি !

শুভ জানলা দিয়ে উঁকি মেরে জিভ কাটল।...ও কী রে ! এই রোদের মধ্যে জল ঢালছিস গাছে ? উঁহু—বিকেলে। পাঁচটার পর। বোকা মেয়ে কোথাকার !

নীলিমা কাঁচুমাচু মুখে বলল, এখন জল দিতে নেই বুঝি ? কিন্তু নেতিয়ে গেছে দেখছ না ?

তোর মাথা !—শুভ হাসল।—এখানে আয়, মজা দেখে যা।

নীলিমা বাগানে মন রেখেই বাড়ি ঢুকল। ভেতরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে দাদামশাই নলিনাক্ষ কাগজ পড়ছেন। অনি—তার দিদি অনিমা বাচ্চাকে বোতল চোষাচ্ছে। মা গঙ্গাস্নান করে এসেছেন ভোর বেলায়। ঠাকুরঘরে নটা অব্দি কাটিয়ে বেরিয়েছেন। এখন ঝিয়ের ওপর তম্বি করছেন। নীলিমা জানে এই তম্বি সারা দুপুর চলবে। বোকা মেয়েটা কেন যে এ বাড়ি ছেড়ে দেয় না এখনও !

শুভ খাম হাতে নিয়ে বসে ছিল। বলল, তোর চিঠি !

চিঠি ? নীলিমা খামটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেল।—পুরোটাই আমার দেখছি ইস ! কে এত ভারি খাম পাঠাল রে দাদা ? ওপরে তো কিচ্ছু লেখা নেই !

হাতের লেখাটা ভাল করে দ্যাখ ! শুভ চোখে হেসে বলল। চেনা লাগছে না ?

নীলিমা খামটা ঝটপট ছিঁড়ে লম্বা চিঠির তলায় চোখ বুলিয়ে ফিক করে হাসল। তাই বল্। বউদির। ও দাদা, তোকে লেখেনি ?

শুভ বলল, বলব কেন ?

তোরটা কতবড় দেখি ?

শুভ চোখ পাকিয়ে বলল, খুব পেকে গেছ কলেজে ঢুকতে না ঢুকতে।

নীলিমা চিঠিটা আঁকড়ে ধরে বলল, বলনা দাদা, তোকে লেখেনি বউদি ?

না লিখে থাকলে ?

আমারটা পড়ব না। ছিঁড়ে ফেলব।

শুভ সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল, লিখেছে। যা—কোথাও বসে পড়্গে। এখানে ঝামেলা করিস নে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে নীলিমা আস্তে আস্তে চলে গেল। শুভ জানালা দিয়ে দেখল, নীলিমা গেটের পাশে কদমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ছে।

শুভ একটা চারফুট-আড়াইফুট মাপের সাইনবোর্ড আঁকছে কাল থেকে। জয়মালা স্টোর্সের বিপুলবাবু পুরনো সাইনবোর্ড বদলাবেন। ঘাটের মাথায় বাজারটা একটু করে বাড়ছে। বিপুলবাবুর স্টেশনারি দোকানটারও খুব উন্নতি হয়েছে। ওপারের শহরের দরেই উঁচু স্ট্যাণ্ডার্ডের মাল রাখেন। শহরফেরা বাইরের লোকেদেরও হঠাৎ

মনে পড়ে যায় কোনটা কিনতে ভুলে গেছে। বিপুলবাবুর দোকান দেখেই মনে পড়ে আর কী!

খুব মডার্ন হওয়া চাই ভাই। বিপুলবাবু শুভকে বলে দিয়েছেন। মেয়েছেলের অর্ধেকটা অন্তত দিও—তবে আগের মতো বেঢপ নয়। স্লিম অ্যান্ড ট্রিম। বুকটা লক্ষ্য রেখো।

মহা ফাজিল লোক! শুভ ঘরের দরজা আটকে ছবিটা আঁকার চেষ্টা করছে কাল থেকে। দিদি অনিমা এসেছে দুদিন আগে। মা তার ঘরে বিশেষ ঢোকেন না। কিন্তু দিদি আর বোনের মুখ চেয়ে এমন ছবি আঁকতে একটু সংকোচ বোধ হয় তার। আঁকা হয়ে গেলে তখন আর এ প্রশ্ন নেই। কিন্তু, ওরা ঢুকে দেখবে, শুভ যত্ন করে একটা মেয়ের শরীরের ওপরটা আঁকছে—এটা কেমন অস্বস্তিকর।

শুভ দরজা আটকে ফের ছবিটা নিয়ে পড়ল। সিগারেট ধরে স্কেচটার দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে রইল। কাল থেকে কতবার স্কেচটা ধুয়ে ফেলছে। এর আগে মেয়েদের ছবি আঁকে নি এমন নয়—অথচ কীভাবে যেন হাত থেকে রত্নার শরীরটাই ফুটে বেরুচ্ছে। কোমর থেকে কাঁধ, দুই বাহু, বুক এবং মুখের আদল। শুভ গদিআঁটা টুলে বসে তুলি হাতে নিল।

খামের ওপর হরিদ্বারের ডাকঘরের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে নীলির চিঠিতে। রত্না তাহলে এখন বহুদূরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বলেছিল বটে, দিল্লীতে মাসতুতো দাদা না কে আছে। তবে দিল্লীতে বড্ড গরম হবে সামারে। হিমালয়ের দিকে চলে যাবে কোথাও। ফিরবে জুলাইয়ের মাঝামাঝি। এখন তো তাহলে কলকাতা ফেরা উচিত ছিল। নীলি এসে জানাবে কী হল।

চিবুকের কাছে তুলি ঠেকাতেই জানলায় নীলির মুখ। চিঠিটা কখন এসেছে রে? সকালের ডাকে।—শুভ তুলি রেখে জানলার কাছে গেল।—ঘাটে গেলাম তখন। ফিরে এসে তো তোকে পেলাম না। তারপর ভুলে গেছি!

থাক। অত কৈফিয়ৎ চাইনি।—নীলি গম্ভীর হয়ে বলল।—বউদি হরিদ্বারে আছে। আরও কোথায়-কোথায় যাবে—ফিরবে অগাস্টের ফাস্টউইকে। তখন আমাকে কলকাতা যেতে লিখেছে।

বেশ তো! যাস।

যাচ্ছি! বলে বাগানে গিয়ে ঢুকল নীলি।

চোখে প্রশ্ন ছিল শুভর। কয়েকসেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর সেটা নিজেই টের পেয়ে সরে এল। আর সব কী লিখেছে রত্না, জানতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কেন? শুভ নিজের ওপর ক্ষুব্ধ হল। যার যেখানে ভাল লাগবে, ঘুরে বেড়াবে—যা খুশি করবে। তার তাতে মাথাব্যথার কারণ কী?

রত্না গত মার্চে জেদ ধরেছিল কলকাতা যেতে। শুভর তখন সময় নেই। কদমতলায় ওপেন এয়ার স্টুডিও বানিয়ে ফেলেছে। ক্লাবের থিয়েটারের সিন আঁকছে। ঘাসের

ওপর পেণ্টের মস্ত বড় কয়েকটা টিন। নানা সাইজের ব্রাশ আর তুলি। ক্লাবের ছেলেরাও হাত লাগিয়েছে। নীলিও কোমরে আঁচল জড়িয়ে ব্রাশ ঘষছে। সে এক কর্মযজ্ঞ। রত্নাকে এগিয়ে দিতে যায় নি কেউ। যাবার সময় গেটের কাছে একটু দাঁড়িয়ে রত্না নীলির সঙ্গে কথা বলে গেল। শুভ মুখ নামিয়ে উইংসের থামে আর কী অলংকার পরাবে ভাবতে ভাবতে খুব কাছে নীলির পায়ের শব্দ হল। তারপর নীলি খুব আস্তে বলল, বউদি গেল! শুভ কোনো কথা বলেনি। একটু পরে ঘুরতে গিয়ে দেখেছিল বাইরের বারান্দায় মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। রত্নার যাওয়ার মধ্যে হয়তো স্বাভাবিকতা দেখছিল এতক্ষণ, কিন্তু মায়েব এমন করে দাঁড়িয়ে থাকা দেখেই শুভর মনে হয়েছিল, এ একটা বিশ্রি অস্বাভাবিকতা। এ ভাবে বাড়ির বউয়ের যাওয়া ঠিক না। তার মাথার ভেতর দপ করে জ্বলে উঠেছিল। আসছি বলে হঠাৎ শুভ হন হন করে গেট পেরিয়ে হাটতে শুরু করেছিল।

ঘাটে গিয়ে দ্যাখে, রত্না নৌকোয়। নৌকো ঘাট ছেড়ে উজোনে চলেছে। শম্ভু মাঝি লগি ঠেলতে ঠেলতে অভ্যাসমতো গান ধরেছে চড়া গলায়। রত্না এদিকে পেছন ফিরে বসে আছে।

শুভ আস্তে আস্তে ফিরে এসেছিল ঘাট থেকে।

সে জানত, কলকাতার মেয়েদের রানীরঘাটে থাকতে মোটেও ভাল লাগবে না। ওপারের শহরে হলেও কথা ছিল। রাতে শেয়ালডাকা জোনাকিজ্বলা ছোট্ট গঞ্জের গুমোট নিঃঝুম জীবনের সঙ্গে রত্নার খাপ খাইয়ে চলা কঠিন। প্রচুর আলো আর প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে তার জন্ম। রত্না বলত, যেন সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে বসে আছি।

মাঝে মাঝে শুভরও তো তাই লাগে। আবার কলকাতায় ছুটে গিয়ে ফের একটা কাজ খুঁজে নিতে তীব্র ইচ্ছা জাগে। অরোরা অ্যাডভারটাইজিং খামখেয়ালী করে ছেড়ে আসাটা হয়তো ঠিক হয় নি। পস্তানি লাগে। রত্নার সঙ্গে সেখানেই আলাপ, প্রেম এবং বিয়ে। অথচ হঠাৎ এক রাতে ঘুম ভেঙে কেন তার মন হু হু করে উঠেছিল কে জানে। রানীরঘাটের গঙ্গা, ঘাসে ঢাকা পাড়, শস্যক্ষেত্র, বাবলাবন—এই সব প্রাকৃতিক ব্যাপার তাকে ভীষণ টানছিল। মনে হয়েছিল, এখানে বড় বেশি আলো. প্রচণ্ডতর শব্দ, কোলাহল, উত্তেজনা তার মনের পক্ষে অনেক বেশি গুরুভার। হয়তো পৃথিবীর যা কিছু আছে, তার ভেতব থেকে বেছে নিয়ে ভালবাসবার প্রবণতা ছেলেবেলায় জেগে ওঠে। তারপর সংস্কারে দাঁড়িয়ে যায়। শহর তাই তার ভাল লাগে না। রত্নার বেলাতেও তাই—শুভর উল্টো সংস্কার। রত্নার কোনো দোষ নেই। শুভরও নেই। সব মানুষ যেন নিজের-নিজের ছোটবেলার মধ্যে সারা জীবন আটকে থেকে হাত-পা ছোঁড়ে।…

শুভ পরপর কয়েকটা সিগারেট পুড়িয়েও ছবির স্কেচটা শেষ করতে পারল না। রঙের দিকে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল।

আবার জানলায় নীলির মুখ। চোখে হাসি ঝিলমিল করে। চাপা গলায় বলল-

দাদা ! আনন্দমাস্টার কামিং ! আজ তোর বারোটা বাজবে।

শুভ আনমনে বলল, কে ?

স্লোলি স্লোলি কামিং !—নীলি হাসতে লাগল।—বলে দেব নাকি দাদা নেই ? তাহলে তো তোকেই ধরবেন।

মায়ের পেছনে লেলিয়ে দেব। সে ট্যাকটিক্স আমার জানা আছে।

শুভ সিগারেট ঘষটে নিভিয়ে বলল, না। পাঠিয়ে দিস। অনেক দিন আড্ডা হয়নি মাস্টারমশায়ের সঙ্গে।

সে মেঝে থেকে সিগারেটের ছাই খবরের কাগজে ঝেঁটিয়ে সাফ করল। রঙ তুলি কাঁচি পেনসিল অজস্র জিনিস একপাশে ঠেলে সরিয়ে রাখল। কোণে থেকে ফোমের গদি-আঁটা দামী ইজিচেয়ারটা এনে জানলার পাশে রাখল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখতে থাকল, আর কিছু করা যায় নাকি।

এ ঘরটাই সব থেকে বড়। পুরনো বাড়িটা ভেঙে শুভর বাবা এই বাড়ি করে গেছেন। শহরে জেলা সমবায় ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন। মাঠে খানিকটা জমি-জিরেতও ছিল। বাড়ি করতে আর অনিমার বিয়ে দিতে সবটাই গেছে। তবে খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন শক্তিব্রত। সায়েবী চালে চলতেন। এ বাড়ির গড়নে, সামনেকার লন আর গেটে তার ছাপ রয়েছে। কুকুর পোষার শখ ছিল। রোজ বিকেলে গায়ে স্পোর্টিং গেঞ্জি, সাদা হাফপ্যান্ট, মাথায় টুপি, হাতে ছড়ি এবং কুকুরের চেন নিয়ে বেড়াতে যেতেন ঘাটের দিকে।

বইপত্রের নেশাও ছিল খুব। এ ঘরের দেয়ালের তাকে এবং দুটো শেলফে ঠাসা ইংরেজি বই। আনন্দময় এসে রাতদুপুর করে তবে যেতেন। এখনও যেন সেই স্মৃতির টানেই আসেন।

এসে বললেন, আগের মতো হাঁটাচলা করতে পারিনে ! বড়জোর বিকেলে ওই ঘাটঅব্দি যাই। চৌবের গদীতে বসে কিছুক্ষণ গপ্পসপ্প করি।

শুভ বলল, বসুন মাস্টারমশাই ! আপনার সিংহাসন রেডি।

আনন্দময় হাসতে হাসতে ইজিচেয়ারে বসলেন। অনি এসেছে দেখলাম। ও ভদ্রলোক কে বলো তো ?

দাদামশাই ! কানে একদম শোনেন না ! বলেন নাইনটির ওপর নাকি বয়স !

অ।—আনন্দময় ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে একটু ঢোক গিলে আস্তে বললেন, ইয়ে—ইন্দ্র এসেছে দেখলাম। হাইকোর্টে খালাস পেয়েছে।

পাশে বড় খাট। পা ঝুলিয়ে বসে শুভ বলল, কাল এসেছিল ইন্দ্র।

তাই বুঝি ! আনন্দময় শুভর দিকে তাকিয়ে বললেন। শুভর প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে চাইছিলেন। শুভর দৃষ্টি জানলার বাইরে। কদম গাছে ঠেস দিয়ে নীলি আবার রত্নার চিঠিটা পড়ছে। কী এত লিখেছে রত্না !

শুভ বলল, জানেন ? ইন্দ্র এখনও সেই পয়েন্টায় স্টিক করে আছে।

কী ?
স্নেহাকরকে ও নাকি স্ট্যাব করেনি। ওকে মিছিমিছি ফাঁসানো হয়েছে।
ইমপসিবল্!—আনন্দময় ভাঙা গলায় বললেন।—গঙ্গাপুজোর দিন ঘাটে অসংখ্য মানুষ ছিল। তাছাড়া আমি তখন চৌবেজীর গদিতে। ভকত ছুটে এসে বলল, ইন্দ্র রাজেনবাবুর ছেলেকে ছুরি মেরেছে।
শুভ হাসল।—ইন্দ্রের কিন্তু সেই একই কথা। জায়গাটা অন্ধকার ছিল। সেই সুযোগে কে শোধ নিয়েছে স্নেহাকরের ওপর।
তোমাকে তাই বলল বুঝি ?
হ্যাঁ। আগেও বলেছিল।
তুমি বিশ্বাস করো ওর কথা ?
শুভ একটু চুপ করে থাকার পর বলল, ইন্দ্র আমার জ্যাঠতুতো ভাই হলেও আপনি তো জানেন মাস্টারমশাই, ওকে আমি ডিফেন্ড করব না।
হুঁউ, খুব জানি।—সায় দিলেন আনন্দময়।—জানি বলেই তো তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে পারি।
আর স্নেহাকরের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ছিল, তাও আপনার অজানা নেই মাস্টারমশাই।
হুঁউ হুঁউ।—আনন্দময় একটু হাসলেন। স্মৃতির দিকে তাকানোর ভঙ্গিতে বললেন, বহু ঘটনা এখনও জ্বলজ্বল করে ভাসছে চোখের সামনে। কতদিন দেখেছি তোমরা দুটিতে মুক্তকেশী মন্দিরের পেছনে কল্কেফুলের জঙ্গলে বসে আছ। কখনও বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে দেখেছি তোমরা ডোমপাড়ার ঘাটে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছ।
শুভ লজ্জা পেয়ে জিভ কাটল। ওটা ছিল তাদের লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার জায়গা। একদিন সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিলেন। ক্লাস এইটেই সিগারেট খেতে শিখেছিল তারা। তবে ওপারের শহরের স্কুল আর গঞ্জের স্কুলের হালচালে তফাত ছিল অনেক। গঞ্জের স্কুলের শাসন ছিল কড়া। রেজাল্ট তত ভাল না করলেও শহরের ছাত্রদের মতো বল্গাছাড়া হওয়ার উপায় ছিল না। এখন নাকি উল্টো হয়ে গেছে। শহরের ছাত্ররা একগুণ করলে গঞ্জের মোহিনীমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তার চারগুণ না করে ছাড়ে না।
শুভ বলল, স্নেহাকর কবি ছিল মাস্টারমশাই। ওর মৃত্যুর পর কলকাতার কাগজে কবিতা বেরিয়েছিল। ওর বাবা দেখাতে এসেছিলেন। আশ্চর্য, কবিতার নাম 'মৃত্যুর আগের দিন'।
আনন্দময় একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, সে কি আমি জানিনা ভাবছ ? ইন্সপিরেশানটা কার ছিল ? স্কুল ম্যাগাজিন কার চেষ্টায় হয়েছিল ?
শুভ ঝটপট বলল, হ্যাঁ—সবই তো আপনার ইন্সপিরেশান! এই যে আমার ছবি-টবি আঁকার ঝোঁক—সেও তো আসনারই ইন্সপিরেশান।

আনন্দময় শান্ত হয়ে বললেন, 'মৃত্যুর আগের দিন'। আসলে কী জানো? কবিরা অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। ক্রান্তদর্শী, সত্যদ্রষ্টা। তারা বহুদূর দেখতে পায়। স্নেহাকর দেখতে পেয়েছিল।

শুভ বলল, ওর মৃত্যুর দিনটা আমার মনে আছে মাস্টারমশাই। ১৪ই জুন। সেদিন ছিল জৈষ্ঠসংক্রান্তি। আগের দিন রাতে অনেকক্ষণ আমরা আশ্রমের ঘাটে বসে ছিলুম। কথায় কথায় হঠাৎ বলল, দেখিস—আমি শিগগির হয়তো মরে যাব।

বলেছিল?

হ্যাঁ। তো ওকে বললাম, কেন একথা বলছিস তুই? স্নেহাকর বলল, কী জানি! কিছুদিন থেকে আমার কী একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। বললাম, গণ্ডগোলটা কিসের? স্নেহাকর বলল, সব কিছু আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই যে তুই পাশে বসে আছিস, কথা বলছিস—আমার খালি মনে হচ্ছে এ কে? অত দূরে থেকে কেন কথা বলছে? শুনে আমি খুব হাসলাম। তবে একথা ঠিক, কিছুদিন থেকে ওকে খুব অন্যমনস্ক মনে হত। মুখে দাড়ি রাখতে শুরু করেছিল। বলত, রাতে একেবারে ঘুম হয় না। জেগে কাটায়।

আনন্দময় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হয়তো ইন্দ্র নিমিত্ত মাত্র।

না।—শুভ একটু ঝুঁকে এল।—মাস্টারমশাই, আমার বিশ্বাস, ইন্দ্র মিথ্যা বলছে না।

আনন্দময় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

শুভ বলল, সেশান কোর্টে ইন্দ্রের যাবজ্জীবন হয়েছিল সারকামস্ট্যানসিয়্যাল এভিডেন্সের জোরে। হাইকোর্টের রায়ে নাকি বলেছে, এক্ষেত্রে স্যরকামস্ট্যানসিয়্যাল এভিডেন্সের চেয়ে বড় কথা সাক্ষীরা সবাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। অথচ কেউ স্বচক্ষে ইন্দ্রকে স্ট্যাব করতে দেখেনি—এমন কী ইন্দ্রের হাতে ড্যাগারও দেখেনি।

অ।—আনন্দময় কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

মাস্টারমশাই, ইন্দ্র আমার জ্যাঠতুতো ভাই বলেই জানি, তার মধ্যে কিলিং ইন্সটিংকট আছে। আমি তো ওকে বর্নকিলার বলে ভাবতাম বরাবর। যখন স্নেহাকরের স্ট্যাব হওয়ার খবর পেয়ে দৌড়ে গেলাম, গিয়ে কী দেখলাম জানেন? ইন্দ্র দু হাতে স্নেহাকরকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। একটা ছেলে ওর তলপেটে রুমাল চেপে ধরেছে।

আনন্দময় শিউরে উঠে বললেন, আমি দেখতে যাইনি সহ্য করতে পারতাম না।

শুভ বলল, বাসের ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টাররা ইন্দ্রকে টেনে তুলে মার ধর শুরু করল। মবের ব্যাপার তো। ভাগ্যিস গঙ্গাপুজোর দিন বলে পুলিশ ছিল ঘাটে। তারা ইন্দ্রকে বাঁচায়। নৈলে ইন্দ্রও মারা পড়ত।

আমি এসব কিছু শুনি নি, শুভ। যাই হোক, তুমি যখন বলছ, তখন কথা নেই। আনন্দময় চাপা গলায় ফের বললেন, কিন্তু তাহলে কে স্ট্যাব করল স্নেহাকরকে?

কার রাগ ছিল ওর ওপর ? আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, বাবা !
শুভ উঠে দাঁড়াল।—এখনও চা এল না দেখছি ! নীলি নিশ্চয় বলে নি মাকে।
শুভ বেরিয়ে গেল, আনন্দময় পা দোলাতে দোলাতে অসমাপ্ত সাইনবোর্ডটার দিকে ঝুঁকলেন। কিছু বুঝতে না পেরে উঠে দাঁড়ালেন। বুক শেলফের কাছে যেতে যেতে টের পেলেন, কাল সন্ধ্যার পর থেকে একটা গভীর অস্বস্তি তাঁকে ঠেসে ধরেছিল, সেটা বাড়তে বাড়তে তাঁকে বেকায়দায় ফেলেছে। শুভও বিশ্বাস করছে ইন্দ্রের কথাটা ?

শুভ স্নেহাকরের খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু। শুভও এমন কিছু আজেবাজে ছেলে নয়। ছাত্র হিসেবে তো ভালই ছিল। বি এ-তেও ভাল রেজাল্ট করেছিল। এম এ পড়া হয়নি শক্তিব্রতের বাড়ি করার খেয়ালে। সব পয়সা বাড়িতেই শেষ। কলকাতায় ছেলেকে রেখে পড়াবেন কী করে ?
তবে শুভ বলত, আর্টস্কুলে ভর্তি হবে। শান্তিনিকেতন যাবার কথা বলত। কিন্তু শক্তিব্রত বলতেন, মাথা খারাপ ? ছবি এঁকে পয়সা রোজগার করবি এ দেশে ? ও আনু, একটু বুঝিয়ে দিও তো ওই পাগলটাকে !
আসলে শুভ বাবার বড় অনুগত ছেলে ছিল। এই পরিবারের সঙ্গে আনন্দময়ের দু পুরুষ ধরে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পরস্পর সব খবর জানা। হাঁড়ির খবরও। আনন্দময় টের পেয়েছিলেন, শক্তিব্রতের মৃত্যুর পর থেকে শুভ নিজের পথে চলার চেষ্টা করেছে। যেন খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল সে।
শুভ চায়ের কাপ এনে বলল, নীলির কাণ্ড। বলে নি কিছু। আর অনিকে তো জানেন। একটা বাচ্চা সামলাতে নাকি লাইফ হেল্‌ হয়ে যাচ্ছে !
শুভ হাসতে লাগল। আনন্দময় বললেন, বউদি নেই বুঝি ?
মা ? মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। শুয়ে আছেন।
ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন ?
ওপারের জ্ঞানবাবু দেখছেন।
আনন্দময় চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, ভাল চা হয়েছে ! তুমি করে আনলে নাকি ?
না। অনি।
আনন্দময় ইজিচেয়ারে বসে বললেন, বউমাকে অনেকদিন দেখছি না। কলকাতায় বাপের বাড়ি কাটাচ্ছে ?
শুভ আস্তে বলল, হুঁ। তারপর টুলটা টেনে নিয়ে সামনাসামনি বসে বলল, জানেন মাস্টারমশাই ? কাল ইন্দ্রকে দেখার পর স্নেহাকরের ব্যাপারটা আমার মাথা থেকে যাচ্ছে না। বছর দুই কলকাতায় ছিলাম। ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। সেবার গঙ্গাপুজোয় হঠাৎ করে কদিনের জন্য বাড়ি এলাম। এসে ওই সাংঘাতিক কাণ্ড। আমি বুঝতে পারছি না তাহলে কে ওকে স্ট্যাব করল ?

কথা কেড়ে আনন্দময় একটা হাত নেড়ে রায় দিলেন, ইন্দ্র বলছে যখন, তখন ইন্দ্র নয়। আমারও মনে হচ্ছে অন্য কেউ। তুমিও খোঁজো, আমিও খুঁজে দেখি।

শুভ হেসে ফেলল।—তাতে লাভ কী ?

সত্যোদ্ঘাটন!—আনন্দময় ভরাট গলায় বললেন।—তাছাড়া শুভ, ভেবে দেখ কথাটা। আমাদের এই সুন্দর পিসফুল জায়গায় একজন খুনী দিব্যি গা বাঁচিয়ে ভালমানুষ সেজে কাটাবে, এটা কি অস্বস্তিকর নয় সমাজের পক্ষে? কে বলতে পারে, আবার সে কাউকে স্ট্যাব করবে না? রক্তের স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে মানুষখেকো বাঘ। তোমাদের তখন জন্মই হয় নি। আমরাও এতটুকু ছেলে। রানীরঘাটের ওপাশে শেয়ালমারা বলে যে গ্রাম আছে, সেখানে সেবার মানুষখেকো বাঘের দৌরাত্ম্য শুরু হল। তো··

শুভ বেগতিক দেখে বলল, আমরা ছোটবেলায় বাঘের কথা শুনি নি। তবে স্কুলের পেছনে কাশবনের ভেতর খরগোস দেখতে পেতাম। বড় বড় কান। কী যে ভাল লাগত। আর মাস্টারমশাই, পাখিও কম ছিল না তখন। আজকাল আর তত পাখিও দেখিনা। কী হল বলুন তো ?

আনন্দময়ের এই স্বভাব। কথা বলতে যেমন ভালোবাসেন, শুনতেও তেমনি। একটু পরে শুভ বলল, এই রে। একেবারে ভুলে গেছি। ওপারে একটু কাজ ছিল যে।

আনন্দময় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে রেডি হয়ে নাও। আমি ততক্ষণ নীলির সঙ্গে কথা বলি গে। ঘাট পর্যন্ত যাব তোমার সঙ্গে। বাড়ি বসে থাকতে একদম ইচ্ছে করে না। যা গরম পড়েছে!

বিকেলে ইন্দ্র ডোমপাড়ার ঘাটের মাথায় ঘাসে ঢাকা পাড়ে বসে সিগারেট টানছিল। পায়ের দিকে একটা প্রকাণ্ড আকন্দঝোপ। সাদা ফুলে গাছটা ঝলমল করছে— ফুলের ভেতর বেগুনি ছোপ। ডাইনে একটু তফাতে ঘাটে কাপড় কাচছে একটা মেয়ে। মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে ইন্দ্রকে দেখে নিচ্ছে। মাথায় ঘোমটা।

ইন্দ্রকে সবাই বড় খুঁটিয়ে দেখছে ফিরে আসা অব্দি। বড্ড বেশি খাতিরও করছে যেন।

সিধু ভেরেণ্ডা ডালের দাঁতন দাঁতে ঘষতে ঘষতে আনমনে ঘাটে নামছিল। হঠাৎ ঘুরে ইন্দ্রকে দেখে দাঁত বের করে এগিয়ে এল। বাবুদা যে! শুনেছি ছাড়া পেয়েছেন। কেমন আছেন বাবুদা ?

ইন্দ্র সংক্ষেপে বলল, ভাল।

হ্যাঁ গো, পেরায় বছরটাক খামোকা ভোগান্তি হল—কী বলেন? সিধু থমকে দাঁড়াল। ইন্দ্রের হাতে একটা মাঝারি গড়নের ড্যাগার। ঠোঁটে সিগারেট ধোঁয়াচ্ছে। ড্যাগারের ডগা দিয়ে সে ঘাসের ওপর আঁচড় কেটে ফালাফালা করছে।

ইন্দ্র বলল, কী দেখছিস রে ? চান করগে না !
সিধু অগত্যা হাসতে হাসতে ঘাটে গিয়ে নামল। ঘোমটাপরা বউটি রামভকতের ছেলে সুরিনের দ্বিতীয় পক্ষ। সুরিন আজকাল ট্রাক চালায়। প্রথম পক্ষের বউ সরস্বতীয়ার সঙ্গে ইন্দ্রের পরিচয় ছিল। সুরিন ডাকত বুড়িয়া বলে। সরস্বতীয়া সত্যি বুড়ি হয়ে গিয়েছিল রোগে ভুগে। তবে তার মেয়ে কমিলাবতীর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কমিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাকছিল, ছোটি মা গে !
তারপর ইন্দ্রকে দেখে চমকাল। ইন্দ্র বলল, কী রে কমিলা ! তোর বাবা আছে বাড়িতে ?
মাথা নাড়ল কমিলা।
ইন্দ্র হাত তুলে ডাকল।—শোন্ কাছে আয়।
কমিলা দৌড়ে এল। ঘাট থেকে তার ছোটমা —তারই বয়সী মেয়েটা ঘোমটার ফাঁক থেকে তাকিয়ে আছে। সিধুও গা কচলাতে কচলাতে নজর রেখেছে। কমিলা বলল, কী ? বোলেন !
ইন্দ্র ড্যাগারটা তুলে বলল, তোকে চাক্কু মারব !—সে হাসছিল।
কমিলাও হাসল।…মারবেন তো মারেন !
তোর ভয় করছে না ?
কমিলা মাথাটা জোরে দোলাল।
করছে না ?
উঁহু।
বাবা এলে বলিস আমি এসেছিলাম।
কমিলা নিস্পলক চোখে ইন্দ্রকে দেখতে দেখতে বলল, বোলবে।
কী দেখছিস রে অমন করে ?
কুছু দেখছিনা।
দেখছিস !
কমিলা হঠাৎ চলে গেল ঘাটের দিকে। ছোট-মার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলতে থাকল। ইন্দ্র আবার ঘাসে আঁচড় কাটতে লাগল।
বাঁদিকে শ্মশানের পাশে সাধুবাবার আশ্রম ফুলে-ফুলে রঙিন হয়ে আছে। পাড়ে বটগাছটায় অসংখ্য পাখি চেঁচামেচি করছে। বাছুরের গলায় ঘণ্টা বাজল কোথায়। গাভীর হাম্বা ডাক শোনা গেল। দিন শেষ হয়ে আসছে। সামনে ভরা গঙ্গার বুকে এপারের ছায়া ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওপারের শহরের প্রতিবিম্ব এলোমেলো হয়ে কাঁপছে লালচে জলের তলায়। পালতোলা নৌকোটা দেখতে দেখতে ভাটির দিকে সরে গেল কতদূরে। বাঁকের দহের মাথায় বাঁশ ঝাড়টা হেলে আছে। এবারই তলিয়ে যাবে গঙ্গায়। ইন্দ্র দেখছিল। দেখছিল, অথবা চোখে ভাসছিল এসব—নিরর্থক।

তারপর আশ্রমের দিক থেকে কাঁসর ঘণ্টা শোনা গেল। আরতি হচ্ছে। ঘাট থেকে মেয়ে দুটো চলে গেছে ঘরে। সিধু বহুক্ষণ ধরে সাঁতার কাটছে। ইন্দ্র রাগী চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কাল পূর্ণিমা গেছে। চাঁদটা দেরি করে উঠল। তারপর পায়ের শব্দ হল কাছে। ইন্দ্র মুখ তুলল।

ও! ইন্দ্র! আমি ভাবলাম···শশাংক হাসল একটু।—এসেছিস, শুনেছি। তারপর আছিস কেমন? মানে—ছিলি কেমন?

আয় বোস।

এ কি বসবার জায়গা?—শশাংক খিক খিক করে হাসতে লাগল।—এখানে বসলেই লোকে ভাববে তালে আছে! না রে, বসব না। এসেছিলাম দুটো মজুর খুঁজতে ডোমপাড়ায়। হঠাৎ দেখি তুই বসে আছিস! আমি ভাবলুম কুমু নাকি?

কুমু?

আবার কে? সুরিনের মেয়ের সঙ্গে ভাব করার তালে আছে শালা! নাকি সুরিনের বউয়ের সঙ্গেই।

ইন্দ্র উঠল। পা বাড়িয়ে বলল, কুমুর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

তোর হাতে ওটা কী রে?

ড্যাগার।—ইন্দ্র ছোরাটা দেখাল। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল ফলাটা।

শশাংকের বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। বলল, কী ছেলেমানুষী করিস! পকেটে ঢুকিয়ে রাখ্।

ইন্দ্র কোনো জবাব দিল না। সরু রাস্তা এগিয়ে গিয়ে মাঝারি একটা রাস্তায় মিশেছে। খোয়াঢাকা রাস্তা। যথেষ্ট ফাঁকা—কিছু ঝোপঝাড় চারদিকে। ওপাশে খেলার মাঠ, স্কুল। ইন্দ্র হঠাৎ বলল, তুই যা! আমি একটু ঘুরব।

শশাংক হন হন করে চলে গেল। যেন পালিয়ে বাঁচল!···

শুভদের বাড়ির পেছন দিয়ে ইন্দ্রদের বাড়ি ঢোকার রাস্তা। রাস্তাটা হাতচারেক চওড়া। অন্যপাশে আগাছার বন। কতকাল থেকে একটা ভাঙাচোরা মরচেধরা মোটরগাড়ি ওই জঙ্গলে পড়ে আছে। একসময়ে ওই গলিরাস্তায় একটা গোখরো সাপকে শুয়ে থাকতে দেখা যেত। বড় শান্ত আর নিরীহ সেই সাপ। ঘাটের বাজারে অনেকটা রাত অব্দি আড্ডা দিয়ে ইন্দের বাবা ভক্তিব্রত বাড়ি ফিরতেন। তখন বিদ্যুৎ ছিল না রানীরঘাটে। ভক্তিব্রতের হাতে থাকত একটা লণ্ঠন আর ছড়ি। গলির মুখে এসে চাপাস্বরে ধমক দিতেন, সর্ সর্। সরে যা না হারামজাদী! তারপর

ছড়ি নাচিয়ে মাটিতে থপাস থপাস করে লাথি মারতেন।
সাপটা থাক আর নাই থাক, ভক্তিব্রতের এই ছিল অভ্যাস। বাস্তুসাপ মারতে নেই। বেদে ডেকে এনে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার কথা ভুলেও ভাবতেন না। নেশার ঘোরে মাঝে মাঝে সাপটার সঙ্গে তাঁকে বাক্যালাপ করতেও দেখা গেছে।
তাঁর লিভার পচে মৃত্যুর পর ইন্দ্র সাপটাকে মেরেছিল। বাবার কথা শুনে-শুনে তার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল সাপটা মেয়ে। তাকে মেরে তার জোড়াটাকে খুব খুঁজেছিল ইন্দ্র। জরাজীর্ণ বাড়িটার তিনপাশেই জঙ্গল আর গর্ত। একটা ঘর ধ্বসে গিয়েছিল। পুরুষ সাপটা সেখানেও লুকিয়ে থাকতে পারে। ইন্দ্র তার পাত্তা পায় নি।
বাস্তুসাপ মারলে নাকি অকল্যাণ হয়। নতুন করে কী আর হবে? ইন্দ্র জ্ঞান হওয়া তক দেখেছে একটা পুরনো ক্ষয়াটে, হাড়জিরজিরে, প্রচণ্ড গরিব সংসারে সে আছে। বাড়ির পেছনে পঞ্চাশ পা হাঁটলে গঙ্গা। বাড়ির ওপর সারাক্ষণ একটা বটগাছের কালো ছায়া পড়ে আছে। উঠোনে একচিলতে রোদ পড়ে সেই বেলা গড়িয়ে। চিরদিন চুল শুকোতে তার মাকে যেতে হয়েছে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গঙ্গার পাড়ে। ঘাসে বসে চুল শুকোতেন মলিনা। পাশে একটা ছোট্ট ডালায় মাসকলাইয়ের বড়ি! কখনও দুখিনীর মতো ওখানে বসেই চালের কাঁকর বাছতেন।
খিড়কির দরজায় কখনও দাঁড়িয়ে ইন্দ্রের হঠাৎ মনে হয়, ঘাসের ওপর রোদে পিঠ দিয়ে তার মা গঙ্গামুখো হয়ে বসে আছেন। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে সে বাড়িতে মাকে না দেখলে খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে চেরা গলায় ডাক ছাড়ত। চমকে উঠে পেছন ফিরতেন মলিনা। শেষবেলার রোদে মুখে হাসি চকচক করত।
জামাইবাবু হরিশংকর ডাকছিল, ইনা! ও ইনা! মাস্টারমশাই এসেছেন!
ইন্দ্র খিড়কিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ড্যাগারটা দিয়ে আনমনে একটা শুকনো ডাল চাঁছছিল। বিরক্ত হয়ে বলল, কে, মাস্টারমশাই? যাচ্ছি।
বারান্দার খানিকটা চৌকো অংশ এগিয়ে উঠোনে ঢুকেছে। খোলামেলা একটু চত্বরের মতো। ওখানে বসে ইন্দ্রের বাবা ভক্তিব্রত মাতলামি করতেন। ডোমপাড়ায় তাড়ি গিলে এসে বলতেন, রাঘব আজ হুইস্কি খাওয়ালে! ধুস শালা! হুইস্কি না ঘোড়ার পেচ্ছাপ! দিশি জিনিস তালের তাড়ির কোনো তুলনা হয় না। ও আনু, হবে নাকি একপাত্তর?…সরি, তুমি তো ছেলেঠ্যাঙানো পণ্ডিত! তোমাকে বললেও পাপ হয়।
আনন্দময় চত্বরে মোড়ায় বসে যেন তাড়ির গন্ধ পাচ্ছিলেন। আগের দিনের মতোই। কে জানে ভক্তিব্রতের জামাই হরিশংকরও একই লাইনের লোক কি না। ঘাটে কল্যাণ ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে কম্পাউণ্ডারি করে হরিশংকর। চেহারা দেখে মাতাল-মাতাল লাগে।
ইন্দ্রের কথা কানে এলে আনন্দময় দ্রুত সাড়া দিলেন।—ইন্দ্রনাথ! এস বাবা,

একবার দেখি তোমাকে।

ইন্দ্র এসে উঠোনে দাঁড়াল।

আনন্দময় ওর হাতে ছোরা দেখে চমকে উঠেছিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, দুদিন থেকে ভাবছি আসব-আসব। ভরসা পাচ্ছিলাম না বাবা, খুলেই বলছি তোমাকে। ছিলে কেমন—আছ কেমন বলো ?

ইন্দ্র আস্তে বলল, যেমন রেখেছিলেন স্যার।

আনন্দময় কাঁচুমাচু মুখে বললেন, একটা মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং বাবা ইন্দ্রনাথ ! সেই এক্সপ্লানেশান দিতেই এসেছি। আফটাব অল, তুমিও আমার প্রিয় ছাত্র ছিলে। দেখ, আমার সব আঙুলই সমান। চোট পড়লে সব আঙুলেই ব্যথা লাগে।

ইন্দ্র একটু হাসল।—ছাড়া পেয়েছি বলে স্যার কি খুব ভয় পেয়েছেন ?

আনন্দময় জোরে হাসবার চেষ্টা করলেন।—আমাকে দারোগাবাবু খামোকা সাক্ষী করেছিলেন। আমি কী বলেছিলাম সেশানকোর্টে, সেও তো নিজের কানে শুনেছিলে ইন্দ্রনাথ ! বলো, তোমার বিরুদ্ধে একটা বাক্যও উচ্চারণ করেছিলাম নাকি। স্রেফ বলেছিলাম, আমি কিছু দেখিনি স্বচক্ষে। তবে ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলাম। সবই শোনা কথা।

ইন্দ্র বললে, ছেড়ে দিন।

ইন্দ্রের দিদি শ্যামলী পাতকুয়োর ধারে বসে কাপড় কাচছিল। ঘুরে একটু বাঁকা হেসে বলল, ইনাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে বানীরঘাটে কেউ চেষ্টার ত্রুটি করেনি মাস্টারমশাই ! তখন তো দেখেছি, চেনা লোক মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। এই বাড়ির অংশ বন্ধক রেখে যে মামলা চালাব, তাতেও কত ভাঙচি দিয়েছে সবাই। বলেছে, শুভরা জমির শরিক। গণ্ডগোল আছে।

হরিশংকর বউকে চাপা গলায় ধমক দিল।—তুমি থামো দিকি ! যা হবার তা হয়ে গেছে, আর ও নিয়ে কথা কী ?

শ্যামলী তবু আপনমনে গজগজ করতে থাকল। আনন্দময় বললেন, তুমি আমার প্রিয় ছাত্র ছিলে ইন্দ্রনাথ। তোমাকে ভয় করব কেন ? তাছাড়া আমি বুড়োমানুষ। নানান অসুখে ভুগছি। তুমি যদি মারো আমাকে, বেঁচে যাই।

শুকনো হাসি হাসলেন আনন্দময়। ইন্দ্র বলল, ফিরে এসে দেখছি, হঠাৎ যেন খাতির বেড়ে গেছে আমার। আগে যারা পাত্তা দিত না, এখন ডেকে আলাপ করে। আমি তো অবাক। ঘেন্না ধরিয়ে দিল শালারা।

বলেই সে ফের খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল। আনন্দময় অপমানিত বোধ করছিলেন। গম্ভীর হয়ে গেলেন। হরিশংকর চাপা গলায় বলল, ইনার একটু যেন মাথার গণ্ডগোল হয়ে গেছে। বুঝলেন মাস্টারমশাই ? এমন তো ছিল না। একটু-আধটু দুষ্টুমি বা মারপিট করত কখনও-সখনও। কিন্তু এমন সব সময় মেজাজ করে থাকত না।

শ্যামলী শক্ত মুখে বলল, হবে না মেজাজ ? ঘেন্না ধরবে না মনে ?
এই মেয়েছেলেটার বেজায় মুখ হয়েছে দেখছি।—হরিশংকর তেড়ে গেল।—মানুষজন মানামানি নেই। সবার সামনে খালি ধানাই-পানাই কথা। মুখ বুজে থাকতে পার না একটুও।
শ্যামলী পাল্টা চেঁচাল।……তুমি মুখ বুজে থাকো। আমি থাকব না। কাকে ভয়—কিসের ভয় ?
আনন্দময় বেগতিক বুঝে বললেন, উঠি হরিশংকর।
গলি রাস্তায় পেছন পেছন এগিয়ে হরিশংকর চাপা গলায় বলল, কী বলব মাস্টার-মশাই ! এদের বংশটাই এমনি তেজী। তাও যদি পয়সাকড়ি থাকত, তাহলে তো হাতে মাথা কাটত। আমার হয়েছে জ্বালা। না পারি গিলতে, না পারি ফেলতে।
আনন্দময় আনমনে বললেন, কিসের ?
আমার এই ভুতুড়ে বাড়িতে আর থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না মাস্টারমশাই। হরিশংকর সাবধানে বলল।—বেশ ছিলাম বর্ধমানে। শাশুড়ি মারা গেলে শ্বশুর-মশাই ভুজুং-ভাজুং দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে এলেন। বললেন, রানীরঘাট উঠতি জায়গা। কিছুদিন পরে নিজেই ডিসপেন্সারি খুলে বসতে পারবে। তো…
আনন্দময় বললেন, খুললেই পারো। তোমার তো ভালই এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে।
হরিশংকর সে কথায় কান করল না।—বলল, কেন ডেকে এনেছিল পরে টের পেলাম : ঘরের কথা বাইরে বলতে নেই। তবে আপনি সজ্জন মানুষ। আপনাকেই বলি। আমি না এলে শ্বশুরমশাইকে ভিক্ষে করে খেতে হত। ভাইয়ের সঙ্গে মামলা করে তাকে চটিয়ে রেখেছিলেন। ওদিকে ঘরে ওই ধর্মের পাঁঠা—মানে, কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন তো ?
আনন্দময় একটু হেসে বললেন, ইন্দ্র ?
আবার কে !—হরিশংকর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল।—দুঃখের কথা কাকে কী বলব মাস্টারমশাই—ইনা এত বাড় বেড়েছিল যে আমার গায়ে পর্যন্ত হাত তুলতে শুরু করেছিল !
আনন্দময়ের ভাল লাগছিল না এসব কথা শুনতে। ভুলবোঝাবুঝিটা মেটাতে এসেছিলেন। তার চেয়ে বড় কথাটা বলার ছিল ইন্দ্রকে, স্নেহাকরের প্রকৃত খুনী তাহলে কে ? তাকে খুঁজে বের করা দরকার। ফুলের মতো নিষ্পাপ একটা তাজা জীবনকে ব্যর্থ করে দিল যে শয়তান, তার একটা যোগ্য শাস্তি হওয়া উচিত নয় কি ?
বললেন, আসি হরিশংকর। আজ বুঝি ডিসপেন্সারিতে যাবে না ?
হরিশংকর সঙ্গ ছাড়ল না। হাঁটতে হাঁটতে বলল পাপের ফল ভুগছে ইনা। নেহাত শ্বশুর শাশুড়ির মুখ চেয়ে এ মামলায় আমি ছোটাছুটি করে বেরিয়েছি। যেখানেই থাকুন, ওনাদের, আত্মার তো অগোচর নেই কিছু। কি বলেন মাস্টারমশাই ?

আনন্দময় হুঁ দিলেন।

তবে আর না, খুব হয়েছে।—হরিশংকর চাপা স্বরে বলল।—এই নরকে পড়ে থাকলে আবার কী ঝামেলা পোয়াতে হবে কে জানে! ইনার হাতে ড্যাগার দেখলেন তো! কোন ড্যাগারটা বলুন তো?

আনন্দময় থমকে দাঁড়ালেন।

হরিশংকর চারদিক দেখে নিয়ে গলা আরও খাটো করে বলল, সেই ড্যাগারটা। যেটা দিয়ে রাজেনদার ছেলেকে স্ট্যাব করেছিল।

আনন্দময় হেসে ফেললেন। বললেন, না হে, না! ইন্দ্র স্নেহাকরকে খুন করে নি। কাজেই ও মার্ডার-উইপন পাবে কোথায়? তাছাড়া মার্ডার-উইপন পুলিশও খুঁজে পায় নি।

হরিশংকর সন্দিগ্ধ ভাবে বলল, কিন্তু ইনা যে ওর দিদিকে বলেছে, ওই দিয়েই…

মিথ্যা বলেছে।

কথাটা শুনুন না! ও দিদিকে বলেছে, ড্যাগারটা বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা ঝোপে পড়ে ছিল। পরে একজন ওটা কুড়িয়ে পায়। সে-ই নাকি ইনাকে ড্যাগারটা দিয়েছে।

আনন্দময় হাসতে হাসতে মাথা দুলিয়ে বললেন, না, না। সব বাজে কথা।

হরিশংকরের মনঃপুত হল না একথা। বলল, দিদিকে মিথ্যা বলে না ইনা। আমি তা জানি। তবে আমার কিন্ত ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না মাস্টারমশাই। ইন্দ্র আবার কাউকে ঝাড়বার তালে আছে। ওর মতিগতি একেবারে ভাল ঠেকছে না।

আনন্দময় পা বাড়ালেন। দশটা নাগাদ শহরে যাবার তাগিদ আছে। নিরুর মাকে সঙ্গে নিয়ে হেমন্তবাবু উকিলের বাড়ি যাবেন। উকিলগিন্নি নিরুর ব্যাপারে একটা খবর দিয়েছেন। ছেলেটি নাকি কালেক্টরিতে চাকরি করে। সদ্বংশজাত। শহরে নিজেদের বাড়িও আছে।

খোয়াঢাকা রাস্তার একধারে কয়েকটা নতুন গড়নের বাড়ি, অন্যধারে আগাছার বন আর গাছপালার ফাঁকে পুরনো বসতি। টালি ও টিনের চাল, কোনটা একতালা পুরনো দালান। হরিশংকর তখনও সঙ্গ ছাড়েনি। নিজের বিড়ম্বনার কথা বলতে বলতে আসছে।… দেখবেন, আর এই দুটো মাস। তারপর এ শর্মা কাট্ করবে। সাপে-নেউলে একজায়গায় থাকা চলে না। কিছুতেই না। মাস্টারমশাই, ইনা যতই সাধু সাজুক এখন, খুন যে সেই করেছিল তাতে কোনো ভুল নেই। নিজেও তো এতকাল ধরে কিছুকিছু দেখেছি ওর মস্তানী! ডিসপেনসারি থেকে লক্ষ্য করতাম, বাঁদরটা ঘাটোয়ারির গদীর কাছে ঠিক ঘাটের মাথায় বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকা থেকে কোনো মেয়ে এলে কিংবা নৌকোয় চাপতে গেলেই প্যাঁক দিচ্ছে হারামজাদা। একবার কী হয়েছিল আপনি হয়তো জানেন না। এস ডি ও সায়েবের বউয়ের পেছনে প্যাঁক দিয়েছিল। তারপর সে এক কেলেংকারি। রোজ পুলিশ

এসে বাড়িতে হামলা করে। ইনা গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। শেষে আপনা-আপনি থেমে গেল। বললাম, এসব তুই কেন করিস বল্ তো? নাকি বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে? হয়ে থাকলে বল, পাত্রী দেখি। শুনে শুয়োরের বাচ্চা দড়াম করে এক ঘুষি আমার থুতনিতে। ওর দিদির সামনে!

হরিশংকর দম নিয়ে বলল, পরে ওর দিদির কথায় পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিল। আমিও ভাবলাম, বয়স কম—তার ওপর বাবা-মার শাসন ছিল না। কী আর করা? তবে ওর মধ্যে খুনী যে ছিল, সেটা আমি ভালই জানতাম। আমার শাশুড়ি বলতেন, ইনার দিদিও বলত—ছেলেবেলায় কেমনধারা চালচলন ছিল, সব বলত। রানীরঘাটে শেয়ালের বংশ নাকি ইনাই শেষ করে দিয়েছে। গঙ্গার পাড়ে শেয়ালের গর্তে আগুন ধরিয়ে দিত ইনা। গর্ত খুঁড়ে ছানাগুলোকে বের করে মুণ্ডু কাটত।

আনন্দময় দাঁড়ালেন। বললেন, সেটা সত্যি হে! একবার বেড়াতে বেরিয়েছি, দেখি ডোমপাড়ার ওখানে ইন্দ্র একদল ছেলে নিয়ে খেলছে। আমাকে দেখেই সবাই পালিয়ে গেল। গিয়ে আমার চক্ষুস্থির। কাদা দিয়ে বেদী বানিয়েছে! তার ওপর একটা মূর্তিটুর্তি বসিয়ে রেখেছে। তার সামনে ঘাসের ওপর মুণ্ডুকাটা কয়েকটা শেয়ালের বাচ্চা পড়ে আছে। রক্তারক্তি ব্যাপার। বীভৎস!

হরিশংকর সায় পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে বলল, শুধু শেয়াল? পাখি? শাশুড়ি বলতেন, ইনার ভয়ে রানীরঘাটে আর আগের মতো রঙবেরঙের পাখি আসে না বাবা! কত পাখি বাসা করত গাছপালায়। ডিম ভেঙে বাসা তছনছ করে ইনা পাখির বংশ উজাড় করে ফেলেছিল। আসলে ওর রক্তে এসব আছে মাস্টারমশাই। কেউ যদি হলপ করে বলে, রাজেনদার ছেলেকে ইনা মার্ডার করেনি, আমি বিশ্বাস করি না—করবও না। শুওরের বাচ্চার প্রাণে দয়ামায়া এতটুকু নেই মাস্টারমশাই।

আনন্দময় নড়ে উঠলেন।—সর্বনাশ! দশটা বেজে এল যে! ওপারে যেতে হবে। বলেই হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। হরিশংকর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শিরিষ গাছের তলায়।…

লনের কোণায় কদমগাছটার তলায় ইজেল রেখে শুভ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ইজেলে ক্যানভাস আঁটা। একটা সাদামাটা প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকবে, নাকি মানুষ—সাদাসিদে ধরনেরই কোনো মানুষ, এই গঞ্জেরই মানুষ—ঠিক করতে পারছিল না। মাথায় একটা থিম খেলছে কদিন থেকে। সেটা হল প্রাকৃতিক স্বাধীনতা। নদীর স্রোত, গাছের ঋজুতা, বিস্ফোরণের মতো কাঁটায় ভরা একটা ক্যাকটাস—পরমাণুশক্তির বিস্ফোরণের সঙ্গে যার মিল থাকবে, কিংবা কালো নৌকোর স্টিমলাইনে গতিব্যঞ্জক কিছু সংকেত, যে-নৌকোর কোনো মাঝি নেই—এসব উপসর্গ তাকে জ্বরভাবে আক্রান্ত করেছিল।

শুভ ভাবছিল, মানুষের মুখচোখে, অবয়বেও কি প্রাকৃতিক স্বাধীনতার সংকেত নেই ? একজন সাদাসিদে মানুষের মধ্যেই তা তো থাকা উচিত—এমন মানুষ, যার মধ্যে সভ্যতার আব্রু নেই, সংস্কার নেই, সাবলীলতা আছে। অথচ নিজে যে টের পায় না কিছু। টের পায় না তার দুহাতের দৈর্ঘে তার পদক্ষেপে স্বাধীনতা উপচে পড়ে।

পুবের হাওয়াটা চলে গেছে। আকাশ বরং আরও নীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আবহাওয়া তত গুমোট নেই। গাছতলা জুড়ে কদমফুলের হলুদ রেণু ছড়িয়ে রয়েছে। শুভ টেনশান ঘোচাতে সিগারেট ধরাল ফের। আগের টুকরোটা এখনও কচি ঘাস ও শুকনো পাতার ফাঁকে ধোঁয়াচ্ছে। খুব বেশি ছবি সে আঁকে না। কলকাতায় তার ছবি আঁকার নেশা বেড়ে যায়, অথচ এখানে এলেই কী বিশ্রি আলস্যি! এই থিমটাকে তার মুক্তি দিতেই হবে। ক্যানভাসে শাদা বেস তৈরি করে আরও মুশকিলে পড়ে গেছে সে পারস্পেকটিভ খুঁজে বের করতে পারছে না।

সিগারেট টানতে টানতে সে ঘুরে ফাঁকা জমিটার ওপর দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আরও একটু বাঁদিকে ঘুরে বটগাছটার দিকে তাকাল। দেখল, একটা ঝুরিতে হেলান দিয়ে ইন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে। দূরত্ব বেশি নয়, একশো গজের মতো। ইন্দ্রদের বাড়ির পেছনে ওই বটগাছটা ডালপালা ছড়িয়ে বাড়িটাকে গিলে ফেলতে চাইছে কতকাল থেকে। ওটা শুভদেরও বাড়ি ছিল একসময়। ইন্দ্র ও তার ঠাকুরদাও নাকি ওই বাড়িতে শৈশব কাটিয়েছিলেন। শুভর বাবা শক্তিব্রত এবং ইন্দ্রের বাবা ভক্তিব্রত পরস্পর বিরোধী-চরিত্রের মানুষ। শক্তিব্রত লায়েক হয়েই পৃথগান্ন হন। তারপর বাড়িটার একাংশ ভেঙে এই নতুন বাড়ি করেছিলেন। ভক্তিব্রত পুরনো অংশটার চেহারা বদলাতে পারেন নি। এমন কী ছোটভাই বেশি জায়গা নিয়েছে বলে মামলা করে ফতুর হয়েছিলেন। তার ওপর নেশাভাঙ। জরাজীর্ণ বাড়িটার অবস্থা এখনও তেমনি হয়ে আছে। শ্যামলী আর তার বর আসার পর ছাদটা একটু মেরামত করেছিল। নৈলে এতদিনে ভেঙে পড়ত।

শুভ বুঝতে পারছিল না ইন্দ্র ওখানে কী করছে। সে কয়েক পা এগিয়ে নিচু পাঁচিলের কাছে গেল। সেইসময় ইন্দ্রও ঘুরে তাকে দেখতে পেল। হনহন করে এগিয়ে আসছিল সে। পোড়ো জমিটা পিটুলিঝোপে ভরা। তার ভেতর দিয়ে ইন্দ্রকে আসতে দেখে শুভ হাসল। ইন্দ্র বরাবর এমনি করে বদবাদাড় ভেঙে চলাফেরা করে। সাপের ভয় করে না। পুরনো বাড়ির যে বাস্তুসাপটাকে অথবা সাপিনীকে ইন্দ্র মেরেছিল, পারিবারিক বিশ্বাস—তাদের বংশধররা এখনও আনাচে-কানাচে জীবনযাপন করছে।

ইন্দ্র বলল, ছবি আঁকছিস নাকি ?

শুভ বলল, চেষ্টা করছি। আসছে না রে! আয় আড্ডা মারি।

নিচু পাঁচিল ডিঙিয়ে ইন্দ্র লনে ঢুকল। তারপর ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল,

ধ্বস ! কিছুই তো দেখছি না ।

শুভ ঘাসে বসে বলল, বোস্ । সিগারেট খা ।—সে ইন্দ্রকে সিগারেট দিল ।

ইন্দ্রের হাতে ড্যাগারটা আছে । জেল থেকে ফেরার পর যখন কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে এল, তখনও তার হাতে এটা ছিল । ড্যাগার দিয়ে ঘাসের ওপর আঁচড় কাটতে গিয়ে ইন্দ্র বলল, সরি ।

শুভ বলল, তোকে একটা কথা বলি ইনা । এভাবে ছুরিটুরি নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরিস না । আসলে এ দিয়ে কিছু হয় না ।

ইন্দ্র সিগারেটটা শুভর সিগারেটের আগুনে ধরিয়ে নিয়ে আনমনে বলল, কিসে হয় ? রিভলবার দিয়ে ? না বোমা দিয়ে ?—সে খিক খিক করে একটু হাসল ।

ছেলেমানুষী করার বয়স তোর নেই ইনা ।—শুভ বলল শান্ত ভাবে ।—তুই বলেছিস বলে নয়, আমি জানি তুই স্নেহাকরকে স্ট্যাব করিসনি । তোকে বুদ্ধির দোষে খামোকা ভুগতে হয়েছে । কিন্তু যেভাবেই হোক, ব্যাপারটা যখন চুকে গেছে আর ও নিয়ে ঝামেলা করতে যাস নে ।

ইন্দ্র মুখ নামিয়ে গলার ভেতর বলল, আমি ভুগেছি বলে না ।

তবে ?

স্নেহাকরের জন্যে ।

স্নেহাকরের জন্যে কী ?—শুভ একটু ঝুঁকে গেল ওর দিকে ।—শোধ নিবি ? তুই কি জানিস কে ওকে অন্ধকারে গণ্ডগোলের মধ্যে স্ট্যাব করল ?

ইন্দ্র মাথা দোলাল ।

শুভ বলল, আমি বিপুলদার দোকানে বসে ছিলুম তখন । টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল । বাসস্ট্যাণ্ডের ওই অংশটা ছিল পুরো অন্ধকার । তার মধ্যে অসংখ্য লোক থিকথিক করছিল । হঠাৎ খুব হইচই শুনতে পেলাম । বিপুলদার ছেলে ননা দৌড়ে এসে বলল, ইনাদা রাজেন কণ্ডাক্টারের ছেলেকে স্ট্যাব করেছে । শুনেই দৌড়ে গেলাম । অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না । কেউ টর্চ জ্বালল । তখন দেখলাম, তুই স্নেহাকরকে জড়িয়ে ধরে বসে আছিস । পাগলের মতো চ্যাঁচাচ্ছিস, সরে যাও ! সব সরে যাও ! তারপর ইসলাম ড্রাইভার আর সব কারা এসে তোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ।

ইন্দ্র আস্তে বলল, আমার খুব অবাক লেগেছিল, জানিস পুটুদা ?—ইন্দ্র শুভর ছেলেবেলার ডাকনাম উচ্চারণ করল ।—আমি ভীষণ ভাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম । স্নেহাকরকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম গঙ্গাপুজোর মেলায় । তারপর টপটপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল । বাসস্ট্যাণ্ডের পেছনে বাঁশবনটার ভেতর একটা ভাঙাচোরা বাস দাঁড় করানো ছিল, দেখেছিস তো ?

মনে পড়ছে না ।

ছল । সুরিনদা—মানে ডোমপাড়ার সুরেন ড্রাইভার বাসটা চালাত । অ্যাকসিডেণ্টে

সামনের দিকটা দুমড়ে গিয়েছিল। কী যেন মামলা-টামলা হয়েও ছিল—মনে নেই। হাজরাবাবুর বাস।

সে মুখ নামিয়ে কী ভাবতে থাকল। শুভ বলল, তারপর?

ইন্দ্র মুখ তুলে বলল, কী খেয়াল হল—ভাবলাম ওই বাসটার ভেতর গিয়ে বসি। ভিড় ঠেলে কয়েক পা এগিয়েছি, হঠাৎ স্নেহাকরের চ্যাঁচানি শুনতে পেলাম। কী বলে চ্যাঁচাল মনে নেই। কিন্তু গলা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম স্নেহাকরের কিছু হয়েছে। আমি চেঁচিয়ে সাড়া দিলাম। তারপর স্নেহাকর সে বাসটার কাছ থেকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে গেল। তখনও বুঝিনি স্ট্যাব হয়েছে। ওকে দুহাতে তুলে নিয়ে আসছিলাম আলোর দিকে। সেই সময় চেঁচিয়ে উঠল, খুন! খুন! ইনা খুন করেছে!

শুভ তাকাল ওর দিকে। বলল, কে চ্যাঁচাল?

ইন্দ্র বলল, বুঝতে পারিনি। গলাটা খুব চেনা লেগেছিল। ওই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা কঠিন। টর্চের আলো ফেলল কেউ। দেখি স্নেহাকরের তলপেট পুরোটা লাল। তারপর মুকুল, মানু, আর কারা এসে গেল। ওরা বলল, পেটটা বেঁধে দিতে হবে রুমাল দিয়ে। আর আমার কিছু খেয়াল ছিল না।

শুভ ফের বলল, কে চেঁচিয়েছিল বুঝতে পারিস নি?

নাঃ।

শুভ একটু পরে বলল, যে চেঁচিয়েছিল, সেই স্ট্যাব করেছিল, ইনা! বুঝতে পারছিস না!

ইন্দ্র একটু হাসল! আমার বুদ্ধি একটু দেরিতে খোলে রে পুটুদা। পরে জেল-হাজতে ঘটনাটা তন্নতন্ন করে ভাবতাম। এ একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল যেন।

শুভ বলল, কিন্তু স্নেহাকরকে কে মার্ডার করতে পারে ভেবে পাই নে। এত ভাল ছেলে। দোষের মধ্যে খালি ওই একটা—লোকের মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলা। কোথাও কিছু ঘটলে নাক না গলিয়ে ছাড়ত না। প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইনসাল্টেড হত। অথচ ওই অভ্যাস।

ইন্দ্র বলল, কেসটা এমন করে সাজিয়েছিল যেন আমি গঙ্গাপুজোয় আসা মেয়েদের পেছনে লেগেছিলাম আর স্নেহাকর তাতে প্রটেস্ট করেছিল। তাই আমি ওকে স্ট্যাব করেছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার পুটুদা কোন গাঁয়ের একটা মেয়েকেও যোগাড় করেছিল পুলিশ। মামলা চলার সময় তুই কলকাতায়। মেয়েটা কোর্টে দাঁড়িয়ে দিব্যি বলে গেল, এই বাবু আমাকে জ্বালাতন করছিল।

কোথাকার মেয়ে কী নাম?

ইন্দ্র হাসল।—এমন করে বলছিস যেন নাম বললেই চিনে ফেলবি। সুরেন ড্রাইভার চেনে। কাল দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। বলল, মেয়েটা প্রস। পুলিশ কেস সাজাতে ওকে যোগাড় করেছিল।

থাকে কোথায় ?

ওপারে মেছোপট্টিতে।—ইন্দ্র হাসতে লাগল।—আরতি নাম। থাকে মেছোপট্টির গলিতে। কোর্টে বলেছিল কোনো এক…

শুভ কথা কেড়ে বলল, কোনো এক গাঁয়ের বধূ! তারপর সেও হাসতে লাগল।

ইন্দ্র বলল, নীলি নেই পুটুদা ?

কলেজে। কেন ?

চা খাওয়াবি ?

গিয়ে নিয়ে আয় না!—শুভ একটু চটে ওঠার ভঙ্গি করল।—ওঠ্, যা। বড়দি আছে দ্যাখ গে।

ইন্দ্র পা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, উঠতে ইচ্ছে করছে না। জেলে গিয়ে কী এক আলিস্যি ধরে গেছে মাইরি! শুধু চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে।

শুভ উঠল। আড়ামোড়া দিয়ে হাই তুলে লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে চলে গেল। ইন্দ্র আনমনে হঠাৎ ড্যাগারটা কদমগাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। ফলাটা ইঞ্চি দুই ঢুকে স্থির হয়ে রইল। ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে সে শুভর ইজেলের সামনে দাঁড়াল। ক্যানভাস সাদা রঙে ঝকমক করছে। এপাশে-ওপাশে নিচের ঘাসে কয়েকটা পেণ্টের কৌটো, ব্রাশ, তুলি ছড়িয়ে রয়েছে। ইন্দ্র একটা ধাবড়া তুলি নিল। তারপর একটার পর একটা রঙ মাখাতে শুরু করল শাদা ক্যানভাসে।

বাইরের বারান্দা থেকে দেখেই শুভ চেঁচিয়ে উঠেছিল, ইনা! কী করছিস তুই।

সে দৌড়ে লন পেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল।—মাই গুডনেশ! করেছিস কী! ইমপসিবল! রিয়েলি ইট ইজ কোয়াইট আনবিলিভেবল!

ইন্দ্র নির্ভয়ে মিটিমিটি হাসছিল। তুলিটা রেখে শুকনো পাতায় আঙুলের রঙ মুছতে থাকল।

শুভ বলল, একটা মজার গল্প বলি শোন। একবার ইউরোপে ছবির একজিবিশান হচ্ছে। বাঘা-বাঘা সব আর্ট-ক্রিটিক এসেছেন। একটা ছবির প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ! সব আর্টস জার্নালে তাঁরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ছবিটা সম্পর্কে লিখলেন-টিখলেন। শেষে পেইণ্টার নিজেই ফাঁস করে দিলেন—ছবিটা তাঁর পোষা শিম্পাঞ্জীর আঁকা!

শুভ হো হো করে হেসে উঠল। ইন্দ্র বলল, শিম্পাঞ্জীর চেয়ে খারাপ নিশ্চয় আঁকিনি।

সেই তো বলছি।—শুভ ওর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় মারল।—তোর হিউমার বোধ কোনোদিন দেখলাম না ইনা!

চা কই ?

আসছে। ততক্ষণ আরেকটা সিগারেট খা।…বলেই শুভর চোখ পড়ল কদমগাছের গুঁড়িতে। সে লাফিয়ে উঠল। সর্বনাশ করেছে! নীলির চোখে পড়লেই

কেলেংকারি। গাছটা ওর প্রাণ।

সে টানাটানি করে ড্যাগারটা খুলে আনল। ইন্দ্র হাত বাড়িয়ে নিল সেটা। বলল, ভাল্লাগেনা। চা খেয়ে একবার ঘাটের দিকে যাব। পুটুদা, জানিস? কিছুক্ষণ আগে আনুমাস্টার এসেছিল আমাদের বাড়িতে।

তাই বুঝি?—শুভ রঙ-বেরঙের ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর একটা ব্রাশ তুলে নিয়ে ঘষতে শুরু করল।—ইনা, পারস্পেকটিভ পেয়ে গেছি। তোকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইন্দ্র বলল, আনুমাস্টারের ব্যাপারটা দেখে আমার গা জ্বলে যায় মাইরি! যেন ভগবানের অবতার। তুই ডিটেলস জানিস না পুটুদা! আনুমাস্টার ভেতর-ভেতর আমার যাতে সাংঘাতিক কিছু হয়, তার চেষ্টা কম করেনি। ফিরে এসে সব কথা কানে আসছে।

শুভ আনমনে বলল, স্নেহাকরকে স্নেহ করতেন মাস্টারমশাই। মনে জোর বেজেছিল রে। তাছাড়া স্ট্রং মরালিটির মানুষ বরাবর। ওঁর দোষ নেই।

কী বললি? মরালিটি?

হ্যাঁ।—শুভ হেঁট হয়ে একটা তুলি তুলে নিল। পেণ্টের কৌটোয় চুবিয়ে তুলিটা ঝুলিয়ে রাখল। ফোঁটা ফোঁটা রঙ পড়তে থাকল। বলল, তোর ওপর রাগ থাকতেই পারে। কেন তা আশা করি জানিস?

মেয়েদের প্যাঁক খায়ানোর জন্যে তো?

শুভ একটু হাসল।—সম্ভবত তোকে সচ্চরিত্র মনে করেন না মাস্টারমশাই।

ইন্দ্র বলল, শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর!

শুভ তুলিটা নিয়ে ক্যানভাসের ওপর ঝুঁকে বলল, তোর মনে আছে নিশ্চয়—স্কুলে কো-এডুকেশনের কথা উঠলে উনি ভীষণ আপত্তি করেছিলেন। শেষে সব কেঁচে গেল মাস্টারমশায়ের খানিকটা ইনফ্লুয়েন্স তো আছেই রানীরঘাটে। কিন্তু তার ফলটা ভালই হয়েছিল। তাই না?

ইন্দ্র ড্যাগারে ঘাসের বুকে আঁচড় কাটছে। কিছু বলল না।

শুভ একটু পিছিয়ে ক্যানভাসটা দেখতে দেখতে বলল, কেন, মাইনর গার্লস স্কুলটা হল না? ক্রমশ হাইস্কুল হয়ে যাবে দেখবি। শুনলাম, ইটখোলার চাঁদুবাবু কলেজ করার চেষ্টায় আছে। একদিন এপারটাও পুরো টাউন হয়ে যাবে। কলকাতা আর হাওড়ার মতো আর কী!

শুভ এগিয়ে গিয়ে ফের তুলিটা বুলিয়ে বলল, তবে তখন আমি শেয়ালমারায় চলে যাব। বুঝলি ইনা। আই হেট দা ব্ল্যাডি ফুল রানীরঘাট টাউনশিপ! ছেলেবেলায় কী ছিল এখানটা। হেভেন অ্যান্ড হেল ডিফারেন্স! তুই কী বলিস?

ধুস! চা কোথায়?

এসে যাচ্ছে। বস্ না।—শুভ বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, বরং গিয়ে দেখ্ না

তুই।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। তারপর হনহন করে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। শুভ চেঁচিয়ে উঠল, ইনা! কী হচ্ছে? এই ইনা! এটা কিন্তু ইনসাল্টিং!

ইন্দ্র কোনো জবাব দিল না। সোজা এগিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে। শুভ ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তার মনে হল, ইন্দ্র ঠিকই করেছে। অনিমার মুখের চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিল, ইচ্ছে করেই দেরি করবে। ইন্দ্রকে সে যেমন সহ্য করতে পারে না, তেমনি মাও তাকে পছন্দ করেন না। ইন্দ্র বাড়ি ঢুকলে হঠাৎ বাড়িটা কেমন গুমোট হয়ে যায়। বরাবর একরকম।

শুধু নীলি ইন্দ্রকে খাতির করে। ইন্দ্রের নামে বদনাম হলে প্রতিবাদ করে নীলি। নীলি থাকলে কখন চা এনে দিত। পাশে বসে গল্প করত। ইন্দ নীলিকে জেলের গল্প শোনাবে বলেছিল।

শুভর মনটা তেতো হয়ে গেল। আসলে তার এই ভাগ্য। সবাই তাকে অপমান করে অকারণে। তাকে কী সহজে যে ভুল বোঝে লোকেরা! এত কাছে এসেও যদি রত্নার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে ভুল বুঝতে পারে, অন্যরা তো বুঝবেই। শুভ ক্যানভাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কালো নীল সাদা লাল সবুজের ভেতর থেকে একটা অপমানিত ক্রুদ্ধ অসহায় মুখ বেরিয়ে আসছে। স্বাধীনতাহীন, ক্রীতদাস, ভাঙাচোরা সেই মুখ শুভর নিজেরই।...

নিরু সদর দরজা খুললে ইন্দ্র তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকল। তারপর দরজা আটকে দিল। নিরু একটু তফাতে সরে গিয়েছিল। ঠোঁট কামড়ে ধরে ইন্দ্রকে দেখছিল।

ইন্দ্র বলল, চ্যাঁচাবে ভাবছ নাকি?

নিরু শক্ত গলায় বলল, আগে ওটা ফেলে দাও!

ইন্দ্র হাসল। এটাকে কেন এত ভয় নিরু? এটা তো তুমিই যত্ন করে কুড়িয়ে রেখেছিলে।

নিরু ছোট করে শ্বাস ফেলে বলল, তোমাকে ওটা সারাক্ষণ সবাইকে দেখিয়ে বেড়ানোর জন্য দিই নি!

বড় রোদ! চলো, বারান্দায় যাই।—বলে ইন্দ্র সিঁড়ি বেয়ে উঁচু বারান্দায় উঠল। নিরু এসে থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

একটু চা খাওয়াবে?

আঁচ নিভে গেছে।—নিরু আস্তে বলল।—এত বেলায় চা কেন? ভাত খাবে তো বলো!

ইন্দ্র মাথা নাড়ল। এত সকাল-সকাল ভাত-ফাত খাওয়া অভ্যাস নেই।

একা আছি কেমন করে জানলে? সবসময় ওঁত পেতে বেড়াও নাকি?

ঘাটে তোমার গার্জেনদের সঙ্গে দেখা হল। তুমি অত গম্ভীর কেন নিরু? একটু হেসে-টেসে কথা বলো। আজ আমার কিচ্ছু ভাল্লাগছেনা! কী যে করি!…ইন্দ্র ড্যাগারের উল্টো পিঠে বাঁহাতের মুঠোর ওপর মৃদু আঘাত করতে থাকল।

নিরু বলল, কুমু কী করে বেড়াচ্ছে শুনেছ?

কুমু? কী করছে বলো তো?

তোমার নামে পিটিশন লিখে সই করিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমাকে মিশায় ধরিয়ে দেবে!

মিশা? ইন্দ্র একটু চুপ করে থেকে বলল, কে বলল তোমাকে?

কাল সন্ধ্যার পর বাবার সই নিতে এসেছিল।

সই দিলেন মাস্টারমশাই?

নিরু চুপ করে থাকল।

ইন্দ্র প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, বলো!

আঃ চেঁচাচ্ছ কেন? আমি দেখিনি। রান্নাঘরের বারান্দায় ছিলাম।

ইন্দ একটু হাসল। লুকোনোর দরকার নেই নিরু। স্যার সই দেবেন আমি জানি। আমি খালাস পাওয়াতে স্যার ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। কিন্তু বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

নিরু ওর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় মেরে বলল, অসভ্যতা কোরো না তো!

আমি কি সত্যি খুব অসভ্য? কুমুর মতো? ইন্দ্র ওর মুখটা দেখে নিয়ে ফের বলল, স্নেহাকরের মতো?

নিরু হিসহিস করে বলল, জেলে ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে কাটিয়ে তুমি কী নির্লজ্জ হয়ে উঠেছ ইনা। ছিঃ!

ইন্দ্র মিটিমিটি হাসছিল।—আমি বরাবর জানি, তুমি স্নেহাকরকে…নিরু শক্ত গলায় বলল, না।

কিন্তু কতদিন দেখেছি আশ্রমের ঘাটে তুমি আর স্নেহাকর বসে আছ।

নিরু চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এমনি গল্প করতাম। ও কিছু না। কেন? কুমুর সঙ্গে তো গল্প করেছি কতদিন। কুমুদের বাড়িতে গেছি। কুমুও এসেছে। সবসময় বাবা মা যে থাকতেন, তাও না। আর তোমার সঙ্গেও কি নিরিবিলি গল্প করিনি কতদিন? যাইনি তোমাদের বাড়িতে?

ইন্দ্র বলল, তোমার বাবার চেয়ারটাতে বসব?

ন্যাকামি কোরো না!

কী জানি, পাপী তাপী-মার্ডারার মানুষ—যা ছোঁব তাতেই পাপ লাগবে। রক্ত মেখে যাবে। জানো? আমাকে সবাই খাতির করছে অথচ কেউ বসতে বলে না? …ইন্দ্র চেয়ারটাতে বসে বাঁকা মুখে বলল, ঘেন্না ধরে যায় শালা মানুষের ওপর! আসছি বলে নিরু চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। একটু পরে ফিরে এল চা নিয়ে। ইন্দ্র বলল, ম্যাজিক নাকি?

নিরু পাশে ন্যাড়া তক্তাপোষটার ওপর বসে বলল, কুমুকে তুমি কিছু বলবে না ?

কী বলব বলো তো ?—ইন্দ্র খিকখিক করে হাসতে লাগল। চা ছলকে পড়ল কাপ থেকে। সামলে নিয়ে ফের বলল, লোকের ওপর বেশি ঘেন্না হলে ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করে।

নিরু বাঁকা হেসে বলল, ইস ! জেলে গিয়ে সাধুমহাত্মা হয়ে গেছ দেখছি। বাবার আশ্রমে গিয়ে না ঢোকো শেষ পর্যন্ত !

ইন্দ্র ভুরু কুঁচকে ওর চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি কি বলতে চাইছ—এই ড্যাগারটা দিয়ে কুমুকে…

আমি তোমার মতো ছেলে হলে ঠিক তাই করতাম !

আমি জানি, তোমার সাহস আছে ! ক্ষমতা আছে। তুমি ভীষণ ডানপিটে মেয়ে। —ইন্দ্র নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলতে থাকল।…হয়তো কুমু এমন সাংঘাতিক কিছু করেছে, তুমি ওকে ক্ষমা করতে পারছ না ! কিন্তু কুমুর ওপর আমার রাগ হয় না। কেন জানো ? ও মানুষ নয়—একটা ছুঁচো। ছুঁচোর গায়ে হাত দেওয়ার অর্থ হয় না। তাছাড়া আর আমার জেলে যেতে একটুও ইচ্ছে নেই। আর নিরু, তুমি হয়তো বলতে চাইছ, স্নেহাকরকে কুমুই স্ট্যাব করেছে—তাই না ?

নিরু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, করেছে। আমি দেখেছি।

ইন্দ্র ওর চোখে চোখ রেখে বলল, দেখেছ ? তখন ওখানে ছিলে তুমি ?

ছিলাম। ভাঙ্গা বাসটার ভেতর আমি আর স্নেহাকর বসে কথা বলছিলাম। বৃষ্টি এসে গেল তাই…

ওকে থামিয়ে ইন্দ্র বলল, অন্ধকারে তুমি দেখতে পেলে কুমু স্ট্যাব করছে স্নেহাকরকে ?

আঃ ! বলতে দাও ব্যাপারটা।

ইন্দ্র চা-টুকু গিলে কাপ নামিয়ে রেখে বলল, বলো !

নিরু আস্তে বলল, আমরা কথা বলছি। হঠাৎ অন্ধকারে বাসটার দরজায় কে এসে টর্চ জ্বালল। অমনি স্নেহাকর বলল, কে ? জবাব এল না। আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তাছাড়া ভীষণ ভড়কে গিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ঘুরে বসেছি ! টর্চ নিভছে না দেখেই স্নেহাকর উঠে গেল। ওর রাগ হয়েছিল। তারপর যেই নেমেছে টর্চ নিভে গেল—তারপরই স্নেহাকর গোঙিয়ে উঠল।

তুমি কী করলে ?

আমি তক্ষুনি নেমে এলাম।

নিরু মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। ইন্দ্র বলল, তারপর পালিয়ে গেলে ?

হুঁ।

সেটা স্বাভাবিক। তুমি মেয়ে। তাছাড়া আনু-স্যারের মেয়ে। কিন্তু সে কুমু—কীভাবে বুঝলে ?

ওটা বোঝা যায়। তাছাড়া আর কে হতে পারে?
ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল হঠাৎ।—নিরু চলি। আরও কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু থাক। তোমার প্রব্লেম আসতে পারে। বাড়িতে আর কেউ নেই।
নিরু ঝাঁঝাল স্বরে বলল, তুমি মহাপুরুষ! তাই অমন করে দরজা এঁটে দিলে তখন।
ইন্দ্র একটু হাসল।—বারবার ইচ্ছে বদলে যাচ্ছে, জানো। মনের ভেতর হাজারটা ইচ্ছে ঘুরপাক খাচ্ছে। দরজা খুললে যখন, তখনকার ইচ্ছে কোথায় সরে গেছে। আসলে আমার কিছু ভাল লাগছে না নিরু। কী যে করি!
সে সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে উঠোনে নামল। তারপর বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।
নিরু কতক্ষণ পরে গিয়ে দরজার বাইরে উঁকি দিল। রাস্তা নির্জন। সে দরজা এঁটে ঘুরে একটুখানি দাঁড়িয়ে রইল। ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে কলতলার দিকে হেঁটে গেল।

একটানা খরার পর রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টিটা জমিয়ে দিল দিনের দিকে। গঙ্গার ওপর ধূসর পর্দা কাঁপতে থাকল। ঘাটোয়ারীজীর গদিতে এসেই বিপদ হয়েছে আনন্দময়ের। পুরনো ছাতাটা যে বেজায় কমজোর হয়ে গেছে, অনুমান করতে পারেন নি। আসার সময় বারতিনেক উল্টেছে। ভিজেছেন আষ্টেপিষ্টে।
জামাকাপড় গায়ে শুকিয়ে গেল। চৌবেজী মাথার ওপর বেড়াজালে ঘেরা ছোট্ট ফ্যান খুলে দিয়েছিলেন। ইটের পলকা দেয়ালের মাথায় টালির তেচালা ঘর। সামনে উঁচু তক্তাপোষ। তার ওপর তোষক সাদা চাদরে ঢাকা। বড় বড় কয়েকটা তাকিয়া আছে। তক্তাপোষের পেছনে খানিকটা অংশে টিনের পার্টিশান। ওখানে চৌবেজী স্বপাক খান। দড়ির আলনায় একটা গামছা ঝুলছে মাত্র। বোঝা যায় না লাখপতি লোক। বছরে আটানব্বুই হাজার টাকায় ঘাট ডেকে নেন কালেকটারির নিলামে।
ভাতিজা রামলাল বাঁশের বেড়ার মুখে বসে পারানি গুনে নেয়। গাড়িটাড়ির ফটক নিচের দিকে। এ বৃষ্টিতে একদঙ্গল গরুর গাড়ি এসে আটকে গেছে। তুফান কমলে নৌকা পাবে। কিন্তু মানুষ পারাপারের কমতি নেই। শম্ভু মাঝি ডিউটি করছিল ভোরবেলা থেকে। দশটায় তার ছুটি। এখন ভাদুয়া আর শংকরা নৌকা বাইছে। তারাও বড় দড় মাঝি।
শম্ভু মেঝেয় বসে হুঁকো টানছে। মুখ থেমে নেই। তার মাথার ওপর ময়নার খাঁচা।

বিষ্টিবাদলার দিন ময়নাটা কেমন ঝিম মেরে বসে থাকে। কেউ না শুনলে ময়নাটাকেই কথা শোনায় শম্ভু।

পটল ভিজতে ভিজতে কেটলি করে চা আনল। আনন্দময় বললেন, বিষ্টির দিনে চায়ের একটা মজা আছে। তবে চৌবেজী, ফ্যানটা এবার বন্ধ করুন। শীত করছে।

চৌবেজী সুইচ অফ করে দিলেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, এ শম্ভুয়া! কাহে ওত্না বকবক করছিস? চায় পি লে!

শম্ভুর এক হাতে মাটির ভাঁড়ে চা। কিন্তু হুঁকো ছাড়তে মন চায় না! বলল, মাস্টারমশাই বললেন, বিষ্টির দিনে চায়ের একটা মজা আছে। আমার মজা হুঁকোয়! সেবার টিপটিপ করে বিষ্টি হচ্ছে—এত জোরে না, যাকে বলে টিপ-টিপানি! তো রাজেনবাবু—কনডেকটার গো মাস্টারমশাই, বুঝলেন?

শম্ভুর বাক্যবচনা এইরকম। চৌবেজী বিরক্ত হয়ে বললেন, খালি বকবক!

আনন্দময় বললেন, রাজেন খুব হুঁকোর ভক্ত ছিল। মোটর আপিসে সবসময় দেখেছি টেবিলের পাশে হুঁকো ঠেস দিয়ে রেখেছে। ফুড়ুক ফুড়ুক করে টানছে, আর পয়সা হিসেব করছে।

ভাতিজা রামলাল বলল, রাজেনবাবুর সঙ্গে উত্তরোজ দেখা হল।

আনন্দময় বললেন, কোথায়, কোথায়?

উপ্পার—টাউনে—।—রামলাল বলল। ওন্হেক বাত করল রাজেনবাবু। আপনার কোথা বলল।—সকলকার কোথা বলল।

শম্ভু বলল, দেখা আমার সঙ্গেও কি হয়নি? একদিন না, দুদিন পরপর। পেত্থম দিন নৌকা একটুখানি ভাটিয়ে গিয়েছিল। দেখি উইখেনে—শম্ভু বাইরে ঝুঁকে বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে থাকা গঙ্গার দিকে কোথাও আঙুল তুলল। তারপর বলল, চুপচাপ বসে আছে গাছতলায়। দেখে বলল, ভাল তো? বললাম, পারে আসবেন নাকি? হাত নেড়ে বলল, না। তা'পরে একদিন ফের নৌকা ভাটিয়ে গেছে, সেদিনও দেখি সেই গাছতলায় চুপ করে বসে আছে। লোকটা ছেলের শোকে ক্ষ্যাপা না হয়ে যায়!

আনন্দময় কান করে শুনছিলেন। অবাক হয়ে বললেন, তবে যে বলেছিল কাটোয়ায় পৈতৃক ভিটেয় গিয়ে থাকবে?

রামলাল বলল, আমারও কী রোকম লাগল মাস্টারমোশাই! ওনহেক বাত কোরলেন, লেকিন সবকুছু সমঝতে পারলাম না। উনহির কুছু গড়বড় হইয়েছে!

চৌবেজী উদাস মুখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বললে, বেটার জন্যে বহুৎ দুখ্ বেজেছে। পাগলা হোবে না কেন?

আনন্দময় গম্ভীর হয়ে গেছেন। আস্তে বললেন, তাহলে রাজেন ওপারেই আছে। আশ্চর্য!

একটা বাস এসে থেমেছে স্ট্যান্ডে। যাত্রীরা নেমে বৃষ্টির মধ্যে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে আশ্রয় নিচ্ছে। কয়েকজন এসে পাশের আটচালায় গাড়োয়ানদের দঙ্গলে ঢুকে গেল। কজন সোজা ভিজতে ভিজতে ঘাটের মুখে এল। কেউ-কেউ ছাতা মাথায় এসে দাঁড়াল। নৌকা এখনও ওপারে। বৃষ্টি-বাদলার দিন পারাপারে বড় দেরি হয়। গদীর ভেতর ভিড় হয়ে গেল।

আনন্দময় বললেন, উঠি চৌবেজী।

দমকা হাওয়ার দাপট আছে। ছাতার শিক চেপে ধরে আনন্দময় কিছুটা এগিয়ে কল্যাণ ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে ঢুকলেন। হরিশংকর চুপচাপ বসে সিগারেট টানছিল। ঘর ফাঁকা। সিগারেট লুকিয়ে বলল, এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েছেন মাস্টারমশাই ?

আনন্দময় রোগীদের বেঞ্চে বসে ছাতাটা একপাশে রাখলেন।...কল্যাণ কোথায় হে হরিশংকর ? বলে গত কালকের খবরের কাগজটা টেনে নিলেন।

হরিশংকর বলল, ডাক্তারবাবু ভেতরে। ডাকব নাকি ?

থাক।

রুগীপত্তর নেই-টেই। হরিশংকর মুচকি হাসল।—এমন দিনে কি কারুর বেরুতে ইচ্ছে করে ? আমিও বেশিক্ষণ থাকব না।

আনন্দময় কাগজে চোখ রেখে বললেন, একটা কথা বলতে এলাম হরিশংকর !

বলুন মাস্টারমশাই ?

তুমি আমার নাম কোরো না—ইন্দ্রনাথকে বোলো একটু সাবধানে চলাফেরা করবে।

হরিশংকর গ্রাহ্য করল না। বলল, ধুস্ ! ও আবার একটা মানুষ, না ইয়ে। ইনার কথা আর বলবেন না মাস্টারমশাই ! পেয়েছিল আমার মতো একটা মানুষ। কাঁধে চেপে খুব স্ফূর্তি উড়িয়ে বেড়াল। তবে আর না। আপনাকে বলেছিলাম, এ শর্মা আর রানীরঘাটের জল খাবে না। তখন ইনা বুঝবে কী করে মুখের সামনে অন্ন আসে।

আনন্দময় বললেন, আহা ! কথাটা শোনোই না হে ! শ্যামলীকে বলে আসব ভাবছিলাম, কিন্তু ও বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না। ইন্দ্রনাথ আমাকে ফের ইনসাল্ট করে বসবে। তো...

হরিশংকর বলল, বলছেন যখন, বলব।

কথাটা না শুনেই কী বলবে ?—আনন্দময় বিরক্ত হয়ে বললেন।...রাজেন—মানে স্নেহাকরের বাবা শুনলাম রোজ ওপারে কোথায় এসে বসে থাকে। পাগলামির লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে। কথাটা শুনে আমার কেমন যেন লাগল। রাজেনের তো বরাবর একটু মাথা গরম ছিল।

আচ্ছা, বলব।—বলে হরিশংকর বৃষ্টি দেখতে লাগল। মনে মনে সে বিরক্ত। এই লোকটার মাথায় কী যেন আছে। সারাক্ষণ খালি ইনা আর ইনা। দেখা হলেই

ওসব কথা নিয়ে ফুসুর-ফাসুর! হরিশংকরের ভারি অবাক লাগে।

অবশ্য কিছু কিছু বাতিকগ্রস্ত লোক এ সংসারে দেখেছে হরিশংকর। তাদের মাথায় একটা কিছু ঢুকলে আর রক্ষে নেই। হরিশংকর হাই তুলে বলল, বিষ্টি ভালও বটে, আবার মন্দও বটে। এতক্ষণ জায়গাটার কী অবস্থা হত। কাঁসরঘণ্টার মতো ঝমঝম কবে বাজত। এখন দেখুন, যেন শ্মশানঘাট। মানুষজন যেন মড়া। চা আনব মাস্টারমশাই?

চা খেয়ে এলাম। থাক।

আনন্দময় বাসস্ট্যান্ডের ওদিকে মোটর-আপিসেব দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতে খোলা কাগজ। হরিশংকর একটু হেসে বলল, আপনি এখনও খালি চোখে দেখতে পান মাস্টারমশাই?

পাই।

পান বটে। আসলে আপনারা আগের দিনের লোক। আর আমার অবস্থা দেখুন না! কবে থেকে চশমা নেব-নেব করছি, হয়ে উঠছে না।

বয়স কত হল হরিশংকর?

চল্লিশ পেরিয়েছি। আপনার কত হল মাস্টারমশাই?

পঁয়ষট্টি।

হরিশংকর মেয়েদের ভঙ্গিতে বলল, যাঃ! বিশ্বাস না হয়।

আনন্দময় একটু হাসলেন।...কেন হে? আমাকে বুড়ো লাগে না দেখে?

আজ্ঞে না।—হরিশংকর সপ্রশংস দৃষ্টে তাকিয়ে বলল।—দেখে পঞ্চাশ-টঞ্চাশ লাগে। তাছাড়া আপনার হেলথখানাও দেখবার মতো।

না হে! বাইরেই এমনি। ভেতরটা ফোঁপড়া।—আনন্দময় আনমনা হয়ে বললেন। —তবে যৌবনে নিয়মিত শরীরচর্চা করতাম। উঠতাম খুব ভোরবেলায়। এই ঘাটের আড়তের মুটেরা ওই সময় গঙ্গার ধারে ডনবৈঠক করত। কুস্তি করত। তাগড়াই চেহারা ছিল হিন্দুস্তানীগুলোর। প্রথম প্রথম আমাকে খুব ঠাট্টাতামাশা করত। শেষে ওদের আখড়ায় ভিড়ে গেলাম। আখড়া মানে ভোরে একবার, সন্ধ্যায় একবার, ঘাটের নীচে চৌকো একটা জায়গায় ফিজিক্যাল একসারসাইজ।

তারা কোথায় গেল বলুন তো?

আনন্দময় গাল থেকে মাছি তাড়িয়ে বললেন, মোহনবাবুর আড়তে বেছে-বেছে তখন হিন্দুস্থানী নেওয়া হত। বেশির ভাগই পূর্ণিয়ার লোক। ঘাটোয়ারীও ছিলেন ঐ তল্লাটের বাসিন্দা। তিনিই আনিয়ে দিতেন মোহনবাবুকে। এখন মোহনবাবুর নাতির আমল। যাকে পায় রাখে। রোগা পটকা মুটেগুলো দেখলে এখন আমার হাসি পায়। দেড় মণ বস্তা পিঠে টানতে ধকায়। মোহনবাবুর আমলে আড়াই মণ-তিন মণ খন্দের বস্তা নামাতে দেখেছি পিঠ থেকে। তখনও গরুর গাড়ির চল ছিল বেশি। লরি-টরি এ রাস্তায় এল যুদ্ধের সময়। তার আগে ছিল গরুমোষের গাড়ি।

সাঁইথিয়া থেকে বোঝাই বয়ে আসত। ঘাট জুড়ে খালি গাড়ি আর গরুমোষের বাথান। চেঁচামেচি হট্টগোলে কানপাতা দায় হত।
বৃষ্টিটা একটু বাড়ল। হাওয়া থেমে গেছে। ঝমঝম করে ঝরছে আর আয়তক্ষেত্রের গড়ন চৌকো বাজার এলাকার সব জল রাস্তা উপচে ওপাশের গভীর খালে গিয়ে পড়ছে। খালের পাড় বাঁশ আর কাঠের বেড়ায় আটকানো। নৈলে দোকানপাট কবে ধসে গিয়ে খালে পড়ত।
হরিশংকর বলল, ব্যাস! এবেলার মতো বেধে গেল। মাস্টারমশাই, কেলেংকারি দেখছি!
আনন্দময় হাত বাড়িয়ে ছাতা নিয়ে বললেন, কেলেংকারি কিসের হে? ভিজতে তোমার ভাল লাগে না?
সর্বনাশ! এর মধ্যে বেরুচ্ছেন?
হুঁ। যাবে তো এস।
হরিশংকর আঁতকে দাঁত বের করে বলল, আমার সইবে না মাস্টারমশাই! একটুখানি ভিজলেই নাক দিয়ে জল গড়াতে শুরু করে। এই যে বৃষ্টির মধ্যে ডিসপেনসারিতে এসেছি, সে নেহাত চাকরির দায়ে।
বলে সে সন্দিগ্ধভাবে ভেতরের দরজার দিকে তাকিয়ে নিল একবার। আনন্দময় ধুতি গুটিয়ে স্যাণ্ডেল এক হাতে, অন্য হাতে ছাতা নিয়ে বেরুলেন। হরিশংকর দেখল, বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে মোটর-আপিসে গিয়ে ঢুকলেন।
হরিশংকর দেখেছে, আনুমাস্টারের এই স্বভাব। সকাল-বিকেলটা ঘাটের এখান-ওখান করে আড্ডা দিয়ে কাটান। বৃষ্টিবাদলাতেও এ স্বভাবের নড়চড় নেই। অদ্ভুত মানুষ এই আনুমাস্টার।
ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টিটা বেশ কমে এল। তখন হরিশংকর ডাক্তারবাবুর চাকর ভোলাকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বলে বেরুল। যাবার পথে দেখল, তখনও আনুমাস্টার বাড়ি ফেরেন নি। এখন মনোহরের চায়ের দোকানে ঢুকেছেন।
বাড়ির উঠোনে জল জমেছে। খিড়কির দিকে পাঁচিলের তলা দিয়ে জল যাওয়ার ফোঁকর আবর্জনায় ঠাসা। হরিশংকর এ হে হে হে করে দৌড়ে গেল! স্যাণ্ডেল-দুটো ছুঁড়ে ফেলল বারান্দায়। আবর্জনা পায়ে ঠেলে সরিয়ে পাতকুয়োর কাছে এল। বাড়ি সুনসান স্তব্ধ। ইন্দ্রের ঘরের দরজা ভেতর থেকে আটকানো। হরিশংকর বুঝল, বাবু তবে আজ টোটো করতে যাননি। খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছেন।
পাতকুয়োর কাছটা খোলামেলা। বৃষ্টি থেমেছে ততক্ষণে। জল তুলে পা হাত মুখ রগড়ে ধুয়ে হরিশংকর বারান্দায় গেল। তারে গামছা ঝুলছে। টেনে নিয়ে চাপা গলায় ডাকল, শ্যাম!
শ্যামলী ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে বটতলার ফাঁক দিয়ে গঙ্গা দেখছিল। বেরিয়ে এসে বলল, ভিজেছ তো? ফের জ্বর বাধাও। বিনি পয়সার ওষুধ পেলে এমনি সাহস

বাড়ে মানুষের।
হরিশংকর খ্যা খ্যা করে হাসল।...কী বলে শোনো! বৃষ্টির দিন। শুকনো থাকব কেমন করে বলো দিকি?
সে কাপড় বদলাতে ঘরে ঢুকলে শ্যামলীর চেহারা হঠাৎ বদলে গেল। বড়-বড় চোখ করে ফিসফিসিয়ে বলল, ইনা যা করছে, আর সহ্য করা যায় না! কী নির্লজ্জ—কী নির্লজ্জ! ছি! ছি! ভাই না হলে আমি কেলেংকারি করে ছাড়তাম!
হরিশংকরও গলা চেপে বলল, ব্যাপার কী?
আনুমাস্টারের মেয়ে আছে ও ঘরে।
অ্যাঁ!—হরিশংকরের মুখ হাঁ হয়ে গেল।
শ্যামলী বলল, আমি রান্না করছিলাম। পেছনে তো আমার চোখ নেই। কখন এসে ঢুকেছে তাও দেখিনি। কতক্ষণ পরে রান্না শেষ করে ইনাকে ডাকতে গেলাম। দেখি দরজা বন্ধ। ভেতরে কথা বলছে কার সঙ্গে। দরজায় কান পেতে শুনি আনুমাস্টারের মেয়ের গলা।
হরিশংকর সন্দিগ্ধ মুখে বলল, আর কেউ নয় তো?
আবার কে হবে? রানীরঘাটে অমন দুকানকাটা মেয়ে আর আছে নাকি?
তুমি গলার স্বর শুনে বুঝলে আনুমাস্টারের মেয়ে?
বলছি তো!
হরিশংকর হঠাৎ ফিক করে হাসল।...দরজা বন্ধ করলো কেন বলোদিকি?
শ্যামলী ওর বুকে থাপ্পড় মেরে বলল, ন্যাকার মতো হেসো না! গা জ্বলে যায়। শোনো, আমরা আর এখানে থাকব না। বর্ধমানে ফিরে যাই, চলো। ইনা যা খুশি করুক—জানব আমার একটা ভাই ছিল, গঙ্গায় ভেসে গেছে।
সে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল। হরিশংকর গুম হয়ে ঠোঁট কামড়ে জানলার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, দেখ শামু! আমি পারি। হ্যাঁ—আমি পারি বইকি শায়েস্তা করতে। আমার অধিকারও আছে। কিন্তু খালি ভাবি কি জানো, শেষে তুমিই হয়তো ভাইয়ের হয়ে আমার সঙ্গে লাগতে আসবে।
শ্যামলী আঁচলে নাক মুছে কী বলতে যাচ্ছিল, ইন্দ্রের ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল। খুব চাপা শব্দ। হরিশংকর বলল, হারামজাদী মেয়েছেলের বড় বাড় হয়েছে! আমি যে পুরুষ মানুষ—নৈলে চুলের ঝুঁটি ধরে এ্যায়সা আছাড় মারতাম, প্রেম-ট্রেম কেলিয়ে লাট হয়ে যেত!
বলতে বলতে তার গলা ফুটে বেরুল।—পেয়েছ কী সব? এটা কী বেশ্যাবাড়ি? এ্যাঁ? ছোটলোকের মেয়ে! এখনই যাচ্ছি তোর বাপের কাছে। বাপ বেড়াচ্ছে আড্ডাবাজি করে, এদিকে মেয়ে বেড়াচ্ছে বেশ্যাগিরি করে।
রাগের নিয়মই এই। আচমকা সাহস বাড়িয়ে দেয়। হরিশংকর বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্র সিগারেট টানছে। হরিশংকর জলদগম্ভীর স্বরে বলল,

ইনা টেক কেয়ার বলে দিচ্ছি। খুব বাড়াবাড়ি করছ তুমি। হ্যাঁ—খুব বেড়ে গেছ!

ইন্দ্র আস্তে বলল, চেঁচাচ্ছেন কেন?

হরিশংকর গর্জন করল, ঘরে কে ছিল? এ্যাঁ? কে ছিল ঘরে? এ কি প্রস-কোয়ার্টার? এ্যাঁ?

ইন্দ্র সিগারেট উঠোনের জলে ছুঁড়ে বলল, যেই থাক, ও নিয়ে ভাববেন না জামাইবাবু। আমার ব্যাপারে নাক গলাবেন না বলে দিচ্ছি।

হরিশংকর ক্ষোভে ভাঙা গলায় শ্যামলীর উদ্দেশে ঘুরে বলল, শুনছ? যদি নাক না গলাতাম, এ্যাদ্দিন কী হত ভাবছ না? কে পয়সা খরচ করে হাইকোর্টে লড়তে গিয়েছিল? তখন তো সারা রাণীরঘাটে মাথা ভাঙলেও কাকেও পাওয়া যায় নি! নেমকহারাম! স্বার্থপর! বেইমান!

ইন্দ্র নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, হাইকোর্টের টাকা মায়ের গয়নাগাঁটি বেচে। মাথা খারাপ করবেন না জামাইবাবু! আমি সব জানি।

শ্যামলী দরজায় উঁকি দিচ্ছিল। বেরিয়ে বলল, ধিক্ শত ধিক তোকে। নির্লজ্জ! আমি বাড়িতে আছি—আমার সামনে মেয়ে ঢোকাচ্ছিস ঘরে? ছি ছি ছি! ছিঃ! —সে মুখে আঁচল ঢেকে হু হু করে কাঁদতে থাকল।

স্ত্রীর কান্নায় হরিশংকর আরো ক্ষেপে গিয়ে চেঁচাল, লম্পট! চিরকালের লম্পট!

ইন্দ্র প্যাণ্টের পকেট থেকে ড্যাগারটা বের করল। ফলা খুলতেই হরিশংকর কয়েক পা পিছিয়ে গেল। সে হাঁফতে হাঁফতে বলল, শামু! শামু! উরে ব্বাস! তোমার ভাই আমাকে স্ট্যাব করতে আসছে!

শ্যামলী তাকাল। ইন্দ্র ছোরাটা দিয়ে থামে আঁচড় কাটছে। শ্যামলী বোবাধরা গলায় বলল, ইনা!

হরিশংকর হঠাৎ মরিয়া হয়ে গেল। একলাফে ঘরে ঢুকে একটা মরচেধরা শাবল নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর আকাশ ফাটিয়ে বলল, আয় শালা! চলে আয় শুওরের বাচ্চা! তোর একদিন কী আমার একদিন! হয় আমি মরব, নয় তুই! আয়! কাম অন!

সে লাফাতে শুরু করেছে শাবলটা নিয়ে। ইন্দ্র আপনমনে জীর্ণ পলেস্তারাহীন থামে আঁচড় কেটে চলেছে। এই সময় আবার বৃষ্টিটা ঝাঁপিয়ে এল। শ্যামলী ছিটকে গিয়ে উঠোনে নামল। তারপর সদর দরজা দিয়ে ছুটে গেল।

হরিশংকর সমানে লাফাচ্ছে আর হুংকার ছাড়ছে—আও! কাম অন! শুয়ারকা বাচ্চা! কাম অন!

শুভ ছাতা মাথায় দৌড়ে এল শ্যামলীর সঙ্গে। শুভকে ডাকতে গিয়েছিল শ্যামলী। শুভ ঘুমোচ্ছিল। মুখটা ফোলা একটু, চোখ দুটো লালচে। বারান্দায় উঠে বলল, জামাইবাবু! চুপ করুন তো!

হরিশংকরের তেজ বেড়ে গেল শুভকে দেখে। শুভ তার হাত থেকে শাবলটা কেড়ে নিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর ইন্দ্রের হাত থেকে ড্যাগারটা কাড়তে গেলে ইন্দ্র ফলা বুজিয়ে ঝটপট পকেটে চালান করে দিল। শুভ বলল, মারব এক থাপ্পড় রাস্কেলকে! আবার দাঁত বের করে হাসা হচ্ছে! লজ্জা করেনা তোর?

সে ইন্দ্রের নীল স্পোর্টিং গেঞ্জির কলার খামচে ধরে বলল, আয় আমার সঙ্গে।

ইন্দ্র বলল, আঃ পুটুদা! ছিঁড়ে যাবে যে!

ছিঁড়ুক। তুই চলে আয়।

ছাড়ো, যাচ্ছি।

ছাতার তলায় ইন্দ্রের কাঁধ বেড় দিয়ে শুভ উঠোনে নামল। তারা যখন সদর দরজার কাছে, শ্যামলী ভাঙা গলায় বলে উঠল, শুভ! ইনা এখনও খায় নি।

শুভ জবাব দিল না। গলিতে গিয়ে বলল, কী নিয়ে বাধল রে?

নিরু এসেছিল।

বলিস কী!

হঠাৎ ভিজতে ভিজতে এসে ঘরে ঢুকল। দরজা আটকে দিল। আমি কী করব?

নিরুকে বিয়ে করবি?

ধুস! ওসব কে ভাবছে?

তাহলে ওকে নষ্ট করছিস কেন?

নষ্ট মানে?

শুভ হাসল।—থাপ্পড় মারব বলে দিচ্ছি! ন্যাকা!

বিশ্বাস কর, পুটুদা, আজ অব্দি একটা চুমুও খাইনি ওকে।…ইন্দ্র একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলল, নিরু চায়, আমি ওকে নিয়ে যা খুশি করি। কিন্তু ওকে আমার ভাল লাগে না। এবার যেন জোঁকের মতো লেগেছে আমার গায়ে।

কেন? ওর সঙ্গে তো তোর অনেক কালের প্রেম!

প্রেম!—ইন্দ্র হাসল।—পুটুদা, বিয়ে করে তুই মাইরি কী যেন হয়ে গেছিস!

বাঁদিকের পোড়ো জমিতে ঘুরে শুভ বলল, তাহলে কেন তুই ওর সঙ্গে এত মিশতিস?

ইন্দ্র সেকথার জবাব না দিয়ে বলল, নিরুকে আমি বুঝি না পুটুদা! স্নেহাকরের সঙ্গেই ওর ছোটবেলা থেকে বেশি ভাব ছিল। স্নেহাকর ওর বাবার কাছে বিনি-পয়সায় পড়ত দুবেলা। অনেকদিন ওদের বাড়িতেই খেয়ে স্কুলে যেত। আবার দেখেছি, কুমু শালাও নিরুর সঙ্গে মাখামাখি করছে।

শুভ হাসতে লাগল।…মাস্টারমশাই বেশি কড়াকড়ি করতে গিয়েই হয়তো মেয়ের বারোটা বাজিয়েছেন। আয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার মানে হয় না।

ইন্দ্র ইতস্ততঃ করছিল। শুভ তাকে কাঁধ জড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল। এপাশের দরজা ভেজানো ছিল। ঘরে ঢুকে শুভ বলল, বস্। সিগারেট খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর। আসছি।

শুভ ভেতরে চলে গেল। একটু পরে নীলি একটা বই হাতে করে ঘরে ঢুকল। বলল, কী হয়েছে গো ইনাদা ? জামাইবাবু হঠাৎ ক্ষেপলেন কেন ? খুব চেঁচাচ্ছিলেন শুনছিলাম !

ইন্দ্র বলল, এমনি। তুই বুঝি কলেজ যাস্‌নি আজ ?

নীলি জানলার কাছে গিয়ে বলল, মাথা খারাপ ? রেনিডেতে বেরুব ? নৌকো উল্টে মারা পড়ি আর কী ! তারপর ঘুরে ফের বলল, হ্যাঁ গো ইনাদা, কাল বিকেলে ঘাটের ওখানে কী হয়েছিল ? মারামারি করেছিলে নাকি ?

ইন্দ্র হাসল।—তুই দেখেছিস ?

কলেজ থেকে আসছিলাম। দেখলাম তোমাকে সবাই হাতমুখ নেড়ে কী সব বোঝাচ্ছে।—নীলি খিলখিল করে হাসতে লাগল।—আর তোমাকে দেখলাম, খুব মন দিয়ে শুনছ।

ইন্দ্র বলল, শশাংক আর কুমুকে একটু ধোলাই দেবার ইচ্ছে ছিল। হল না।

সে কী ! কেন ?

ইন্দ্র বলল, এমনি।

নীলি বলল, পারতে ওদের সঙ্গে ? এখন তো তোমার সাপোর্টার নেই। তুমি তো একা।

তুই জানিস ?

নীলি মাথা নেড়ে জানলার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। বলল, ইনাদা ! দেখেছ আমার গাছগুলো রাতারাতি পেখম মেলেছে ? ইস ! মিরাকল ! ইনাদা ! বৃষ্টিতে কী থাকে বলো তো ? হঠাৎ সবকিছুতে কেমন চেঞ্জ—কেমন একটা লাইফ। তাই না গো ?

এই মেয়েটা বরাবর এরকম। আপন মনে বিড়বিড় করে। মাথায় ছিট আছে নির্ঘাৎ। ইন্দ্র বাড়ির পেছনে বটগাছটার ওখানে দাঁড়িয়ে নীলিকে তাদের বাগানে অদ্ভুত ভঙ্গিতে—নাচের মতো শরীর নিয়ে খেলতে দেখেছে। ছোটবেলাতেও এই অভ্যাস ছিল নীলির।

কিন্তু 'তুমি তো একা' কথাটা ইন্দ্রের বুকে নতুন করে পেরেক বিঁধিয়ে দিয়েছে। সত্যি, এভাবে তো দেখেনি ব্যাপারটা। মুকুল, কানু, অরুণ—ছায়ার মতো ঘুরতো তার সঙ্গে যেসব ছেলেরা, তারা যেন রাণীরঘাট থেকে উধাও হয়ে গেছে। অথবা গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে ইন্দ্রের চোখের আড়ালে। কেউ তাকে ডাকতে আসে না।

ইন্দ্র প্যান্টের পকেট থেকে ড্যাগারটা বের করে হাতের নখ কাটার চেষ্টা করল। নীলি এদিকে পেছন ফিরে আছে। জানলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। হঠাৎ ঘুরে ড্যাগারটা দেখে ভয় পাবে ভেবে ইন্দ্র তক্ষুনি ফলা বুজিয়ে দিল। প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে ফেলল। তারপর আনমনে ডাকল, পুটুদা। কী করছিস রে ভেতরে ?…

আজকাল আনন্দময় হঠাৎ-হঠাৎ কী এক বোধে আক্রান্ত হন। দ্রুত পেছন ফেরেন, পেছনে পায়ের শব্দ। ভিড়ের ভেতর চলতে চলতে হঠাৎ মনে হয়, সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। বিব্রত বোধ করেন। মনোহরের চায়ের দোকানের সামনে সেদিন কারা চুপিচুপি কথা বলছিল, আনন্দময়ের মনে হচ্ছিল যেন তাঁকে নিয়েই কী সব কথাবার্তা চলেছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সরে এলেন। লোকগুলো তাঁর চেনা নয়।

এসবের সঙ্গে ইন্দ্র ফিরে আসার কোন সম্পর্ক আছে কি না বুঝতে পারেন না আনন্দময়। একেক সময় তাঁর মনে হয়, পৃথিবীতে তিনি বড্ড বেশি একা হয়ে পড়েছেন। সবকিছু তাঁর কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে এবং সরে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

স্ত্রী সুচরিতাও তাঁকে ত্যাগ করার মতলবে আছে যেন। দিনরাত্রি প্রায় সারাক্ষণ সাধুজীর আশ্রমে কাটান তিনি। আচার-ব্যবহারে আগের চেয়ে একেবারে উল্টে হয়ে গেছেন। মুখে মিষ্টি হাসি লেগে আছে। মধুর কথাবার্তা বলেন। বলেন খুব কম কথাই —কিন্তু যেটুকু বলেন, অনেক ওপর থেকে মধু দিয়ে মাখিয়ে বলেন। আর নিরুকে তো কোনোদিনই আয়ত্তে রাখতে পারেননি আনন্দময়। ছোটবেলায় উঠোনের পেয়ারাগাছে বেঁধে রাখতেন। ওর পাড়াবেড়ানী আর দস্যিস্বভাব শায়েস্তা করতে বেদম পিটুনি দিতেন। ও যে ছেলে নয়, মেয়ে এবং মেয়েদের জন্য ছেলেদের শাস্তি প্রয়োগ করার নিয়ম নেই, শিক্ষক হয়েও তা গ্রাহ্য করতেন না আনন্দময়। সুচরিতা একটা বয়স অব্দি স্বামীকে একটু ভয় করে চলতেন, তারপর শক্ত হতে শুরু করেন। শেষে আনন্দময়কে কথায়-কথায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে বা মুখনাড়া দিতে শাসন করতেও সফল হয়েছিলেন। এতে আনন্দময়ও যেন স্ত্রীকে উল্টে ভয় পেতে শুরু করেন এবং নিরুর অভিভাবকত্ব পরিত্যাগ করেন। নিরু বরাবর মায়েরই অনুগামিনী ছিল। ফলে নিরুও মায়ের তালে তাল দিয়ে বাবাকে অগ্রাহ্য করতে থাকে। তারপর আনন্দময় একদিন বুঝতে পারেন, নিরু তার মায়েরও তোয়াক্কা করছেনা আর।

ঘরে-বাইরে অনেক যুদ্ধ করে মানুষকে বাঁচতে হয়। আনন্দময়ের বেশি যুদ্ধটা ঘরের ভেতর হয়েছে। এখন হার মেনে একপাশে সেঁটে গেছেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে।

কদিন বৃষ্টির পর আকাশ একটু পরিচ্ছন্ন হয়েছে আবার। গঙ্গার ধারের মাটিটা জমানো দুধের মতো। জল শুষতে দেরি করে না। প্রবল বৃষ্টির পরও কাদা জমে না তত। ডোমপাড়া ছাড়িয়ে ডাইনে চাঁদুবাবুর ইটভাটার পর আউস-পাটের ক্ষেত। কোথাও আখের চারা হাঁটুভর উঁচু হয়েছে। নিচু বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দময় জমিজমা দেখছিলেন। এদিকটা শেয়ালমারা মাঠ। এ মাঠে কিছু পৈতৃক জমি আছে আনন্দময়ের। শেয়ালমারার গরীব শেখ জমিগুলো চষে। ফসল তুলে ভাগ দিয়ে আসে।

গরীব আর তার ছেলে ইসলাম হাঁটু দুমড়ে দিনভর আউসের জমিতে আগাছা

উপড়েছে। বিকেলে কাজ শেষ করে চলে গেল গাঁয়ের দিকে। ঘন বাঁশবনে ঢাকা গাঁয়ে পাখিদের চেঁচামেচি কানে ভেসে আসে। নীলচে কুয়াশা এখনও জড়িয়ে আছে দূরের বাবলাবনে। হঠাৎ আনন্দময়ের মনে হল, এই অবেলায় তাঁকে নির্জনে দেখে ইন্দ্র কোথাও ওঁত পাতে নি তো?

আসার সময় ডোমপাড়ার কাছে ইন্দ্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। ইন্দ্র তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওখানে কী করছিল সে?

পাছে তাঁকে দেখতে পায়, আনন্দময় হন্তদন্ত হয়ে লিচুর বাগানে ঢুকে পড়েছিলেন। এখন সেই বাগানের ভেতর দিয়ে একটু ঘুরে ইটখোলার অন্য প্রান্ত দিয়ে রাস্তায় উঠবেন কি না ভাবলেন। রোদ মরে এসেছে। ফিকে, ছাইরঙা একটা ব্যাপকতা ছড়িয়ে আছে চার ধারে। আনন্দময় সতর্ক দৃষ্টি রেখে পা বাড়ালেন।

বাঁধের ডাইনে নিচে এলোপাথাড়ি আগাছার জঙ্গল আর টুকরো-টাকরা সবজিক্ষেতের পর গঙ্গা কলকলিয়ে বইছে। বাঁদিকে আদিগন্ত মাঠ। লিচু-বাগানের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ওপাশে ইটখোলার ধারে ঢিবির ওপর কে দাঁড়িয়ে আছে। ধূসর আলোয় তার সিল্যুট মূর্তিটা স্থির। ও কি ইন্দ্র? তার হাতে নিশ্চয় সেই সাংঘাতিক ছোরাটা আছে। আশ্চর্য, ওভাবে প্রকাশ্যে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেলফেরত দাগী এক খুনী। কেউ কিছু বলছে না—ফাঁড়ির পুলিশও চুপ করে আছে। আনন্দময়ের ভীষণ রাগ হল। ওদিকে দৃষ্টি রেখে সোজা হাঁটতে থাকলেন। বাঁধটা ঘুরে গেল ডোমপাড়ার পেছনে। বাঁধ থেকে নেমে সরু একফালি রাস্তা। দুধারে নিশিন্দা গাছের সারি। প্রতিমুহূর্তে আনন্দময়ের আশংকা হচ্ছিল, হঠাৎ ইন্দ্র সামনে এসে দাঁড়াবে।

একটু পরে দেখলেন, সমান তালে পা পড়ছে না। মাতালের মতো টলছেন। ধূসরতা ঘন হচ্ছে দ্রুত। পশ্চিমের দিগন্তের মাথায় মেঘের পাহাড় থেকে লাল রঙটা মুছে গেছে। একটু দাঁড়িয়ে শক্ত হবার চেষ্টা করলেন আনন্দময়। চোয়াল আঁটো হয়ে গেল। নিস্পলক চোখে পেছন ফিরে ইটভাটার দিকে তাকালেন এবার। কালো প্রকাণ্ড চিমনি থেকে এখন ধোঁয়া উঠছে না। মজুর-মজুরানীদের কুঁড়েঘরের ওপর চাপ চাপ ধোঁয়া। তারপর ঢোলকের শব্দ ভেসে এল। ঢোলক বাজিয়ে গানের আসর বসছে। অনেকটা রাত অব্দি চলবে। কিছুদিন আগেও জমি দেখে ফেরার সময় দাঁড়িয়ে আনন্দময় ওদের নাচগান উপভোগ করেছেন। এখন এ এক সাংঘাতিক অবস্থা!

স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলা শেষ। কয়েকটা ছেলে গোল হয়ে বসে চাপা গলায় কথা বলছে। আনন্দময় ভাবলেন, ওদের ডেকে বলবেন নাকি বাড়ি পৌঁছে দিতে। কিন্তু লজ্জাবশতঃ ওদের ডাকতে পারলেন না।

শুভদের বাড়ি পর্যন্ত এসে মনে হল, এখন অনেকটা নিরাপদ। ওদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। বাইরের বারান্দায় আলো। কারা সব বসে আছে। গেলে এক

কাপ চা পাওয়া যায় এবং ভীষণ ক্লান্তিটাও ঘোচে। কিন্তু এখন শিগগির বাড়ি ফেরাটাই বড় কথা।

এবড়োখেবড়ো রাস্তার ধারে অনেকটা দূরে দূরে একটা করে কাঠের খুঁটিতে বাল্ব জ্বলছে। রাণীরঘাট মিউনিসিপ্যালিটি নয়, ব্লকের হাতে। সেই সুবাদে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। আলোয় হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কাছাকাছি এসে আবার পিছনে তাকালেন। দূরে আলো-আঁধারি জায়গায় কেউ আসতে আসতে যেন তাঁর মতো থমকে গেছে। আবার বুকটা ধড়াস করে উঠল। রাস্তা থেকে ভেরেণ্ডাগাছে ভরা ইটপাটকেলের স্তূপে ঢাকা একটু জমি। তার কিনারা দিয়ে বাড়ি ঢোকার এক চিলতে পথ। আনন্দময় ওই পথটুকু কোনোমতে পেরিয়ে দরজার কড়া প্রচণ্ড জোরে নাড়তে থাকলেন। নিরু দরজা খুলে বলল, দরজা ভেঙে ফেলছ যেন। কী হয়েছে?

আনন্দময় বারান্দায় গিয়ে ন্যাড়া তক্তাপোষটায় বসলেন। নিরু ফের বলল, কথা বলছ না কেন? কী হয়েছে?

আনন্দময় চাপা গর্জন করলেন।—কী হবে? চা নিয়ে আয়।

সুচরিতা ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, কী রে নিরু?

নিরু হাসছিল।—বাবার কাণ্ড। এমন করে কড়া নাড়ছেন যেন বাঘে তাড়া করেছে!

সুচরিতা একটু হেসে বললেন, গরীবের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে এলে নাকি? অমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?

আনন্দময় স্ত্রীর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, বেরুচ্ছ নাকি?

কখন বেরোতাম। তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।

ক্রূর দৃষ্টে একটু বাঁকা হেসে আনন্দময় বললেন, রোজই কি আশ্রমে কেত্তন লেগে আছে? আশ্চর্য!

আজ ভাগবত পাঠ। যাবে নাকি?—সুচরিতাও বাঁকা হাসলেন।—যাবে তো এস। আশ্রমের দরজা সবার জন্য খোলা।

নিরু ঝটপট চা বানাতে পারে। চায়ের কাপপ্লেট পাশে রেখে বলল, বললে না তো বাবা?

কী বলব?

সুচরিতা থপথপ করে উঠোনে নামলেন। তারপর একটু দাঁড়িয়ে চোখ বুজে কিছু আওড়ে এবং করজোড়ে প্রণাম করে বেরুলেন। পরনে চওড়া নকসিপাড় তাঁতের শাদা শাড়ি। হঠাৎ যেন বয়স কমে গেছে। আনন্দময় তাকিয়ে একবার দেখে চায়ে চুমুক দিলেন। নিরু আঙুল মুচড়ে বলল, জমি দেখতে গিয়েছিলে—তাই না বাবা?

হুঁ।

এবার এখন যাবে, আমাকে নিয়ে যাবে?

হুঃ।

হুঃ নয়, সত্যি যাব। ছোটবেলায় যেতাম না বুঝি?

নিরুকে নিয়ে আনন্দময় শেয়ালমারার মাঠে যেতেন। তবে সেখানেও বই-খাতা সঙ্গে নিয়ে যেতে হত। হিজলগাছের ছায়ায় বসে পড়াতেন মেয়েকে। গরীব শেখ আউসের ক্ষেতে আগাছা ওপড়াত। একবার একটা সাপ ফোঁস করে উঠেছিল তার সামনে। আনন্দময় ছড়ি দিয়ে আশ্চর্য দক্ষতায় সাপটা মেরেছিলেন। নিরু অবাক হয়ে গিয়েছিল তার বাবার ক্ষমতা দেখে। আরও ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে।

একটু পরে আনন্দময় আস্তে বললেন, যাবি বৈকি। আমি না থাকলে তোকেই তো এসব দেখতে হবে।—

সে রাতে ভালো ঘুম হল না আনন্দময়ের। যখনই ঘুম আসে, একটা করে অদ্ভুত-অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে গিয়ে পড়েন। ভোরের দিকে দেখলেন, ইন্দ্র তাকে ড্যাগার নিয়ে তাড়া করছে। আনন্দময় আতঙ্কে উড়তে শুরু করলেন। দিব্যি উড়তে পারছেন। একটু পরে দেখলেন, চারদিকে প্রকাণ্ড সব ইটের স্তূপ, ইটের পাহাড়। তার মধ্যে ইন্দ্র মরে পড়ে আছে। শ্বাসনালী কাটা। খুনটা আনন্দময়ই করেছেন। ইট কুড়িয়ে লাস চাপা দিচ্ছেন। প্রচণ্ড আতঙ্কে দুহাতে ইট টেনে ফেলছেন।

ঘুম ভেঙে টের পেলেন স্বপ্ন। অথচ মনে হল, সত্যই ঘটছিল। মনে সেই আতঙ্কের ছোঁয়াচ তখনও লেগে আছে। দরজা খুলে দেখলেন, সূর্য ওঠেনি। আকাশে মেঘ করেছে। পাশের ঘরে নিরু তার মায়ের কাছে শোয়। ডেকে চা করতে বলবেন ভাবলেন, কিন্তু এত ভোরে ওরা উঠবে না। মাথা ভাঙলেও না।

ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকে আনন্দময় ছড়িটি নিয়ে বেরুলেন। পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। সদর দরজা ভেজিয়ে রাস্তায় গেলেন। কালকের আতঙ্কটা চলে গেছে।

ঘাটের দিকে সবে জাগরণের সূচনা। চায়ের দোকানের সামনে উনুন ধোঁয়াচ্ছে। বাসস্ট্যাণ্ডে সার সার কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাস ছাড়বে এখনই। ঘাটের মাথায় গিয়ে নৌকোর যাত্রীর আশায় দাঁড়িয়ে আছে মধু কণ্ডাক্টার। ওপারের আপ ট্রেনে কলকাতা থেকে লোক আসবে। গঙ্গা পেরিয়ে এই বাসটা ধরবে অনেকে।

ঘাটের পাশ দিয়ে এগিয়ে গঙ্গার ধারে বসলেন। ছড়ি দিয়ে জলে আঁকজোক কাটতে থাকলেন আনন্দময়।

একটু পরে মুখ ধুয়ে ফেরার সময় আটচালায় নজর গেল। থমকে দাঁড়ালেন। নগ্ন মেঝেয় কাত হয়ে রাজেন শুয়ে আছে। পরনে নোংরা প্যাণ্ট, ছেঁড়া শার্ট, মুখে একরাশ দাড়ি। রাজেন ছেলের শোকে সত্যি পাগল হয়ে গেল তাহলে?

রাজেন হঠাৎ উঠে বসতেই আনন্দময় হন হন করে ঢাল বেয়ে উঠে গেলেন উপরে। মনোহরের চায়ের দোকানের ঝাঁপ উঠেছে ততক্ষণে। আনন্দময় বললেন, রাজেনকে

দেখলাম আটচালায়।

মনোহর বলল, হ্যাঁ। কাল রাত্তিরে এসেছে। নেচে-নেচে গান গাইছিল—আবোল তাবোল কাণ্ড। সব্বাইকে বড্ড জ্বালিয়েছে সারারাত। যতক্ষণ জেগেছিলাম, শুনি ফটাস ফটাস করে ঢিল ছুঁড়ছে বাসে। অমলবাবুর গলা পেলাম কবার। বকাবকি করছিলেন।

চা খেয়ে বেরিয়ে যেতেই রাজেনের সামনে পড়ে গেলেন আনন্দময়।

রাজেন মাটির দিকে তাকিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতো। ধুলোকাদামাখা নোংরা চেহারা। আনন্দময় অগত্যা আস্তে ডাকলেন, রাজেন!

রাজেন একবার তাকিয়েই মুখ নামাল। তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। মধু কণ্ডাক্টার এসে চ্যাঁচাতে লাগল, এই রাজেনদা! ঝামেলা করো না তো! সারারাত একটু ঘুমোতে দাওনি। এখন রাস্তা ছাড়ো।

রাজেন চোখ লাল করে বলল, তোর বাপের রাস্তা!

মনু ড্রাইভার হর্ণ বাজাতে বাজাতে তার পিঠের কাছে বাসটা নিয়ে এল। মনু হাসছিল। কারা রাগ করে বলল, ধাক্কা মারুন না মশাই! পাগলামি ঘুচে যাবে। মারুন ধাক্কা!

মধু রাজেনকে টানতে টানতে একপাশে রেখে এল। রাজেনের গায়ে একফোঁটা জোর নেই। বাসটা বেরিয়ে গেলে রাজেন টের পেল তাকে ফাঁকি দিয়েছে। সে ইট কুড়িয়ে তাড়া করল বাসটাকে। পেট্রল পাম্পের কাছে বাঁকের মুখে বাস আর রাজেন অদৃশ্য হলে আনন্দময় বাড়ির রাস্তা ধরলেন।

ঘাটের আড্ডায় আসাটাও এবার যেন বন্ধ হয়ে যাবে। পাগলকে বিশ্বাস নেই। ইট ছুঁড়ে বসলেই হল। আনন্দময় টের পেলেন, সত্যি তাঁকে কোণঠাসা হয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে এবার।…

শুভ ওপারে শহরে যাবে বলে বেরিয়েছিল। পেট্রলপাম্পের কাছে এলে শশাংক তাকে ডাকছে শুনল।—পুটু! কোথায় চললে সেজেগুজে? শোনো, শোনো।

শুভ দাঁড়াল। একটু হেসে বলল, কী রে শশাংক? এত পালোয়ান হয়ে যাচ্ছিস যে! খাচ্ছিস কী?

শশাংক পাম্প দেখিয়ে বলল, পেট্রল। তারপর হা হা করে হাসতে লাগল।

কাচের ঘরের দরজায় কুমু দাঁড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। শুভকে দেখতে পেয়ে কাছে এল।—তোমার সঙ্গে জরুরী দরকার ছিল, পুটু। আজই যোগাযোগ করব ভাবছিলাম। ব্যস্ততা নেই তো?

শুভ পাঞ্জাবির হাত সরিয়ে ঘড়ি দেখে বলল, তত কিছু নেই ওপারে যাব।

ভেতরে এস না!—কুমু শশাংকের দিকে ঘুরে বলল, এই ভোঁদড়! তুইও আয়।

কুমুর বাবা পরেশ বাবুকে দেখতে পেল না শুভ। তিনি থাকলে কুমুর হাবভাব এমন স্মার্ট থাকেনা। আজকাল কুমু পাম্পে এসে বাবাকে সঙ্গ দিচ্ছে। পাশে একটা গ্যারেজ করেছে। কয়েকটা ট্রাক আর বাস দাঁড়িয়ে আছে। মিস্ত্রিরা কালিঝুলি মেখে কাজে লেগেছে। নানারকম শব্দে কানে তালা ধরে যায়।

শুভ বসে বলল, বলো কুমু!

কুমু চাবির একটা রিং আঙুলে নাচাতে নাচাতে বলল, মাইরি, ইনা বড্ড গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। কী ছেলে বলো তো? দিব্যি ভালয়-ভালয় ফিরে এলি, ভদ্রলোকের মতো থাকবি। তা নয়, খালি—

শশাংক ওর কথার ওপর বলল, কদিন আগে ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি। কুমুও আছে। হঠাৎ ইনা এসে বলে কী, তোরা আমার নামে পিটিশান সই করে বেড়াচ্ছিস! কে কী লাগায় মাইরি!

কুমু বলল, থাম তো তুই। বুঝলি পুটু? ইনাকে একটু কেয়ারফুলি ট্যাকল করা দরকার। তোকে তো ও ভীষণ মানে-টানে। তুই প্লিজ ওকে বুঝিয়ে বল, ওর পেছনে কেউ লাগে নি। লাগবেও না। যা হবার হয়ে গেছে। আর কেন? বরং ইনা যদি কিছু কাজকম্ম করতে চায়, আমি ওকে হেল্প করতে রাজি। আমাদের একটা নতুন বাস আসছে। ওপারে একটা রুটে লাইসেন্স পেয়ে গেছি। ইনাকে বল, ওই রুটের ব্যাপারে অল রেসপন্সিবিলিটি ওকে ছেড়ে দেব। ভাল মাইনেকড়িও পাবে ইনা।

শশাংক বলল, অ্যান আইডল ব্রেন ইজ দি ডেভিলস ওয়ার্কশপ!

শুভ বলল, ভেরি গুড প্রপোজাল কুমু। নিশ্চয় বলব। তবে—

কুমু বলল, তবে কি?

ইনাকে তো জানিস!—শুভ হাসল।—বরাবর দেখেছি, ওর একটা নিজস্ব লাইফ-স্টাইল আছে।

শশাংক মুখ বাঁকা করে বলল, পুটু! লাইফ স্টাইল সবারই আছে। হরিশংকরদা না থাকলে ইনার লাইফস্টাইলটা কী দাঁড়াত বল্? হুঃ, লাইফস্টাইল!

শুভ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, সেটা ঠিকই। হরিশংকরদা না থাকলে ওকে নিশ্চয় পেটের ধান্দায় একটা কিছু করতে হত। তবে সেটা হয়তো সাংঘাতিক কিছু হত। মানে ডাকাতি-টাকাতি করত আর কী!

কুমু হাত নেড়ে বলল, না না। এ তুই কী বলছিস শুভ? ইনাকে আমি তোর চেয়ে হয়তো ভালই জানি। হতে পারে ইনা তোর জ্যাঠতুতো ভাই। কিন্তু আমি সেই এতটুকু বয়স থেকে ওর সঙ্গে মিশেছি। ইনার মধ্যে গুড এলিমেণ্ট প্রচণ্ড আছে। আসলে একটু মিসগাইডেড ছেলে হলে যা হয়।

শশাংক ফুট কাটল।—তাই বুজম ফ্রেণ্ডকে স্ট্যাব করতে হাত কাঁপে নি। কুমু, শুভ নিজের জ্যাঠতুতো ভাইটিকে ভালই চেনে। এই যে সব সময় হাতে ড্যাগার নিয়ে ঘুরছে, শুভই হলফ করে বলুক, ওর গা ছমছম করে কি না।

সে শুভর দিকে তাকাল। শুভ বলল, ঠিকই বলেছিস শশাংক! ওকে আমি চিরদিন ভয় পাই।

কুমু বলল, ইনার আসলে ক্ষোভ হয়েছে। কিসের ক্ষোভ বলব? ওকে আমরা কেউ বাঁচাবার চেষ্টা করিনি! উল্টে ওর যাতে সাজা হয়, তারই চেষ্টা করেছি।

শশাংক খাপ্পা হয়ে বলল, বাঃ! কী বলছিস কুমু? স্নেহাকরকে মার্ডার করবে, আর আমরা ওকে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করব। এটা বিবেকের প্রশ্ন। শুভ যাই ভাবুক, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন না এটা?

শুভ বলল, শশাংক, আমি অন্যায়ের সাপোর্টার নই। কিন্তু ইন্দ্র খুন করে নি।

করেনি?—শশাংক ট্যাবা চোখে তাকিয়ে রইল শুভর দিকে!

না। আমি দেখেছি ইনা স্নেহাকরকে জড়িয়ে ধরে বসে ছিল। মুকুল আর কারা যেন স্নেহাকরের পেটে রুমাল বেঁধে দিচ্ছিল।

শশাংক অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে অন্যাদিকে তাকিয়ে রইল। কুমু বলল, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ইনাই করুক, আর যেই করুক স্নেহাকর ইজ ডেড।

শশাংক রাগীচোখে তাকিয়ে বলল, কী বলছিস মাইরি? স্নেহাকরকে আর কে স্ট্যাব করবে। তার সঙ্গে কার শত্রুতা ছিল? অত ভাল ছেলে—কারুর সাতে-পাঁচে থাকত না। আমাদের কয়েকজন ছাড়া আর কারুর সঙ্গে মিশত না। তাকে ভূতে খুন করল?

কুমু থাপ্পড় তুলে বলল, শাট আপ! রামভোঁদড় আর কাকে বলে! যত বলছি, ও সব বাজে কথা চাপা থাক, তত খুঁড়ে বের করছে। শুভ, তুই ইনাকে বল, যা হবার হয়েছে, লেট আস স্টার্ট ক্লিন। ডোমকল রুটে ওর মতো সাহসী আর ডানপিটে কাউকে আমাদের দরকার। বাবার এতে আপত্তি নেই। কথা বলে নিয়েছি।

শুভ বলল, বলব।

সে উঠলে কুমু বলল, তুই বলে দ্যাখ, কী বলে। তারপর না হয় আমার সঙ্গে মিট করিয়ে দে। তুইও থাকবি। এ মাথা গরম ভোঁদড়টা থাকলে গণ্ডগোল বাধাবে।

শশাংক রাগ করে চলে গেল। কুমু গ্রাহ্য করল না। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে কুমু ফের বলল, ইনা আমার উপর ভীষণ চটে আছে। আসার দিনই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথা বলতে গেলাম, টন্টিং টোনে বলল, 'ফাঁসির পরও বেঁচে থাকে মানুষ। ভূত হয়েও বেঁচে থাকে' আরো কী সব আবোল-তাবোল বলতে লাগল। আমার খারাপ লাগল। কোনো কথা না বলে সরে এলাম।

শুভ সিগারেট ধরিয়ে বলল, মুশকিল হয়েছে কী জানিস? তুইও তো সাক্ষী

দিয়েছিলি মামলায়।

দিয়েছিলাম। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে তো একটা কথাও বলিনি। বলেছিলাম, অন্ধকারে কে স্ট্যাব করেছে দেখিনি। তবে লোকেরা বলছিল, ইনা···

কথা কেড়ে শুভ বলল, সেটাই ওর বিরুদ্ধে গিয়েছিল। আচ্ছা, চলি রে!

কুমু আবার মনে করিয়ে দিল ইন্দ্রকে কী বলতে হবে। শুভ হনহন করে হেঁটে ঘাটের দিকে গেল। সে বুঝতে পারছিল, কুমু খুব ভয় পেয়েছে ইন্দ্রের হাবভাব দেখে। মিটমাট করতে চায়। আসলে ইন্দ্রকে গঙ্গার ওপারে ঠেলে দিয়ে নিরাপদ হতে চায়।

কিন্তু কেন কুমুর এত ভয়? স্নেহাকরকে কি কুমুই খুন করেছিল?

নৌকোর ভিড়ের ভেতর বসেও শুভ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকল! কুমু একটু সৌখিন প্রকৃতির ছেলে। ফিল্মের হিরোর মত চেহারা। লুকিয়ে একটু-আধটু মদ খায় কোনো উপলক্ষে। মনে পড়েছে, সেই গঙ্গাপুজোর দিন কুমুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ঘাটে দাঁড়িয়ে মাতলামি করছিল। শুভকে দেখে জড়িয়ে ধরেছিল। শুভ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেলার ভিড়ে ঢুকে যায়। তখনও বৃষ্টিটা শুরু হয় নি। হাল্কা রোদ্দুর ছিল।

হয়তো মানুষ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করে কিছু বলা যায় না তার আচরণ দেখে। বাইরের চেহারার সঙ্গে ভেতরের চেহারার তো কোনো মিল নেই মানুষের। অনেক সময় মানুষের নিজের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়, সে আসলে কী। হঠাৎ কোনো এক মুহূর্তে আসল চেহারা বেরিয়ে আসে বাইরে। নিজেই অবাক হয়ে যায় নিজেকে জেনে।

ইন্দ্র বলছিল, আনুমাস্টারের মেয়ে নিরুর সঙ্গে কুমুরও নাকি সম্পর্ক ছিল একসময়। মেয়েটা কী! কেন অমন স্বভাব নিরুর? বাবার ওপর শোধ নিতেই কি?

অথবা কোনো-কোনো মেয়ে এমন হয়। নিজেও জানেনা নিজের আচরণের অর্থ। এ যেন অজান্তে মানুষের সমাজের খুব কাছে ঘেঁষে বয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক স্বাধীনতার চোরা স্রোতের টান। যাকে টেনে নেয়, তার আর উদ্ধার নেই। নিরু কি সেই চোরা স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে বহুদিন থেকে?

তা না হলে সেদিন বৃষ্টির মধ্যে নির্লজ্জের মতো ইন্দ্রের ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছিল—বাড়িতে তখন শ্যামলীদি ছিল, এই বেপরোয়া আচরণের মানে কি? নিরু ইন্দ্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

যেমন করে সে হয়তো স্নেহাকরকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল।

শুভ শিউরে উঠল। মনে হল, ইন্দ্র বিপন্ন। তাকে সাবধান করা উচিত। কুমুর প্রস্তাবটা এমন সময়ে মেঘ না চাইতে জলের মতো অভাবিত ভাল। ইন্দ্র পালিয়ে যাক।

শম্ভু মাঝি ডাকল, পুটুদা! ও পুটুদা! পারে নাববেন, নাকি নৌকো চাপার সখ,

হয়েছে ?

শুভ দেখল, সে নৌকো থেকে নামে নি। নৌকো ওপারের ভিড়ে রয়েছে। দুজন যাত্রী এসে নৌকোয় পা দিল। একটু হেসে শুভ লাফ দিয়ে নেমে গেল ঘাটের পাটাতনে। সামনে গলিরাস্তায় সার সার সাইকেল রিকশ দাঁড়িয়ে আছে।

ডোমপাড়ার ঘাটের পাশে সবুজ ঘাসের চটানে সুরিন ড্রাইভারের মেয়ে কমিলাবতী একটা দড়ি নিয়ে 'স্কিপিং' খেলছিল। স্কুলের মেয়েদের দেখে শেখা। তার ছোটমা ঘাটে নামতে গিয়ে বকে গেছে—সরম নাহিক গে ছোকড়ি? কমিলার সরম নেই। পনের-ষোল বছর বয়সে এখনও আইবুড়ি হয়ে আছে। সুরিন ড্রাইভারি করে বাবুর চালে চলে। স্কুলে পাঠিয়েছিল মেয়েকে। যেদিন মেরে ধরে পাঠায়, সেদিনই একটু পরে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে আসে। একদিন আর বাড়িই ফেরে নি। শ্মশানের জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। রামভকত লণ্ঠন নিয়ে অনেক রাতে নাতনিকে বের করে আনে। সিধু দেখেছিল ভাগ্যিস।

সুরিনের পরবর্তী ইচ্ছে, বুদ্ধিসুদ্ধি পাকলে 'বিভা' দেবে। সুতরাং কমিলাকে বহুড়ী সেজে ঘোমটা টেনে কারুর সংসারে এখনও ছেলেপুলের মা হতে হয়নি। এ বয়সে তাদের ঘরের মেয়েদের অন্তত গোটা দুযেক বাচ্চা হওয়ার ট্রাডিশান। সুরিন ট্রাডিশান ভাঙছে।

বিকেলের গঙ্গায় চাপ চাপ নীল মেঘের ছায়া টলমল করছে। পশ্চিমে সূর্যের থমথমে চেহারা এবং রোদে ঘোর লেগেছে। ডোমপাড়া সারাদিন খাঁ খাঁ করে এতক্ষণে গতর খাটিয়ে মেয়েমরদরা দু-একজন করে ফিরে আসছে। কমিলা তাদের চোখের কাঁটা হয়ে খেলছে।

স্কুলের দিক থেকে কুমু আসছিল। কাছাকাছি আসার পর বাঁদিকে হঠাৎ ঘুরে দেখল, একটু দূরে আশ্রমের বেড়ার কাছে ইন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে। অমনি সে থমকে দাঁড়াল। তারপর যেদিক থেকে আসছিল, সেদিকে চলে গেল।

কমিলা খেলা থামিয়ে ব্যাপারটা দেখে একটু হাসল। তার বাবা বলেছে, ইনাবাবু কুমুবাবুর জান খতম করে দেবে। সেজন্যেই ইনাবাবু হরঘড়ি হাতে ছোরা নিয়ে ঘুরছে।

একটু পরে ইন্দ্র এদিকে আসতে থাকল। তখন কমিলা ফের খেলায় মন দিল। মুখে হাসিটা লেগে আছে তার। ইন্দ্র গঙ্গার বুকের কাছে আকন্দ ঝোপের কাছে বসে পড়ল। তারপর সেই ছোরাটা দিয়ে ঘাসে আঁচড় কাটতে থাকল।

খেলতে খেলতে ইন্দ্রের কাছে এগিয়ে কমিলা খিলখিল করে উঠল। ইন্দ্র বলল, কী রে? হাসছিস কেন?

কমিলা দূরে স্কুলের দিকে হাত তুলে বলল, কুমুবাবু ভাগ গেল।

কে? কুমু?

হাঁ। আসতে আসতে তুমাকে দেখল। দেখ্‌কে ভাগ গেল তুরন্ত!

আমাকে দেখে ভাগবে কেন ? কী বলছিস যা তা ?
হামি সব জানে, হাঁ।
কী জানিস ?
তুমি ওকে চাক্কু মারবে।
ইন্দ্র একটু হেসে বলল, তোকেও মারব। ভাগ্ এখান থেকে।
কমিলা বুক চিতিয়ে বলল, হুঁ, মার দো। মারো !
কুমু এখানে কেন আসে রে ?
হামি জানে না কুছু।
রোজ আসে ?
নাহিক্ কৈ কৈ রোজ আসে।
তোর বাবা ফিরেছে ?
নাহিক্ !
তুই এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে খেলে বেড়াচ্ছিস, লজ্জা করে না ? ভাগ।
কমিলা আবার খেলতে শুরু করল। ইন্দ্র গঙ্গার পাড়ে ঢালের শেষে বসে আছে কমিলা ওপরদিকে খেলছে। সূর্যের গায়ে কমিলার সিল্যুট চেহারা আর ওঠা নামা, একটা দড়ি, দড়িটা ওপরে-নিচে এবং কমিলাও ওপরে-নিচে পর্যায়ক্রমে—ইন্দ্র দেখতে থাকল। তারপর ড্যাগারটার ফলা বুজিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ইন্দ্র লাফিয়ে উঠল।—কমিলা ! এবার আমি একটু খেলি। বলে সে ওর হাত থেকে দড়িটা কেড়ে নিয়ে স্কিপিং খেলতে শুরু করল। কমিলা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল।
কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্র থামল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বেলা পড়ে গেছে। ধূসবতা ঘন হয়ে ঘিরেছে চারদিকে। বসতির দেয়াল ঘেঁষে ডোমপাড়ার লোকেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখছিল এতক্ষণ। খেলা থামলে তারা যে-যার বাড়ি গিয়ে ঢুকল। ইন্দ্র কমিলাকে খুঁজছিল দড়িটা ফেরত দেবে বলে, কিন্তু কেটে পড়েছে সুরিনের মেয়ে।
দড়িটা ইন্দ্র ছুঁড়ে ফেলে গঙ্গার ঢালু পাড় বেয়ে আশ্রমের দিকে চলল আবার। শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি। কেন হঠাৎ কমিলার মতো দড়ি ডিঙোনোর খেলা খেলতে ছুটে গেল সে ? অবাক লাগছিল নিজেকে। লোকগুলোও নিশ্চয় তার কাণ্ড দেখে খুব হাসাহাসি করেছে।
আশ্রমে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে আরতি শুরু হল। তারপর টিপটিপ করে বৃষ্টি। আশ্রমের গেটের মাথায় একটুখানি খড়ের চাল আছে। তার ওপর বুগানভিলিয়ার বিশাল ঝাঁপি। তলায় দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচাতে গেলো। আশ্রমের ভেতর একটা সুন্দর আটচালা, তার ওপাশে ছোট্ট মন্দির। আটচালায় ভক্তদের ভিড় আছে। মাথার ওপর উজ্জ্বল বাল্ব জ্বলছে। ইন্দ্র ভেতরে যাবে কি না ভাবছিল।
বৃষ্টিটা সমান তালে টিপটিপিয়ে পড়ছে। দ্রুত আকাশ কালো হয়ে গেছে। তাই

সন্ধ্যা হতে না হতেই এত অন্ধকার। ইন্দ্রর বাড়ি ফেরার ইচ্ছে হল। সে মাথায় রুমালচাপা দিয়ে হন হন করে চলতে থাকল। আশ্রমের পশ্চিম ঘুরে পোড়া জমি আর আমবাগান, তারপর টানা আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে সিধে হেঁটে যাচ্ছিল ইন্দ্র। সামনে বাঁয়ে শুভদের বাড়ি পড়বে। ডাইনে ঘুরে ফের গঙ্গার পাড়ে গেলে সামনে ঝুরিওয়ালা বটগাছ—তারপর তাদের বাড়ির খিড়কির দরজা।

শুভদের বাড়ির আলো এতদূরে পৌঁছয় নি। গাছপালার দঙ্গল সামনে। হঠাৎ ইন্দ্রের ভীষণ ভয় করতে থাকল। কিসের ভয়, ঠিক বুঝতে পারছিল না সে। ভূত, অথবা মানুষের ভয়, কিংবা বৃষ্টিপড়া অন্ধকার আগাছার বনে কী একটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভেবে তার বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকল। পা টিপে টিপে এবং চারপাশে অন্ধকারে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে সে যখন বটতলায় পৌঁছুল, তখন কোথাও শুকনো পাতার ওপর মচমচ শব্দ হল। ইন্দ্র বলল, কে?

সাড়া না পেয়ে ইন্দ্র বেশ জোরে বলে উঠল, কে?

এবার মচমচ শব্দটা আরও কাছে। ইন্দ্র অন্ধকারে শেকড়বাকড় আর ঝুরির সঙ্গে টোক্কর খেতে খেতে খিড়কির দরজায় গিয়ে জোরে ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে শ্যামলীর গলা শোনা গেল, ইনা নাকি?

ইন্দ্র বলল, দিদি, একটা আলো নিয়ে আয়! শিগগির!

ঠিক সেই সময় ইন্দ্রের কানের পাশ দিয়ে কী একটা জিনিস প্রচণ্ড জোরে চৌকাঠে গিয়ে পড়ল। ইন্দ্র ছিটকে সরে দাঁড়াল। তারপরই শ্যামলী দরজা খুলে বলল, পোকামাকড় নাকি রে? তার হাতে টর্চ আছে। কিন্তু আলো তত জোরালো নয়।

ইন্দ্র টর্চটা কেড়ে নিয়ে চারদিকে আলো ফেলল। ঝুরিগুলোর ভেতর দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে দরজার ওপর আলো ফেলে দেখল, একটা ইটের আধলা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে। চৌকাঠে ইটের ছাপ লেগে আছে।

ইন্দ্র ড্যাগারটা বের করে এগিয়ে গেল। শ্যামলী ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল কী হয়েছে ইনা? কোথায় যাচ্ছিস অমন করে?

বটতলায় কোথাও একটুকরো ইট পড়ে নেই। তাহলে নিশ্চয় কেউ ইট হাতে নিয়ে তাকে অনুসরণ করছিল এতক্ষণ। অন্ধকারে ঠাহর করতে পারে নি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে বলেই ইটটা ছোঁড়েনি। দরজায় ধাক্কা দেওয়ার সময় ছুঁড়েছে। ইটটা মাথার পেছনে লাগলে ইন্দ্র নির্ঘাত মারা পড়ত।

ইন্দ্র চাপা গর্জন করছিল, সাহস থাকলে সামনে আয়! লুকিয়ে আছিস কেন?

সে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করলে শ্যামলী ভাঙা গলায় বলল, বলবি তো কী হয়েছে? ও ইনা! চুপ করে আছিস কেন?

বারান্দায় উঠে ইন্দ্র বলল, কোন শালা ইট ছুঁড়ল!

শ্যামলী আঁতকে উঠে বলল, তাই অমন ফটাস করে শব্দ হল? আমি ভাবলাম

তুই দরজা ভেঙে ফেলছিস।

এক সেকেণ্ড আগে খুললে ইটটা তোকেই লাগত।...বলে ইন্দ্র তার ঘরে ঢুকল। শ্যামলী দরজার কাছে এসে ভয়ার্ত স্বরে বলল, আমার মনে হচ্ছে, রাতবিরেতে বাড়িতে ওরা হামলা করবে। শুভকে ডাকব? ও ফাঁড়িতে গিয়ে খবর দিক।

ইন্দ্র সিগারেট খুঁজছিল বালিশের নিচে। প্যাকেটটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। সিগারেট ধরিয়ে বিরক্তভাবে বলল, কারা হামলা করবে ভাবছিস?

ওই যারা তোকে ইট ছুঁড়ে মারল।

ইন্দ্র হাসল বাঁকা ঠোঁটে।—ধুস! এটা মনে হচ্ছে রাজেন কাকার কাণ্ড। প্রথমে ততটা বুঝতে পারি নি। এখন মনে পড়ল। কাল আমাকে ঘাটে দেখে ইট তুলেছিলেন। আমি ড্যাগার দেখাতেই দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

শ্যামলী শুনেছে, স্নেহাকরের বাবা পাগল হয়ে গেছে। কিছুদিন থেকে ঘাটে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হরিশংকরকেও ইট নিয়ে তাড়া করেছিল সেদিন। হরিশংকর ওঁর ভয়ে ঘুরপথে ডিসপেন্সারিতে যায়। পাগলকে বিশ্বাস নেই।

শ্যামলী বলল, ওঁকে কেউ পাগলা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে না কেন বল তো? ব্রজবাবুদের বাসেই তো চাকরি করতেন। ব্রজবাবুর সে ব্যবস্থা করা উচিত।

ইন্দ্র বলল, আর আমিও যেন কেমন হয়ে গেছিরে দিদি! মধুবাবুদের আমবাগানে এসে হঠাৎ কেমন ভয় করছিল। তারপর বটতলায় আসতেই মচমচ শব্দ। শেষে আধলা ইট পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য, রাজেন কাকার কথাটা একেবারেই মনে আসে নি। খালি মনে হচ্ছিল, কুমু কিংবা তার কোনো পোষা নেড়িকুত্তার কাণ্ড।

কুমু মোটেই না।—শ্যামলী মাথা দোলাল।—কুমু তো তোর সঙ্গে মিটমাট করতে চাইছে! চাকরি দিতে চাইছে। তুই ঠিক ধরেছিস, রাজেনবাবুই বটে।

একটু চা খাওয়াবি দিদি?—ইন্দ্র ভেজা শার্ট খুলতে খুলতে বলল। বৃষ্টিটা বেশ জমেছে এবার। উঠোনের মাথায় গাছের ডালপালার ভেতর জোনাকিগুলো কোথায় লুকিয়ে গেছে। ইন্দ্র পেছনের জানলা খুলতে গিয়ে সাহস পেল না। আবার যদি ইট ছোঁড়েন রাজেনকাকা!

কিছুক্ষণ পরে চা এনে শ্যামলী গুছিয়ে বসল তক্তাপোষের বিছানায়। বলল, শুভকে বলব বলেছিলি, বলেছিস?

কী রে?

আবার কী? কুমু যা বলেছে!

ইন্দ্র মুখ নামিয়ে বলল, ধুস! আসলে তো বাসকণ্ডাক্টারি। ও আমার পোষাবে না। তাছাড়া কুমু শালার চাকর হবার জন্য আমার জন্ম হয় নি।

বলে সে মুখ তুলে হাসতে লাগল।...জানিস দিদি, আজ কুমুর কাণ্ড? বিকেলে ডোমপাড়ায় আসছিল। আমাকে দেখে ব্যাটা দূর থেকে লেজ তুলে পালিয়ে গেল! ওর নোকর হব আমি? তোর মাথা খারাপ দিদি?...

শুভর দাদামশাই চলে গেছেন। অনিমাও গেছে। বাড়ি এখন ফাঁকা বললেই চলে। নীলি সারাদিন কলেজে। শুভর মা বিভাবতী রুগ্ন মানুষ। বেশির ভাগ সময় ঘরে শুয়ে থাকেন। যখন ওঠেন, তখন কারণে-অকারণে একটু-আধটু চেঁচামেচি করে বেড়ান। সেটা লক্ষ্মী ঝিকে কেন্দ্র করেই।

আবার রত্নার চিঠি এসেছে। রত্না কলকাতা ফিরেছে হিমালয় থেকে। হিমালয়ে এখন প্রবল বর্ষা নেমেছে। নীলিকে লিখেছে অন্ততঃ দুচারদিনের জন্য কলকাতা যেতে। বিভাবতী কড়া মুখে বলেছেন, না। লিখে দে, পরীক্ষা চলছে।

বিভাবতী জানেন, বউমা তাঁর ছেলেকে চিঠি লেখেনি একটাও। যাবার সময় তেমন কিছু ঝগড়াঝাঁটিও তো হয় নি। কলকাতার মেয়ে সম্পর্কে বিভাবতীর ধারণা ভাল ছিল না। এখনও তো আরো খারাপ। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কষ্ট হয়। মনে হয়, শুভ ভেতর-ভেতর ক্ষয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। কত চঞ্চল হাসিখুশী তেজী প্রকৃতির ছেলে ছিল শুভ। এখন চুপচাপ বসে থাকে। ছবি সে ছেলেবেলা থেকে আঁকে। কিন্তু এখন যেন নিজেই ছবি হয়ে যাচ্ছে। কদাচিৎ বাইরে বেরোয়। সারাক্ষণ ঘরের ভেতর হাতে তুলি নিয়ে কি ভাবে। কখনও রোদের দিনে লনে কদমতলায় ইজেল নিয়ে যায়। বিভাবতী জানেন, ক্যানভাসে আঁচড় পড়ে সামান্যই।

কিন্তু তার চেয়ে বড কথা, শুভ সংসারের ভবিষ্যৎ একেবারেই ভাবছে না। শক্তিব্রতের সঞ্চয় দিনে দিনে শেষ হয়ে আসছে। শুভ কি টের পায় না এটা? মধ্যে দুটো বছর কলকাতায় চাকরি করত বটে, পয়সাকড়ি নিয়মিত কিছুই পাঠাত না। মাঝে মাঝে বাড়ি এলে তখন দু একশো টাকা এবং কিছু কাপড়-চোপড় মা বোনের জন্য। বিভাবতী কিছুদিন থেকে ভাবছিলেন, সংসারের ব্যাপারটা তুলবেন ছেলের কাছে। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যান। নীলিকে কলকাতায় রেখে এম এ পড়ানোর কথা শুভ কোন মুখে বলে? তারপর তো নীলির বিয়ের প্রশ্নও আছে। শক্তিব্রত বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েই ফতুর হয়েছিলেন।

রাতে খাওয়ার পর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে, বিভাবতী সংসারের গল্পটা শুরু করবেন ভাবছিলেন তখন। হঠাৎ শুভ হাসতে হাসতে বলল, নীলি! মা! সাবধান। রাজেন কণ্ডাক্টার নাকি রাত্রে বাড়ি বাড়ি ঢিল ছুঁড়ে বেড়াচ্ছে। জানলা খুলে রেখো না কেউ।

বিভাবতী রাগ করে শুতে গেলেন। নীলি বলল, সত্যি রে দাদা। ঘাটে ওর হাতে ইট দেখেছি, জানিস?

শুভ বলল, ইনাকে সেদিন রাতে চুপি চুপি নাকি ফলো করেছিল। তারপর দড়াম করে থান ইট!

বলিস কি!—নীলি চোখ বড় করে বলল।—ইনাদা নিশ্চয় ড্যাগার নিয়ে তাড়া করেছিল?

অন্ধকারে দেখতে পেলে তো !—শুভ ফের হাসতে লাগল।—আজকাল স্নেহাকরের বাবা রানীরঘাটে সেন্সেশান এনেছে। ইট খাবার ভয়ে সবাই তটস্থ।···

নিজের ঘরে ঢুকে বিভাবতী কিন্তু সত্যি পিছনদিকের জালানা বন্ধ করেছেন ততক্ষণে। একটু পরে ডাকলেন, নীলি! ও নীল! শুনে যা।

নীলিমা জমিয়ে গল্প শুনছিল কলকাতার এক পাগলের! বিরক্ত হয়ে উঠে গেল মায়ের ঘরে। শুভ তাকে মনে করিয়ে দিল, জানলা বন্ধ করে রাখিস যেন।

নীলি বলল, কী ?

বিভাবতী চটে গেলেন।—কী এমন রাজকার্যে ব্যস্ত আছিস রাতবিরেতে যে—কী ? কথা শোনো মেয়ের।

নীলি একটু হেসে বসল মায়ের বিছানায়। বলল, আস্তে! রাজেন পাগলা ইট ছুঁড়বে।

ছিঃ!—বিভাবতী ভর্ৎসনার সুরে বললেন।—অমন অশ্রদ্ধা করে কথা বলছিস কেন ? খুব যে লেখাপড়া শিখেছিস! না হয় বাস কণ্ডাক্টারি করতেন ভদ্রলোক! মানুষ তো কম কষ্টে পাগল হয় না!

নীলি বলল, আচ্ছা বাবা আচ্ছা! হয়েছে! বেশি কথা বললে নাকি তোমার বুক ধড়ফড় করে ?

বিভাবতী একটু চুপ করে থাকাব পর চাপা গলায় বললেন, শুভ আমার কথায় তো কোন দিন কান করে না। আমাকে বলেও না খুলে কিছু। ও কি ফের কলকাতা যাব-টাব বলছে শুনেছিস ?

না তো! কেন ?—বলেই নীলি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে চোখে হাসল।—বউদির •ব্যাপারে বলছো তো ?

বিভাবতী আবার চটলেন।···যা বললাম তার জবাব নেই—কোন কথা এনে ফেলল!

নীলি হতাশ ভঙ্গিতে বলল, ঠিক আছে বাবা। বলছি। দাদা কলকাতা যাবে না। নাও, হল তো?

সে না যাক্।—বিভাবতী অন্যমনস্ক ভাবে বললেন। যেতেও আমি বলছি না। কিন্তু এমন করে দিন কাটালে কি চলবে ওর ? নিজের ভবিষ্যৎ আছে। আমার যা অবস্থা, কখন আছি কখন নেই—তারপর কী হবে ?

কী হওয়া উচিত ?

তুই বড্ড চালিয়াত হয়েছিস নীল! ওপারের মেয়েগুলোর সঙ্গে মিশেই এইসব শিখেছিস!—বিভাবতী দুঃখিত ভাবে বললেন।—তোর বয়সে আমরা এমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে শিখিনি। কলেজে না হয় পড়িনি—কিন্তু আমার বাবার বাড়ি কেষ্টনগর। মনে রাখিস!

নীলি হাসতে লাগল।···কেষ্টনগর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়! এর মানে কী মা ?

বিভাবতী খাপ্পা হয়ে বললেন, লজ্জা করে না হাসতে ? আর কিছুদিন পরে যখন

বাপের এই অট্টালিকা বেচে খেতে হবে, কলেজের মাইনে দিতে হবে, তখন হাসি বেরিয়ে যাবে!

শুভ ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। মায়ের তখন অমন করে তার ঘরে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে টের পেয়েছিল একটা গুরুতর কিছু বলতে চান বিভাবতী। কিছুদিন থেকে মায়ের এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে শুভ। কিছু বলতে গিয়ে যেন পারেন না। কিন্তু শুভ তো সবই বোঝে।

মায়ের ঘরে সটান ঢুকে বলল, তুমি নিশ্চিত থাকো। তেমন কিছু ঘটার আশংকা নেই।

বিভাবতী একটু অপ্রস্তুত হয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘোরালেন।

শুভ হাসছিল। ফের বলল, কেন ওসব তুমি ভাবো আমার মাথায় আসে না! আমি কী ইনার মত লক্ষ্যহীন বাউণ্ডুলে? কী ভাবো তুমি আমাকে?

নীলি একবার দাদার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। শুভ বলে উঠল, ঢিল খাবি, সাবধান কিন্তু!—অমনি নীলি দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল!

বিভাবতী তাকে একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, ধিঙ্গি মেয়ে ঢঙ দেখ না! শোগে যা। রাত হয়েছে।

নীলি বলল, তোমার কাছে শোব। তারপর সে উঁচু বিশাল খাটে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে অন্যপ্রান্তে চলে গেল। সত্যি শুয়ে পড়ল। দুষ্টুমি করে নাক ডাকার শব্দ তুলল।

বিভাবতী দরজায় উঁকি মেরে লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে বললেন, লক্ষ্মী! দরজা আটকে শুয়ে পড়। নীল আমার কাছে থাকছে।

লক্ষ্মীর তিনকুলে কেউ নেই। বিধবা মেয়ে। নীলির ঘরের মেঝেয় সে শুয়ে থাকে। সে দরজা বন্ধ করা পর্যন্ত বিভাবতী উঁকি মেরে রইলেন।

শুভ বলল, আমি ওপারে একটা ঘর পেয়ে গেছি। ভাড়া তেমন বেশি কিছু না।—ম্যানেজ করা যাবে। সাইনবোর্ডের স্টুডিও করব। ফেস্টুন টেস্টুনেরও কাজ পাওয়া যাবে প্রচুর। পরে একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নেওয়া যাবে অবস্থা বুঝে। অতএব তোমার ভাবনা চিন্তা নিষ্ফল।

বলে সে জোকারের ভঙ্গিতে দরজার কাছে এল।···আজ তোমার নিশ্চয় সাউণ্ড স্লিপ হবে!

বিভাবতী গুম হয়ে বললেন, সাইনবোর্ড আঁকবি? এইজন্যে এত লেখাপড়া শিখেছিলি?

কেন? এটাকে ছোট কাজ ভাবার কারণ কী? কাজটা তো আর্টিস্টের। কলকাতার বিজ্ঞাপন কোম্পানীতে গোলামী করতাম। এখন স্বাধীন ভাবে একই ধরনের কাজ করব।

শুভ চলে গেলেও বিভাবতী চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিটা সমানতালে ঝরছে। বাল্বে

পোকা থিক থিক করছে। নীলি ঘুমঘুম স্বরে ডাকল, মা! শুয়ে পড়ো আলো নিভিয়ে। বড্ড পোকা।
মশারী টেনে দিয়ে বড়ো আলোটা নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বাললেন বিভাবতী। বাইরের আলোটা সারা রাত জ্বলবে। দরজা আটকে আস্তে বললেন, নীল, ঘুমোলি ?
না। কেন ?
বউমার চিঠিটা আরেকবার পড়ে শোনাবি ?
না। ঘুম পাচ্ছে।
বিভাবতী অনেকক্ষণ পরে ঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে শুতে গেলেন। টের পেলেন, নীলি ঘুমোয় নি। মাকে জড়িয়ে গালে গাল রেখে ফিসফিস করে বলল, জানো মা ? দাদার স্কেচের খাতার ভেতর একটা চিঠি ছিল। ইনকমপ্লিট চিঠি। বউদিকে কবে লিখতে লিখতে আর লেখেনি। চিঠিটা আমি চুপি চুপি বউদির নামে পোস্ট করে দিয়েছি। দাদা এখনও টের পায় নি। শোনো মা, দাদা যখন টের পাবে, আমার অবস্থা শোচনীয় হবে। বুঝতে পারছ তো ? তখন কিন্তু আমি তোমার কোলের ভেতর ঢুকে পড়ব।
বিভাবতী শুধু বললেন, ঠিক করিস নি।...

হরিশংকর সকাল সাতটা নাগাদ ঘাটে গিয়ে বাজার করে আনে। গাঁ-গেরাম থেকে বাসে চেপে যে সব মেছুনী ঘাটে পেঁছিয় এবং গঙ্গা পেরিয়ে শহরে যায় মাছ বেচতে, তাদের প্রচণ্ড গরজ। চৌবেজী বললেও তারা মাঝের ঝুড়ির ডালা খুলতে রাজী না। কিন্তু চৌবেজী তো মাছই খান না। এদিকে হরিশংকর ডাক্তারখানার লোক হলেও তার খাতির করে না। তবে ফেরার সময় তাদের কারুর চোখের সামনে নাপিত দেখলে নখ বাড়ার মতো ওষুধ খেতে ইচ্ছে করে। এভাবেই হরিশংকর ভাগ্যে-ভোগায় সেই দুষ্প্রাপ্য মাছ পেয়ে যায় কোনো ওষুধখাকী মেছুনীর কাছে। মাছ তরিতরকারীর বাজার রোজ সকালে রানীরঘাটেও বসে। কিন্তু লোকের এক অদ্ভুত ধারণা, ওপারের শহরে যায় যা কিছু, সবই উৎকৃষ্ট বস্তু। হরিশংকর নিজের ওপর এবং অন্যদের ওপরও খাপ্পা হয় অনেক সময়। কিন্তু সকালবেলা থলে হাতে ঠিক সে চৌবেজীর গদীর পাশে গিয়ে অপেক্ষা করে।
থলের বাজার বাড়িতে পেঁছে দিয়ে ফের আটটায় গিয়ে ডিসপেন্সারি খুলতে হয়। দশটায় কল্যাণবাবু যান প্রাইমারি হেলথ সেণ্টারে। ফেরেন ঘণ্টাখানেক পরে। ওই একঘণ্টায় হরিশংকরের কিছু উপরি রোজগার হয়। ইঞ্জেকশান দেয়। চুপি চুপি মিক্সচার-বড়ি এসবও দেয় বিশ্বস্ত কোন রুগীকে। তাছাড়া বাড়ি গিয়ে ইঞ্জেকশান দিয়ে আসারও কিছু রোজগার আছে হরিশংকরের। ইঞ্জেকশান পিছু একটা করে আধুলি।

কল্যাণবাবু সব বোঝেন। মাইনে প্রথমে দিতেন মাসে পঞ্চাশ। পরের বছর ষাট, এখন পঁচাত্তর। এই বেতনবৃদ্ধির পেছনে হরিশংকরের শাসানি ছিল। সে কম্পাউণ্ডার হিসেবে পাকা লোক। বর্ধমানে বড় হাসপাতালে চাকরি করত। সে-চাকরি ছেড়ে আসতে হয়েছিল শ্বশুরমশাইয়ের নানা প্রলোভনে পড়ে। এখন পস্তায়।

আজ আটটা বাজলেও হরিশংকর ফিরছে না দেখে শ্যামলী একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। রানীরঘাটের ইদানিংকার হালচাল ভাল না। তার ওপর ইন্দ্রের জন্য ভাবনা হয়। হরিশংকর ইন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া করুক আর মারামারি করতেই যাক, শ্যালকটিকে সে স্নেহও করে। শ্যামলী দেখেছে, খুনের মামলায় ইন্দ্রের জন্য কী ছুটে না বেড়িয়েছে সে।

ইন্দ্র এখনও শুয়ে আছে। দরজা বন্ধ। শ্যামলী তাকে বলতে যাচ্ছিল, কী হল ঘাটে গিয়ে দেখে আসতে—সেই সময় হরিশংকর ফিরল হন্তদন্ত হয়ে। বাজারের থলে রেখে বলল, যা সবাই বলাবলি করছিল, ঠিক তাই হল। এই জন্যে বলে, পাগলকে কিছু মনে করিয়ে দিতে নেই। একবার এক পাগল দুষ্টুমি করছে দেখে একজন যেই বলেছে, ওরে! দেখিস যেন ঢিল ছোঁড়ে না—অমনি পাগল বলল, এই তো মনে করিয়ে দিয়েছ বাবা! ব্যস! ঢিল ছুঁড়তে শুরু করল ব্যাটা। এও হয়েছে তাই। একজাক্টলি তাই! সবাই বলে বলে…

শ্যামলী চেঁচিয়ে উঠল, ভাষণ থামাও। হয়েছে কী?

আরে, ওই রাজেন পাগলার কাণ্ড!

হুঁউ! তুমিও খোকা সেজে মজা দেখছিলে বুঝি! ঢিল যখন খাবে তখন বুঝবে। …বলে শ্যামলী থলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

হরিশংকর বলল, ইনার সাবধান হওয়া দরকার, বুঝলে? কবে না আনুমাস্টারের মতো মাথা থেঁতলে দেয়। সে-রাতে চেষ্টা করেছিল তো। খুব বেঁচে গেছে ইনা।

শ্যামলী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আনুমাস্টারকে ঢিল মেরেছে?

বলছি কী! সেই জন্যে তো এত দেরি।—হরিশংকর ঘরে ঢুকে লুঙ্গি ছেড়ে প্যাণ্ট পরতে গেল।

শ্যামলী দরজার কাছে গিয়ে হাতমুখ নেড়ে বলল, তোমার অর্দ্ধেক মুখে অর্দ্ধেক পেটে। আনুমাস্টারকে মেরেছে?

হ্যাঁ। সে এক কাণ্ড। মাস্টারমশাই গেছেন আর পড়েছেন রাজেনের পাল্লায়। ইট নিয়ে তাড়া করেছে। মাথার পেছনে লেগে এক ইঞ্চি ক্র্যাক। মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। ডিসপেন্সারি খুলে ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম। রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। স্টিচ্ করে দিয়েছি কোনোরকমে।

তারপর, তারপর?

রিকশোয় করে বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে এলাম।

হ্যাঁ গো, বাঁচবেন তো ?

হরিশংকর শার্ট বদলে বলল, শক্ত মানুষ। অন্য কেউ হলে লাইফ রিস্ক হত। শোনো, ঘাটে কিছু সিঙাড়া-টিঙাড়া খেয়ে নেব।

রুটি সেঁকে রাখলাম যে! কে খাবে অত ?

তাহলে দাও। ঝটপট গিলে নি। সাড়ে আটটা বাজে।

খেতে দিয়ে শ্যামলী বলল, হ্যাঁ গো, রাজেনবাবুকে কেউ বেঁধে রাখছে না কেন? না হয় পাগলা হাসপাতালে দিয়ে আসুক কোথাও!

হরিশংকর রুটি চিবুতে চিবুতে বলল, পাগলের ওষুধ প্রহার! আজ ধোলাই খেয়েছে লোকের হাতে।

শ্যামলী শিউরে উঠে বলল, আহারে!···

আনন্দময় মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে বারান্দায় তক্তাপোষে কয়েকটা বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। বাইরের দরজা বার বার খুলতে হচ্ছে বলে নিরু বিরক্ত হয়ে খুলে রেখেছে হাট করে। রানীরঘাটে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে যেন। তখন থেকে কত লোক এল। স্কুল থেকে ক'জন মাস্টারমশাই বিশাল এক ছাত্রবাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। উঠোন থৈ থৈ করছিল। চৌবেজী এলেন। দুপুর অব্দি এতসব লোক দেখে গেল। আনন্দময় একটুও কাবু হননি সামান্য একটুকরো ইটের ঘায়ে, সেটা বুঝতে চায় না কেউ। কিন্তু প্রমাণ হল, রানীরঘাটের মানুষ আনুমাস্টারকে কতটা শ্রদ্ধাভক্তি করে।

দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে হরিশংকর আবার দেখতে এল। আনন্দময় বললেন, তেমন কিছু না হে! বেলা হয়েছে, খাওয়াদাওয়া করগে, যাও।

হরিশংকর বলল, যাই। ব্যথা-বেদনা কেমন আছে এখন? টনটন করছে না তো?

হাসলেন আনন্দময়।···কী ট্যাবলেট খাওয়ালে! কোনো সেন্সেশান নেই মাথায়।—বলে কপালে একবার হাতও বোলালেন।

হরিশংকর বলল, চান করবেন না যেন। এ টি দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। ভয়ের কিছু নেই।

সুচরিতা কাতর চেহারায় থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, হ্যাঁ গা, ভাত খাওয়া চলবে তো?

খুব চলবে।—হরিশংকর হাসল।—মাছের ঝোল ভাত দিন। সন্ধ্যায় বরং আরেক-বার এসে দেখে যাব।

সুচরিতা বললেন, সন্ধ্যায় কল্যাণবাবুকে একবার আসতে বলো না বাবা!

লছেন যখন, বলব।···বলে হরিশংকর বেরিয়ে গেল। তার কথায় আস্থা নেই দেখে

একটু বিরক্ত হয়েই গেল।
আনন্দময় সুচরিতার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।···তোমার ধর্মকর্ম সব পণ্ড হল এদিনটা। নাকি আজ কোনো অনুষ্ঠান নেই আশ্রমে?
সুচরিতা ক্ষুব্ধভাবে বললেন, নেই কেন? আছে।
আহা! সেভাবে বলি নি।—আনন্দময় দেয়ালে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।—এ একটা সামান্য ব্যাপার। এজন্যে তোমার উদ্বেগের কারণ ছিল না।
পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ বসে পড়লেন। সুচরিতা ব্যস্তভাবে এক পা এগিয়ে বললেন, কী হল?
মাথাটা একটু ঘুরে উঠল। ও কিছু না।
সুচরিতা ডাকলেন, নিরু! নিরু! আয় তো এখানে!
নিরু টিউবয়েলের পাশে শিউলি গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। বলল, কী হয়েছে?
সুচরিতা চটে গেলেন।···ত্রিভুবন ডুবে গেলেও তোর হাঁটু জল সর্বক্ষণ। কৈ, ওঠ—ঘরে গিয়ে শোবে। আহা, ওঠ না!
আনন্দময়ের মনে হচ্ছিল সুচরিতা অনেকটা দূরত্ব বিদ্যুদ্বেগে ডিঙিয়ে কাছে এসে গেছেন। কতকাল পরে এত কাছে দেখছেন নিরুর মাকে। ইচ্ছে করেই তাঁর কাছে সমর্পণ করলেন নিজেকে। কোনো-কোনো মুহূর্তে পুরুষের জীবনে মেয়েরা করুণা হয়ে আসে। সব রুক্ষতা ঘুচিয়ে দেয়।
বিছানায় বসিয়ে সুচরিতা বালিশ আনতে যাচ্ছিলেন। নিরু নিয়ে এল বাইরের তক্তাপোষ থেকে। সুচরিতা বললেন, এখানেই মেঝেয় আসন করে দে। আমি ভাত বেড়ে আনছি।
নিরু বালিশ দুটো বাবার পেছনে গুঁজে দিয়ে আসন আনতে গেল।

অনেককাল পরে সুচরিতা সামনে বসে খাওয়ালেন। আনন্দময় তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন বটে, মনে মনে বললেন, রাজেন! এ তোমারই কীর্তি! ইটটা না মারলে এসব কিছুই ঘটত না।
সুচরিতা লক্ষ্য করলেন আনন্দময় মিটিমিটি হাসছেন। বললেন, কী হল? হাসছ কেন?
হাসছি। রাজেনটা···খামোকা মারধর খেল লোকের কাছে। কী যে করে!
সুচরিতা ঝাঁঝাল করে বললেন, বেশ করেছে ওকে মেরেছে। পাগল হয়েছে বলে মাথা কিনে নিয়েছে। ওকে পুলিশে দিলে না কেন?
নিরু বারান্দা থেকে বলল, মা! তুমি ওখানেই খেয়ে নেবে?
হুঁ। তোর বাবার পাতেই বসছি। একটুখানি ভাত তরকারি দিয়ে যা। বেশি না—একটুখানি।—সুচরিতা উঠে স্বামীকে ধরে আঁচাতে নিয়ে গেলেন বারান্দায়।

হাতে জল ঢালতে ঢালতে ফের বললেন, তুই খেয়ে নে নিরু। বেলা হয়ে গেছে।
আনন্দময় বললেন, পান খেতে ইচ্ছে করছে। তুমি খেয়ে নাও আগে। তারপর সেজে দিও।
কিন্তু সুচরিতা পান সেজে দিয়ে তবে খেতে বসলেন।
খাওয়ার পর বিছানায় স্বামীর মুখোমুখি বসে নিজের খিলিটা মুখে পুরে বললেন, একটু শোও। খালি তো দিনরাত ঘাটে গিয়ে আড্ডা। সময়মতো খাওয়া নেই, ঘুমনো নেই। রোজ রাতে শুনি বার বার বেরুচ্ছ দরজা খুলে। ঘুম হয় না বুঝি?
আনন্দময় পা ছড়িয়ে শুলেন। সুচরিতা পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে আনন্দময় বললেন, আসলে রিটায়ার্ড লাইফটা মানুষের বড় একঘেয়ে হয়ে ওঠে। একটা কিছু নিয়ে থাকলে হয়তো চলে যায় কোনোরকমে। অনেক সময় ভাবি, প্রাইভেট টিউশানি ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয় নি। কিন্তু আর সইছিল না। সারাজীবন অন্যের ছেলেপুলের কাছে বকবক করে কাটিয়ে দিলাম। খামোকা! সবটাই অর্থহীন লাগে। কে কী শেখে? কে কী হবে, মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থায় সেটা ঠিক হয়ে যায়। লম্পট হবে, না খুনী—কিংবা জজসায়েব!
কথা বল না! ঘুমোও দিকি চুপচাপ!
বলতে ইচ্ছে করছে। কতকাল পরে তোমাকে পেলাম!
সুচরিতা তাকিয়ে মুখ নামালেন। আস্তে বললেন, কে কাকে পায়! আমি কি পেয়েছিলাম তোমাকে?
পাও নি?
উঁহু।
কেন ওকথা বলছ সুচি?
সারাজীবন তো শুধু স্কুল আর ছাত্র, ছাত্র আর স্কুল করে কাটালে। হুঁ, এখন মনে হয় শিক্ষকজীবনের মতো অভিশপ্ত জীবন আর নেই। অবশ্য যারা নেহাত চাকরি হিসেবে কিংবা বৈষয়িক উন্নতির জন্য শিক্ষকতা করছে, তাদের কথা আলাদা। আমার একটা ব্রত ছিল।
এবার চুপ করো। ঘুমোও।
সুচি, কিছুদিন থেকে স্নেহাকরের কথা খুব করে মনে পড়ছিল। অনেকবার ব্যর্থতার পর ভেবেছিলাম, এই ছেলেটি অন্তত আমাকে ফাঁকি দেবে না। অত ভাল ছেলে! শান্ত নিরীহ। আবার অন্যায়ের প্রতিবাদে ওর জুড়ি ছিল না। কিন্তু পরেশের ছেলে কুমু আর ওই মাতাল ভক্তিব্রতের ছেলে ইন্দ্র স্নেহাকরকে নষ্ট করে ফেলল। তুমি জানো না সুচি, স্নেহাকরের কলেজের মাইনে মাঝে মাঝে আমিও দিয়েছি। বই কেনার টাকাও দিয়েছি। আমার একটা স্বপ্ন ছিল ছেলেটাকে নিয়ে। আনন্দময় একটা জোরালো নিঃশ্বাস ফেললেন।

সুচরিতা স্বামীর গালে একটা হাতের ছোঁয়া দিয়ে আদর করে বললেন, চুপ করো না এবার। মাথা ঘুরবে যে!

আনন্দময় বললেন, কথা বলতে ইচ্ছে করছে। জানো সুচি? ইদানিং প্রায় স্বপ্ন দেখতাম স্নেহাকরকে। খুব কষ্ট হত। এ ঘরে আমি একা। ঘুম ভাঙার পরও সে কি অসহ্য কষ্ট। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করত।

সুচরিতার ভাতঘুমের অভ্যাস আছে। ঢুলছিলেন। এবার স্বামীর পায়ের কাছে শুয়ে পড়লেন।

আনন্দময় বললেন, সব কথা হয়তো তুমি জানো না। স্নেহাকর নিরুর সঙ্গে আমার অসাক্ষাতে মেলামেশা করত। একদিন হঠাৎ বাড়ি ঢুকে দেখি, বারান্দায় থামের কাছে···

সুচরিতার সাড়া নেই দেখে থেমে গেলেন আনন্দময়। চোখ বুজে স্নেহাকরকে দেখতে গিয়ে দেখলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্রের হাতে সেই ছোরাটা। শাদা বাঁট। ছ'ইঞ্চি লম্বা, ইঞ্চিটাক চওড়া ফলা। ভয়ে চোখ খুললেন তক্ষুনি।

সেবার গঙ্গাপুজোর দিন নিরুপদ্রব রানীরঘাটে এক আততায়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল। স্নেহাকরের রক্তাক্ত দেহটা চোখে দেখতেও সাহস হয়নি আনন্দময়ের। তারপর থেকে প্রতিমুহূর্ত কেটে গেছে অস্বস্তিতে। বারবার চমকে উঠেছেন। পেছনে সেই নিষ্ঠুর আততায়ী নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করছে যেন। গাছের শুকনো পাতায় মচমচ শব্দ শুনে একদিন ইটখোলার কাছ থেকে হন্তদন্ত হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। হয়তো জঙ্গলে একটা গরু চরে বেড়াচ্ছিল। অথচ গিয়ে দেখারও সাহস হয় নি। তারপর আস্তে আস্তে সয়ে গিয়েছিল ভয়টা। স্নেহাকর খুব কাছের বলেই যেন ওই আতঙ্ক। নিজের ছেলে নেই। শুধু ওই এক মেয়ে। তাই স্নেহাকরকে একসময় নিজের ছেলে বলে মনে করতেন। তার নিষ্ঠুর ভয়ংকর মৃত্যুতে সেই আতঙ্ক স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু ইন্দ্র ফিরে আসার চাইতে ইন্দ্রের হাতের ওই ড্যাগারটা তাঁর সেই পুরনো আতঙ্কটা খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিল। আবার বড় অস্বস্তিতে জীবনযাপন করেছেন আনন্দময় অথচ আঘাতটা পেছন থেকে যে করল, সে ইন্দ্র নয়। রাজেন।

মরে যেতে পারতেন এক টুকরো ইটের ঘায়ে। মাথার পেছনে ঘা। শক্ত মানুষ বলে বেঁচে গেছেন।

আনন্দময় ডাকছিলেন, সুচি! সুচি! শুনছ? একবার ওঠ না লক্ষ্মীটি!

সুচরিতা সাড়া দিলেন।—কী? মাথা ঘুরছে নাকি?

শীত করছে যেন। একটা চাদর দিতে পারো?

সুচরিতা উঠে বসলেন। গলার কাছে হাত রেখে বললেন, জ্বর বলে তো মনে হচ্ছে না!

আমার ভীষণ শীত করছে কিন্তু।

সুচরিতা একটা চাদর এনে ঢেকে দিয়ে বললেন, ফ্যানটা বন্ধ করে দেব? ফ্যানের জন্য হয়তো শীত করছে।
ফ্যান বন্ধ করো।—বলে আনন্দময় একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। শুনেছি, স্নেহাকরকে স্ট্যাব করার পর সে বলেছিল, এত শীত কেন? মনোহর বলেছিল। মনোহরকে চেনো তো? ঘাটের চা-ওলা। হয়তো ব্লাড চলে গেলে শরীরের ভেতরটা হীম হয়ে যায়।
কেন তুমি অত বকবক করছ? চুপ করো তো।
আনন্দময় ঠোঁট দুটো এদিকে-ওদিকে নাড়িয়ে বললেন, আমার কথা কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে দেখছ? চোয়ালটায় কী হল? একটু দেখতো সুচি। এখানটা।
সুচরিতা ঝুঁকে দেখে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, মুখটা কেমন বেঁকে আছে কেন বলো তো? কৈ, হাঁ করো! পারছ না? সত্যি ঠোঁটের একটা দিক বেঁকে আছে। নিরু! নিরু!
নিরু নেই। সুচরিতা বাইরে বেরিয়ে ডাকাডাকি করে সদর দরজায় গেলেন। বাইরে থেকে ভেজিয়ে কোথায় বেরিয়েছে সে। সুচরিতা হন্তদন্ত হয়ে পাশের বাড়ির জানালায় ডাকতে থাকলেন, মুকুল! মুকুল আছিস?
মুকুল তাস খেলছিল। উঁকি মেরে বলল, কী গো মাসীমা?
নিরু আছে ওখানে?
না তো!
তুই একবার আয় তো বাবা!—সুচরিতা ব্যাকুল ভাবে বললেন।—শিগগির আয় বাবা! তোর মামাবাবুর কী রকম হয়েছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। মুখ বেঁকে গেছে।
মুকুল বলল, সর্বনাশ! টিটেনাস নয় তো?
বিছানায় আনন্দময় একপাশে কাত হয়ে আছেন। একটা পা বেঁকে রয়েছে। চোখ লাল—নিষ্পলক। জড়িয়ে-জড়িয়ে বললেন, এদিকটা সেন্সেশান নেই। স্নেহাকরকে ডাকো।
সুচরিতা চেঁচিয়ে বললেন, কাকে ডাকতে বলছ?
কল্যাণবাবুকে।…

আজ হরিশংকর নীরব। শ্যামলী মাঝে মাঝে গজগজ করছে চাপা গলায়। হরিশংকর দরজা এঁটে স্ত্রীকে ঠেসে ধরে শুয়ে আছে।
ইন্দ্র ঘরের দরজা বন্ধ করতে দেয়নি নিরুকে। সে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট টানছে। নিরু একটু তফাতে তার পায়ের কাছে বসে আছে।
ইন্দ্র বলল, বউদি আসছে জানো? এলে সেবারকার মতো নৌকো ভাড়া করে পিকনিকে যাব। যাবে নাকি?

নিরু ভুরু কুঁচকে বলল, বউদি ! কে তোমার বউদি ?

ইন্দ্র চটে গেল।···তুমি মাইরি মাঝে মাঝে একেবারে ন্যাকা হয়ে যাও। পটুর বউ।

নিরু হাসল।···তাই বলো ! সেই কলকাতার মহিলা ! যা দেমাক ওঁর !

দেমাক ? তুমি মিশেছ ওর সঙ্গে ?

দায় পড়েছে। যেচে আমি কারুর সঙ্গে মিশি নাকি ?

তুমি মেশো নি, তাই বলছ। কদিন পরেই আসছে, আলাপ করিয়ে দেব। দেখবে কত ভাল।

নিরু ঠোঁট কামড়ে মিটিমিটি হেসে বলল, আমার মতো আনএডুকেটড মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে কী হবে ? ইংরিজি বলতেই তো পারব না।

মাস্টারমশায়ের মেয়ে। ইংরিজি শেখনি কেন ?—ইন্দ্র হাসতে লাগল। আমার বাবা অবশ্য মাতাল-টাতাল ছিল। আমিও শেষপর্যন্ত তাই হব কি না কে জানে ? পয়সা নেই, তাই।

নিরু মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বলল, বিনিপয়সায় তো রোজ খেতে যাও ডোমপাড়ায়।

ধুস ! কে বলল ?

দেখতে পাই দূর থেকে।

কী দেখ ? মদ খাচ্ছি ?

নিরু মুখ তুলে একটু হাসল।···একটা ব্যাপার নিশ্চয় দেখতে পাই।

কী সেটা ?

সুরেন ড্রাইভারের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা।

প্রেম ?

তাই তো মনে হয়।

ইন্দ্র সিগারেটে শেষ টান মেরে জানালা গলিয়ে ফেলে দিল। তারপর বলল, দুঃখ শুধু এটাই, আমার সঙ্গে প্রেম করার মতো বুদ্ধিসুদ্ধি ছুঁড়িটার নেই। একেবারে নাবালিকা। তবে দেখতে বিউটিফুল !

বাঃ ! তাহলে তো আর কথাই নেই !

তোমার কি ঈর্ষা হয় নিরু ?

নিরু ওর পায়ে থাপ্পড় মেরে বলল, শাট আপ !

এই যে ! এবার ইংরেজী বলে ফেললে কেমন। ওতেই চলবে। বলে ইন্দ্র উঠল। কোণায় টাঙানো দড়ি থেকে শার্টটা টেনে নিয়ে পরতে থাকল। তারপর লুঙ্গিটা ফেলে আণ্ডারপ্যাণ্ট পরা অবস্থায় বলল, এদিকে তাকিও না। সাবধান।

সে প্যাণ্ট পরে চুল আঁচড়াতে থাকল। নিরু বলল, কোথায় চললে ?

ডোমপাড়ায় প্রেম করতে।

চলো, আজ আশ্রমের ঘাটে গিয়ে বসি।

তোমার মা দেখতে পেয়ে পিট্টি দেবেন।
মা আজ বাবার সেবায় ব্যস্ত।
ইন্দ্র বালিশের তলা থেকে ড্যাগারটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল। তারপর বলল, মাস্টারমশাইকে দেখে আসব ভাবছিলাম। একবার গিয়েছিলাম, জানো? গিয়ে দেখি বাড়িতে প্রচণ্ড ভিড়। চলে এলাম। খুব সিরিয়াস কিছু কি? জামাইবাবু অবশ্য বলল,ততটা না। একটু চিরে গেছে মাথার পেছনটা।
নিরু উঠল।...এই চলো না আশ্রমের ঘাটের ওদিকে।
কেন?
অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।
এতক্ষণ বললেই পারত।
দেয়ালেরও কান আছে।
একটু হিন্ট্ দাও না।
নিরু রাগ করে বলল, ঠিক আছে। শুনে কাজ নেই। চলি।
নিরু দ্রুত বেরিয়ে গেল। খিড়কির দরজা খুলে বটতলায় গেল। জানালায় গিয়ে ইন্দ্র দেখল, নিরু বটতলা ঘুরে আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হনহন করে চলে যাচ্ছে।...
এবেলা আকাশ ময়ূরকণ্ঠী নীল। গাছপালার মাথায় ঝিলমিলে রোদ খেলে বেড়াচ্ছে। গঙ্গা আজ আশ্চর্য শান্ত। তার বুকের ভেতর ওপারের রঙিন শহরের প্রতিবিম্ব একটু-একটু কাঁপছে। এপারে ছোট্ট এই গঞ্জের শরীরও স্থির, চাঞ্চল্যহীন। বড় নিরুপদ্রব লাগে। ইন্দ্র আনমনে ধীরে হাঁটছিল।
সে দূর থেকে দেখল, শুভদের লনে শুভ, নীলিমা আর বিভাবতী বেতের চেয়ার পেতে বসেছেন। শক্তিব্রত সপরিবারে ঠিক এমনি করে লনে বসে থাকতেন। একটু সাহেবী চালচলন ছিল শুভর বাবার। কুকুর আর ছড়ি নিয়ে গঙ্গার পাড়ে ঘাসের চটানে দাঁড়িয়ে থাকতেন কোনো-কোনো বিকেলে।
আর ঠিক সেই সময় তাঁর দাদা ভক্তিব্রত ডোমপাড়ায় কারুর বাড়ির উঠোনে বসে তাড়ি গিলতেন।
ইন্দ্র এই দুরকম জীবনের কোনোটাই বেছে নেয় নি। নিতে চাইলেও কি মেলে? কিন্তু কে জানে কোন জীবনে কত সুখ—লনে বেতের চেয়ার, কুকুর ও ছড়ি নিয়ে ঘোরা কিংবা ডোমপাড়ায় তাড়ি গেলা!
ডোমপাড়ার চটানে কমিলা আজ এক্কা দোক্কা খেলছে। মেয়েটা একা খেলতেই ভালবাসে। ওর খেলার সঙ্গীরা কখনও থাকে, কিন্তু তারা কাল্পনিক। কমিলা খেলতে খেলতে তাদের সঙ্গে কথা বলে। মাথায় কি ছিট আছে মেয়েটার?
সেদিন গঙ্গার ঢালে বসে ইন্দ্র কমিলাকে সূর্যের ভেতর স্কিপিং করতে দেখেছিল। আজ কমিলার পেছনে প্রথম শরতের ভরা গঙ্গা। আর দূরের রঙিন শহর। ইন্দ্র

শুভর মতো ছবি আঁকতে পারে না। পারলে এরকম কত ছবি আঁকত কমিলার।
ইন্দ্রকে দেখে কমিলা খেলা থামাল। ইন্দ্র বলল, থামলি কেন রে?
কমিলা বলল, তুমার চাক্কু কাঁহা গে বাবুদা?
সিধুর কাছে বাবুদা শিখেছিস দেখছি!—ইন্দ্র হাসল।—চাক্কু আছে রে! পকেটে।
দেখাও?
বিশ্বাস হচ্ছে না?—ইন্দ্র প্যাণ্টের পকেট থেকে ড্যাগারটা বের করে দেখাল।
খুলো! খুলো না বাবুদা!
ইন্দ্র ফলা খুলে বলল, তারপর? তোর পেটে মারব নাকি?
মারো! মার দো!—কমিলা সিধে হয়ে বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়াল।
কমিলাবতী! তোর শাড়িটাতো ভারি সুন্দর! কোথায় পেলি?
বাবা দিসে।
কানের দুলদুটো?
বাবা দিসে।
সবই বাবা দিসে?—ইন্দ্র হাসতে লাগল।—আর কেউ দেয় না তোকে?
ন্যাহিক্।
ন্যাহিক্!—ইন্দ্র ভেংচি কাটল।—কেন? কুমুবাবু, শশাংবাবু—এরা যে তোদের বাড়ি আসে? দেয় না কিছু?
কমিলা তাকে অবাক করে হেসে ফেলল।···হামি লিবে তব্ তো? বোলে কী, চলো কমিলা উপ্পার শহরমে। ছিন্‌মা দেখাব। হামি যাবে, তব্ তো? হামি বোলে কী, বাবাকে বোলব, হাঁ! তোখন ভাগ্ যায়।
ইন্দ্র জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ফের যদি তোকে ওসব কথা বলে, বলবি বাবুদাকে বলে দেব। ইন্দ্রবাবুকে। বুঝলি?
ইন্দরবাবুকে?—কমিলা একপায়ে লাফাতে থাকল আবার। সুর ধরে বলতে থাকল, ইন্দরবাবুকো বোল দেগা। ইন্দরবাবুকো বোল দেগা···বোল দেগা···বোল দেগা! তারপর হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ল ঘাসে। কয়েকবার গড়াগড়ি খেয়ে তবে উঠল। সে খিলখিল করে হাসছিল।
ইন্দ্র ঘাসে বসে পড়ে। সিগারেট ধরিয়ে বলে, তুই খেল্ কমিলা। আমি দেখি।
কমিলা কোনো কথা বলে না আর। খেলেও না—অথবা এ তার অন্য এক খেলা। ঘাসের উপর ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ইন্দ্রের চারপাশে বিশাল বৃত্তের পথে দৌড়তে থাকে। বৃত্তটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। ইন্দ্র চোখ বুজে নিজের চারিদিকে ধারাবাহিক ধুপ্‌ধুপ্ শব্দ শোনে। শব্দটা ঘুরেঘুরে আঁটো হতে থাকে। কমিলার রঙিন শাড়ির বাতাস তার গায়ে ঝাপটা মারে। ইন্দ্র চোখ বুঁজে বলে আমি, তোর বুড়ি কমিলা!
কমিলা তার মাথা ছুঁয়েই ছিটকে সরে যায়। ধুপ করে বসে। ইন্দ্র চোখ খুলে

দেখে, সে চোখ বুজে মাথাটা দোলাচ্ছে। ঘূর্ণীর ঘোর লেগেছে কমিলাকে। ইন্দ্র বলে মাথা ঘুরছে তো? এই কমিলা!

কমিলা হাসে। ঘাসের ওপর অবেলায় সাদা প্রজাপতিরা ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। রোদের রঙে লালের আভাস। সামনে গঙ্গার জলে চোখ ধাঁধানো লাল রঙ ঝলমল করছে। ইন্দ্র বলে, কী হল? এই কমিলা!

কমিলা হঠাৎ উঠে বাড়ির দিকে চলে গেল।

ইন্দ্র আরো কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ওঠে। সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিমে ইটখোলার কালো মস্ত চিমনী থেকে ধোঁয়া উঠছে। চলতে চলতে কানে এল মজুর মজুরনীদের বস্তিতে ঢোলকের বাজনা বাজছে। এবড়ো-খেবড়ো খোয়াঢাকা রাস্তাটা ডিঙিয়ে সে একটা ঢিবির উপর গিয়ে দাঁড়াল। ঢিবির মাথায় বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওলা একটা গাছ। তার ফল কালো—বাঘের নখের মতো নাকি, তাই বাঘনখা নাম গাছটার। ইন্দ্র ভীষণ চমকাল।

গাছটার তলায় শুয়ে আছে স্নেহাকরের বাবা। কপালে ঠোঁটে কালো রক্ত জমে আছে। পরনের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। ইন্দ্র চলে আসবে কিনা ভাবছিল, রাজেন হাত তুলে ডাকল। ইন্দ্র বলল, বলুন!

রাজেন শুয়ে থেকেই কপাল, ঠোঁট, তারপর ছেঁড়া জামা সরিয়ে বাহু, পিঠ দেখিয়ে বলল, আমাকে মেরেছে।

ইন্দ্র বলল, আপনি আনুমাস্টারকে ইট মেরেছেন কেন?

বেশ করেছি। তোর কি?

ইন্দ্র একটু হাসল।—আপনি সেদিন রাতে বটতলায় আমাকেও ইট ছুঁড়েছিলেন।

আমি না। মাইরি!

আবার কে ইট ছুঁড়বে আমাকে। আপনিই ছুঁড়েছিলেন।

মাইরি, তোর দিব্যি। তোকে মারব কেন? তোকে কত ভালবাসি!…রাজেন হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

ইন্দ্র বলল, এখানে শুয়ে আছেন কেন? এই জঙ্গলের ভেতর শোয় না। ঘাটে যান।

উঁহু! ওরা মারবে। রাজেন চোখ মুছে উঠে বসল।—একটা সিগ্রেট দে না বাপ, খাই! তোরা আমার কত আপনজন। দে না, খাই!

স্নেহাকরের বাবাকে সিগারেট দেওয়ার কথা একদিন ভাবা যেত না—হলই বা কণ্ডাক্টার। কিন্তু এখন অন্য সময় ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে সিগারেটটা ধরে ফুঁক ফুঁক শব্দে টেনে ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল রাজেন। ধোঁয়া গিলছিল না। ইন্দ্র দেখল, হাতের আঙুলও ফেটে গেছে মারের চোটে। বলল, কে এমন করে মারল রাজেনকাকা?

রাজেন আপন খেয়ালে জড়িয়েমড়িয়ে কী সব বলে চলেছে, একটা শব্দও বুঝতে

পারছিল না ইন্দ্র। অন্ধকার ঘনিয়ে এল ধীরে। ইন্দ্র বলল, আপনি আমাদের বাড়ি যাবেন ? যাবেন তো চলুন।

ভাত খাওয়াবি তো ?—সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে রাজেন নড়বড় করে উঠে দাঁড়াল।—বল্, ভাত খাওয়াবি নাকি ?

খাওয়াব। আসুন।

খপ করে ইন্দ্রের বাঁ বাহুটা ধরে রাজেন বলল, তুই ভাল ছেলে। তুই আমার আপনজন বাপ।

ইন্দ্র হাত ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারছিল না। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। এভাবে ধরে রাজেন একটা টাট্টু ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। সেইরকম জড়িয়ে-মড়িয়ে কী সব দুর্বোধ্য কথা বলছিল সে। স্কুলের সামনে এসে ডাইনে আগাছার ভেতর সরু পায়ে চলা পথ ধরল ইন্দ্র।

শুভদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। লনে চেয়ারগুলো পড়ে আছে। ওরা কেউ নেই। পেছনের গলিরাস্তা দিয়ে বাড়ি ঢুকল ইন্দ্র। শ্যামলী বারান্দার লাগোয়া খোলামেলা উঁচু চত্বরটাতে দাঁড়িয়ে ছিল। চমকে উঠল সে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রাজেন উঠোনে থেবড়ে বসে পড়ল। তারপর বলল, আজ প্রচুর ভাত খাব। দে, আমাকে অনেক ভাত দে। কম দিলে ইট মারব বলে দিচ্ছি। দে! শিগগির ভাত দে। খাব খাব খাব খাব হাঃ!

ইন্দ্র শ্যামলীর কাছে গিয়ে বলল, ভাত-টাত আছে রে দিদি ?

শ্যামলী ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, তুই এবার সত্যি মরার রাস্তা ধরেছিস ইনা! বার বার ইচ্ছে করে নিজের ঘাড়ে ঝামেলা এনে ফেলছিস! কেন ওঁকে নিয়ে এলি ? এতটুকু বুদ্ধি নেই তোর ?

ইন্দ্র চটে গেল।···বেশ করেছি। ভাত না থাকলে বলে দে না। হোটেলে নিয়ে যাব তাহলে!

শ্যামলী গলা চেপে বলল, রাতে ভাত কোথায় পাব ? রুটি বেলে দিচ্ছি। আর শোন, দরজাটা এঁটে দিয়ে আয়। ওঁকে এখানে দেখলে লোকে কেলেংকারি করবে। আনুমাস্টারের টিটেনাস হয়েছে। ওপারের হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে এই একটু আগে নিয়ে গেল। এখনও বোধ হয় নৌকোয় পেরুচ্ছে।

ইন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, ঠিক আছে। ঝটপট রুটি বেলে দে!

কেরোসিন কুকার সামনে রেখে ইন্দ্র রান্নাঘরের দরজার কাছে বসল। শ্যামলী ময়দা মেখে রুটি বেলতে থাকল। উঠোনে রাজেন সমানে বকবক করে চলেছে। শ্যামলী চাপা গলায় বলল, হঠাৎ ওঁকে খেতে ডেকে আনলি যে ? কোথায় পেলি ? তোর জামাইবাবু বলছিল, কুমুরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিশকে ধরিয়ে দেবে।

আনুমাস্টারের অবস্থা ভাল না।

ইন্দ্র বলল, তরকারি আছে তো দিদি ?

হাঁটুতে নাকটা ঘষে শ্যামলী জবাব দিল, আছে। দরজাটা এঁটে দিয়ে আসতে বললাম যে তোকে !

থাক।

কুকারটা ধরিয়ে দে। নাকি তাও পারবি না ?

দিচ্ছি।

ইন্দ্র কুকার ধরাতে গিয়ে গণ্ডগোল করে ফেলল। তখন শ্যামলী তার হাত থেকে দেশলাই কেড়ে নিয়ে ধরাল। বলল, জীবনে একটা কিছুও তো পারবি ইনা ? কেমন করে কী করবি রে ? যদি আমরা না থাকতাম !

ইন্দ্র হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে থালায় রুটি তরকারি আর একটু গুড় নিয়ে ইন্দ্র বারান্দায় গেল। ডাকল, রাজেনকাকা !

উঠোনে কেউ নেই। ইন্দ্র আবার ডাকল, রাজেনকাকা ! কোনো সাড়া এল না। তখন সে শ্যামলীকে থালাটা দিয়ে দৌড়ে উঠোনে নামল। দরজায় গিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকল আবার, রাজেনকাকা ! কোথায় গেলে ?

গলিতে অন্ধকার। অনেকটা গিয়ে খুঁজে ফিরে এল ইন্দ্র।

শ্যামলী দুঃখিত ভাবে বলল, খেতে দেবো বলেই তো কষ্ট করে রুটিগুলো করলাম এই সাত সকালে। তোর জামাইবাবুর গরম গরম না হলে চলে না ! তুই বরং খেয়ে নে রে !

ইন্দ্র আস্তে বলল, আরো কিছুক্ষণ দেখি। যদি ফিরে আসেন !

পাগল রাজেন আর এল না। এল হরিশংকর হাঁফাতে হাঁফাতে।…শামু খবর খারাপ। আনুমাস্টার মারা গেছে। মুকুল ফিরে এসে খবর দিলে। হাসপাতালে যাবার পথেই শেষ। আসলে এই শালা—এক নদী বিশ ক্রোশ না ? তার ওপর ঘাটের মাঝিগুলোও মাইরি বড্ড অলস। অ্যাম্বুলেন্স পার করে আনতেই দেড়ঘণ্টা লাগল। বড় ভাল মানুষ ছিল গো আনুমাস্টার ! সামান্য পাগলের হাতে মরা ওনার কপালে ছিল ! কী আর বলব ? শোন—আমি যাচ্ছি ওপারে। এপার থেকে ঝেঁটিয়ে সবাই যাচ্ছে। আমি না গেলে ভাল দেখায় না।

শ্যামলী চুপ করে থাকল। ইন্দ্র তার ঘরে বসে শুনছিল। সেও চুপ করে থাকল।

হরিশংকর বলল, ইনা নেই ? ও, ওই তো ! ইনা ! এস। তুমিও এস। তোমারও তো…

ইন্দ্র ভেতর থেকে বলল, আপনি গেলেই হবে। আমার শরীর ভাল না।

ও, আচ্ছা !…হরিশংকর শ্যামলীর দিকে ঘুরে বলল, ফিরতে অনেক রাত হতে পারে। কুমুরা চেষ্টা করবে যাতে বডি মর্গে না যায়। মর্গে গেলে সেই কাল বেলা

বারোটার আগে বডি পাওয়া যাবে না। দেখা যাক্। কল্যাণবাবুকে নিয়ে গেছে কুমু।
হরিশংকর চলে গেলে শ্যামলী দরজা বন্ধ করে এল। তারপর ডাকল, ইনা!
কী?
রাজেনবাবুকে তো তাহলে সত্যি পুলিশ ধরবে—তাই না রে?
জানি না।
একটু চুপ করে থেকে শ্যামলী আপন মনে বলল, দ্যাখ ইনা। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল হঠাৎ। তোকেও তো ইট ছুঁড়েছিল। যদি বাইচান্স লাগত তোর মাথায়।
ইন্দ্র কোনো কথা বলল না। সে ড্যাগারটা খুলে অভ্যাসমতো জীর্ণ দেওয়ালে আঁচড় কাটছে।
শ্যামলী বলল, আর কী বুদ্ধি তোর! সেই পাগলা লোকটাকে তুই দিব্যি নিয়ে এলি খাওয়াবি বলে! পাগলের কি দিগ্বিদিক জ্ঞান আছে? কথায় বলে, পাগলের গোবধেও আনন্দ।···

কদিন পরে এক সন্ধ্যায় গঙ্গার আকাশে বিশাল চাঁদ, ইন্দ্র আশ্রমের ঘাটে বসে আছে। আশ্রমে সংকীর্তন শুরু হয়েছে। শান বাঁধানো ঘাটের ওপর জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না জলে। পেছনে পায়ের শব্দে ইন্দ্র চমকাল।—কে?
নিরু বলল, আমি!
ইন্দ্র বলল, কদিন ধরে তোমাকে খুঁজছিলাম।
বাড়িতেই ছিলাম। গেলেই পারতে!
বসো। কথা আছে।—নিরু বসলে ইন্দ্র বলল, তোমার মা বুঝি আশ্রমে?
হুঁ। মায়ের সঙ্গে এসেছি। হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেলাম।
আচ্ছা নিরু, ওই ড্যাগারটা তুমি সত্যি কি বাসস্ট্যান্ডের পেছনে ঝোপে কুড়িয়ে পেয়েছিলে? নাকি···
ও কথা তুলে লাভ কি?
তুমি এটা তোমাদের বাড়িতেই পেয়েছিলে। তাই না?
নিরু আস্তে বলল, হ্যাঁ। বাবার খাটের তলায় জুতোর বাক্সে ভরা ছিল। রক্ত লেগে না থাকলে···
ইন্দ্র ওর একটা হাত নিয়ে বলল, থাক্ গে। এসো, এবার আমরা অন্য কথা বলি। তারপর ঘুরে নিরুর দিকে তাকিয়ে দেখল সে নিঃশব্দে কাঁদছে। ইন্দ্র ড্যাগারটা গঙ্গার বুকের তলায় চাঁদকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। একটা শব্দ হল দূরে।

জলটা হয়তো কাঁপল, কিংবা কাঁপল না। জ্যোৎস্না ঝলমল করতে থাকল। ইন্দ্র বলল, রত্নাবৌদি যদি আসেন, আমরা মহুলার বিলে নৌকো নিয়ে যাব। সেবার খুব জমেছিল, জানো ?
নিরু চুপ করে থাকল।
গঙ্গার আকাশের সেই বিশাল লাল চাঁদের আকার আরও ছোট হয়ে যাচ্ছিল। তার গায়ে ক্রমশ ফুটে উঠছিল সোনালী আভা। জলের বুকে তার প্রতিবিম্বও বদলাতে বদলাতে তরল সোনার ঝলমলানি দেখা দিচ্ছিল। দূরের শ্মশান থেকে একটু পরে ছুটে এল কী এক বাতাস। বাতাসটা দুজনকে কয়েকমুহূর্ত ঘিরে রেখে চলে গেল। তারপর খুব কাছে কোথাও ছায়ার ভেতর একটা পেঁচা ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করে বারতিনেক ডাক দিল। তখন ইন্দ্র নিরুর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, কেন কান্না, নিরু ? বাবার জন্য ? আমি বিশ্বাস করি না। আমার খালি মনে হত—মানে তুমি যেদিন এসে ড্যাগারটা দিয়ে গেলে, সেদিন থেকেই—যে, তুমি বাবার মৃত্যু চাইছ। কিছুতেই বাবাকে ক্ষমা করতে পারছ না। পার নি।
নিরু চোখ মুছে নিজের দুহাঁটুর মাঝখানে মুখ রেখে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আগের বছর কালী পুজোর মেলায় বাবাকে ড্যাগারটা কিনতে দেখেছিলাম। জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, জিনিসটা দেখতে ভাল লাগল। তাই কিনলাম। তখনও বুঝতে পারিনি বাবার উদ্দেশ্য কী।
ইন্দ্র বলল, সেই সন্ধ্যায় অন্ধকার বাস থেকে যখন স্নেহাকর ছিটকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরল, কেউ চেঁচিয়ে উঠেছিল—"খুন! খুন! ইনা খুন করেছে।" তখন গণ্ডগোলের ভেতর গলার স্বরটা চিনতে পারিনি। তারপর বহুদিন ধরে স্মৃতি থেকে সেই স্বর চেনার চেষ্টা করেছি। তারপর জেল থেকে ফিরে যখনই তুমি ড্যাগারটা দিলে, আমার হঠাৎ মনে হল, ওটা মাস্টারমশাইয়ের গলা। কিন্তু তবু বুঝতে পারলাম না, কেন মাস্টারমশাই একাজ করলেন! তাছাড়া ওঁর মত শান্ত ভদ্র মানুষ···
কথা কেড়ে নিরু বলল, কে শান্ত ভদ্র মানুষ ? বাবাকে তুমি তাহলে চেন নি।
ইন্দ্র একটু হাসল। হয়তো তাই। কোনো মানুষই একজন মানুষ নয়।
নিরু মুখ তুলে বলল, তুমি জানো ? এর পর বাবার লক্ষ্য ছিলাম আমি ?
ইন্দ্র হেসে ফেলল। যাঃ! কী যা তা বলছ ? দৈবাৎ ঝোঁকের মুখে একটা ঘটে গেছে বলে···
নিরু বাধা দিয়ে বলল, না। দৈবাৎ নয়। সেইসব কথাই তোমাকে বলতে এসেছি। আজ বিকেলে বাবার বাক্সো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ডাইরি বই পেলাম। টুকরো টুকরো অনেক কথা তাতে লেখা আছে।
বলো কী!
নিরু আবার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে চঞ্চলভাবে মাথা নেড়ে ভাঙা গলায় বলল, তুমি

কিছু জানো না—কিছু জানো না ইন্দ্র। আমার এত ভাল বাবা ভেতর-ভেতর কেন ভীষণ পাগল হয়ে যাচ্ছিলেন—কেন সব কিছুর ওপর ওঁর অত রাগ ছিল—অথচ সব চেপে রাখতেন, এতদিনে বুঝতে পেরেছি। সবকিছুর জন্য আসলে আমি দায়ী, ইন্দ্র!

ইন্দ্র আস্তে বলল, ডাইরিটা আমাকে দেখাবে?

নিরু মুখ নামিয়ে বলল, দেখাতাম! কিন্তু তাহলে যে তুমিও আমাকে আর ভালবাসতে পারবে না ইন্দ্র। আমাকে তুমি ভীষণ ঘেন্না করবে।

ইন্দ্র ওর পিঠে হাত রাখল।…ছেলেমানুষী করে না। আমি তো সব জানি, তুমি স্নেহাকরকে সবকিছু দিয়েছিলে—তোমার কুমারীত্ব, তোমার স্বপ্ন…

ইন্দ্র শ্বাস ছেড়ে চুপ করল। কয়েক মুহূর্ত পরে ফের বলল, দেখ নিরু, ওসবে আমার কিছু যায় আসে না। ওই যে সব—কুমারীত্ব কিংবা সতীত্ব—শরীর! শরীর-টরীর নিশ্চয় একটা ব্যাপার। কিন্তু আমার ওসবে বিশ্বাস নেই। তা যদি থাকত, তোমাকে সত্যি ঘৃণা করতাম, নিরু! তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

নিরু ওর দিকে তাকাল। নিরুর চোখে জ্যোৎস্না ঝকমক করছিল। বলল, ঘৃণা কর না?

না।

তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে?

সেটা অন্য প্রশ্ন, নিরু।

বুঝেছি। তাহলেই দেখ ইন্দ্র, মুখে ওসব বড়-বড় কথা বলা কত সোজা।

ইন্দ্র ঝাঁঝালো স্বরে বলল, বিয়ে করাটাই কি বড় কথা? আমার চাকরি-বাকরি নেই। পরাশ্রিতা। অবশ্য বলতে পারো, তোমার দাঁড়াবার মতো একটা মোটামুটি শক্ত জায়গা আছে। কিন্তু আমি কি ভাবছ, তোমাদের বাড়ি গিয়ে থাকব?

ইন্দ্র শেষ বাক্যটা বলতে গিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল। ফের বলল, আমার জামাইবাবুর ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স দেখতে পাও না! ·ছাড়ো এসব কথা। ডাইরিটা আমি দেখতে চাই।

নিরু সংযত ভাবে উঠে দাঁড়াল। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল শান্ত পা ফেলে। ইন্দ্র তাকে অনুসরণ করল না। কিছু বললও না। ওপরে উঠে নিরু ঘুরল। বলল, দেখবে না?

এবার ইন্দ্র হাসতে হাসতে উঠল। আমি ভাবলাম, তুমি আমার কথা শুনে রাগ করে চলে যাচ্ছ।

আশ্রমে খোলকত্তালের উদ্দাম বাজনার সঙ্গে জোরালো গলায় কীর্তনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বেড়ার ধারে একফালি পায়ে চলা পথে ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। আশ্রম পেরিয়ে আগাছার জঙ্গলের রাস্তায় পৌঁছে নিরু হঠাৎ বলল, তুমি সুরিন ড্রাইভারের মেয়ের প্রেমে পড়েছ। তাই না ইন্দ্র?

ইন্দ্র আনমনে হাঁটছিল। আনমনেই বলল, তুমি একথাটা অনেকদিন ধরে বলছ কিন্তু!

বলছি। দেখছি, তাই। -

আমি শশাংক নই, নিরু।

তফাৎ বুঝতে পারছি না।

ইন্দ্র মনে মনে রুষ্ট হয়ে বলল, ছেড়ে দাও! সে তুমি বুঝবে না।

নিরু দাঁড়িয়ে গেল। তুমি বুঝিয়ে বললে কেন বুঝব না ইন্দ্র?

বুঝবে!

তুমি বলো।

ইন্দ্র পা বাড়িয়ে বলল, তুমি দুঃখ পাবে হয়তো। তোমার কষ্ট হবে।

না। নিরু শক্ত গলায় ফের বলল, হবে না। তুমি বলো।

জেল থেকে ফেরার পর কেন কে জানে···ইন্দ্র শ্বাস ফেলে বলল, কেন জানি না, ইনোসেন্স ব্যাপারটা আমাকে এত টানে নিরু! ভীষণ অবাক হয়ে যাই কোথাও ইনোসেন্স দেখতে পেলে। ওই মেয়েটা—কমিলা! এসেই ওকে দেখলাম, কতো বড় হয়ে উঠেছে। দেখে গেছি, ফ্রকপরা একরত্তি মেয়ে। এবার দেখলাম, 'সবুজ ঘাসের ওপর আশ্চর্য ঝলমলে একটা ফুলের মতো।' বলোতো কার লেখা এই লাইনটা?

স্নেহাকরের।

হ্যাঁ, স্নেহাকরের। এই পদ্যটা আমাকে শুনিয়েছিল। আমি তখন কিচ্ছু বুঝিনা। এখনও পদ্য বুঝিনা। কিন্তু ওই লাইনটা বুঝি। ওটা ইনোসেন্স। আমার ইচ্ছে করে, কোথাও ইনোসেন্স থাক মানুষের জীবনে। মুগ্ধচোখে দেখি, উপভোগ করি। চারপাশে যখন এত কালো দাগ খাপচা-খাপচা ছড়ানো। তার মধ্যে একটু সাদা ফাঁকা জায়গা।

ইন্দ্র একটু হেসে ফের বলল, পুটুদার সংসর্গে একটু-একটু করে ওর ছবি চিনতে শিখেছি। ওর ছবির মধ্যে নাকি এসব কথা থাকে। কিন্তু আমার—ওই যে বললাম, হঠাৎ কোথাও এতটুকু ভাল জিনিস—মানে ওই ইনোসেন্স···

ইন্দ্র থেমে গেল হঠাৎ। নিরু বলল, চুপ।

কারা যাচ্ছিল দল বেঁধে। তাদের পাশ দিয়ে তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। তারপর নিরু বলল; বুঝেছি।

বুঝেছ?

হুঁউ। আমি তো কম বয়সে নষ্ট হয়ে যাওয়া মেয়ে, ইন্দ্র!

ছিঃ নিরু! আমি এমন করে কিছু বলিনি। তাছাড়া তোমার ব্যাপারটা ওভাবে আমি দেখি না।

কীভাবে দেখ?

রাগ করো না নিরু! আমি জানি, তুমি মাস্টারমশাইয়ের কড়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলে—খুব কম বয়স থেকেই। তুমি তাই একই সঙ্গে কুমু, স্নেহাকর আর আমার—এমন কী ঐ গাড়োল শশাংকের সঙ্গেও চুপিচুপি মেলামেশা করতে। কিন্তু আমি তোমাকে সেভাবে কখনও চাইনি, তুমি ভালই জানো। একবার মুক্তকেশীর মন্দিরের পেছনে কল্কেফুলের জঙ্গলে ঢুকে তুমি আমাকে···

নিরু ওর দিকে ঘুরে ধমকের সুরে বলল, চুপ করো তো!

নির্জন রাস্তায় চকরাবকরা ছায়া। গাছপালার গায়ে কুয়াশার নীল জামা। সদর দরজার তালা খুলে নিরু একটু হাসল।···মা যদি টের পায়, আমি তালাচাবির এই সব সদ্‌গতি করছি, আর চাবি পাব না। শোনো, ডাইরিটা আমি নিয়ে আসছি। তুমি অন্য সময় পড়বে।

ইন্দ্র বলল, ঠিক আছে। এখানেই থাকছি। তুমি নিয়ে এস।···

•

নিরুকে আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরল ইন্দ্র। তখনও হরিশংকর বাড়ি ফেরেনি। শ্যামলী বারান্দায় বসে ট্রানজিস্টারে গান শুনছিল। ইন্দ্রকে দেখে আওয়াজ কমিয়ে বলল, কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? পুটু খুঁজছিল তোকে। টাউনে স্টুডিও খুলছে বলল। তোকে ওর সঙ্গে থাকতে হবে। আর সব কী যেন বলল! তুই দেখা করে আয়।

ইন্দ্র হাসল। বাঃ! তাহলে আমারও একটা গতি হবে! কিন্তু আমি কি ছবি আঁকতে জানি নাকি?

শ্যামলী আওয়াজ বাড়িয়ে ফের গানে মন দিল। ইন্দ্র তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। শুভর সঙ্গে থাকাটা মন্দ নয়। সাইনবোর্ডে ধ্যাবড়া করে রঙ বুলোতে অন্তত পারবে ইন্দ্র! সে তাক থেকে মোম খুঁজে নিয়ে জ্বালাল। কালো ডাইরি বইটা কিছুক্ষণ হাতে ধরে রাখল। মনটা খুশি-খুশি লাগছে। সে বুঝতে পারছে না কেন—কিসের জন্য এই মনের ভাব হাল্কা হয়ে ওঠা আনন্দ তাকে পেয়ে বসেছে! এমন সময় আনুমাস্টারের ডাইরিটা পড়া উচিত হবে কি?

দ্বিধা নিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল। কতক্ষণ চোখ বুজে সিগারেট টানার পর চোখ খুলে দেখল, ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি হয়ে গেছে। জানালা খুলে দিল। তারপর ডাইরিটা খুলল।

অনেক কাল আগের এই ডাইরির পাতার রঙ ঘোলাটে হয়ে গেছে। তার ওপর টুকরো টুকরো কিছু বাক্য ডট পেনে লেখা। জায়গায় জায়গায় অস্পষ্ট।···

···সারাজীবন এরকম হচ্ছে। আমি চাইছি যা, তার উল্টো হয়ে যাচ্ছে। কেন? আমি ভাগ্যফল মানি না। ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। কিন্তু মনে হচ্ছে, এর পেছনে যেন কার কারচুপি আছে। কে সে? তাকে সামনে পেলে দেখে নিতাম।'

'···সুচরিতাকেও আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল সেই অদৃশ্য পেছনের

চক্রান্তকারী। আমি একা হয়ে গেলাম। বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এ কি আমারই ব্যর্থতা ?·· প্রবল সন্দেহ। এই সাধু পূর্বাশ্রমে সুচরিতার খুব আপনজন ছিল।··· এ বয়সে আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না। পৃথিবী উচ্ছন্নে যাক।'

ইন্দ্র ডাইরির পরের পাতা ওল্টালো। আবার এক টুকরো লেখা।

'···নিরুর সঙ্গে স্নেহাকরের বিয়ে দিলে কত ভাল হত। কিন্তু ভয় হচ্ছে, স্নেহাকর নিরুকে সামলাতে পারবে না। নিরু বড় দুরন্ত। ও কারুর শাসন মানবার পাত্রী নয়। দেখা যাক। দুটিতে বড় হয়ে উঠুক।'

'নিরুকে আজ উঠোনের পেয়ারাগাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম। ওর মা এসে ছাড়িয়ে দিল। আমারই কষ্ট হচ্ছিল। নিরুও আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ কী ব্যর্থতা !'

পরের পাতায় ঃ

'···স্নেহাকরকে খুব ভাল ছেলে মনে করতাম। ওর ভাবগতিক ভাল মনে হচ্ছে না। ওকে আশ্রয় দিয়েছি। ওকে মানুষ করতে চাইছি। কিন্তু ওর মন অন্য কোথাও বাঁধা আছে। ও পদ্য লেখে। কিন্তু এই বল্‌গাছাড়া মানসিকতার পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে। কী সেটা ? খুঁজে দেখতেই হবে।'

পরের পাতায় ঃ

'···নিরুর জ্বর বলে স্কুলে যায় নি আজ। স্কুলে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করলাম স্নেহাকর নেই। অথচ সে স্কুলে যাবে বলে বেরিয়েছিল। মুক্তকেশী মন্দিরের পেছনের জঙ্গলে ওদের একটা আড্‌ডা আছে জানি। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, মাথা ঘুরে গেল। নিরু আর স্নেহাকর বসে আছে। স্নেহাকর সিগারেট দিল নিরুকে। নিরু টানতে লাগল। দেখে চুপিচুপি সরে এলাম। একটা বড় শাস্তি সময় মতো ওদের দিতে হবে।'

পরের পাতায় স্নেহাকর ও নিরুর এমনি সব টুকরো ঘটনা। ইন্দ্র পাতা ওল্টাতে থাকলো। স্কুল জীবনের অনেক ছোটখাট ঘটনাও লিখে রেখেছেন আনুমাস্টার। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একখানে চোখ পড়ল ইন্দ্রের।

'···কাল দুপুরে স্নেহাকরকে বললাম, তোমার কলেজের মাইনে বাকি পড়েছে শুনলাম ! আমার কাছে নিয়ে যেও। স্নেহাকর বলল, ক্ষমা করবেন মাস্টারমশাই ! আপনি অনেক দিয়েছেন। আর কেন ? ও আমি ম্যানেজ করে নেব। ভাববেন না। ও চলে গেলে আমার খুব রাগ হল। পাটোয়ারিজীর গদিতে গিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। স্নেহাকরের আত্মমর্যাদায় লেগেছে। সেটা ভালই। কিন্তু ও তো জানে নিরুকে ওকেই গ্রহণ করতে হবে। শ্বশুরের টাকায় কি কেউ লেখাপড়া শেখেনা এদেশে ? রাজেনকে বুঝিয়ে বলতে হবে।'

আরো কয়েকপাতা পড়ার পর ইন্দ্র বুঝল, ভেতরে-ভেতরে আনুমাস্টার স্নেহাকরকে জামাই করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। রাজেন কণ্ডাক্টারের আপত্তি ছিল না।

কিন্তু স্নেহাকর বেঁকে বসছিল ক্রমশ।

আবার একখানে দৃষ্টি আটকে গেল ইন্দ্রের। চমকে উঠল।

'...যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই হল। নির্বোধ মেয়েটার সর্বনাশ করেছে শুওরের বাচ্চা। অথচ আশ্চর্য, সুচরিতা কী নির্বিকার! মেয়েকে নির্লিপ্ত মুখে ওপারে কোথায় নিয়ে গেল। আমি শক্ত হয়ে বসে রইলাম বাড়িতে। সন্ধ্যায় ফিরে সুচরিতা বলল, নিরুকে একমাসের জন্য নৈহাটীতে রেখে আসব। তুমি যেন হৈ চৈ বাধিও না। আমি বললাম, যা ভাল বোঝো, করো। আমি আর সাতে পাঁচে নেই।'

ইন্দ্রের মনে পড়ছিল, আগের বছর পুজোর সময় মাসখানেক নিরুকে দেখতে পায়নি বটে। ডাইরিতে আর তার চোখ রাখতে ইচ্ছে করছিল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ টানার পর আনমনে সে একটা পাতা ওল্টাল।

'...কালীপুজোর দিন স্নেহাকরকে ধরেছিলাম। অনেকদিন সে আমার চোখের আড়ালে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল! বলল, ক্ষমা করবেন মাস্টারমশাই! আপনার মেয়ের সর্বনাশ আমি করিনি। অন্য কেউ করেছে। তখন আমি ওকে চার্জ করলাম, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। স্নেহাকরের কী স্পর্ধা! বলল, তাহলে হাতেনাতে ধরেন নি কেন? আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। নিরু আমার মেয়ে! মেয়ের বাবা হয়ে, ছিঃ!'

'...কালীপুজোর মেলায় আজ বিকেলে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। এক খানে দেখি, ছুরি বল্লম এসব বিক্রি করছে। হঠাৎ খেয়াল গেল, একটা ছোরা কিনে ফেললাম। ছোরাটা ভারি সুন্দর মনে হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে দেখি, নিরু চুপচাপ একা বসে আছে। ওর শরীরটা এতদিনে সেরেছে। ওকে একা বসে থাকতে দেখে চোখ ফেটে জল এল। নিজের ওপর রাগ হল তখন। আমি না শক্ত মানুষ! বললাম, নিরু! এই ড্যাগারটা কিনলাম মেলায়। কেমন সুন্দর না? নিরু দেখে বলল, ড্যাগার কী হবে? বললাম, তোর জন্য। নিরু অবাক হয়ে গেল। কিন্তু ও কিছু বোঝবার আগে ওটা দ্রুত ঘরে নিয়ে গেলাম।'

পরের পাতায়।

'...কেন বেঁচে আছি? নিজের শক্তির বড়াই আর আমার সাজে না। ড্যাগারটা আমাকে খালি তাতাচ্ছে ভেতর-ভেতর। সুযোগ পেলেই লুকিয়ে ওটা বের করে দেখি। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুঝতে পারি, আড়ালের চক্রান্তকারীকে ঢিট করার শক্তি আমার আছে। অথচ তারপর ক্লান্তি আসে। মনে হয়, কেন বেঁচে থাকা আর? নিজের যে শক্তিকে আমি ব্যবহার করতে পারছিনা, কেন তাকে দেখে বৃথা উত্তেজনা? নাঃ, আমার দ্বারা কিছুই হবে না।'

পরের পাতায়।

'আজ বিকেলে স্কুল থেকে বেরিয়ে কী খেয়াল হল, ইটখোলার কাছে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল, দূরে একটা ঢিবির ওপর ঝোপের আড়ালে কারা বসে

আছে—একজন মেয়ে। সন্দেহক্রমে চুপিচুপি এগিয়ে গিয়ে দেখি, অবিশ্বাস্য! আবার স্নেহাকরের সঙ্গে মিশছে নিরু! নির্লজ্জ মেয়ে! আমারই শরীরের এক দুষ্টব্রণ। সঙ্গে ড্যাগারটা যদি থাকত! আফশোস করতে করতে পিছু হটে এলাম। একটা প্ল্যানিং দরকার।

ইন্দ্র ডাইরিটা সশব্দে বন্ধ করে দিল। আনুমাস্টারের পরিকল্পনা যেভাবেই হোক, একটু বদলে গিয়েছিল। ড্যাগারের প্রথম বলি হল স্নেহাকর। কিন্তু এরপর কি নিরুকেও খুন করবেন বলে সেই রক্তাক্ত ড্যাগার লুকিয়ে রেখেছিলেন আনুমাষ্টার? ইন্দ্র শিউরে উঠল। নিরুর জন্য তার কষ্ট হচ্ছিল। ইন্দ্র দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। শ্যামলী ট্রানজিস্টারে মগ্ন।

ইন্দ্র আশ্রমের দিকে চলতে লাগল। আশ্রমে ঢুকে নিরুর কাছাকাছি বসে সে আজ রাতে কিছু ধর্মসঙ্গীত শুনবে।···